জিজ্ঞাসে কোন জন

গোরাচাঁদ মিত্র

সুপ্রকাশিনী
৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র
৮ বি, কলেজ রো,
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচিপত্র

মহরম পর্ব

মীর মশাররফ হোসেন

হোসেন সপরিবারে ষষ্টি সহস্র সৈন্য লইয়া নির্বিঘ্নে কুফায় যাইতেছেন। কিন্তু কতদিন যাইতেছেন, কুফার পথের কোনো চিহ্নই দেখিতে পাইতেছেন না। একদিন হোসেনের অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া গেল। ঘোড়ার পায়ের খুর মৃত্তিকা মধ্যে দাবিয়া যাইতে লাগিল। কারণ কী? এইরূপ কেন হইল? কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী হোসেনের মনে পড়িল। নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হোসেন গণনা করিয়া দেখিলেন, আজ মহরম মাসের ৮ই তারিখ। তাহাতে আরো ভয়ে ভয়ে অশ্ব কশাঘাত করিয়া কিঞ্চিত অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। চক্ষুনির্দিষ্ট সীমামধ্যে মানব-প্রকৃতি জীবজন্তুর নামমাত্র নাই। আতপতাপ নিবারণোপযোগী কোনো প্রকার বৃক্ষও নাই, কেবলই প্রান্তর— মহা প্রান্তর। প্রান্তরসীমা যেন গগনের সহিত সংলগ্ন হইয়া ধু-ধু করিতেছে। চতুর্দিকে যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বরে আক্ষেপ— 'হায়! হায়!!' শব্দ উত্থিত হইয়া নিদারুণ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। জনপ্রাণীর নামমাত্র নাই, কে কোথা হইতে শব্দ করিতেছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। বোধ হইল যেন শূন্যপথে শত সহস্র মুখে, 'হায়! হায়' শব্দে চতুর্দিক আকুল করিয়া তুলিতেছে।

হোসেন সকরুণ স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গীগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল, হাস্য-পরিহাস দূর কর ; সর্বশক্তিমান জগৎনিদান করুণাময় ঈশ্বরের নাম মনে কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, ভাই রে! মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, 'যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয়ই জানিও সেই তোমার জীবন বিনাশের নির্দিষ্ট স্থান এবং তাহারই নাম 'দাস্ত কারবালা'। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়, পথ ভুলিয়া আমরা কারবালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা কি কর্ণে কিছু শুনিতে পাইতেছ? দৈব শব্দ কিছু শুনিতেছ?" তখন সকলেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন, চতুর্দিকেই, 'হায়! হায়!' রব। ধন্য নূরনবী মোহাম্মদ! হোসেন বলিলেন, "মাতামহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, চতুর্দিকে যেস্থানে 'হায়! হায়!' শব্দ উত্থিত হইবে নিশ্চয় জানিও, সেই কারবালা। ঈশ্বরের লীলা কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। কোথায় যাইব? যাইবারই-বা সাধ্য কী? কোথায় দামেস্ক, কোথায় মদীনা, কোথায় কুফা আর কোথায় কারবালা। আমি কারবালায় আসিয়াছি, আর উপায় কী? ভাই সকল! ঈশ্বরের নাম করিয়া গমনে ক্ষান্ত দাও।" ক্রমে ক্রমে সঙ্গীরা সকলেই আসিয়া একত্রিত হইল। হোসেনের মুখে কারবালার বৃত্তান্ত এবং চতুর্দিকে

'হায়! হায়!' রব স্বকর্ণে শুনিয়া সকলেরই মুখে কালিমারেখা পড়িয়া গেল। যে যেখানে হইতে শুনিল, সে সেইখানেই অমনি নীরবে বসিয়া পড়িল।

হোসেন বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আর চিন্তা কী? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে ভাবনা কী? এই স্থানেই শিবির নির্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভব করিয়া তাঁহারই নাম ভবসা করিয়া থাকিব। সম্মুখে প্রান্তর, পার্শ্বে ভয়ানক বিজন বন, কোথায় যাই? অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহাই ঘটিবে, এক্ষণে চিন্তা বিফল। শিবির নির্মাণের আয়োজন কর। আমি জানি, ফোরাত নদী এই স্থানের নিকট প্রবাহিত হইতেছে। দূর কত এবং কোন দিকে, তাহা নির্ণয় করিয়া কেহ কেহ জল আহরণে প্রবৃত্ত হও। পিপাসায় অনেকেই কাতর হইয়াছেন, আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আপাতত ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ কর।"

শিবির নির্মাণ করিবার কাষ্ঠস্তম্ভ সংগ্রহ করিতে এবং রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, শোণিতাক্ত কুঠারহস্তে অত্যন্ত বিষাদিত চিত্তে কম্পাকুল লোচনে তাহারা হোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, "হযরত, এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমরা কোনো স্থানেই দেখি নাই, কোনোদিন কাহারো মুখে শুনিও নাই। কী আশ্চর্য! এমন আশ্চর্য ঘটনা জগতে কোনো স্থানে ঘটিয়াছে কি না তাহাও সন্দেহ। আমরা বনে নানা প্রকার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম ; যে বৃক্ষের যে স্থানে কুঠারাঘাত করিলাম, সেই বৃক্ষেই অজস্র শোণিত চিহ্ন দেখিয়া ভয় হইল। ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। এই দেখুন! আমাদের সকলের কুঠারে সদ্যশোণিত চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।"

হোসেন কুঠারসংযুক্ত শোণিতদর্শনে বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই এই কারবালা। তোমরা সকলে এই স্থানে 'শহীদ' স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, তাহারই লক্ষণ এই শোণিত চিহ্নে দেখাইতেছে। উহাতে আর আশ্চর্যান্বিত হইও না, ঐ বন হইতেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর। দারু-রস শোণিতে পরিণত দেখিয়া আর ভীত হইও না।"

ইমামের বাক্যে সকলেই আনন্দোৎসাহে শিবির সংস্থাপনে যত্নবান হইলেন। সকলেই আপন আপন সংস্থানোপযোগী এবং ইমামের পরিবারবর্গের অবস্থান জন্য অতি নির্জন স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া যথাসম্ভব বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

আরবদের দাসের অভাব নাই। যে সকল ক্রীতদাস হোসেনের সঙ্গে ছিল, তাহারা কয়েকজন একত্রিত হইয়া ফোরাতের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, দুঃখে ফিরিয়া আসিয়া সকাতরে ইমামের নিকট বলিতে লাগিল, "বাদশাহ নামদার! আমরা ফোরাত নদীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলাম। পূর্ব উত্তর প্রদক্ষিণ করিয়া শেষে পশ্চিমদিকে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ফোরাত নদী কুলকুল রবে দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। জলের নির্মলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জলেপানেচ্ছা আরো চতুর্গুণরূপে বলবতী হইল, কিন্তু নদী তীরে অসংখ্য সৈন্য সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি সতর্কতার সহিত নদীর জল রক্ষ্য করিতেছে। যতদূর দৃষ্টির ক্ষমতা হইল দেখিলাম, এমন কোনো স্থানই নাই যে, নির্বিঘ্নে একবিন্দু জল লইয়া

পিপাসা নিবৃত্তি করা যায়। আমরা সৈন্যদিগকে কিছু না বলিযা যেমন নদীর তীরে যাইতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহারা অমনি অতি কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বলিল, "মহারাজ এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত নদীকূল রক্ষিত হইতেছে, এই রক্ষক বীরগণের একটি প্রাণ বাঁচিয়া থাকিতে একবিন্দু জল কেহ লইতে পারিবে না। আমাদের মস্তকের শোণিত ভূতলে প্রবাহিত না হইলে ফোরাতপ্রবাহে কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। জল লইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করা তো অনেক দূরের কথা! এবার ফোরাতকূল চক্ষে দেখিয়াই ইহজীবন সার্থক করিয়া গেলে, যাও, ভবিষ্যতে এদিকে আসিলে, আমার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত থাকিতে হইবে। নদীর তীরে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া যাও ; নিশ্চয় জানিও, ফোরাতে সুস্নিগ্ধ বারি তোমাদের কাহারো ভাগ্যে নাই।"

কথা শুনিয়া হোসেন মহাব্যস্ত হইলেন ; খাদ্যাদির অভাব না থাকিলেও জল বিহনে কীরূপে বাঁচিবেন, এই চিন্তাই প্রবল হইল। মদিনার বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে রহিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ যখন পিপাসায় কাতর হইবে, জিহ্বা কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া অর্ধোচ্চারিত কথা বলিতেও ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কী করিবেন? এই চিন্তায় হোসেন ফোরাত নদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী উপায় জয়লাভ করিবেন ভাবিতেছেন, দেখিতে পাইলেন যে, চারি জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার শিবির লক্ষ্য করিয়া সম্ভবত কিছু ত্রস্তে চলিয়া আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন, মোসলেম আমরা কুফা গমনে বিলম্ব দেখিয়া হয়তো সৈনিকগণকে কোনো স্থানে রাখিয়া অগ্রে আমার সন্ধান লইতে আসিয়াছে।

আগন্তুক চতুষ্টয় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কল্পনা যে ভ্রমসঙ্কুল, তাহা প্রমাণ করাইয়া দিল। শেষে দেখিলেন যে, তাহারা অপরিচিত ; এমনকি কোনো স্থানে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন কি না, তাহাও বোধ হইল না। সৈন্য চতুষ্টয় নিকটে আসিয়াই অপেক্ষাকৃত হোসেনের পদচুম্বন করিল। তন্মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত সজ্জিত পুরুষ কিঞ্চিৎ অগ্রসর লইয়া নতশিরে বলিতে লাগিলেন, "হযরত, দুঃখের কথা কী বলিব, আমরা এজিদের সৈন্য, কিন্তু আপনার মাতামহ-উপদিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত। আমাদের কথায় অবিশ্বাস করিবেন না, শত্রুর বেতনভোগী বলিয়াও শত্রু মনে করিবেন না। আমরা কিছুরই প্রত্যাশী নহি, কেবল আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কয়েকটি মাত্র কথা বলিতে অতি সাবধানে আপনার শিবিরে আসিয়াছি। সময় যখন মন্দ হইয়া ওঠে, তখন চতুর্দিক হইতেই অমঙ্গল ঘটিয়ে থাকে। এক্ষণে আপনার চতুর্দিকেই অমঙ্গল দেখিতেছি, মোসলেমের ন্যায় হিতৈষী বন্ধু জগতে আপনার কেহ হইবে না। আবদুল্লাহ জেয়াদ আপনার প্রাণ বিনাশ করিবার আশায় ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। ভাগ্যগতিকে মোসলেম কুফায় যাইয়া আবদুল্লাহ জেয়াদের হস্তে বন্দি হইলেন। শেষে তাহারই চক্রে ওত্‌বে অলীদ এবং মারওয়ানের সহিত যুদ্ধে মোসলেম বীরপুরুষের ন্যায় শত্রু বিনাশ করিয়া সেই শত্রুহস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যে সহস্র সৈন্য ছিল, তাহারাও ওত্‌বে অলীদ ও জেয়াদের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বর্গবাসী হইয়াছে।

এক্ষণে সীমার, ওমর আপনাব প্রাণবধের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টায় আছে। মারওয়ান, ওত্‌বে অলীদ এ পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এজিদের আজ্ঞাক্রমে আমরাই ফোরাত নদীকূল একেবারে বন্ধ করিয়াছি। মনুষ্য দূরে থাক, পশুপক্ষীকেও না ছাড়িয়া দিলে নদী তীরে যাইতে কাহারো সাধ্য নাই। সংক্ষেপে সকলই বলিলাম, যাহা ভালো বিবেচনা হয় করিবেন।" এই বলিয়াই আগন্তুক হোসেনের পদচুম্বন করিয়া চলিয়া গেল।

মোসলেমের দেহত্যাগের সংবাদে হোসেন মহা শোকাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হা ভ্রাতঃ মোসলেম। যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহাই ঘটিল। হোসেনের প্রাণ বিনাশ করিতেই যদি আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কোনো ষড়যন্ত্র করিযা থাকে, তবে সে যন্ত্রে আমিই পড়িব, হোসেনের প্রাণ তো রক্ষা পাইবে! ভাই নিজ প্রাণ দিয়া হোসেনকে জেয়াদের হস্ত হইতে রক্ষা করিলে। তুমি তো মহাঅক্ষয় স্বর্গসুখে সুখী হইয়া জগৎযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলে। আমি দূরন্ত কারবালা প্রান্তরে অসহায় হইয়া বিন্দুমাত্র জীবন প্রত্যাশায় বোধহয় সপরিবারে জীবন হারাইলাম। রে দুরন্ত পাপিষ্ঠ জেয়াদ! তোর চক্রে মোসলেমকে হারাইলাম। তোর চক্রেই আজ সপরিবারে জলবিহনে মারা পড়িলাম!" মোসলেমের জন্য হোসেন অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। ওদিকে জলাভাবে তাঁহার সঙ্গীগণমধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

ক্রমে সকলেই পিপাসাক্রান্ত হইয়া হোসেনের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "জলাভাবে এত লোক মরে! পিপাসায় সকলেই শুষ্ককণ্ঠ, এক্ষণে আর তো সহ্য হয় না!"

সকাতরে হোসেন বলিলেন, "কী করি! বিন্দুমাত্র জলও পাইবার প্রত্যাশা নাই। ঈশ্বরের নামামৃত পান ভিন্ন পিপাসা নিবৃত্তির আর এখন কী উপায় আছে? বিনা জলে যদি আপন আপন স্থানে যাইয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ কর।" সকলেই পরমেশ্বরে শিবিরে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ৯ই তারিখ কাটিয়া গেল, দশম দিবসের প্রাতে হোসেনের মহা কোলাহল। "প্রাণ যায় আর সহ্য হয় না" এই প্রকার গগনভেদী শব্দ উঠিতে লাগিল। পরিবারস্থ সকলের আর্তনাদে এবং কাতরস্বরে হোসেন আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। উপাসনায় ক্ষান্ত দিয়া, হাসনেবানু ও জয়নাবের বস্ত্রাবাসে যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কন্যা, পুত্র এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা আসিয়া একবিন্দু জলের অন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

শাহরেবানু দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানটি ক্রোড়ে করিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, 'আজ সাত রাত নয় দিনের মধ্যে একবিন্দু জল স্পর্শ করিলাম না। পিপাসায় আমার জীবন শেষ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না; কিন্তু স্তনের দুগ্ধ পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। এই সময়ে একবিন্দু জল কোনো উপায়ে ইহার কণ্ঠে প্রবেশ করাইতে পারিলেও বোধহয় বাঁচিতে পারিত।"

হোসেন বলিলেন, "জল কোথায় পাইব? এজিদের সৈন্যগণ ফোরাত নদীকূল আবদ্ধ করিয়াছে, জল আনিতে কাহারো সাধ্য নাই।"

শাহরেবানু বলিলেন, "এই শিশুসন্তানটির জীবন রক্ষার্থে যদি আপনি নিজে গিয়াও

উহাকে কিঞ্চিৎ জল পান করাইতে পারেন, তাহাতেই-বা হানি কী? একটি প্রাণ তো রক্ষা হইবে? আমাদের জন্য আপনাকে যাইতে বলিতেছি না।"

হোসেন বলিলেন, "জীবনে কোনোদিন শক্রুর নিকট, কি বিধর্মীর নিকট কোনো বিষয়ে প্রার্থী হই নাই। কাফেরের নিকট কোনো কালে কিছু প্রার্থনা করি না, জল চাহিলে কিছুতেই পাইব না। আর আমি এই শিশুর প্রাণরক্ষার কারণেই যদি তাহাদের নিকট জল ভিক্ষা করি, তবে আমি চাইলে তারা জল দিবে কেন? আমার মনঃকষ্ট, মনোবেদনা দিতেই তো তাহারা কারবালায় আসিয়াছে, আমার জীবন বিনাশ করিবার জন্যই তো তাহারা ফোরাতকূল আবদ্ধ করিয়াছে।"

শাহরেবানু বলিলেন, "তাহা যাইই বলুন, বাঁচিয়া থাকিতে কী বলিয়া এই দুগ্ধপোষ্য সন্তান দুগ্ধ পিপাসায়— শেষে জল পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, ইহাই কীরূপে স্বচক্ষে দেখিব!"

হোসেন আর দিরুক্তি করিলেন না। সত্বর উঠিয়া গিয়া অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনিয়া বলিলেন, "দাও! আমার ক্রোড়ে দাও! দেখি আমার সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া দেখি।"— এই বলিয়া হোসেন অশ্বে উঠিলেন, শাহরেবানু সন্তানটি হস্তে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্বামীর ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মুহূর্তমধ্যে ফোরাত নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নদীতীরস্থ সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাই সকল, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মুসলমান থাক, তবে এই দুগ্ধপোয্য শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিত জল দান কর। পিপাসায় উহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া একেবারে নীরস কাষ্ঠের ন্যায় হইয়াছে! এ সময়ে কিঞ্চিৎ জলপান করাইতে পারিলেও বোধহয় বাঁচিতে পারে। তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই, এই শিশুসন্তানটির জীবন রক্ষার্থে ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ জল দান কর। এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণরক্ষা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

কেহই উত্তর করিল না। সকলেই একদৃষ্টে হোসেনের দিকে চাহিয়া রহিল। পুনরায় হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল। এ দিন চিরদিন তোমাদের সুদিন থাকিবে না; কোনোদিন ইহার সন্ধ্যা হইবেই হইবে। ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর; তাঁহাকে একটু ভয় কর! ভ্রাতৃগণ, পিপাসায় জলদান মহা পুণ্য, তাহাতে আবার অল্পবয়স্ক শিশু। ভ্রাতৃগণ, ইহার জীবন আপনাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি সামান্য সৈনিক পুরুষ নহি; আমার পিতা মহামান্য হযরত আলী, মাতামহ নূরনবী হযরত মোহাম্মদ, মাতা ফাতেমা জোহরা খাতুনে জেন্নাত। এই সকল পুণ্যাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিয়াই এই শিশুসন্তানটির প্রতি অনুগ্রহ কর। মনে কর যদি আমি তোমাদের নিকট কোনো অপরাধে অপরাধী থাকি, কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য বালক, তোমাদের কোনো অনিষ্ট করে নাই। ইহার প্রতি দয়া করিয়াই ইহার জীবন রক্ষা কর।"

সৈন্যগণ মধ্যে একজন বলিল, "তোমার পরিচয় জানিলাম, তুমি হোসেন। তুমি সহস্র অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেও তোমাকে জল দিব না। তোমার পুত্র জল পিপাসায় জীবন হারাইবে তাহাতে তোমার দুঃখ কী? তোমার জীবনই তো এখন যাইবে ; সন্তানের দুঃখে

না কাঁদিয়া তোমার নিজের প্রাণের জন্য কাঁদ;— অসময়ে পিপাসায় কাতর হইয়া কারবালায় প্রাণ হারাইবে, সেই দুঃখে একবার ক্রন্দন কর, শিশুসন্তানের জন্য আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই তোমার সকল জ্বালাযন্ত্রণা একেবারে নিবারণ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি হোসেনের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিল! ক্ষিপ্রহস্তনিক্ষিপ্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণ হোসেনের বক্ষে না লাগিয়া ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানের বক্ষ বিদারণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। হোসেনের ক্রোড়ে রক্তে ভাসিতে লাগিল।

হোসেন বলিতে লাগিলেন, 'ওরে পাষাণহৃদয়! ওরে শরনিক্ষেপকারী! কী কার্য করিলি! এই শিশুসন্তান বধে তোর কী লাভ হইল? হায়! হায়! আমি কোন মুখে ইহাকে লইয়া যাইব! শাহরেবানুর নিকট গিয়াই-বা কী উত্তর করিব।" হোসেন মহাখেদে এই কয়েকটি বলিয়াই সরোষে অশ্বচালনা করিলেন। শিবিরসম্মুখে আসিয়া মৃত সন্তান ক্রোড়ে লইয়াই লম্ফ দিয়া অশ্ব অবতরণ করিলেন। শাহরেবানুর নিকট গিয়া বলিলেন, "ধর! তোমার পুত্র ক্রোড়ে লও! আজ বাছাকে স্বর্গের সুশীতল জল পান করাইয়া আনিলাম!" শাহরেবানু সন্তানের বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বলিলেন, "ওরে। কোন নির্দয় নিষ্ঠুর এমন কার্য করিল! কোন পাষাণহৃদয় এমন কোমল শরীরে লৌহশর নিক্ষেপ করিল! ঈশ্বর! সকলই তোমার খেলা! যেদিন মদিনা পরিত্যাগ করিয়াছি, সেইদিনই দুঃখের ভার মাথায় ধরিয়াছি।" শিবিরস্থ পরিজনেরা সকলেই শহরেবানুর শিশুসন্তানের জন্য কাঁদিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হইল না। মদিনাবাসীদিগরে মধ্যে আবদুল ওহাব নামক একজন বীরপুরুষ হোসেনের সঙ্গী লোকমধ্যে ছিলেন। আবদুল ওহাবের মাতা এবং স্ত্রীও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হোসেনের এবং তাঁহার পরিজনদের দুঃখ দেখিয়া আবদুল ওহাবের মাতা সরোষে বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! তোমাকে কী জন্য গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম? হোসেনের এই দুঃখ দেখিয়া তুমি এখনো বসিয়া আছ? এখনো তোমাকে অস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিতেছি না? এখনো তুমি অশ্ব সজ্জিত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইতেছ না? জল বিহনে সকলেই মরিবে, আর কতক্ষণ বাঁচিবে? ধিক্ তোমার জীবনে! কেবল কি বন্যপশুদের জন্যই শরীর পুষিয়াছিলে? এখনো স্থির হইয়া আছ ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার বীরত্বে। হায়! হায়! হোসেনের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের প্রতি যে হাতে তীর মারিয়াছে, আমি কি সেই পাপীর হাতখানা দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইব, তাহা মনে করিও না। তোমার শরসন্ধানে সেই বিধর্মী নারকীর তীরবিদ্ধ মস্তক আজ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। হায়! হায়! এমন কোমল শরীরে যে নরাধম তীর বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার শরীরে মানুষী রক্ত, মানুষী ভাব কিছুই নাই। আবদুল ওহাব! তুমি স্বচক্ষে শাহরেবানুর ক্রোড়স্থ সন্তানের সাঙ্ঘাতিক মৃত্যু দেখিয়াও নিশ্চিন্তভাবে আছ! শিশুশোকে শুধু নয়নজলই ফেলিতেছে! নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! বিপদে-দুঃখ তোমারাই যদি কাঁদিয়া অনর্থ করিলে

তবে আমরা আর কী করিব? অবলা নিঃসহায়া স্ত্রীজাতির জন্যই বিধাতা কান্নার সৃষ্টি করিয়াছেন, বীরপুরুষের জন্য নহে!"

মাতার উৎসাহসূচক ভর্ৎসনায় আবদুল ওহাব তখনই সজ্জিত হইয়া আসিলেন। মাতার চরণ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আবদুল ওহাব আর কাঁদিবে না। তাহার চক্ষের জল আর দেখিবেন না; ফোরাত নদীর কূল হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া মোহাম্মদের আত্মীয়স্বজন পরিবারদিগের জলপিপাসা নিবারণ করাইবে, আর না হয় কারবালাভূমি আবদুল ওহাবের শোণিতে আজ অগ্রেই রঞ্জিত হইবে! কিন্তু মা, এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণাশয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন সময়ে আমার সহধর্মিণীর মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

মাতা বলিলেন, "ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা! যুদ্ধযাত্রীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা রমণীর নয়নতৃপ্তির জন্য নহে। বীরবেশ বীরপুরুষেরই চক্ষুরঞ্জক ; বিশেষ এই সময়ে যাহাতে মনে মায়ার উদ্রেক হয়, জীবনাশা বৃদ্ধি হয়, এমন কোনো স্নেহপাত্রের মুখ দেখিতেও নাই ; দেখাইতেও নাই! ঈশ্বরপ্রসাদে ফোরাতকূল উদ্ধার করিয়া অগ্রে হোসেন পরিবারের জীবন রক্ষা কর, মদিনাবাসীদিগের প্রাণ বাঁচাও, তাহার পর বিশ্রাম। বিশ্রাম সময়ে বিশ্রামের উপকরণ যাহা যাহা, তাহা সকলই পাইবে। বীরপুরুষের মায়ামমতা কী? বীরধর্মে অনুগ্রহ কী? একদিন জন্মিয়াছ, একদিন মরিবে,— শত্রুসম্মুখীন হইবার অগ্রে স্ত্রীমুখ দেখিবার অভিলাষ কী জন্য? তুমি যদি মনে মনে স্থির করিয়া থাক যে, এই শেষ যাত্রা, আর ফিরিব না, জন্মশোধ স্ত্রীর মুখখানি দেখিয়া যাই তবে তুমি কাপুরুষ, বীরকুলের কণ্টক, বীরবংশের গ্লানি, বীরকুলের কুলাঙ্গার।"

আবদুল ওহাব আর একটি কথাও না বলিয়া জননীর চরণ চুম্বনপূর্বক ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফোরাতকূলে যাইয়া বিপক্ষগণকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণহৃদয় বিধর্মীগণ! যদি প্রাণের মমতা থাকে, যদি আর কিছুদিন জগতে বাস করিবার ইচ্ছা তাকে, তবে শীঘ্র নদীকূল ছাড়িয়া পলায়ন কর। দেখ আবদুল ওহাব নদীকূল উদ্ধার করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুহন্তার মস্তক নিপাত জন্য আসিয়াছে। তোদের বুদ্ধিজ্ঞান একেবারেই দূর হইয়াছে, তোরা কি এই অকিঞ্চিৎকর জীবনকে চিরজীবন মনে করিয়া রহিয়াছিস? এ জীবনের কি আর অন্ত নাই? ইহার কি শেষ হইবে না? শেষ দিনের কথা কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিস? যেদিন স্বর্গাসনের বিচারপতি স্বয়ং বিচারাসনে বসিয়া জীবনমাত্রের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন, বল তো কাফের সেদিনে আর তোদের কে রক্ষা করিবে? সেই সহস্র সহস্র সূর্যকিরণের অগ্নিময় উত্তাপ হইতে কে বাঁচাইবে? সেই বিষম দুর্দিনে অনুগ্রহবারি সিঞ্চনে কে আর তোদের পিপাসা নিবারণ করিয়া শান্তিদান করিবে? বল তো কাফের! কাহার নাম করিয়া সেই দুঃসহ নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবি? অর্থের দাস হইলে কি আর ধর্মাধর্মের জ্ঞান থাকে না? যদি যুদ্ধের সাধ থাকে, সে সাধ আজ অবশ্য মিটাইব। এখনো বলিতেছি, ফোরাতকূল ছাড়িয়া দিয়া সেই বিপদকাণ্ডারী প্রভু হযরত

মোহাম্মদের পরিজনগণের প্রাণ রক্ষা কর। অবলা অসহায়দিগকে শুষ্ককণ্ঠ করিয়া মারিতে পারিলেই কি বীরত্ব প্রকাশ হয়? এই কি বীরধর্মের নীতি? দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে দূর হইতে চোরের ন্যায় বধ করাই কি তোদের বীরত্ব? যদি যুদ্ধার্থে যুদ্ধের সাধ থাকে, যদি যথার্থই বীরত্ব দেখাইয়া মরিতে ইচ্ছা থাকে, আবদুল ওহাবের সম্মুখে আয়। যদি মরিতে ভয় হয়, তবে ফোরাতকূল ছাড়িয়া পলায়ন কর। ন্যূনতা স্বীকার কিংবা যাজ্ঞা করিলে আবুদল ওহাব পরম শত্রুকেও তাহার প্রাণ ভিক্ষা দিয়া থাকে। মদিনাবাসীরা তোদের ন্যায় যুদ্ধে শিক্ষিত নহে— এই অহঙ্কারেই তোরা মাতিয়া আছিস। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহারা যথার্থই বীর ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী'।''

আবদুল ওহাব অশ্বে কশাঘাত করিয়া শত্রুদলসম্মুখে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিল না : নদীকূলও ছাড়িয়া দিল না। আবদুল ওহাব পুনরায় সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, ''যোদ্ধাই হউক, বীরেন্দ্র হউক, উদ্যোগী পুরুষ হউক, সেই ধন্য যে সময়কে অতি মূল্যবান জ্ঞান করে। তোদের সকল বিষয়েই জ্ঞান আছে দেখিতেছি। যদি সাহস থাকে, যদি আবদুল ওহাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কাহারো ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র আয়। আবদুল ওহাব আজ বিধর্মীর রক্তপাতে ফোরাতজল রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দ্বিগুণ রঞ্জন বৃদ্ধি করিবে, এই আশাতেই তোদের সম্মুখে আসিয়াছে। শত্রুসম্মুখীন হইতে এত বিলম্বে? শত্রু যুদ্ধপ্রার্থী, তোরা বিশ্রামপ্রার্থী! ধিক্ তোদের বীরত্বে! ধিক্ তোদের সাহসে! আজ সাত রাত নয় দিন আবদুল ওহাব জলস্পর্শ করে নাই; ফোরাত নদী তীরে মহানন্দে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া রহিয়াছিস। ইহাতেও এত বিলম্ব, এত ভয়! শীঘ্র আয়, একে একে তোদের সকলকেই নরকে প্রেরণ করিতেছি।''

বিপক্ষগণ হইতে দীর্ঘকায় এক বীরপুরুষ বহির্গত হইয়া অতি উচ্চ লোহিতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক বিশেষ দক্ষতার সহিত অসি চালনা করিতে করিতে আবদুল ওহাবের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, ''মুর্খেরাই দর্প করে। কাপুরুষেরাই অহঙ্কার প্রদর্শনী করিয়া থাকে। শৃগাল, বাকচাতুরী ছাড়িয়া পুনরায় শিবিরে প্রস্থান কর— তোকে মারিয়া কী হইবে? আবদুল ওহাব, তুই কাহার সন্তান, তোর জননী কাহার কন্যা, সেই সকল পরিচয় লইয়া আসিতেই আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে। তুই কেন এই নবযৌবনে পরের জন্য আপন প্রাণ হারাইবি? তোকে বধ করিলে এজিদের নিকট যশোলাভ হইবে না। তোদের হোসেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে বল। তুই যদি কিছুদিন সংসারে বাস করিতে বাসনা করিস, ফিরিয়া যা, তোকে চাহি না।''

আবদুল ওহাব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, ''বিধর্মী কাফের। এত বড় আস্পর্ধা তোর! অগ্রে তুই হোসেনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিস? আবদুল ওহাবের পদাঘাতে কি কিছুমাত্র বল নাই? যে ক্ষুদ্র কীট, চিরস্মরণাগত দাস বাঁচিয়া থাকিতে প্রভুকে আহ্বান কেন? অগ্রে আবদুল ওহাবের পদাঘাত সহ্য কর, তাহার পর অন্য কথা।'' সদর্পে এই কথা বলিয়া আবদুল ওহাব অশ্ব ঘুরাইয়া বিধর্মীর নিকটে যাইয়া এমনই জোরে তরবারির আঘাত করিলেন

যে, এক আঘাতে অশ্বসহিত তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বচক্র দিয়া শত্রুবিনাশী আবদুল ওহাব প্রত্যেক চক্র পরিবর্তনে বিপক্ষগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। একে একে সত্তর জন বিধর্মীকে নরকে প্রেরণ করিয়া পুনরায় পরিক্রমণের জন্য শত্রুগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সম্মুখে আর অগ্রসর হইল না। দূর হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আবদুল ওহাব ভীত হইলেন না, দুই হস্তে অগ্নি চালনা করিয়া নিক্ষিপ্ত শর খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শত্রুনিক্ষিপ্ত শর আবদুল গুহাবের গাত্রে বিদ্ধ হইয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেদিকে আবদুল ওহাবের দৃষ্টি নাই, কেবল শত্রু বিনাশে কৃতসংকল্প।

বহু পরিশ্রম করিয়া আবদুল ওহাব পিপাসায় আরো কাতর হইলেন। কী করেন, কোনো উপায় না পাইয়া দ্রুত বেগে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হোসেনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হযরত, বড় পিপাসা! এই সময় ওহাবকে যদি এক বিন্দু জল দান করিতে পারেন, তাহা হইতে শত্রুকুল—"

"জল?— জল আমি কোথা পাইব ভাই?" অধিকতর কাতর দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই, যদি সেই ক্ষমতাই থাকিত, তবে তোমার আর এমন দুর্দশা হইবে কেন?"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মহা উত্তেজিত কণ্ঠে আবদুল ওহাবের জননী বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কি ফিরিতে আছে? তুমি যদি ইচ্ছা না করিয়াও ফিরিয়া থাক, কাহারো আদেশেও যদি ফিরিয়া থাক, তাহা হইলেও কি শত্রু হাসিবে না? কী ঘৃণা! কী লজ্জা! কেন তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? শত্রুকে পিঠ দেখাইয়া সামান্য জলপিপাসায় প্রাণ রক্ষা করিতে যুদ্ধ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিলে। তোমার ও কলঙ্কিত মুখ আমি আর দেখিব না। আমি তোমাকে জীবিত ফিরিয়া আসিবার জন্য যুদ্ধে পাঠাই নাই। হয় ফোরাতকূল উদ্ধার করিয়া হোসেনের পুত্রপরিজনকে রক্ষা করিতে দেখিব, না হয় রণক্ষেত্রপ্রত্যাগত তোমার মস্তকশূন্য দেহ দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে জীবন শীতল করিব; এই আমার আশা ছিল। তুমি বীরকুলকলঙ্ক, আমার আশা ফলবতী হইতে দিলে না।"

সভয়ে কম্পিত হইয়া আবদুল ওহাব কহিলেন, "জননী, আবার আমি যাইতেছি, আর ফিরিব না—হয় নদীকূল উদ্ধার, নয় আবদুল ওহাবের মস্তক দান। কিন্তু জননী, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত! পিপাসা নিবারণ করিবার আর উপায় নাই। একটিমাত্র নিবেদন চরণদর্শনে পিপাসা শান্তি। আর— একবার আমার স্ত্রীর মুখখানি—"

"হাঁ বুঝিয়াছি। সেই মুখখানি! মুখখানি দেখিতে পার, কিন্তু অশ্ব হইতে নামিতে পারিবে না।" মাতার আজ্ঞানুযায়ী সেই অবস্থাতেই আবদুল ওহাব আপন স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিলেন, "জীবিতেশ্বরী, আমি যুদ্ধযাত্রী। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার কথা মনে পড়িল, পিপাসাতেও প্রাণ আকুল। ভাবিলাম তোমাকে দেখিলে বোধহয় কিছু শ্রান্তি দূর হইবে, পিপাসাও নিবারণ

হইবে। এই মনে করিয়াই আসিয়াছি, কিন্তু অশ্ব হইতে নামিবার আদেশ নাই। মাতার আজ্ঞা,— অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই সাক্ষাৎ।"

পতিপরায়ণা পতিব্রতা সতী পতির নিকট যাইয়া অশ্ববগলা ধারণপূর্বক মিনতি বচনে কহিতে লাগিলেন, "জীবিতেশ্বর, সমরাঙ্গনে অঙ্গনার কথা মনে করিতে নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তঃপুরের কথা যাহার মনে পড়ে, সে আবার কেমন বীর? শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া যে যোদ্ধা স্ত্রীর মুখ দেখিতে আইসে, সেই-বা কেমন বীর? প্রাণেশ্বর! আমি নারী, আমি তো ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রভু মোহাম্মদের বংশধরগণের বিপদ সময়ে সাহায্য করিতে স্ত্রী-পরিবার সন্তানসন্ততির কথা যে যোদ্ধাপুরুষ মনে করে, তাহাকে আমি বীর পুরুষ বলি না। যদি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয় করেন, তবে আমরাই— এই আমারই এলোচুলে রণরঙ্গিণী রণবেশে সমরাঙ্গনে অসিহস্তে নৃত্য করিব ; রণরঞ্জিত বস্ত্রে আমরাও রণসাজে সাজিতে কুণ্ঠিত হইব না। দেখি, কোন বিপক্ষ যোদ্ধা আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে? দেখার দিন, কথার দিন, বিশ্রামের দিন, ঈশ্বরপ্রসাদে যদি পাই, তবে মনের আনন্দে আপনার সেবা করিব। হোসেনের বিপদ চিরকাল থাকিবে না ; কিন্তু এমন দিন পাইয়া আপনি আর খোয়াইবেন না ; এমন দিন আপনি আর পাইবেন না। এমন সময় কি বিলম্ব করা উচিত? ছি! ছি! বীরপুরুষ! তোমারে ছি! ছি! শত্রু যুদ্ধার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছ, তুমি কিনা কাপুরুষের মতো অবরোধপুরে আসিয়া অবরোধবাসিনী কুলবালার মুখ দেখিতে অভিলাষী হইয়াছ? ছি তোমাকে!"

অশ্ব হইতেই নতশিরে সাধ্বীসতীর কপোল চুম্বন করিয়া আবদুল ওহাব আর তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। সতীর মিষ্ট ভর্ৎসনায় অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হইয়া সজোরে অশ্বে কশাঘাত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শত্রুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিধর্মী কাফেরগণ! ভাবিয়াছিল যে, আবদুল ওহাব পলাইয়াছে। আবদুল ওহাব পলায় নাই। ঈশ্বরের নামে অতি অল্প সময় এই জগৎ দেখিতে আমি তোমাদিগকে অবসর দিয়াছিলাম। আর দেখি, কত জনে আবদুল ওহাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবি আয়।"

আবদুল ওহাবের মাতা তাঁহার অজ্ঞাতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে যাইয়া আবদুল ওহাবের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। পূর্বেই সেনাপতি ওমর সকলকেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আবদুল ওহাব কোনো কারণবশত ফিরিয়া গিয়াছে, এখনই আবার আসিবে। এবার সকলে একত্র হইয়া আবদুল ওহাবকে আক্রমণ করিতে হইবে। যাহার যে অস্ত্র আয়ত্তে আছে, সে সেই অস্ত্র আবদুল ওহাবের প্রতি নিক্ষেপ করিবে।

রণক্ষেত্রে একবারে একযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য মণ্ডলাকালের চতুর্দিক ঘিরিয়া একেশ্বর আবদুল ওহাবের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। বীরবর আবদুল ওহাব কত মারিবেন। শেষে শত্রুপক্ষের অস্ত্রাঘাতে আবদুল ওহাবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুদূরে বিনিক্ষিপ্ত হইল। সেই ছিন্ন মস্তক আবদুল ওহাবের মাতার সম্মুখে গিয়া পড়িল। বীরজননী

পুত্রশির ক্রোড়ে লইয়া ত্রস্তে শিবিরে আসিয়া নির্জনকক্ষে হোসেনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এই অবসরে আবদুল ওহাবের শিক্ষিত অশ্ব শিরশূন্য দেহ লইয়া অতিবেগে শিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শিরশূন্য দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইত সকলের সম্মুখে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। আবদুল ওহাবের মাতা শোণিতাক্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিলেন এবং আব্দুল ওহাবের উদ্দেশে আশীর্বাদ করিলেন— "আবদুল ওহাব! তুমি ঈশ্বরকৃপায় স্বর্গীয় সুখভোগে সুখী হও, হোসেনের বিপদ সময়ে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিলে, প্রভু মোহাম্মদের বংশধরগণের পিপাসাশান্তিহেতু কাফেরহস্তে জীবন বিসর্জন করিলে। তোমায় শত শত আশীর্বাদ! তুমি যে জননীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে, তাহারও সার্থক জীবন। তোমার মস্তক দেহ হইতে কে বিচ্ছিন্ন করিল?' আবদুল ওহাবের মাতা আবদুল ওহাবের মস্তক লইয়া পতিত দেহে সংলগ্ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! বৎস! প্রাণাধিক! .... সজ্জিত আছে, তোমার হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়াছে, বিধর্মীরক্তে অস্ত্র রঞ্জিত করিয়াছ, তবে আর ধূলায় পড়িয়া কেন? বাছা! দুঃখিনীর জীবনসর্বস্ব! উঠিয়া অশ্বে আরোহণ কর। প্রাণাধিক! এইবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে আর আমি তোমাকে যুদ্ধে পাঠাইব না। ঐ দেখ তোমার অর্ধাঙ্গরূপিণী বণিতা তোমার যুদ্ধবিজয় সংবাদ শুনিবার জন্য সতৃষ্ণনয়নে অপেক্ষা করিতেছে।"

আবদুল ওহাবের বিয়োগে হোসেন কাঁদিলেন। হোসেনের পরিবার পরিজনবর্গ ডাক ফুকরাইয়া কাঁদিলেন। আবদুল ওহাবের মাতা অশ্রুনয়নে রোষভরে বলিতে লাগিলেন, "আবদুল ওহাব! এত ডাকিলাম উঠিলে না? তোমার মায়ের কথা আর শুনিলে না?" শোকাবেগে এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় পুত্রমস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার পুত্রহন্তা কে? আবদুল ওহাব কাহার হস্তে জীবন বিসর্জন করিল? কে আমার আবদুল ওহাবের মস্তক আমার ক্রোড়ে আনিয়া নিক্ষেপ করিল? দেখি দেখি, দেখিব, দেখিব।" বলিয়া আবদুল ওহাব জননী তখনই ত্বরিত পদে আবদুল ওহাবের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হোসেন অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নিষেধ করিলেন, কিছুতেই শুনিলেন না। পুত্রমস্তক কোলে করিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'কোন কাফের, কোন পাপাত্মা, কোন শৃগাল আমার পুত্রের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে? ঈশ্বরের দোহাই, এই যুদ্ধক্ষেত্রে একবার আসিয়া সেই পাপাত্মা, সেই পিশাচ, সেই কাফের সম্মুখে দেখা দিক।"

ঈশ্বরের দোহাই শুনিয়া আবদুল ওহাবহন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দর্পসহকারে বলিতে লাগিল, "আমারই এই শাণিত অস্তে আবদুল ওহাবের মস্তক সেই পাপদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।" আর কোনো কথা হইল না। আবদুল ওহাব জননী পুত্রঘাতককে দেখিয়া সক্রোধে আবদুল ওহাবের মস্তক এমন জোরে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিলেন যে, ঐ আঘাতেই কাফেরের মস্তক ভগ্ন হইয়া মজ্জা নির্গত হইতে লাগিল, তখনই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

এই ঘটনা দেখিয়া ওমর মহারোষে আবদুল ওহাবের জননীর চতুর্দিকে সৈন্য বেষ্টন করিলেন। বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক! আমার জীবনে মায়া নাই। পুত্রশোক নিবারণ করিবার জন্য এই বৃদ্ধবয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে নিপাত কর। যে পথে আমার আবদুল ওহাব গিয়াছে, আমি সেই পথে যাই। কিন্তু আকাশে যদি কোনো বিচারকর্তা থাকেন, তিনি তোমাদের বিচার করিবেন।" অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবদুল ওহাব জননী শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসিনী হইলেন।

আবদুল ওহাবের মাতা প্রাণত্যাগ করিলে গাজী রহমান হোসেনের পদচুম্বন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনিও বহুসংখ্যক বিধর্মীকে জাহান্নামে পাঠাইয়া শত্রুহস্তে শহীদ হইলেন। ক্রমে জাফর প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ হোসেনের সাহায্য জন্য শত্রুসম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু কেহই জয়লাভে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। প্রায় দেড় লক্ষ বিপক্ষসৈন্য বিনাশ করিয়া মদিনার প্রধান প্রধান যোদ্ধামাত্রই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বর্গধামে মহাপ্রস্থান করিলেন।

প্রেম-রহস্য

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

কবি বলেন, যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালবাসে যেহেতু ফুল সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই "সুন্দরী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথমে দর্শকের নয়নরঞ্জন। অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে না।

বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে? —অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালবাসে. তবে কি সে কবি সমাজের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে? তা যদি হয়, হউক। প্রেমিক প্রাণ দিতে কাতর নহে।

প্রেম কি? এই রহস্য অতি বড় পণ্ডিতেরাও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, আর তুমি আমি কোন ছার? তবে আমি এখন জীবনাবর্তের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এই সুদীর্ঘ ষাট বছরের বহুদর্শিতায় প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম যে, ও রহস্য দুর্ভেদ্য। যিনি প্রেম সম্পর্কে কিছুটা বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত "অন্ধের হস্তী দর্শনের" ন্যায়। —অন্ততঃ আমার ধারণা ঐরূপ।

এস্থলে আমার জীবনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান— সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই ভালবাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভালবাসিয়াছি, আজ পর্যন্ত বুঝি নাই।

আমি কয়েক মাস আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরার নিকট উড়িষ্যায় ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার লোকেরা বড় ভীরু প্রকৃতির। আমাদের বাঙ্গলোর ত্রিসীমায় (বিশেষতঃ আমার ভগ্নিপতির উপস্থিতির সময়) কেহ আসিত না। আসিত কেবল এক জন। প্রেমিকের অগম্য কোন স্থান নাই— প্রেমিকের গিরি লঙঘন করিতে হয়, বিনা নৌকায় দুস্তর সাগর পার হইতে হয়, কত কি করিতে হয়, — আর এ "হাকিমবাবুর" বাসাবাটির নিকট আগমন তো সামান্য ব্যাপার।

প্রত্যুষে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইলে দেখিতাম একটি বালিকা আমাদের বাঙ্গলোর প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম ; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখনই বারান্দায় আসিতাম, দেখিতাম সেই চক্ষু দুটি আমার প্রতি।

আমার ভগ্নীপতি আফিসে গেলে পর মধ্যাহ্নে যখন আমরা দুই ভগিনী অলস সময় কাটাইবার জন্য গাঁথন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম, অথবা যখন গল্প করিতে করিতে দিদি

তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর আমি কোন পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম, কবিতার ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া থাকিতাম,— সেই সময় দৈবাৎ মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতাম, জানালার নিকট বাহিরে চম্পা (সেই বালিকা) আমাকেই দেখিতেছে।

একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আসিস?"

চম্পা নত মস্তকে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তোমহঙ্কু দেখিবাকু" (তোমাকে দেখিতে)। বলিয়াই আবার শঙ্কিত হইল ; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন কবিল। বলা বাহুল্য চম্পার কথা শুনিয়া আমার মনে যারপর-নাই আনন্দ হইল। আমাকে সে প্রতিদিন দেখিতে আইসে ভাবিয়া কেমন একটু অহঙ্কারও অনুভব করিলাম। মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী, তাই (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না) তবু এ অযাচিত প্রেমলাভে, কাঙ্গালের ধনরত্নলাভে আহ্লাদিত ও গর্বিত হওয়ার ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।

সময় সময় দেখিতাম আমাদের ঝী চাকরেরা চম্পাকে তাড়া দিয়া বলিত, "এখানে রোজ কি কর্ত্তে আসিস?" সে বিনীতভাবে উত্তর দিত, "টিকে তাহাঙ্কু দেখি যাই" (তাঁহাকে একটু দেখে যাই)। একদিন আয়া তাহাকে অতি কর্কশস্বরে আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই চম্পা চলিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হইল। আয়াকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করায় যে বলিল, "ও যে জাতে চাঁড়াল, ওর ছায়া মাড়াতে নেই।" তাহার ছায়া মাড়াইলে আয়াকে স্নান করিতে হইত। চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া আমি তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে পারি নাই। সে সুন্দরী ছিল না, বরং অতি কাল কুৎসিত ছিল, তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

আমাদের এই বিমল বিশুদ্ধ ভালবাসা লইয়া দিদিরা আমোদ করিতেন। দিদির এক প্রৌঢ়া ননদ সেখানে ছিলেন ; তিনিও আমাদের যথেষ্ট জ্বালাতন করিতেন। তিনি বলিতেন, "তাহেরা (আমি) চম্পার সহিত আবার মধু-মাস (Honeymoon) যাপন করিতেছে।" সে সময় আমার বিবাহিত জীবনের সপ্তম বৎসর ছিল।

সুখের দিন অস্থায়ী। রবিবারে দুলা-ভাই (আমার ভগ্নিপতিকে আমি আশৈশব দুলা-ভাই বলিয়া ডাকিতাম) আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন। আমাদের তিনজনকে অর্থাৎ দিদি, দিদির ননদ ও আমাকে কাপড় সেলাই লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমারও কিছু করা উচিত।"

দিদি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "মাফ কর, আমাদের ছুঁচ কাঁচি নিয়ে টানাটানি করে কাজ নেই।"

দুলা-ভাই। কেন আমি কি তোমাদের চেয়ে আনাড়ী? তাহারা সেদিন আমায় "য়্যাহু" বলেছিল, তাই বলে কি সত্যই য়্যাহু হয়ে গেলাম?

দিদির ননদ। ডীন. জে. সুইফ্‌টের কল্পনা যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া ; —হুহুন্‌হুম্‌ দেশে অশ্বজাতি রাজত্ব করে, আর মানুষ (য়্যাহু) তাদের অধীন থেকে শকটবহন করে। ঈশ্‌! কল্পনাব আর সীমা নাই।

দিদি। অশ্ব মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, এটা আর আশ্চর্যের বিষয় কি, দিদি? আমাদের সত্যিকার জগতে তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা চিরকাল ঘটে আসছে।

দুলা-ভাই। বটে? সে অদ্ভুত ব্যাপার কি?

দিদি। সে অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে পুরুষেরা আবহমানকাল পৃথিবীতে আধিপত্য করছে, যৎকালে সৃষ্টি জগতের উৎকৃষ্টতমা জীব নারীজাতি তাদের দাসত্ব-শকট বহন করে থাকে।

সহসা একটা উত্তর যোগাইতে না পাবিয়া দুলা-ভাই দিদির দিকে "কটমট" দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমরা উচ্চ হাস্য করিলাম।

"আমি তোমাদের কর্মশালার কিছু স্পর্শ করিব না— আমি আমার কাজ করি", এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে চুরুট বাহির করিলেন। ধূমপান করাটাও একটা মস্ত বড় কাজ কি না।

দুলা-ভাই চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চম্পাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সকৌতুকে বলিলেন, "কি ছুঁড়ি! তোর নাম কি?" তৎক্ষণাৎ চম্পা পলায়ন করিল। দিদি বলিয়া উঠিলেন,— "আঃ! ওকে তাড়ালে কেন, ও যে তাহেরার সখী।"

এই কথায় একটা হাস্য-তরঙ্গ উঠিল, দুলা-ভাই আমার স্বামীকে দয়ার পাত্র বলিয়া আক্ষেপও করিলেন।

পবদিন চম্পা আর আসিল না। স্বয়ং "হাকিম বাবু" (দুলা-ভাই "বাবু" শব্দে আপত্তি করিতেন, কিন্তু গ্রামেব লোকেরা কোন মতেই তাঁহাকে "বাবু" বলিতে ছাড়িত না। "সাহেব" শব্দ শিখাইয়া দিলে "সাহেব বাবু" বলিত।) তাহাকে দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহার ভয়ের কারণ। চম্পার অদর্শনে সমস্ত দিন আমার প্রাণটা কেমন অব্যক্ত যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও বালিকা দেখা দিল না। আমি এক একবার উদাস নয়নে জানালাব দিকে চাহিলাম, —প্রত্যেকবারই চম্পার স্থান শূন্য দেখিলাম।

অপরাহ্নে দুলা-ভাইকে দিদি চা খাওয়াইতেছিলেন। যখন চা ঢালিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার সাত মাসের খোকা পার্শ্বের ঘরে দাঙ্গা আবম্ভ করিল! দেখিতাম, দিদির উপর খোকার প্রভুত্বই অধিক। সুতরাং তিনি আমাকে চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া খোকার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

দুলা-ভাই আমার চায়ের প্রদত্ত স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তাহেবা! আজ তুমি আছ কোথায়?" আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

দুলা-ভাই। চায়ে চিনি দেওয়া হয় নাই।

তাঁহার দিদি বলিলেন, "তাহেরা এ কয়দিন চম্পা বিরহে অন্যমনস্কা আছে!"

দুলা-ভাই। কি জান, আপা: তাহেরার অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ চম্পা-বিরহ, না আজ ডাকে ব্যারিস্টার সাহেবের পত্র না পাওয়া— তাহা ঠিক বুঝা যায় না!

আমি অগত্যা সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলাম।

শেষে মন মানিল না, সন্ধ্যায় চম্পাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ও তাহার মাতা আসিয়া একেবারে আমার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল,— "চম্পা পিলা মনুষ্য— হু হু হু।" ব্যাপার দেখিয়া আমি তো অবাক ; চম্পা ছেলেমানুষ, সেজন্য তাহার মাতা কাঁদে কেন? পরে বুঝিলাম, "হাকিম বাবু" স্বয়ং চম্পার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বিপদ ও ভয়ের কারণ! লোকগুলি যেমন ভীরু, তেমনই আবার যুক্তিতর্কেরও ধার ধারে না!

একবার আমি একটি ইংরাজবালাকেও ভালবাসিয়াছিলাম। তিনি শ্বেতাঙ্গী, আমি কৃষ্ণাঙ্গী— এক কথা বলি, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক, — তাঁহাদের বড়দিনের উৎসব সময়টা প্রায় আমাদের মধুর বসন্তের ন্যায় ; আমরা বাসন্তী সন্ধ্যায় মুক্ত ছাদে বসিয়া সদঃপ্রস্ফুটিত বেল যূথিকার পরিমলবাহী মলয়ানিল উপভোগ করিতে ভালবাসি, আর তাঁহারা পৌষ মাসের দুরন্ত শীতে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া অনল উত্তাপ উপভোগ করিতে ভালবাসেন! তবু আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকপটে সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। মিস্ ডি-ও ইহা স্বীকার করিতেন।

মিস্ ডি-র বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য আমি স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছিলাম। আমি ওয়েটিং রুমে গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী শুনিলাম, গাড়ী চলিবার শব্দও শুনিলাম,— তখন মনে হইল যেন ট্রেনখানা আমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল! তারপর,— মিস্ ডি-ও আমার মাঝখানে বিশাল সাগরের ব্যবধান রহিয়া গেল।

আবার বলি, এ কেমন প্রেম? আমার দীর্ঘজীবনের সমুদয় প্রেমকাহিনী বলিবার এ স্থান ও কাল নয়।— তবে আর একটি মাত্র ঘটনা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি।

আমি কয়েক বৎসর স্বামীসহ পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম। অল্পকাল মধ্যেই প্রতিবেশিনী মহিলাবৃন্দের সহিত আমার আলাপ হইল। বিশেষতঃ একজন প্রবীণা মোসলেম ললনাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম, তিনিও সুদে আসলে আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার সহিত এক ধর্ম ব্যতীত অপর অনেক বিষয়ে আমার ঐক্য ছিল না। যথা তাঁহার জন্মভূমি পশ্চিমে, আমার জন্মভূমি পূর্বে (অর্থাৎ বঙ্গদেশে) ; তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে ত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন, তবুও আমরা দুইটি শৈশবসঙ্গিনীর ন্যায় অভিন্নহৃদয় হইয়া উঠিলাম!

পরমেশ্বর মানবের প্রতি অতি-প্রেম সহ্য করিতে পারেন না ; সুতরাং আমার মাননীয়া

বন্ধুটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার অবৈতনিক সেবিকা হইলাম। এখন হইতে তাঁহাকে "আমার রোগী" বলিব।

জীবনে এই প্রথমবার (আত্মীয় ব্যতীত) অপর রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। পরের সেবায় এত সুখ শান্তি, ইহা পূর্বে জানিতাম না। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে,— তাই আমারও সুখ শান্তিটুকু দেখিতে না দেখিতে— প্রাণ ভয়ে অনুভব করিতে না করিতে— ফুরাইয়া গেল।

আমি অর্ধস্ফুট গোলাপ-মুকুল, আতর, গোলাপজল প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি, এবং বেদানা, কমলালেবু ইত্যাদি জড়বস্তুর আকৃতিতে আন্তরিক প্রেম উপহার লইয়া আমার রোগীর নিকট উপস্থিত হইতাম। কিসে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, কোন জিনিষটি তিনি ভালবাসিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার মনোরঞ্জনই যেন আমার একমাত্র কর্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার রক্তহীন অধরে ঈষৎ হাস্য দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।

আর আমার রোগীর মানসিক অবস্থা?—সন্ধ্যা হইলেই (আমি প্রত্যহ সায়াহ্নে এবং দিবা এক ঘটিকার সময় তাঁহার নিকট যাইতাম) তিনি আমার জন্য তাঁহার শয্যার সন্নিকটে আসন প্রস্তুত করাইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার রোগযন্ত্রণা লাঘব হইত। যখন অত্যধিক দুর্বলতায় অবসন্ন হইয়া মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া থাকিতেন, তখনও আমি আসিয়াছি শুনিলে চক্ষু খুলিতেন। সেই জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় আনন্দ-কিরণে উজ্জ্বল হইত।

আমার রোগী আবদার করিতেন— ঔষধ খাইবেন না। আমি ঔষধ হস্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার শুষ্ক অধরে হাস্যরেখা প্রকটিত হইত- - কপট বিরক্তির সহিত বলিতেন, "আয়িঁ মুঝে সাতানে কো" (আসিলেন আমায় জ্বালাতন করিতে।) কিন্তু ঔষধ তৎক্ষণাৎ সেবন করিতেন। যে পথ্য আর কেহ প্রস্তুত করিলে অখাদ্য হইত, তাহা আমার করস্পর্শে সুস্বাদু হইয়া যাইত। প্রেমের কি আশ্চর্য ক্ষমতা!

আমার রোগী সেই অন্তিম দশায়ও আমাকে দেখিলেই বসিতে অনুরোধ করিতেন। আমি নমস্কার করিলে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেন। আমি তাঁহাকে যাতনা বেদনা ভুলাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য ছোট ছোট গল্প বলিতাম, তিনি উৎকীর্ণ হইয়া শুনিতেন; তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন, সেজন্য আমাকে উর্দু গজল (গীত-কাব্য) গাহিতে হইত। অধিকাংশ গজল তাঁহারই ফরমায়েশ অনুসারে পঠিত হইত।

সেদিন আমার রোগীকে দেখিয়া হতাশ হইলাম। তাঁহার আরোগ্য লাভের শেষ আশাটুকু সেই দিন অন্তর্হিত ছিল। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, অদ্য বসন্ত ঋতুর শেষ দিন ; এই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার রোগীও শেষ বিদায় লইতে চলিলেন। সেই রবি, শশী, তারা সবই থাকে, কেবল বসন্তমাধুরী ফুরায়। মানসকর্ণে কোন কবি ও প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলাম,—

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু "কি হল তোমার
সে সৌন্দর্য্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন?"
সহাস্যে উত্তর দিল সে, "ও প্রিয়তম!
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা স্রষ্টার

বসন্ত তো আবার আসিবে, আসিবে না কেবল আমার রোগী।

ঠিক সেই সময় আমার রোগী অনুরোধ করিলেন,

"গোর-চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হল প্রায়— এই গজলটি গাও, তো, তাহেরা।"

আমি বিস্মিত হইলাম , তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন কিরূপে? সে যাহা হউক, এখন রোগীকে কোথায় আশার কথা শুনাইব, না বৈরাগ্যব্যঞ্জক নিরাশার গান গাহিব, বলিব, "(কিছুক্ষণ পর তোমার) গোরের চিহ্ন পর্যন্তও থাকিবে না?" আর যিনি আজি না হয় দুদিন পরে নিশ্চয় মরিবেন, এরূপ রোগীর পার্শ্বে বসিয়া মৃত্যুগীত গাওয়া তো শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, ওটা খুব কণ্ঠস্থ নাই। তখন তিনি আমার হাতে একখানি গজলের খাতা দিয়া বলিলেন, "তবে—

নাই সেকেন্দার কিম্বা দারার কবর,—
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ্ন কত!

ইত্যাদি পড়।"

আমি বিপদে পড়িলাম, এটাও যে ঐ ধরনের কাব্য। শেষে রোগীর (আবদারই) রক্ষা করা গেল! যদিও—

"মৃত্যুযন্ত্র কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে, ভুগর্ভে লীন যশস্বীরা কত?"

আবৃত্তিকালে আমার হৃদয় দ্বিধা হইতেছিল! ভাবিয়াছিলাম এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিবে। কিন্তু না—।

সেদিন বুধবার সন্ধ্যা। আমার রোগী অদ্য আমাকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না ; আমি কাতরে ডাকিলাম, সাড়া দিলেন না। এই অনাদরে (?) আমার বুক ভাঙ্গিযা যাইতেছিল। আমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার কন্যা-বধূরা ধৈর্য্যহারা হইয়া গোল বাধাইবেন, এই ভয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। ঐ সময় অশ্রু সম্বরণ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?

আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, এমন সময় (আমার করস্পর্শে)! তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বহিন্! আজ বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি!" সেই "বহিন" শব্দটি কেমন ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রি ; আমার রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়াছে। আমি সেই প্রাণহীন হাত দুখানি গরম করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম, —আমার সম্মুখেই কি কবিয়া তাঁহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না। প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি উহা দুর্বোধ্য। প্রেমিক-হৃদয় নবনীসদৃশ কোমল ; আবার পাষাণবৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও দেখি, ভঙ্গপ্রবণ। ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ-হৃদয়েও থাকে— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়! প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মত— আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মত বাগরাগিণীর মত মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কাবিত হয? যাহা হউক, বুঝা গেল না, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এইমাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই— প্রেম-রহস্য দুর্ভেদ্য!

ভাঙ্গা বাঁশী

এস. ওয়াজেদ আলি

কার্যান্তরে গমন হেতু আমার Bar Library যাওয়া আসা এক রকম বন্ধ হয়ে গেল, যে সব বন্ধুদের মুখ প্রত্যহ দেখতুম, তাঁরা অতীতের স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়ে গেলেন। অনেকের কথা এক রকম ভুলেই গেলাম। দুই চারিজনের ছবি স্মৃতিপটে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে আঁকা রইল। এক মহাজন বন্ধু কিন্তু আমার মনের চিত্রাগারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রইলেন। তাঁকে রায় সাহেব বলেই পাঠকের নিকট পরিচয় দিব।

রায়সাহেবকে স্মরণ রাখবার আমার অনেকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। তিনি যে কেবল তাঁর সমসাময়িক ব্যারিস্টারদের মধ্যে একজন successful লোক ছিলেন তা নয়। তা হলে এ প্রসঙ্গের অবতারণা আজ করতুম না। তাঁর মত উচ্চমনা এবং কোমলহৃদয় লোক কৃতকার্য ব্যবহারজীবদের মধ্যে আর কাহাকেও দেখেছি বলে মনে হয় না। জুনিয়ারদের প্রতি তাঁর বিশেষ একটা টান ছিল, আর যখন সম্ভব হত, তাদের সাহায্য না করে তিনি থাকতে পারতেন না। সমস্ত Bar Library-র ভিতর তিনিই আমার প্রতি একটু আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। আমি বড় নির্জন প্রিয় ছিলুম। Library-তে আমার নিজের কোণে বসে থাকতুম, কারও সঙ্গে বড় কথা-টথা কইতুম না। আমার একটু লেখার অভ্যাস গোড়া থেকেই ছিল। একদিন একটি ইংরাজি কাগজে আমার একটা লেখা বেরুলো। লেখাটি বোধ হয় ভালই হয়েছিল। কারণ সেটা বেরোবার দুই চারিদিন পর রায়সাহেব নিজেই এসে আমার সঙ্গে প্রবন্ধটি নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন, আর উৎসাহ বাড়াবার জন্যে বেশ দুই চারিটি মিষ্ট কথা আমায় বললেন। আমি তাঁর মত লোকের প্রশংসা শুনে বড় আপ্যায়িত হলুম। এর পর রায়সাহেব দুই একটি ব্রিফ (Brief) ও আমায় পাঠিয়ে দেন। এইসব কারণে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক একটা টান ছিল।

রায় সাহেবের করুণ এবং উদার হৃদয়ই যে কেবল লোককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করতো তা নয়। তাঁর মত সুপুরুষ Bar Library-তে দ্বিতীয়টি ছিল না। তাঁর চেহারা তাঁর মনের উচ্চতা সুন্দররূপে ব্যক্ত করতো। তাঁর শরীরটা ছিল অতি সুগঠন এবং বাহুল্যবর্জিত। আর তাঁর মুখাকৃতির মধ্যে একটা classical সামঞ্জস্য ছিল যা আমাদের এই মেলেরিয়া-প্রপীড়িত এবং অম্লরোগ-নির্যাতিত বাঙ্গলা দেশে কচিৎ দৃষ্ট হয়ে থাকে। তাঁর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাঁর ক্ষোদিত প্রস্তর মূর্তির মত মুখটিকে এমন একটি আড়ম্বরশূন্য সৌন্দর্য দিয়েছিল যা দেখে রং-এর ছটা একটা vulgar জিনিস বলে মনে হত। আর সবের উপর তাঁর উজ্জ্বল মেধাব্যঞ্জক চক্ষু দুটির মধ্যে একটা করুণ বিষাদের ভাব ছিল যা দেখে মনে হত তাদের অন্তরালে ভাবের কোন সুন্দর এবং বিচিত্র খেলা চলেছে। তাঁর ঋজু গঠন, উন্নত গ্রীবা এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক

হাব-ভাব কিন্তু একথাও প্রকাশ করতো যে জগতে উচ্চ হবার অভিলাষ অর্থাৎ ambition ও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় বিরাজ করছে। এই ভাবটি কিন্তু তাঁর চোখ দুটির এবং মুখের কবিত্বময় ভাবের সঙ্গে ঠিক খাপ খেত না। তিনি এই জন্য কখন কখন একটি মূর্তিমান প্রহেলিকার মত দেখাতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো তাঁর অন্তরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে অহরহ এক দ্বন্দ্ব চলেছে, আর সেই দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনকে শান্তিশূণ্য করেছে।

যেদিন হাইকোর্ট ছাড়লুম সেইদিন থেকে তাঁর সঙ্গে দেখাশুনাও বন্ধ হল। মধ্যে মধ্যে তাঁর বাড়িতে দেখা করবার সঙ্কল্প করতুম, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হত না। Bar ছাড়বার দুই বৎসর পর একদিন সন্ধ্যার সময় Eden Garden এ বেড়াতে গিয়েছি। Bar Stand এর নিকট পদচারণা করতে করতে হঠাৎ দেখলুম একটি বেঞ্চে রায়সাহেব একেলা বসে আছেন। নিকটে গিয়ে অভিবাদন করলুম। আমার সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে তিনি বড়ই আনন্দিত হলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বললেন, "অনেকদিন পর আজ তোমার সাথে দেখা হল; এস, একটু বেড়ান যাক।" আমি আনন্দে সম্মতি দিলুম। দুইজনে তখন Garden ছেড়ে মাঠে নামলুম। রায়সাহেব বললেন, "আমি Practice ছেড়ে দিয়েছি শুনেছ?" আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "আপনি অমন লাভের Practice এত শীঘ্র কেন ছাড়লেন?" আর ৭/৮ বৎসর তো অনায়াসে কাজ করে যেতে পারতেন।"

একটা ক্ষীণ হাসি হেসে রায় সাহেব বললেন, "কোর্টের ভন্ডামি আর ভাল লাগে না।" আমি বললুম, "আইনের ব্যবসার মত মহৎ ব্যবসাকে আপনি ভন্ডামি বলেন! আমাদের ব্যারিস্টার ভাইয়েরা শুনলে বলবে কি?"

রায়সাহেব— "চুলোয় যাক তোমার ব্যারিস্টার ভাইয়েরা। প্রত্যহ সত্যকে মিথ্যা বানাতে বানাতে, রামের ধন শ্যামকে দিতে দিতে, আর কালোকে ধলা সাজাতে সাজাতে আমার নিজের উপর একটা বিজাতীয়া ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। Practice ছেড়ে তবু একটু শান্তি পেয়েছি। ভগবান কি এই অদ্ভুত ব্যাভিচারের জন্যই মানুষকে তার প্রতিভা দিয়েছেন?

অনুমোদনের প্রবৃত্তিটা দমন করে আমি বললুম, "কেন, সকলেই ত অমন পাপ করে আসছে। ঐ দেখুন C সাহেব। তিনি বলেন, "আইনের বই ছাড়া অন্য বই পড়ার মত পাপ পৃথিবীতে আর নেই। আইনের বইয়েতে ধর্ম, নীতি, সাহিত্য রাজনীতি সবই আছে। লোকে যে কেন আইনের অত সব মহা মহা Standare বই আর সর্বজন মান্য authoritative decisions থাকতে অন্য রকম সাহিত্যর দিকে আকৃষ্ট হয় তা আমি বুঝতে পারি না।"

সি (C) সাহেবের এই উক্তি শুনে রায় সাহেবের মুখে এমন একটা ঘৃণার ভাব প্রকটিত হয়েছিল, যা, সে সময়ে কোন Leonordo da Vanci কিম্বা Van Dyke থাকলে আর্টে অমর করে যেতে পারতেন। আর C সাহেবের প্রতি তিনি যে বিশেষণটির প্রয়োগ করলেন, সেটি ছাপাবার মানসিক কিম্বা নৈতিক সাহস আমার নাই। উত্তেজিত কণ্ঠে আমায় তিনি বললেন, "আমাকেও কি তুমি ঐসব লোকেদের মধ্যে গণ্য কর?"

আমি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললুম, "ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি যে চক্ষে দেখি

Bar এর আর কাকেও সে চক্ষে দেখি না। আমাদের সমব্যবসায়ীদের মতের কথা আপনাকে বলেছিলুম মাত্র; তুলনার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

রায় সাহেব— "সম ব্যবসায়ীদের আর তাদের মতের কথা আমায় বলো না। আমি তাদের যথেষ্ট দেখেছি, আর তাদের মতও যথেষ্ট শুনেছি। ওসব দুঃস্বপ্ন যত শীগগীর ভুলতে পারি ততই ভাল। আমার জন্ম হয়েছিল অন্য কাজের জন্য। কেবল লোভে পড়ে আর পৃথিবীর একজন বড় মানুষ হবার নীচ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আমি হৃদয়ের অঙ্গুলি সঙ্কেতকে তাচ্ছিল্য করে এই soul desturctive (আত্মঘাতী) ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলুম। স্বকৃত এই মহাপাপের শাস্তিও আমি পেয়েছি। আমার সমস্ত জীবন একটা প্রকান্ড মরুভূমির মত নিষ্ফল হয়েছে।"

আমি বললুম, "আপনার জীবন নিষ্ফল হয়নি। আপনার দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হয়েছে।"

রায়সাহেব— "সেসব কি আমার ব্যারিস্টার না করলে হত'না? আসল কথা তা নয়। আমি জন্মেছিলুম আর্টের জন্যে আর সাহিত্যের জন্যে। আমি যদি আর্ট কিম্বা সাহিত্য নিয়ে থাকতুম তাহলে জগৎকে স্থায়ী কিছু দিয়ে যেতে পারতুম। কিন্তু নীচ স্বার্থের পথে গিয়ে আমি আমার হৃদয়ের প্রেরণাকে তাচ্ছিল্য করেছি, আর আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে হেলায় নষ্ট করেছি।"

এই কথাগুলি বলতে বলতে ভাবাবেশে রায় সাহেবের চক্ষু দুটি জ্বলতে লাগলো। আমি কি উত্তর দিব কিছু ঠিক করতে পারলুম না। কেবল বললুম, "আপনাকে দেখলে আর আপনার কথা শুনলে আপনি যে একজন artist সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না।"

আবিষ্টের ন্যায় রায়সাহেব বলতে লাগলেন "শুন, আবদুল্লা, আমার কথা শুন। হুগলি জিলার এক সঙ্গতিপন্ন জমিদার গৃহে আমার জন্ম। অতুল বিভবের অধিকারী না হলেও আমার বাবা বেশ একজন বিত্তবান লোক ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি অত্যন্ত ambitiouns এবং সম্মানলোভী ছিল। সরকারের বড় বড় জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তিনি বড় ভাল বাসতেন আর নানাবিধ কাজে অংশ নিয়ে দেশের লোকের এবং সরকারের কাছে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টায় সর্বদা তিনি ব্যস্ত থাকতেন। শেষ জীবনে তিনি রাজসরকার থেকে রায়বাহাদুরের উপাধিও পেয়েছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁর ভবিষ্যৎ আশা ভরসা তিনি সব আমার উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। আমি কবে হাইকোর্টের বেঞ্চে বসবো, কিম্বা Advocate General এর গাউন পরব, সেই সুদিনের স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন।

"আমার মা কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আর তাঁর প্রাণে যথেষ্ট কবিত্ব ছিল। ভাবাপূর্ণ সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শুনাতেন। প্রকৃত সৌন্দর্য্যামোদীর মত তাঁর সৌন্দর্য্য জ্ঞান আমাদের বাড়ির প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে প্রকটিত হতো। ঘরের সাজ-সজ্জা, আসবাব পত্রের বিন্যাসের ধরণ,

জিনিষ পত্রের পারিপাট্য, ফার্নিচারের বাহুল্যহীন সুরুচিসম্মত গঠন আমার মার সৌন্দর্য্যানুভূতির কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করতো। বাবার স্থূল প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু এসব একেবারেই স্থান পেত না। তিনি বেশীর ভাগ সময় বাইরের ঘরে থাকতেন আর সেখানে নিজেকে আড়ম্বর, ধূমধাম এবং জাঁকজমকে পরিবৃত রাখতে ভালবাসতেন। প্রকৃত taste এর তিনি বড় একটা ধার ধারতেন না। আর কবিতা দেবীর অঙ্গনে কখনও ভুলেও পা দিতেন না। তাঁর অনিচ্ছাবশতঃই মার কবিতাগুলি কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমার মা বিনা অনুযোগে বাবার আদেশ এবং ইচ্ছা শিরোধার্য করতেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে তাঁর আন্তরিক দুঃখের কথা আমি স্বচ্ছন্দে বুঝতে পারতুম।

"আমাতে আমার বাবার এবং মায়ের দুই বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির একটা সামঞ্জস্যহীন মিলন ঘটেছিল। প্রবল এক সৌন্দর্য্য পিপাসা আমার মনে ছেলেবেলা থেকে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এবং খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্খাও আমার প্রাণকে বাল্যকাল থেকে চঞ্চল করে রেখেছে। কেবল অল্পদিন থেকে এই শেষোক্ত বৃত্তির তাড়না আমি অনুভব করিনি।

"আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই সরস্বতী নদী প্রবাহিতা। নদীর পাশে একটা বড় মাঠ আছে। ছেলেবেলায় নদীর তটে আর মাঠের মধ্যে খেলা করতে আমি বড় ভালবাসতুম। তখনকার কথা মনে হলে শরীর এখনও পুলকে শিউরে উঠে। মাঠে রাখাল বালকদের সঙ্গে হা-ডু-ডু, ঘোল ঘোল, ধাসা প্রভৃতি খেলার স্মৃতি এখনও আমার মনে জেগে আছে।

"ক্ষীণাঙ্গিনী সরস্বতী যখন বর্ষার জলে দুকূল ডুবিয়ে সমুদ্রের পথে ছুটতো, আমার খেয়ালও তখন তার সঙ্গে তার সুদূর অভিসারের পথে ভেসে যেতো। গাছে যখন কোকিল ডাকতো, আর বউ কথা কও পাখী যখন তার সোনার পোষাক পরে ঝোপের ভিতর থেকে অবিরামভাবে তার বউয়ের কাছে তার মিনতি জ্ঞাপন করতো, তখন আমার মনে হতো পৃথিবী কি সুন্দর। এখানে আছে কেবল আনন্দের সঙ্গীত, সোহাগের মিনতি আর প্রেমের আবদার। পায়রার দল যখন ক্ষেতে বসে আহার করতো তখন তাদের পালকের বর্ণচ্ছটা, তাদের লাল ঠোঁটগুলির সুললিত গঠন, আর তাদের রাঙ্গা পায়ের তালবদ্ধ গতি কি অপূর্ব আনন্দে আমার মনকে অভিষিক্ত করে দিত।

"আবার সন্ধ্যার সময় শ্মশানের সঙ্গীহীন তেঁতুল গাছটির মধ্যে কত ভূত প্রেতের খেলাই না আমি দেখতুম, আলেয়ার গতিশীল আকস্মিক জ্যোতি তখন কত রোমাঞ্চক ভাবই না আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে দিত।

"মাঠের মাঝখান দিয়ে যে পথ চলে গেছে, সেই পথে সকালে চাষীদের গিন্নি বউয়েরা চেঙ্গারী মাথায় করে হাটে বাজারে যেতো; পথিকেরা Canvas এর ব্যাগ হাতে করে ছোট ছোট নারকুলি হুকা টানতে টানতে সেই পথ দিয়ে তাদের কার্যক্ষেত্রে যেতো; নিষ্ঠাবান গ্রাম্য রমণীরা দলবদ্ধ হয়ে গল্প করতে করতে সেই পথ দিয়েই আবার গঙ্গাস্নানে যেতো। আমি

গাছের আড়ালে বসে তাদের সব দেখতুম, আর ভাবতুম।" কোথা থেকে তারা আসে আর কোথায় তারা যায়; কাদের তারা গিন্নী, আর কাদের তারা বউ; তাদের ঘরগুলো কেমন কেমন, আর তাদের দিনগুলো কেমন করে কাটে; এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে উঠতুম।

"রাত্রে আমাদের বাড়ির উঠোনে রূপকথার বৈঠক হতো। পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেখানে জড় হতো। বড় একটা মাদুর বিছিয়ে আমরা সব তাতে বসতুম; আর মা, দিদিমা এবং আর আর প্রাচীনাদের জিদ করে গল্প বলতে বাধ্য করতুম। ছেলেবেলার সেইসব কথা-কাহিনী শুনে যে আনন্দ পেয়েছি এখন Hamlet আর Faust পড়ে তার শতাংশের একাংশও পাই না। সেই তীব্র অনুভূতি এখন চলে গেছে। সুখের কথা শুনে প্রাণ আনন্দে তেমন আর নাচে না; দুঃখের কাহিনী চোখ দিয়ে সেই অশ্রুর বন্যা আর বহায় না। বাল্যের সেই কোমল দরদী হৃদয় সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে এখন পাষাণের মত কঠিন হয়ে পড়েছে।"

আমি প্রতিবাদ না করে এখানে থাকতে পারলুম না, বললুম "আপনার হৃদয়ের কোমলতা এখনও যায় নি। ব্যবহারিক জীবন আপনাকে যেমন অবিকৃত রেখেছে, তেমন আর কাউকে রাখতে পারে নি।

রায় সাহেব একটু বিরক্তির স্বরে বললেন, "আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলুম, তোমার তখন জন্মও হয় নি। আমার মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে কিনা তুমি কি করে জানবে? যাক, আমার কথা শুন, তর্ক তোমার আদালতের উকিলদের জন্য তুলে রাখ।

"একবার আমাদের পুরাণ চাকর ধেনুর সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলুম। সেখান থেকে আমি বাঁশের একটি ছোট বাঁশী কিনে আনি। সেই বাঁশীটা শেষে আমার প্রাণস্বরূপ হয়ে পড়েছিল। বনে, মাঠে, নদীর তীরে বসে সেই বাঁশীটা বাজাতে আমি বড় ভালবাসতুম। কখনও গাছের ঝোপে সেই বাঁশীটার সঙ্গে আলাপ করতুম; কখনও কোন নির্জনে পুকুর পাড়ে সেই বাঁশী বাজাতে বাজাতে ভাবে বিভোর হয়ে যেতুম; আবার কখনও নৈশ নিস্তব্ধতায় ছাদে বসে সেই বাঁশীর মধ্যে আমার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস ঢেলে দিতুম। আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার আনন্দ, আমার বিষাদ—আমার আশা, আমার আকাঙ্খা সমস্তই সেই বাঁশীর সুরে ফুটে উঠতো। কখনও সেই বাঁশীর স্বরলহরী সমীরণে কেঁপে কেঁপে নাচতো, কখনও তার আনন্দ-গীতিতে তটিনী সৈকত মুখরিত হতো, আবার কখনও তার ব্যথার মূর্চ্ছনায় প্রকৃতি বিষাদে ভরে যেতো। বাঁশীর মধুর সুরটি যখন নেচে, নেচে, কেঁপে, কেঁপে আকাশে উঠতো আমিও তখন কোন আলোয় গড়া ariel এর মত তাতে চড়ে পরীর দেশে চলে যেতুম। খাবার কথা, শোবার কথা, পড়ার কথা তখন আমি একেবারে ভুলে যেতুম। আমার চেতনার মধ্যে তখন থাকতো কেবল সেই বাঁশীর মধুর স্বর লহরী, আর থাকতো আমার ভাবের সেই সোনার রাজ্য।

"বাবা মাঝে মাঝে আড় চোখে আমায় দেখতেন। মনে হতো যেন আমার কথা নিয়ে

তিনি একটু ভাবনাচিন্তা করছেন। এই সময় একদিন তখনকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার Mr. Banerjee আমাদের আতিথ্য স্বীকার করলেন। তার অভ্যর্থনার মহা ধূমধাম পড়ে গেল। নিকটস্থ গ্রাম সমূহের ভদ্রলোকেরা তাঁর দর্শনের জন্য দলে দলে আমাদের বাড়ি আসতে লাগলেন। তিনিও রাজোচিত বিনয় নম্রতার সহিত তাঁদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন।

"আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবার মনে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেটা এবার দূর হল। আমাকে ব্যারিস্টারি পড়াবার জন্য তিনি স্থিরসঙ্কল্প হলেন। আমিও যে কালে Banerjee সাহেবের মত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করতে পারবো এই আশা এখন বাবার মনকে জুড়ে বসলো। Banerjee সাহেবের সামনে আমার ডাক পড়লো। আমায় তিনি পরীক্ষা নিয়ে বাবাকে বললেন, "বেশ ছেলে, তবে পড়াশুনায় ততটা মনযোগ দেয় নি। এখন থেকে একে একটু আঁটাআটির মধ্যে রাখা ভাল।

"তখন আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর। Banerjee সাহেবের উপদেশে বাবা আমায় কলিকাতায় রাখবার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। আমার মাঠে-ঘাটে ঘোরা, বিরলে বসে বাঁশী বাজান আর চাঁদনীর রাতে রূপকথা শুনা সব বন্ধ হল। এক সপ্তাহ পরে বাবা আমায় নিয়ে কলিকাতায় এলেন, আর একজন খুব কড়া শিক্ষকের হাতে তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। আসবার সময় বাঁশীটিও কাঁদতে কাঁদতে অন্যান্য খেলনার সঙ্গে ছেড়ে এলুম।

"কলিকাতায় বাবা আমায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই আমি পেয়েছিলুম। এখানকার আবহাওয়ায় এই প্রবৃত্তিগুলি খব সবল হয়ে উঠলো। নিজের এর তাড়নে আর বাবা এবং শিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহে আমি খুব মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করতে লাগলুম। প্রথম পরীক্ষাতেই ক্লাসে শীর্ষস্থান অধিকার করলুম। বাবা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলেন।

"বয়সের সঙ্গে আমার উৎসাহ, ambition এবং একাগ্রতা বাড়তে লাগলো। Entrance, F.A., B.A. তিনটি পরীক্ষাতেই ইউনিভার্সিটিতে আমি প্রথম স্থান অধিকার করলুম। বাবা তখন উপযুক্ত আয়োজন করে আমায় বিলাতে পাঠালেন। সম্মানের সহিত ব্যারিস্টারি পাশ করে তিন বৎসর পরে আমি দেশে ফিরে এলুম আর হাইকোর্টে নাম লিখিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলুম।

"এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার অতীত গ্রাম্য জীবনের কথা, আমার কল্পনা-জল্পনার কথা, আমার বাঁশীটার কথা অবশ্য মধ্যে মধ্যে মনে পড়তো। কিন্তু এসবের দিকে অনুরাগ দেখলেই বাবা, আমার শিক্ষক মহাশয় এবং সাহেব আমায় সতর্ক করে দিতেন। কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। গুরুজনের উপদেশ অনুজ্ঞা আমি বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করে নিতুম। পরীক্ষার কৃতিত্বও আমায় তাঁদের উপদেশ অনুসরণে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতো।

"ব্যারিস্টারিতে আমি আশাতীত সাফল্য লাভ করলুম। অল্পদিনের মধ্যে আমার বেশ

পশার প্রতিপত্তি হয়ে গেল। আমাদের ব্যবসায়ে একবার পশার হলে টাকার অভাব থাকে না। আমার বেলাতেও তাই হল। অর্থ পিপাসার কিন্তু নিবৃত্তি নাই। যত উপায় করতে থাকলুম টাকার লোভও ততই বাড়তে লাগলো। ব্যবসায়ে তখন আমি একেবারে মেতে গেলুম।

বাল্যের ভাব-প্রবণতা কিন্তু আমাকে একেবারে ছাড়েনি। পর্বতাভ্যন্তরস্থিত অগ্নি প্রবাহের উর্দ্ধগমন-প্রয়াস যেমন মধ্যে মধ্যে সমস্ত পর্বতকে চঞ্চল করে তুলে, আমার আত্মার উর্দ্ধগমনপ্রয়াসও আমাকে তেমনি মধ্যে মধ্যে চঞ্চল করে তুলতো। সে উত্তেজনা কিন্তু আমার মনকে বেশীক্ষণ চঞ্চল রাখতে পারতো না।

"সংসারের মোহ স্ববলে সেটাকে তাড়িয়ে আমায় আবার পূর্বাচরিত অর্থোপার্জ্জনের পথে টেনে নিয়ে যেতো।"

"ছয় মাস পূর্বে কিন্তু এক অভূতপূর্ব দুর্ঘটনা এসে আমার সমস্ত জীবনকে উলটপালট করে দিলে। আমার জীবনসঙ্গিনী আমায় শোকে ভাসিয়ে পরলোকে অন্তর্দ্ধান করলেন। আমাদের সন্তান-সন্ততি কেহ ছিল না। আমি মূলোৎপাটিত বৃক্ষের মত একেবারে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লুম। সমস্ত জীবন আমাবস্যার রাত্রের মত অন্ধকার মনে হতে লাগলো। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে কয়েক দিন কাটালুম। তারপর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলুম। Practice করা তখন আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একবার ভাবলুম কিছুদিনের জন্য বিলাত যাই। কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হল না। সেখানে কে আছে, কার কাছে যাব? তারপর ভাবলুম Darjeeling কিম্বা শিলং হয়ে আসি। তাতেও মন উঠলো না। কলিকাতার নির্জনতাই আমাকে পীড়িত করে তুলেছিল; সেখানে গিয়ে শেষে পাগল হয়ে না ফিরি। বাল্যের সুখ-স্মৃতি জড়ান দেশের বাড়ির কথা তখন মনে পড়লো। ভাববার একটা বিষয় পেলুম।

"ধীরে ধীরে সেই সুদূর বাল্যজীবনের কথা আমার মনে পড়তে লাগলো। মার অসীম স্নেহের কথা মনে পড়লো। দিদিমার যত্ন আদরের কথা মনে পড়লো। মার গভীর অথচ ভ্রান্ত মঙ্গলাকাঙ্খার কথা মনে পড়লো। যে-দিন দেশ ছেড়ে কলিকাতায় এসেছিলুম সেদিনকার মার বাষ্পাকুল দৃষ্টির কথা মনে পড়লো, দিদিমার রুদ্ধ কণ্ঠের আশীর্বাদের কথা মনে পড়লো। আমার পরীক্ষার ফলের গেজেট হাতে করে বাবা যখন আমার কৃতিত্বের খবর আমায় শুনিয়েছিলেন তখনকার তাঁর সেই গর্বস্ফীত চেহারার কথা আমায় মনে পড়লো।

"কোথায় এখন আমার সেই স্বজনেরা? একে একে আমাকে ছেড়ে সকলেই অনন্তধামে চলে গিয়েছিলেন। কালের স্রোত আমার জীবনেব শেষ অবলম্বনটাকেও এবার ভাসিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারে এখন আমি প্রকৃতই একজন অনাথ; জীবন পথের এখন আমি প্রকৃতই একজন সঙ্গীহীন পথিক।

"আবার সেই জন্মভূমিতে ফিরে যাবার একটা অদম্য বাসনা এসে তখন আমার মনকে জুড়ে বসলো। আমার অন্তরাত্মা বলতে লাগলো আমি সেখানেই শান্তি পাব, আর কোথাও

পাবনা। আর দেরী করতে পারলুম না। সেই দিনই আবশ্যকীয় জিনিসপত্রগুলি একটি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে নিয়ে দেশে ফিরলুম।

"আমাদের সেই পুরাণ চাকর ধেনু অনেকদিন পূর্বে মারা গিয়েছিল। তার ছেলে রাম আমায় অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল। তাকে দেখে ধেনুর কথা আমার মনে পড়লো। চেহারায়, হাবভাবে, ধরণ ধারণে সে ধেনুর একটি নিঁখুত প্রতিমূর্ত্তি। সেই ধেনুর মত মিশমিশে কাল রং, সেই ধেনুর মত খাঁদা বোঁচা নাক, সেই ধেনুর মত সরল অকপট হাসি, আর ঠিক সেই ধেনুরই মত বাৎসল্যপূর্ণ অথচ স্বসম্মান সম্ভাষণ। জীবনের কর্মক্ষেত্রে মানুষ তার অসমাপ্ত কাজ তার সন্তান-সন্ততির হাতে ছেড়ে যায়। কর্ত্তব্যপরায়ণ ধেনুও তার অসমাপ্ত কাজ তার রামের হাতে ছেড়ে গেছে। আমার অসমাপ্ত কাজ আমি কার হাতে ছেড়ে যাব?

"ভাবতে ভাবতে আমি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলুম। সেখানে এখন কেবল প্রাচীনা বিধবা আত্মীয়া একটি কুঠুরিতে থাকতেন আর সেই বাড়ির দেখাশুনা করতেন। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলুম। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি আমার জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। আমি তখন আমার সেই বাল্যের লীলাভূমির এদিক ওদিক দেখতে লাগলুম। সেই প্রকান্ড অট্টালিকা যা একদিন আমাদের আনন্দের কোলাহলে মুখরিত হতো, আজ সেটি আরব্য উপন্যাসের কোন উজাড় শহরের মত নিস্তব্ধ পড়ে আছে। আলিসা থেকে বালি খসে পড়েছে। উঠানে আগাছার বন হয়েছে। মেজেতে শেওলা জমেছে। শ্রীহীনতার চিহ্ন সর্বত্রই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

"মরিচাধরা তালাটি খুলে মার কুঠারিতে প্রবেশ করলুম। সেই চিরপরিচিত কুঠারিটি পূর্বাবস্থাতেই আছে। কেবল দেওয়ালে ছবিগুলির উপর আর আসবাব সামগ্রীর মধ্যে মাকড়সা তার জাল বিছিয়েছে। ঝুলে আর ধুলোয় জিনিসপত্রগুলি মলিন হয়ে পড়ে আছে। মার জন্য তারা যেন তাদের শোকের বেশ পরেছে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে মার আলমারির একটি Dıawer খুললুম। Drawer এর কোণে আমার বাল্যবস্থার একখানি আলোক-চিত্র একটি রূপার ফ্রেমে পড়ে আছে দেখলুম। চিত্রটির পাশেই সার্টিনে মোড়া এক লম্বা জিনিষ আমার দৃষ্টিতে পড়লো। কৌতূহলপরবশ হয়ে সেটি তুলে আবরণটি খুললুম। ভিতরে দেখি কিনা আমার সেই পুরান বাঁশী। আমার স্নেহময়ী মা সেটিকে সযত্নে এই চারু আবরণে কোন মহামূল্য রত্নের মত লুকিয়ে রেখেছেন। বাঁশীটি এখন শুকিয়ে ফেটে ফেটে গিয়েছে।

"আমি আর থাকতে পারলুম না। বাঁশীটি হাতে করে একটি চেয়ারে বসে পড়লুম। দুই চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল।

"পরদিন সকালে সেই বাঁশীটি নিয়ে আমার সেই চির পরিচিত মাঠের দিকে গেলুম। ক্ষীণাঙ্গিনী সরস্বতী ক্ষীণতর হয়ে আগের মতই সমুদ্রের পথে চলেছে, কিন্তু আমার কল্পনার ভেলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা সে আর করলে না। সেই বিভীষিকাময় তেঁতুল গাছটি

নদীর তীরে এখনও একেলা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু পূর্বের মত তার ডালপালা নেড়ে তার রহস্যের ভান্ডার খুলে আর দেখলে না। সেই সরু গ্রাম্য পথটি জলার উপর এখনও বিছান রয়েছে আর তার উপর দিয়ে পথিকের দল আগের মতই তাদের গন্তব্য পথে চলেছে, কিন্তু আমাকে বুকে করে পরীর দেশে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা সে আর করলে না। পাখিগুলি গাছে বসে আগের মতই গাইছে, কিন্তু তাদের সঙ্গীতে যোগ দিতে আমায় তারা আর ডাকলে না। গাছের ডালপালাগুলি বাতাসে আগের মতই নড়ছে, কিন্তু আমায় তারা আগের মত তাদের নাচে যোগ দিতে আর সাধলে না। আমায় এখন তারা সব ভুলে গেছে। আমি আর তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই।

"ব্যথিত মনে তখন বাঁশীটি নিয়ে বাজাবার চেষ্টা করলুম। দুই একবার সেটি পোঁ পোঁ, ফিস, ফিস করে উঠলো, কিন্তু তার মধ্যে সেই প্রাণ মাতানো স্বর-লহরীর কোন সন্ধান আমি আর পেলুম না। তার প্রাণ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কেবল তার শুষ্ক দেহটি এখন পড়ে আছে।

"সব ছেড়ে নিজের জীবনের কথা তখন ভাবতে লাগলুম। আমারও প্রকৃত প্রাণ কি আমায় ছেড়ে যায় নি? বাল্যের সেই অভ্রচুম্বী আশা, সেই অতুল ভাব-সম্পদ, সেই অফুরন্ত আনন্দ-ভান্ডার সেই দৈবদত্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি— এসব কি আমার স্থূল সাংসারিক লোভের চাপে, আমার নীচ ambition এর নিষ্পেষণে বিনষ্ট হয়ে যায় নি? ভগবানের নিকট থেকে বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে আমি জগতে এসেছিলুম, সে সম্পদের কি সদ্ব্যবহার আমি করেছি? বাঁদর যেমন মুক্তা চিনে না, আমিও তেমনি সম্পদের মূল্য বুঝিনি। সংসারের কতকগুলা রঞ্জিত কাচ খন্ডের লোভে এই অমূল্য রত্নের হারকে আমি মাটিতে লুটিয়েছি। আমার জীবনের এই দীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যে আমার অস্তিত্বের সমর্থনের জন্য, ভগবান যে মহামূল্য দৌলৎ আমার হাতে দিয়েছিলেন তার হিসাব তাঁকে দিবার জন্য কি আমি করেছি?

"হাঁ, হাঁ করেছি বইকি! লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করেছি; সত্যকে অগণ্যবার মিথ্যে বানিয়েছি, মিথ্যেকে সত্য বানিয়েছি। করেছি বইকি; গরীবের রক্ত শোষণে ধনীকে সাহায্য করেছি, দুর্বলের দলনে সবলের অমোঘ অস্ত্র হয়ে নিজের দ্যুতিতে জগৎকে চমকে দিয়েছি। করেছি বইকি মনুষ্য শার্দ্দুল এটর্নিকে, পিতৃহীন অনাথের, অভিভাবকহীন বিধবার অবাধ ভক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করেছি। করেছি বইকি,—কপর্দকহীন খাতকেয় শেষ আশ্রয় তার বাস্তু ভিটাকে শেরিফের নিলামে তুলতে, শনিগ্রস্ত দেউলিয়াকে কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভিতর পুরতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছি। কি করিনি আমি? যথেষ্ট করেছি। এটর্নি মহাজনদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলি সগর্বে মাথা তুলে আমার কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। খাতকের শুষ্ক মলিন মুখ আমার প্রতিভার অপূর্ব দাহনশক্তির শরীরী প্রমাণরূপে জগতের দিকে করুণনেত্রে চেয়ে আছে।

মন্দিরের ভগ্নচূড়া, মসজিদের ভগ্ন প্রাচীর—আমার অলৌকিক আইন জ্ঞানের কথা ভক্তসমীপে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করছে। অন্তর্যামী জানেন, আমি যা করেছি, যথেষ্ট করেছি।

"অনুশোচনার তীব্রজ্বালায়, আত্মঘৃণার তীব্র দংশনে আমি অধীর হয়ে পড়লুম। আমার সেই স্নেহময়ী ধাত্রী সরস্বতীকে সাক্ষ্য করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলুম, আইনের ব্যবসায়ে আর ফিরিবো না। জীবনের শেষ দিনগুলি পতিতপাবন ভগবানের চিন্তায়, দুঃখী-দরিদ্রের সেবায়, আর আমার বাল্যের সেই দেবদত্ত অনুভূতির পুনরুদ্দীপনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করবো। প্রতিভায় নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ আবার জ্বলুক আর না জ্বলুক, অন্তরে অন্তত তাতে শান্তি পাব। আমার মত মূঢ়ের পক্ষে তাও যথেষ্টের চেয়ে বেশী হবে।

"রাত্রে সেই বাঁশীটি যত্নে বালিশের নীচেয় রেখে সেই পুরাণ পালঙ্কে শয়ন করলুম। আমাব সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলি গতিশীল চিত্রের ফিল্মের মত আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে অস্পষ্টতর হয়ে সেগুলি শেযে আমার তন্দ্রার জোয়ারে ডুবে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। তখন এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলুম।

"আমি যেন সরস্বতীর তীরে হাতে মাথা দিয়ে পড়ে আছি। আমার বাঁশীটিও আমার সামনে ঘাসের উপর পড়ে আছে। আমি অন্যমনস্কভাবে সেটিকে দেখছি। হঠাৎ সেটি ফেঁপে বাড়তে আরম্ভ করলে। আমি চমৎকৃত হয়ে দেখতে লাগলুম। বাড়তে বাড়তে সেটি ফেটে দুভাগ হয়ে গেল আর তার ভিতর থেকে আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে এক অলোক সামান্য রূপবতী রমণী বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল অপূর্ব দর্শন একটি সোনার বাঁশী। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। অতি মধুরকণ্ঠে আমার দিকে চেয়ে সুন্দরী বললেন, "আমায় চিনতে পারছ?"

আমি মাথা নেড়ে বললুম, "না, আপনি কি স্বর্গের কোন দেবী না কিন্নরী?"

সুন্দরী বললেন, "আমি হচ্ছি এই বাঁশীর প্রাণ। আমার কথা ভেবেছিলে বলে তোমায় দেখা দিতে এসেছি।"

আমি অনুযোগের স্বরে বললুম, "আমার বাঁশীকে ছেড়ে তাহলে আপনি চলে গেলেন কেন?"

সুন্দরী ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "আমায় যে তাচ্ছিল্য করে, তার কাছে থাকবার আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

আমি কুণ্ঠিত হয়ে চুপ করে রইলুম। কি বলবো ঠিক করতে পারলুম না। সুন্দরী তখন স্মিতমুখে বললেন, "অনেক দিন পর আমায় স্মরণ করেছ; আজ তোমায় কিছু বাজিয়ে শুনাই।" আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কিছু বলবার আগেই তার সেই বাঁশীর সুর আমার শ্রবণে প্রবেশ করে আমার মন-প্রাণকে মোহিত করে দিলে।

"নদী প্রান্তর, বৃক্ষলতা, জল স্থল সুন্দরীর বাঁশীর সেই স্বর্গীয় তালে নাচতে লাগলো। এক অপূর্ব পুলকে আমার সমস্ত শরীর কন্টকিত হয়ে উঠলো। আমার বিস্ময় বিস্ফারিত

দৃষ্টির সামনে সেই নদীতটস্থ বন থেকে অনুপম লাবণ্যবিশিষ্ট, বিচিত্র কুসুমাভরণে সজ্জিত এক যুবক যুবতীর দল বের হয়ে এল, আর মধুর অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে নাচতে লাগলো।

" সে কি অপরূপ দৃশ্য! সেই নৃত্যশীল যুবক যুবতীদের কটাক্ষে থেকে মন্মথের ফুলশর অজস্রভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলো। তাদের প্রত্যেক ভঙ্গিমাতে প্রেমের উৎস যেন উথলে উঠতে লাগলো। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে লাগলুম। ক্ষণেক পরে বাঁশী থামিয়ে সুন্দরী সঙ্কেত করলেন, আর অমনি তাঁরা নিমেষের মধ্যে সেই বন মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আমি কথা বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময় সুন্দরী এক নূতন সুর ধরলেন। সে সুরের রুদ্রতেজে জল স্থল কেঁপে উঠলো। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে লম্ফ দিয়ে কোন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবমান হবার একটা উৎকট প্রবৃত্তি আমার মনের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠলো। সুন্দরীর তর্জনীর সঙ্কেতে প্রকৃতস্থ হয়ে দেখলুম বন জঙ্গল সেই নদীতট থেকে অদৃশ্য হয়েছে আর তাদের জায়গায় কোন ইউরোপীয় নগরীর প্রশস্ত রাজপথ বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। নগরীর আকার প্রকার দেখে মনে হল আমি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দেখতে পাচ্ছি। রাজধানীর সেই পথ দিয়ে অসংখ্য নরনারী পতাকা হাতে করে কেউ Liberty কেউ Equality কেউ Faternity বলে চীৎকার করতে করতে দলবদ্ধ হয়ে পরিমিত পদক্ষেপে বাজনা বাজিয়ে চলেছে। তাদের সেই বাজনার সঙ্গে সুন্দরীর বাঁশীতে মিলে La Maisecllee's এর উন্মাদনাময় সুরকে এক অপূর্ব ঝঙ্কারে বাজিয়ে তুললে। আমি চমকে দেখলুম প্যারিসের সেই রাজবর্ত্ত চলে গেছে আর তার সঙ্গে সেই বিপ্লবপন্থী জনপ্রবাহও শূণ্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

"সুন্দরী তখন এক নূতন সুর ধরলেন। এ সুরের প্রথম সুরের কোমল গুঞ্জন ছিল না আর দ্বিতীয় সুরের গভীর বজ্রনিনাদও ছিল না। এতে ছিল অনন্ত, অফুরন্ত আশার মৃদু গম্ভীর মর্মর ধবনি, ভগবদ্ভক্তির আবেগময় ঝঙ্কার, আর বিশ্ব প্রেমের উচ্ছ্বাসময়, উন্মাদনাময় মধুর গম্ভীর কল্লোল। সেই স্বরলহরী আমার মন প্রাণকে এক অপূর্ব স্বর্গীয়ভাবে বিভোর করে দিলে। ভক্তির অমৃতময় উৎস আমার অন্তর থেকে উথলে উঠতে লাগলো। আমার দৃষ্টি আপনা থেকেই দিগন্তের দিকে চলে গেল।

"সেখানে দেখলুম আকাশের গায়ে হালকা হালকা মেঘগুলি বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র হয়ে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। আর তাদের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসনে এক মহাপুরুষ বসে আছেন। তাঁর শরীর থেকে এক অপূর্ব বৈদ্যুতিক আভা বের হয়ে সমস্ত জগৎটাকে আলোকিত করেছে। আর তাঁর পদতলে কোটি কোটি জন প্রাণী এবং নরনারী ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমিও তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণত হলুম। এক অপার্থিব আনন্দে আমার মন প্রাণ ভরে গেল।

"হঠাৎ সুন্দরীর হস্ত-স্পর্শে আমি চমকে উঠলুম। তাঁর বাদ্য তখন থেমে গেছে, দেখলুম

সেই অলৌকিক দৃশ্যও দিগন্ত থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুন্দরীর দিকে চাইলুম। তিনি বললেন, "এস, এবার তোমায় অমরলোকে নিয়ে যাই। ভগবানের দরবার তোমায় দেখিয়ে আনি।"

"সুন্দরী আমার হাত ধরে শূণ্যপথে উঠলেন। আমিও অক্লেশে তাঁর সঙ্গে বায়ুপথে চলতে লাগলুম। পৃথিবী থেমে আমার দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগলো। ঘর, বাড়ি, গাছ, বন ক্রমেই ক্ষুদ্রতর মনে হতে লাগলো। এর মধ্যে আমরা পৃথিবীর মত একটা নূতন জগতের সামনে এসে পড়েছিলুম। সেখানে কেবল শুষ্ক মরুভূমি আর প্রান্তরময় পর্বত দেখতে লাগলুম। সুন্দরী বললেন এই হচ্চে চন্দ্রলোক। আমরা চন্দ্রকে ছেড়ে আরও উপরে উঠতে লাগলুম। পৃথিবী একটা জ্যোতিষ্কের মত দেখাতে লাগলো। চন্দ্রের গোলকটিও ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বোধ হতে লাগলো। এইরূপে অনেক গ্রহ, অনেক উপগ্রহ অতিক্রম করে আমরা এক অন্তহীন প্রচন্ড অগ্নিপিন্ডের সামনে এলুম। ভয়ে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগলো। সেই অগ্নির ভীষণ গর্জনে আমার কান বধির হয়ে যেতে লাগলো। আমরা অবিরাম গতিতে আরও উর্দ্ধে উঠতে লাগলুম।

"ক্রমে অসংখ্য জগৎ, অসংখ্য সূর্য, অসংখ্য গ্রহমালা অতিক্রম করে আমরা এক অপূর্ব অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয় দেশে এসে উপস্থিত হলুম। সেখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই অনুপমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে চলতে চলতে আমরা অনতিবিলম্বে এক অতি সুন্দর নগরে প্রবেশ করলুম। দেখলুম আমাদের সামনে এক অতি প্রশস্ত রৌপ্যনির্মিত রাজপথ বিস্তৃত রয়েছে। সেই পথ দিয়ে আমরা চলতে লাগলুম। পথের দুই পার্শ্বে সুরম্য উদ্যান সমূহের মধ্যে সুবর্ণনির্মিত এবং বিচিত্র বর্ণের মণিমাণিক্যে খচিত প্রাসাদগুলি এক অপূর্ব শোভা বিকীর্ণ করছিল। অনুপম সৌন্দর্যবিশিষ্ট, চিরযৌবনসম্পন্ন নরনারীগণ বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয়ে সেই পথ দিয়ে ইতস্তত চলাফেরা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমার মন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সুন্দরীগণ আমাকে তার কোন অবসর না দিয়ে দ্রুত পথ অতিক্রম করে চললেন। আমিও অগত্যা তাঁর অনুসরণ করলুম।

"অনেকক্ষণ চলবার পর আমরা অতি মনোরম রম্য কাননের মধ্যে অবস্থিত এক কল্পনাতীত সৌন্দর্যময় প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হলুম। প্রাসাদটি যে কি উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত বুঝতে পারলুম না। একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের মত সেটি জ্বলছিল। প্রাসাদের অগণ্য সোপানবলী অতিক্রম করে, এক অপূর্ব কারুকার্যময় দালান পার হয়ে আমরা এক প্রকান্ড হলের মধ্যে প্রবেশ করলুম। হলের গম্বুজগুলি আকাশ স্পর্শ করছে বলে মনে হয়।

"হলের প্রান্তভাগে এক প্রকান্ড বেদীর উপর এক উজ্জ্বল সিংহাসনে এক মহাপুরুষ বসেছিলেন। তাঁকে দেখে সেই মেঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের কথা আমার মনে পড়লো। তাঁর শরীরের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার পার্থিব চক্ষু দুটি যেন ঝলসে যেতে লাগলো।

"হলে প্রবেশ করেই সুন্দরী একান্ত ভক্তির সাথে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করলেন। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর অনুসরণ করলুম। সুন্দরী আমায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আমাকে মনে করেছিলে বলে ভগবানের দরবার আজ তোমায় দেখিয়ে দেলুম। চারি·দিক দেখে তোমার জন্ম সার্থক কর।"

"আমি চক্ষু ফিরিয়ে দেখলুম ভগবানের সিংহাসনের তলে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সিংহাসনে অপূর্ব জ্যোতিবিশিষ্ট মহাপুরুষেরা বসে আছেন। তাঁদের মুখাবয়ব দেখে পৃথিবীর কথা স্মরণ হল। দুই একজনকে তাঁদের মধ্যে আমি চিনতেও পারলুম। সুন্দবী আমায় তাঁদের পরিচয় দিতে লাগলেন। বললেন, "ইনি হচ্চেন বাল্মীকি", "ইনি হচ্চেন হোমার", "ইনি হচ্চেন দান্তে।" এইরূপে অনেক মহাজনদের আমায় দেখিয়ে দিলেন। আমাদের যুগের Victor Hugo প্রভৃতি মহাত্মাদেরও সেখানে দেখতে পেলুম। তাঁদের সমস্ত শরীরের মধ্যে এক অলৌকিক জ্যোতি, এক অবর্ণনীর লাবণ্য এসেছে। তাঁদের মুখমন্ডলে এক স্বর্গীয় শান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

"ক্ষনেক পরে সুন্দরী বললেন, "এখানে তিষ্ঠিবার তোমার অধিকার নাই। এস আবার তোমায় পৃথিবীতে রেখে আসি।" একান্ত ভক্তির সঙ্গে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আমরা দুইজনে বাইরে এলুম। সুন্দরীকে তখন জিজ্ঞাসা করলুম "এই মহাপুরুষেরা এমন কল্পনাতীত সৌভাগ্য কি করে পেলেন?" সুন্দরী বললেন, "আমার বরেই পেয়েছেন।" আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, "আপনার এত ক্ষমতা?" সুন্দরী মৃদু হেসে বললেন, "আমি কেবল তোমার বাঁশীর প্রাণ নই। আমি শিল্পেরও প্রাণ, সাহিত্যেরও প্রাণ। আমিই হচ্চি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমার বরেই লোক কবি হয়, শিল্পী হয়, গায়ক হয়, বাদক হয়। আমিই তাদের সাধনা সার্থক করি। আমিই তাদের ভগবানের জ্যোতির্ময় দরবারে নিয়ে আসি।"

"বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে সুন্দরীর দিকে চেয়ে অতি করুণ কণ্ঠে আমি বললুম, "আমাকেও তাহলে বর দিন। আমিও এই অমর পুরীতে আসতে চাই।"

সুন্দরী স্নেহের কোমল স্বরে বললেন, "বাছা তোমাকে বর দিবার ক্ষমতা আমার নাই। দেবী হলে কি হবে, তোমারই মত আমিও অধীন। তোমার সুযোগ একদিন এসেছিল কিন্তু তুমি তাকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সম্পদকেই কাম্য বলে গ্রহণ করেছ। তুমি যা চেয়েছিলে ভগবান তোমাকে তা দিয়েছেন। এখন অন্যায় আবদার করলে চলবে কেন! এস তোমায় রেখে আসি।" সুন্দরী আমার হাত ধরলেন। আমরা শূন্য পথে নামতে আরম্ভ করলুম। শোঁ শোঁ করে আমরা নেমে আসছি এমন সময় দরজায় হঠাৎ খট খট করে শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

"উঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে। প্রভাত সূর্যের আলো আমার কামরায় প্রবেশ করেছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমার বিধবা আত্মীয়াটি বলছেন,— উঠ বাবা, বেলা হয়ে গেছে, চা খাবে এস।"

রায় সাহেব হঠাৎ স্তব্ধ হলেন। আমি নিবিষ্টমনে তাঁর কথা শুনছিলুম। চমকে উঠে

বললুম "কি চমৎকার স্বপ্ন!" আমরা এর মধ্যে motor stand এর কাছে এসে পড়েছিলুম। তিনি তাঁর মোটরে উঠলেন। আমিও বিদায় অভিবাদন করলুম। মোটব থেকে বের হতে লাগলো, রায়সাহেব আমাব দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "বুড়োকে একেবারে ভুলোনা। মাঝে মাঝে দেখা করো।"

"নিশ্চয" বলে আমিও বাড়ির পথ নিলুম।

অতৃপ্ত কামনা

কাজী নজরুল ইসলাম

সাঁঝের আঁধারে পথ চ'লতে চ'লতে আমার মনে হ'ল, এই দিনশেষে যে হতভাগার ঘরে একটি প্রিয় তরুণ মুখ তার কালো চোখের করুণ কামনা নিয়ে সন্ধ্যাদীপটি জ্বেলে পথের পানে চেয়ে থাকে না, তার মত অভিশপ্ত বিড়ম্বিত জীবন আর নেই!

আমারই বেদনা-রাগে রঞ্জিত হ'য়ে গগনের পশ্চিম দুয়ারে জ্বালা সন্ধ্যা-তারা আমার মুখে তার অশ্রু-ভরা ছল ছল চোখ দিয়ে ঐ কথাটিতে সায় দিলে। ঝিল্লী তান-মুখরিত মাঠের মৌন পথ বেয়ে যেতে যেতে শ্রান্ত চিন্তা ক'য়ে গেল,— "তোমার ব্যথা বোঝে শুধু ঐ এক সাঁঝের তারা!"

যদি কোন ব্যথাতুর একটি পল্লী হ'তে আর একটি পল্লীতে যেতে এম্‌নি সাঁঝে একা শূন্য মাঠের সরু রাস্তা ধ'রে চ'লতে থাকে, আর তার সামনে এক টুকরো টাটকা কাটা-ক'লজের মত এই সন্ধ্যাতারাটি ফুটে ওঠে, তবে সেই বুঝবে কত বুক-ফাটা ব্যথা সে-সময় তার মনে হ'য়ে তাকে নিপীড়িত করতে থাকে!

এই মলিন মাঠের শূন্য বুকে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, শুধু কোথায় সান্ধ্য নীড়ে বসে একটি 'ধুলো-ফুরফুরি' শিস দিয়ে বাউল গান গাইছে, আর তারই সূক্ষ্ম রেশ রেশমী সুতোর মতো উড়ে এসে আমার আন্‌মনা-মনে ছোঁওয়া দিচ্ছে! একটি দুটি করে আস্‌মানের আঙিনায় তারা এসে জুটেছে, আমার মনের মাঝেও তাই অনেক দিনের অনেক সুপ্ত কথার, অনেক লুপ্ত স্মৃতির একটির পর একটির উদয় হচ্ছে।

আমার এই একই কথা, একই ব্যথা যে কত দিক দিয়ে কত রকমে মনে পড়ছে, তার আর সংখ্যা নেই। তবু বারে বারে ও-কথাটি ও-ব্যথাটি জাগবেই! মন আমার এ বেদনার নিবিড় মাধুর্যকে আর এড়িয়ে যেতে পারলে না। সাপ যেমন মানিক ছেড়ে তার সেই মানিকটুকুর আলোর বাইরে যেতে পারে না, আমারও হয়েছে তাই। আমার এই বুকের মানিক বেদনা-টুকুর অহেতুক অভিমানের মায়া এড়িয়ে যেতে পারলাম না!

অনেক দূরে হাটের ফেরতা কোন ব্যথিতা পল্লী-বধূ মেঠো-সুরে মাঠের বিজন পথে গেয়ে যাচ্ছিল,—

"পরের জন্যে কাঁদ রে আমার মন,
হায়, পর কি কখন হয় আপন?"

আমি মনে মনে বললাম, হয় রে অভাগী, আপন হয়; তবে অনেকে সেটা বুঝতে পারে না। বুকের ধনকে ছেড়ে গেলেই লোকে ভুল বুঝে বলে,— "পর কি কখন হয় আপন?" আর একজনও ঠিক এমনি করে আমায় ছেড়ে গেছে, সে বেদনা ভুলবার নয়!

পথের বিরহিণীর ঐ প্রাণের গান আমায় মনে করিয়ে দিলে অমনি আর একজন অভিমানিনীর কথা। সেই দিল-মাতানো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মত আমার হিয়ার যমুনায় বারে বারে ভেসে উঠছে!

তাতে-আমাতে পরিচয় শুধু ছেলেবেলা থেকে নয়— তারও অনেক আগে থেকে; সেই চির-পরিচয়ের দিন তারও মনে নেই, আমারও মনে নেই।..... আমাদের পাড়াতেই তাদের বাড়ী।

তাকে আমার বিশেষ করে দরকার হত সেই সময়, যখন কাউকে মারবার জন্যে আমার হাত দুটো ভয়ানক নিশ্-পিশ্ করে উঠত! এ মারারও আবার বিশেষত্ব ছিল, যখন মারবার কারণ থাকত তখন তাকে মারতাম না; কিন্তু বিনা কারণে মারাটাই ছিল আমার ক্ষেপা-খেয়াল। আমার এ পিটুনী খাওয়াটাকে সে পসন্দ করত কি না জানিনে, তবে দু'দিন না মারলে সে আমার কাছে এসে হেসে বলত "কই ভাই, এ দু-দিন যে আমায় মারনি?"

আমি কষ্ট পেয়ে ব'লতাম,— না রে মোতি, তোকে আর মারব না! তার পর, সে সময় আমার হাতের সামনে যা-কিছু ভাল জিনিস থাকত, তাই তাকে দিয়ে যেন আমার প্রাণে গভীর তৃপ্তি আসত! মনে হত, এই নিয়ে সে হয় তো আমার আঘাতটাকে ভুলবে।

বই থেকে ছবি ছিঁড়ে তাকে দেওয়াই ছিল আমার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। এর জন্যে প্রায়ই পাঠশালায় সারা দিন কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কিন্তু যখন দেখতাম যে, আমার ঐ মহা উপহার সে পরম আগ্রহে আঁচলের আড়াল করে নিয়ে গিয়ে তার পুতুলের বিছানা পেতে দিয়েছে, কিংবা তার খেলাঘরের দেওয়ালে ভাত দিয়ে সেগুলি এঁটে দিয়েছে, তখন আমার পাঠশালার সব অপমান ভুলে যেতাম। কিন্তু তার ঐ মেনী বেড়ালটাকে আমি দু চোখে দেখতে পারতাম না, তাকে যে অত আদর করবে রাত দিন, এ যেন আমার সইত না! সে আমায় রাগিয়ে তুলবার জন্যে কোন দিন আমার-দেওয়া সবচেয়ে ভাল ছবিটা আঠা দিয়ে ঐ মেনী বেড়াল-ছানাটার পিঠে এঁটে দিত, আমিও তখন থাপ্পড়ের চোটে তার দুলালী বেড়াল-বাচ্চাকে ত্রি-ভুবন দেখিয়ে দিতাম।

তার দেখা-দেখি আমিও সময় বুঝে যে দিন সে রেগে থাকত ব' মুখখানা হাঁড়ি-পানা করে বসে থাকত, তখন জোর ধুম্সুনী দিয়ে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম। তখন আমাব আনন্দ দেখে কে! সে যত কাঁদত আমি তত মুখ ভেংচিয়ে তাকে কাঁদিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতাম। এক এক দিন তার পিঠের চামড়ায় পাঁচটি আঙুলের কালো দাগ ফুটিয়ে তবে ছাড়তাম। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, ঐ মার খাওয়ার পরেই সে বেশ শায়েস্তা হয়ে গেছে, আর এক মিনিটে কেমন করে সব ভুলে গিয়ে জল-ভরা চোখে-মুখে প্রাণ-ভরা হাসি এনে আমার আঙুলগুলো টেনে মুচড়িয়ে ফুটিয়ে দিতে দিতে বলছে— "তোমার এই মারহাট্টা হাতের দুষ্টু আঙুলগুলোকে একেবারে ভেঙে নুলো করে দিতে হয়। তা হ'লে দেখি, তোমার ঐ ঠুঁটো হাত দিয়ে কেমন করে আমায় মার।"

তার হাসি দেখে রেগে পিঠের ওপর মস্ত লাথি মেরে বলতাম— "তা হলে এমনি করে তোর পিঠে ভাদুরে তাল ফেলাই।"

সে কাঁদতে কাঁদতে তার দাদিজিকে বলে দিত গিয়ে এবং তিনি যখন চেলাকাঠ নিয়ে আমায় জোর তাড়া করতেন, তখন সে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ত। রাগে তখন আমার শরীর গশ্-গশ্ ক'রত। তাই আবার ফাঁকে পেলেই তাকে পিটিয়ে দোরস্ত করে দিতাম।

কোন দিন বা তার খেলা-ঘরের সব ভেঙে-চুরে একাকার করে দিতাম, এই দিন সে সত্যি-সত্যি ক্ষেপে গিয়ে আমার পিঠে হয় তো মস্ত একটা লাঠির ঘা বসিয়ে দিন পনেরো ধরে লুকিয়ে থাকত, ভয়ে আর কিছুতেই আমার সামনে আসত না। সেই সময়টা আমার বড্ডো দুঃখ হত। আ মলো, ও লাঠির বাড়িতে আমার এ মোষ-চামড়ার কি কিছু হয়? আর লাগলই বা! তাই বলে কি বাঁদ্রী এমন করে লুকিয়ে থাকবে? তার পর যখন নানান রকমের দিব্যি করে কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম, তখন সে আমার লম্বা চুলগুলো নিয়ে নানান রকমের বাঁকা-সোজা সিঁথি কেটে দিতে দিতে বলত "দেখ ভাই, আর আমি, কখ্খনো তোমায় মারব না! যদি মারি তো আমার হাতে যেন কুঠ্ হয়, পোকা হয়!"

তার পরে হঠাৎ বলে উঠত,— "আচ্ছা ভাই, তুমি যদি আমার মতন বেটি ছেলে হতে, তা হলে বেশ হ'ত,—নয়? —দাও না ভাই, তোমার চুলগুলো আমার ফিতে দিয়ে বেঁধে দিই।" কোন দিন সে সত্যি-সত্যিই কখন কথা কইতে কইতে দুষ্টুমী করে চুলে এমন বিউনী গেঁথে দিত যে, তা ছাড়াতে আমার একটি ঘন্টা সময় লাগত।

তারপর কি হল?—

এই শূন্য মাঠের খানিকটা রাস্তা পেরিয়েই আমার মনের শাশ্বত শ্রোতা জিজ্ঞেস করে উঠলে,— হাঁ ভাই, তার পর কি হ'ল?

আমার হিয়ার কথক কিছুক্ষণ এই নিঝুম সাঁঝের জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে যেন তার কথা হারিয়ে ফেললে। হঠাৎ এই নীরবতাকে ব্যথিয়ে সে কয়ে উঠল,—"না, —না, তোমায় আমি ভালবাসি! সে-দিন মিথ্যা ক'য়েছিলাম মোতি, মিথ্যা ক'য়েছিলাম!" তার এই খাপ-ছাড়া আক্ষেপ সাঁঝের বেলায় তোড়ি রাগিণী আলাপের মত যেন বিষম বে-সুরো বাজলো!— সে আবার স্থির হয়ে তার সুরবাহারে পূরবীর মূর্চ্ছনা ফোটালে! চির-পিয়াসী আমার চিরন্তন তৃষিত আত্মা প্রাণ ভরে সে সুর-সুধা পান ক'রতে লাগলো।

এমনি করেই আমাদের দিন যাচ্ছিল। সে যখন এগারোর কাছাকাছি তখন তাকে জোর করে অন্দর মহলের আঁধার কোণে ঠেসে দেওয়া হ'ল।

সে কি ছট্‌ফটানি তখন তার আর আমার! মনে হ'ল, এই বুঝি আমার জীবন-স্রোতের ঢেউ থেমে গেল! স্রোত যদি তার তরঙ্গ হারায়, তবে তার ব্যথা সে নিজেই বোঝে, বাঁধ-দেওয়া প্রশান্ত দীঘির জল তার সে বেদন বুঝবে না। মুক্তকে যখন বন্ধনে আনবার চেষ্টা

করা হয়, তখনই তার তরঙ্গের কল্লোলে মধুর চল চপলতার কলহ-বাণী ফুটে ওঠে! তাই এ-রকমে চলার পথে বাধা পেয়েই আমাদের সহজ ঢেউ বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে সামনের সকল বাধাকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলে। চির-চঞ্চলের প্রাণের ধারা এই চপল গতিকে থামাবে কে? পথের সাথী আমার হঠাৎ তার চলার বাধা পেয়ে বক্র-কুটিল গতি নিয়ে তার সাথীকে খুঁজতে ছুটলো। এত দিনে যেন সে তার প্রাণের ঢেউ-এর খবর পেল।—

সর্বক্ষণ কাছে পেয়ে যাকে সে পেতে চেষ্টা করেনি, সে দূরে স'রে এই দূরত্বের ব্যথা, ছাড়া-ছাড়ির বেদনা তার বুকে প্রথম জেগে উঠতেই সে তাকে চিনল এবং বলে উঠল,— যাকে চাই তাকে পেতেই হবে।

বঞ্চিত স্নেহের হাহাকার, ছিন্ন বাসনার আকুল কামনা তার বুকে উদ্দাম উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন সে তার এই আকাঙিক্ষত আশ্রয়কে নতুন পথে নতুন করে খুঁজতে লাগল। সে অন্তরে বুঝলে, এ সাথী না হলে আমি আমার গতি হারাব। এই রকম মুক্তি আর বন্ধনের যুঝাযুঝির মাঝে পড়ে সে কাহিল হয়ে উঠল! — সমাজ বললে,—রাখ তোর এ-মুক্তি, —আমি এই দেওয়াল দিলাম!

সেই দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে রক্ত-গঙ্গা বহালে, পাষাণের দেওয়াল— ভাঙতে পারলে না।

এ-দিকে আমাকে কেউ রাখতে পারলে না! লোকের চলার উল্টো পথে উজান বেয়ে চলাই হল আমার কাজ! অনেক মারামারি করেও যখন আমাকে স্কুলের খাঁচায় পুরতে পারলে না, তখন সবাই বললে,— এ ছেলের যদি লেখা-পড়া হয় তবে সুগ্রীব-সহচর দগ্ধমুখ হনুবংশ কি দোষ করেছিল? তারাও হাল ছেড়ে দিলে, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলাম এই বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে গিয়ে যত তাকে ভুলে রয়েছি, ততই যেন সে আমার একান্ত আপনার হ'য়ে আমার নিকটতম কাছে এসে আমার ওপর তার সব নির্ভরতা সঁপে গেছে।—

যমুনা আসছিল সাগরের পানে, ঐ সাগরও তার দিগন্ত-ছোঁওয়া ঢেউ-এর আকুলতায় লক্ষ বাহুর ব্যগ্রতা নিয়ে তার দিকে ছুটে যেতে চাইল। দু'জনেই অধীর হয়ে পড়েছিল এই ভেবে—হায়, কবে কোন মোহানায় তাদের চুমোচুমি হবে, তারা এক হ'য়ে যাবে।......

আর আমাদের দেখা-শোনা হত না। কথা যা হত, তা কখনও সবাইকে লুকিয়ে ঐ একটি চোরা-চাওয়ায়, নয়তো বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দু'টি তৃষিত অতৃপ্ত দৃষ্টির বিনিময়ে! ঐ এক পলকের চাওয়াতেই যে আমাদের কত কথা শুধানো হয়ে যেত, কত ব্যথা-পুলক শিউরে উঠত, তা ঠিক বোঝানো যায় না।

আরও পাঁচ বছর পরের কথা।—

এক দিন শুনলাম তার বিয়ে হবে, মস্ত বড় জমিদারের ছেলে বি এ পাশ এক যুবকের সাথে। বিয়ে হবার পর সে শ্বশুর-বাড়ী চ'লে যাবে, তার সাথে আমার এই চোখের চাওয়া-

টুকুও ফুরাবে, এই ব্যথাটুকুই বড় গভীর হয়ে মর্মে আমার দাগ কেটে বসে গেল। এ ব্যথার প্রগাঢ় বেদনা আমার বুকের ভিতর যেন পিশে পিশে দিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু যখন মেঘ-ছাড়া দীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত সহসা এই কথাটি আমার মনে উদয় হ'ল যে, সে সুখী হবে, তখন যেন আমি আমার নতুন পথ দেখতে পেলাম। বললাম,— না, আমি জন্মে কারুর কাছে মাথা নত করিনি, আজও আমাকে জয়ী হ'তে হবে! আর দুঃখই বা কিসের? সে ধনী শিক্ষিত সুন্দর যুবকের অঙ্কলক্ষ্মী হবে, অভাগী মেয়েদের সুখী হবার জন্যে যা-কিছু চাওয়া যায় তার সব পাবে ; কিন্তু হায়, তবু অবুঝ মন মানে না! মনে হয়, আমার মতন এত ভালবাসা তো সে পাবে না!

এই কথা ক'টি ভাবতে গিয়ে আমার বুক কান্নায় ভরে এল,—আমার যে বাইরের দীনতা তাই মনে পড়ে তখন আমাকে আমার অন্তরের সত্য—প্রেমের গৌরবের জোরে খাড়া হ'তে হ'ল! এক অজানার ওপর তীব্র অভিমানের আক্রোশে ব'ললাম, নিজের সুখ বিলিয়ে দিয়ে এর প্রতিহিংসা নেব! ত্যাগ দিয়ে আমার দীনতাকে ভ'রে তুলব।

এত দ্বন্দ্বের মাঝে "আমার প্রিয় সুখী হবে" এই কথাটির গভীর তত্ত্ব প্রাণে আমার ক্রমেই কেটে কেটে বসতে লাগল, তার পর হঠাৎ এক সময় আমার বুকের সব ঝঞ্ঝাঝড় বেদনা-তরঙ্গ ধীর শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে গেল। বিপুল পবিত্র সান্ত্বনায় তিক্ত মন আমার যেন সুধাসিক্ত হ'য়ে গেল। আঃ! কোথায় ছিলে এত দিন ওগো বেদনার আরাম আমার? এত দিন পরে নিশ্চিন্ততার কান্না কেঁদে শান্ত হ'লাম!

এ কোন্ অর্ফিয়াসের বাঁশীর মায়া-তান, এমন করে আমার মনের দুরন্ত সিন্ধুকে ঘুম পাড়িয়ে গেল?.....হায়, এতদিন বাঁশীর এই যাদু-করা সুর কোথায় ছিল?—

সে দিন নিশীথ রাতে তার বাতায়নের পানে চেয়ে তাই গেয়েছিলাম,—

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে!
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে'!......

বাঃ, এরই মধ্যেই দেখছি মাঠের সারা পথটা পেরিয়ে গাঁয়ের সীমা-রেখার কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর হতে ঘরে ঘরে মাটির আর কেরোসিনের যে ধোঁওয়া-ভরা দীপের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই আমার মন কেন ঐ প্রদীপ জ্বালা ঘরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে! মনে হচ্ছে, ঐ দীপের পাশে ঘোমটা-পরা একটি ছোট মুখ হয়তো তার দু'চোখ ভরা আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে পথের পানে চেয়ে আছে। দখিন হাওয়ায় গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে অমনি সে চমকে উঠছে, — ঐ গো বুঝি তার প্রতীক্ষার ধন এল! তার বুকে এই রকম আশা-নিরাশার যে একটা নিবিড় আনন্দ ঘুরপাক খাচ্ছে, তারই নেশায় সে মাতাল!

আমার মনের সেই চিরকেলে অক্লান্ত বিরহী শ্রোতা তাড়া দিয়ে ক'য়ে উঠল, —ও সব পরে ভেবো 'খন, তার পর কি হল বল!—

তখন গাঁয়ের মাথায় মায়ের নত-আঁখির স্নেহ-চাওয়ার মত নিবিড় শান্তি নেমে এসেছে! করুণ বেদনার সাথে পবিত্র স্নিগ্ধতা মিশে আমার নয়ন পল্লব সিক্ত করে আনলে!

জল-ভরা চোখে আমার বাকী কথাটুকু মনে প'ড়ল।—

তার বিয়ের দিন-কতক আগের এক রাতে তাতে আমাতে প্রথম ও শেষ গোপন দেখা-শোনা। সে বললে,—"এ বিয়েতে কি হবে ভাই?"

আমি ব'ললাম, "তুমি সুখী হবে!"

সে আমার সহজ-কণ্ঠ শুনে তার বয়সের কথা, আমার বয়সের কথা, আমার ব্যবধানের কথা— সব যেন ভুলে গেল। মাথার ওপর আকাশ-ভরা তারা মুখ টিপে হেসে উঠল। সে আবার তেমনি করে সেই ছেলেবেলার মত আমার হাতের আঙুলগুলি ফুটিয়ে দিতে দিতে বলল, তা কি করে হবে? তোমাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, তোমাকে যে আর দেখতে পাব না!

এত দিনে তার এই নতুন রকমের আর্দ্র কণ্ঠের বাণী শুনলাম। তার টানা টানা চোখের ঘন দীর্ঘ পাতায় তারার ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত হয়ে জানিয়ে দিল, সে কাঁদছে!

আমি বললাম,— "তোমার কথা বুঝতে পেরেছি মোতি! কিন্তু তুমি যার কাছে যাবে, সে তোমায় আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে ; আর তুমি সেখান গিয়ে আমাদের সব কথা ভুলে যাবে!"

অন্যে আমার প্রিয়কে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসবে, এই চিন্তাটাও যেন অসহ্য! তার স্বামী আমার চেয়ে ধনী হোক, সুন্দর হোক, শিক্ষিত হোক, কিন্তু আমার চেয়ে বেশী ভালবাসবে আমার ভালবাসার মানুষটিকে বড় অভিমানেই ঐ কথাটা আমি বললাম, কিন্তু এ কথাটা বলেই এবার আমারও যেন বিপুল কান্না কণ্ঠ ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল। সে কান্না রুধবার শক্তি নেই— শক্তি নেই! মূর্ছাতুরার মত সে আমার হাতটা নিয়ে জোরে তার চোখের ওপর চেপে ধরে আর্ত কণ্ঠে ক'য়ে উঠল, "না—না—না!" কিসের এ না?

আমি তীব্র কণ্ঠে কয়ে উঠলাম, "এ হতেই হবে মোতি, এ হতেই হবে! আমায় ছাড়তেই হবে!"

তখন এক অজানা দেবতার বিরুদ্ধে আমার মন অভিমানে আব তিক্ততায় ভরে উঠেছে। সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কয়ে উঠল,— "ওগো, চিরদিন তো আমায় মেরে এসেছ, এখনও কি তোমার মেরে সাধ মেটেনি? তবে মারো, আরও মারো—যত সাধ মারো।"

কত দিনের কত কথা কত ব্যথা আমার বুকের মাঝে ভরে উঠল। তার পরেই তীব্র তীক্ষ্ণ একটা অভিমানের কঠোরতা। আমায় ক্রমেই শক্ত করে তুলতে লাগল! মন বললে— জয়ী হ'তেই হবে।

আমি ক্রুর হাসি হেসে মোতিকে বললাম, "হু! কিছুতেই মানবে না তো, তবে সত্যি কথাটাই বলি,—মোতি, তোমায় যে আমি ভালবাসি না!"

কথাটা তার চেয়ে আমার বুকেই বেশী বাজল। সে তীরবিদ্ধা হরিণীর মত চমকে উঠে বললে,—"কি?"

আমি ব'ললাম,— "তোমায় এতদিন শুধু মিথ্যা দিয়ে প্রতারিত করে এসেছি মোতি, কোন দিন সত্যিকার ভালবাসিনি!"

আমাব কণ্ঠ যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে আহত ফণিনীর মত প্রদীপ্ত তেজে দাঁড়িয়ে যেন গর্জন করে উঠল,— "যাও, চলে যাও— তোমায় আমি চাইনে, সরে যাও! তুমি জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর, বে-দিল্!—যাও, সরে যাও! তোমার পায়ে পড়ি চলে যাও, আর আমার ভালবাসার অপমান ক'রো না!"

দু'চোখ হাত দিয়ে টিপে কালবৈশাখীর উড়ো ঝঞ্ঝার মত উন্মাদ বেগে সে ছুটে গেল! আমি টাল খেয়ে মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম আর্তগভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিয়ে বাড়ীর ছাল্না-বাঁধা আঙিনায় কে দড়াম করে আছড়ে প'ড়ে গোঙিয়ে উঠল,—"মা—গো!"

* * *

ঐ—যে অনেক দূরের খেয়া-পারের ক্লান্ত মাঝির মুখে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মনের চিরন্তন কান্নাটি ফুটে উঠছে, ও যেন আমারই মনের কথা.—

"মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

ওগো আমার মনের মাঝি, আমারও এ-ক্লান্তি-ভরা জীবন তরী আর যে বাইতে পারিনে ভাই! এখন আমায় কূল দাও, না হয় কোল দাও!—

আমার মনে বড় ব্যথা রয়ে গেল, সে হয়তো আমার ব্যথা বুঝলে না! যাকে ভালবাসি, তাকে ব্যথা দিতে গিয়ে আমার নিজের বুক যে ব্যথার আঘাতে, বেদনার কাঁটায় কত ছিন্ন-ভিন্ন, কি-রকম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, হায়, তা যদি সে জানত,—তা যদি মোতি বুঝতে পারত! ওঃ, যাকে ভালবাসি সেও যদি আমাকে ভুল বোঝে, তবে আমি বাঁচি কি নিয়ে? আমার এ-রিক্ত জীবনের সার্থকতা কি? হায়, দুনিয়ায় এর মত বড় বেদনা বুঝি আর নেই!

এই তো আমার গাঁয়ের আম-বাগানে এসে ঢুকেছি। ঐ তো আমার বন্ধ-করা আঁধার ঘর। চার পাশে দীপ-জ্বালানো কোলাহল-মুখরিত স্নেহ-নিকেতন, আর তারই মাঝে আমার বিজন আঁধার কুটীর যেন একটা বিষ-মাখা অভিশাপ-শেলের মত জেগে রয়েছে। দিনের কাজ শেষ করে বিনা-কাজের সেবা হতে ফিরে ঘরে ঢুকবার সময় রোজ যে-কথাটি মনে

হয়, বন্ধ দুয়ারের তালা খুলতে খুলতে আজও সেই কথাটিই আমার মনের চির-ব্যথার বনে দাবানল জ্বালিয়ে যাচ্ছে!

একে একে সব ঘরেই প্রদীপ জ্বলবে, শুধু আমার একা ঘরেই আর কোন দিন সন্ধ্যা-দীপ জ্বলবে না। সেই ম্লান দীপ-শিখাটির পাশে আমার আসার আশায় কোন কালো চোখের করুণ-কামনা ব্যাকুল হয়ে জাগবে না!—

বাইরে আমার ভাঙা দরজায় উতল হাওয়ার শুধু একরোখা বুক-চাপড়ানি আর কারবালা-মাতম রণিয়ে উঠল,—

"হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি-হারা!"

আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দসীও সাথে সাথে কেঁদে উঠল,—

"হায় গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতি-হারা!"

নেহাত গল্প নয়

আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ

আদুভাই চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন। ঠিক অধ্যয়ন করতেন না বলে অবস্থান করতেন বলাই ভাল।

কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত আর কোনো শ্রেণীতে তিনি কখনো পড়েছেন কিনা, পড়ে থাকলে ঠিক কবে পড়েছেন, সে কথা ছাত্ররা কেউ জানতো না। শিক্ষকরাও অনেকে জানতেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, ওঁরাও এককালে আদুভাইর সমপাঠী ছিলেন, এবং সবাই নাকি এক চতুর্থ শ্রেণীতেই আদুভাইর সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে আদুভাইর সমপাঠী হলাম, ততদিনে আদুভাই ঐ শ্রেণীর পুরাতন টেবিল ও ব্ল্যাক বোর্ডের মতই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইর এই অসাফল্যে আর যেই হতাশ হোক, আদুভাইকে কেউ সেজন্য কখনো বিষণ্ণ দেখেনি। কিম্বা নম্বর বাড়িয়ে দেবাব জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেন নি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছেঃ "যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্‌টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে 'কয়ে' নম্বরটা নিন না বাড়িয়ে।" তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন ঃ সব সাবজেক্‌টে পাকা হয়ে উঠাই ভাল।

কোন্ কোন্ সাবজেক্‌টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন আছে তা কেউ জানতো না, আদুভাইও জানতেন না; জানবার জন্য চেষ্টাও কখনো করেন নি ; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরঞ্চ তিনি যেন মনে করতেন, ও-রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। তিনি বলতেন ঃ যেদিন তিনি সব সাবজেক্‌টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে শুভ দিন যে একদিন আসবেই, সে বিষয়ে আদুভাইর এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখে নি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্ন-পত্র চুরি করে, অপরের খাতা নকল করে আদুভাইব ঘাড়েব উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে, এ ধরণের ইঙ্গিত আদুভাইর কাছে কেউ করলে তিনি গর্জে উঠে বলতেন ঃ জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সেজন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আদুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে : আদুভাই, আপনার কি সত্যই প্রমোশনের আশা আছে?

নিশ্চিত বিজয় গৌরবে আদুভাইর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন : আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভাল। যে গাছ লক্‌লক্‌ করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।

সেজন্য আদুভাইকে কেউ কখনো পেছনের বেঞ্চিতে বসতে দেখে নি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, হাঁ করে গিলতেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজন মত নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আদুভাই ছিলেন শ্রেণীর একজন অন্যতম।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছুতেন। এ ব্যাপারে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেউ তাঁকে কোনো দিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায় নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আদুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আদুভাই কোন অনাদিকাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আসছেন। তাব একটি, স্কুল কামাই না করার জন্য; অপরটি, সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলীর পাড়া-গাঁ থেকে রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে, কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজে অসুবিধে সৃষ্টি করে উঠতে পারে নি। চৈত্রের কাল্‌-বোশেখী বা শ্রাবণের ঝড়-ঝঞ্ঝায় যেদিন পশু-পক্ষীও ঘর থেকে বেরোয় নি, সেদিনও ছাতার নীচে মুড়িসুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আদুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আসতেন। তেমন দুর্যোগে ছাত্ররা কেউ আসে নি নিশ্চিত জেনেও নিয়মরক্ষার জন্য তাঁরা ক্লাসে একটি উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোন থেকে 'আদাব, সার' বলে যে একটি ছাত্র শিক্ষককে চমকিয়ে দিতেন, তিনি ছিলেন আদুভাই। আর চরিত্র? আদুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিম্বা অভদ্রতা করতে কিম্বা মিছে কথা বলতে দেখে নি।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্স্ট হলাম। সুতরাং আইনত আমি ক্লাসের মধ্যে সব চাইতে ভাল ছাত্র এবং আদুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের দুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্ট হলো। আদুভাই প্রথম থেকেই আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার উপর যেন তাঁর কতকালের দাবী!

আদুভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা ও বক্তৃতা শুনে সবাই হাসতো। সে হাসিতে আদুভাই

লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসা-সূচক-হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেতো।

অন্য সব ব্যাপারে আদুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তাঁর নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাসা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না, দেখে আমার মন আদুভাইর পক্ষপাতী হয়ে উঠলো।

গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। আদুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি চতুর্থ শ্রেণীতেই অবস্থিতি করছিলেন।

ডিসেম্বর মাস।

সব শ্রেণীর পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকলপ্রকারের 'বিবেচনা' হয়ে গিয়েছে। 'বিবেচিত' প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাশ-করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও উর্দ্ধে উঠেছে।

কিন্তু আদুভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। নির্বাচন-পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধু শুধু স্কুল-প্রাঙ্গণে জটলা করছিল— প্রমোশন-পাওয়া ছেলেরা নিজেদের কীর্ত্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনোপ্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবী জানাবার জন্য।

এমনি দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আদুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলাম। আদুভাইকে আমরা সবাই মুরুব্বি মানতুম, তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বললাম ঃ কী হয়েছে আদুভাই, অমন পাগলামো করলেন কেন?

আদুভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে অমন বিচলিত জীবনে আর কখনো দেখি নি। তাঁর মুখের সর্বত্র অসহায়ের ভাব।

তাঁর কাঁধে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম ঃ বলুন, কী হয়েছে?

আদুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ প্রমোশন।

আমি বিস্মিত হলুম, বললুম ঃ প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

— না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

— ওঃ পেতে চান? সে ত সবাই চায়।

আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সঙ্কোচ-জড়িত অনেক প্যাচমোচড় দিয়ে

যা বললেন, তার মর্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এত দিন তিনি কারো কাছে কিছু বলেন নি, কারণ প্রমোশন জিনিষটাকে যথাসময়ের পূর্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে নির্জ্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সে কারণটি বললেন। তা এই যে, আদুভাইর ছেলে সেবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আদুভাইর কোনো ঈর্ষা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণীতে পড়ায় তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আদুভাইর স্ত্রীর তাতে গুরুতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আদুভাইকে সেবার প্রমোশন পেতে হবে, নয় ত পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আদুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে?

আমি আদুভাইর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজী হলাম।

প্রথমে পারসী-শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। এক পরীক্ষায় তিনি আমাকে মোট একশত নম্বরেব মধ্যে একশ পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাস্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায় মৌলবী সাব বলেছিলেন ঃ ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমি খুশি হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখশিশ দিয়েছি। অনেক তর্ক করেও হেডমাস্টার মৌলবী সাবকে এই কার্যের অসঙ্গতি বুঝতে পারেন নি।

মৌলবী সাব আদুভাইর নাম শুনেই জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার নাফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেন নি বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টীনের বাক্স থেকে অনেক খুঁজে আদুভাইর খাতা বের করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ দ্যাখো।

আমি দেখলাম, আদুভাই মোটে তিন নম্বর পেয়েছেন। তবু হতাশ হলাম না। পাশের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরী হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দেবার পর তিনি বললেন, তুমি কার জন্য কী অন্যায় অনুরোধ করছ, খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।

আমি মৌলবী সাবকে খুশী করবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুললাম। দেখলাম পারসীর পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটা পারসী অক্ষর নেই। তার বদলে ঠাসাবুনোনো বাঙলায় অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখলাম ঃ এই বঙ্গদেশে পারসী ভাষা আমদানীর অনাবশ্যকতা এবং ছেলেদের উহা শিখাবার চেষ্টার মূর্খতা সম্বন্ধে আদুভাই যুক্তিপূর্ণ একটি 'থিসিস' লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবী সাবের মুখের দিকে চাইতেই তিনি জয়ের ভঙ্গিতে

বললেন ঃ দেখেছ বাবা, বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভাল মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাস্টিকেটের সুপারিশ করতো।

যাহোক শেষ পর্যন্ত মৌলবী সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার উপর ৩ এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ী ছুটলুম।

সেখানে দেখলুম ঃ আদুভাইব খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বললাম। অঙ্কের মাস্টার ত হেসেই খুন। হাসতে হাসতে তিনি আদুভাইর খাতা বের কবে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্ত্তা ভাল ভাল অঙ্কেব প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন, সেজন্য এবং প্রশ্নকর্ত্তার এ-টি সংশোধনেব জন্য আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন, এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে সমস্ত অঙ্ক কষেছেন, শিক্ষকমশায় প্রশ্ন-পত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে সত্যি আদুভাইর উত্তরের কোনো সংশ্রব নেই।

প্রশ্ন-পত্রের সঙ্গে মিল থাক্ আব নাই থাক্, খাতায়-লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিত বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মশায়, যাহোক, প্রমাণ কবে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয়নি। সুতরাং আমার অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তিনি পাশের নম্বর দিতে রাজী হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্য সব সাব্জেকটের শিক্ষকদের রাজী করতে পারলে তিনি আদুভাইর প্রমোশনের সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্ণ মনে অন্যান্য পরীক্ষকদের নিকট গেলাম। সর্বত্র প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এমন গাঁজাখুরী গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, কোন রাজা কোন সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরাজীর খাতায় তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন— অবশ্য কে যে সিরাজ, আর কে যে ক্লাইভ নীচে লেখা না থাকলে তা বুঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ-ব্যাকুল প্রাণে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'আমি ফিরে এসে নিষ্ফলভাবে খবর দিতেই তাঁর মুখটি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবে আমার কী হবে ভাই? — বলে তিনি মাথায় হাত দিযে বসে পড়লেন।

কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বললাম ঃ তবে কি আদুভাই আমি হেডমাস্টারের কাছে যাবো?

আদুভাই ক্ষণেক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন ঃ তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ, হেডমাস্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমি যাব। হেডমাস্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাই নি। এই প্রথম প্রার্থনা তিনি আমায় ফেলতে পারবেন না।

— বলেই তিনি হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আদুভাইর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিজের কাজে মন দিলাম।

সেদিন বড়দিনের বন্ধ আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটি দেওয়া হল।

আমি বাইরে এসে দেখলাম ঃ স্কুলের গেটের সামনে একটা পোস্তার উপর একটা উঁচু টুলে চেপে তার উপর দাঁড়িয়ে আদুভাই হাত পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুনছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতামণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আদুভাই বলছিলেন ঃ হাঁ, প্রমোশন আমি মুখ ফুটে কখনো চাই নি। কিন্তু সেজন্যই কি আমাকে প্রমোশন না দেওয়া এঁদের উচিত হয়েছে? মুখ ফুটে না চেয়ে এতদিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম ; এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোনো জিনিষ আছে কিনা, আমি তা যাচাই করলাম। দেখলাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিষ এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্মম, হৃদয়হীন। একটা মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার উপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিষ থাকলে সে কথা কি এঁরা এতদিন ভুলে থাকতে পারতেন?

আদুভাইর চোখ ছল্‌ছল্‌ হয়ে উঠলো। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন ঃ আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটা প্রমোশন। তা দিলে কী এমন এঁদের লোকসান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না দেওয়ায় আমি রেগে গিয়েছি। রাগ আমি করি নি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার বাপ-মা তাঁদের ছেলেদের জীবনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁদের আক্কেল কত কম, তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প।

একটু দম নিয়ে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন ঃ আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেই নি। বছর বছর নতুন নতুন পুস্তক ও খাতা কিনতে আপত্তি করি নি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বললেন না

যে ঃ 'আদু মিঞা, তোমার প্রমোশনের কোনো চান্‌স্‌ নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।' মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কিনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না, শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়ম-কানুনে এসে বাধলো? আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করতে পারলুম না বলে তৃতীয় শ্রেণীতেও যে পাশ করতে পারতুম না, একথা এঁদের কে বলেছে? অনেকে ম্যাট্রিক-আই-এ-তে কোনোমতে পাশ করে বি-এ, এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোনো কুগ্রহের ফলে আমি চতুর্থ শ্রেণীতে আটকে পড়েছি, একবার কোনো মতে এই শ্রেণীটা ডিঙোতে পারলে আমি ভাল করতে পারতাম, এটা বোঝা মাস্টারবাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্‌স্‌ এঁরা দিলেন না।

আদুভাইর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখলাম, শ্রোতাগণের অনেকের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার আরম্ভ করলেন ঃ আমি কখনো এতসব কথা বলতাম না। আজ বললাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড় ছেলে এবার চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে। সে-ও এই স্কুলেই পড়তো। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কি অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।

আদুভাইর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। হৈচৈ করতে করতে ছাত্ররা যে যার পথে চলে গেল। আমিও আদুভাইর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে চুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে— সংসার সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জানলাম না।

আমি সেবার বি-এ পরীক্ষা দেব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেপাফাব এক পত্র পেলাম। কারো বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র মনে করে খুললাম। ঝরঝরে তকতকে সোনালী হরফে ছাপা পত্র। পত্র-লেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন, তিনি সেবার চতুর্থ শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করেছেন। দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ী ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরীতে পেয়েছি।

ছাপা চিঠির সঙ্গে হাতের-লেখা একটি পত্র। আদুভাইর পুত্র লিখেছে ঃ বাবার খুব অসুখ, আপনাকে দেখবেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনা ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখতে। এই আট বছর তার কোনো খবর নেই নি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বললে ঃ বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়া আরম্ভ করেছিলেন যে তিনি শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াশুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাস্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পাল্কী চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথা মত তাঁকে প্রমোশন দেওয়া হল। তিনি তাঁর প্রমোশন উৎসব উদ্‌যাপন করার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিস্টও তিনি নিজ হাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ী ফিরলেন।

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম। ছেলে আমাকে গোরস্থানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইর কবরে খোদাই-করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে ঃ

পাদটীকা

সৈয়দ মুজতবা আলী

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তা-ব্যক্তিরা ছেলে-ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়জয়কার পড়ে গেল— সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা যাঁরা কোনওগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনও কোনও ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশির চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিত মশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনও পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব, শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাংলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা— ঘৃণা বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজি হতেন অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা' 'পাখি-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা— সেদিন কাজে লেগেছিল। এবং তার পর মুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের উপর পা দুখানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশি। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গ নিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার

অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশি করবার পন্থা দরকার হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই, ঐ 'দোলা-লাগা পাখি জাগা-ই' আমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালনে একমাত্র গোমাংস-ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানাপ্রকার কটুবাক্য বর্ষণ করে। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়-সম্ভূত কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সম্বোধন করতেন না। তাছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে বলতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভলাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত স্নিগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনও মন স্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি কোনটা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিতমশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোঁকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত— অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয় চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখান টেবিলের উপর রাখতেন। আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্রবারের মতন স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনও একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে দিন কোনও অজুহাতই পেতেন না— ধর্মসাক্ষী সে কসুর আমাদের নয়— সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মতো নিষ্ফল নয় কি? তারপর কখন আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড় বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখাব দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনও প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিত-মশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ং প্রাত শিশির-বসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান— এ কথা অস্বীকার করার জো নাই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে. সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজও যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমাব চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়, সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া, টিকিতে দোল-লাগা, কাষ্ঠাসন-শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমাব ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায় প্রেতাত্মাকে ব্যথিত কবি কেন?

সে সময়ে আসামের চিফ-কমিশনার ছিলেন এন.ডি. বীটসেন-বেল। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে, তাঁর নাম আসলে 'নন্দদুলাল বাজায ঘন্টা।' 'এন. ডি.' তে হয় নন্দদুলাল আর বীটসন্ বেল অর্থ বাজায় ঘন্টা—

— দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে। ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সেই একদিন খবর দিল লাটসায়েব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে— পদ্মার ভগ্নিপতি লাটের টুর-ক্লার্ক নাকি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকাখবর পেয়েছে।

লাটের-ইস্কুল-আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। এক দিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টার মশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা-ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওযা গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘন্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলে সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কিনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার— নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছে, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কী হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনও বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টার চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন, নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন, কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কী বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়েব সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন, আহা, যা মানিয়েছে

(হাতি, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মতো দেখাচ্ছিল), কেউ বলছেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট আউট কী?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভট্টাচায্যি, এ রকম উমদা গেঞ্জি, স্রেফ দুখানা তৈরি হয়েছিল, তারই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানি দেউলে হয়ে গিয়েছে। আর কারও কপালে এরকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশি নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়াডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবি শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সাহেব আসছেন শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না, তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্য আমরা তখন তৈরি কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন-মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ভয়-ডর কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান, ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনও ডান হাত, কখনও বাঁ হাত চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনও মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মতো এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে, সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায় শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনও করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গবব-যন্ত্রণা' কখনও এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড় খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন— লাট সাহেবের সামনে তো সর্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সাহেব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব! তখন না হয় পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গবব-যন্ত্রণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।' আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশায়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই, শুধু আমাদের কারও কাছ থেকে একটু মরাল সার্পোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো আস্ত মর্কট— শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না কারিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পাবতেন না। তারপর লুপ্ত দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গে খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনও বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময় মতো ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তার 'গবব-যন্ত্রণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটার, ইন্‌সপেক্‌টর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ— আর লাট সাহেবের এডিসি ফেডিসি নাকি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট' বলে সাহেব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সাহেবকে সেলাম করলেন— এই অনাদৃত পণ্ডিতশ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন, তা তাঁদের সে সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নাই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃত-তদ্ধিতের বাই জানতেন, তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সাহেব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম প্লিজ'। লাট সাহেব আমাদের বললেন 'প্লিজ— এ কী কাণ্ড! তখন আবার কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন, 'বিহঙ্গ' আমরা চুপ,— তখন প্লিজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁটা যতটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম ক্বরে ফেলল— আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সাহেব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে পণ্ডিত শব্দের মূল নিয়ে ইংরাজিতে আলোচনা

জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কী বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন, যার সব কিছু পণ্ড গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরাজ-শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব-পণ্ডের ইতিহাস হয়তো রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,— না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়তো একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সাহেব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে, পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিযে ঘুমুচ্ছেন না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনও গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারও দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ— যোগরূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর— ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি। উত্তর দিলুম— 'আজ্ঞে'। পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশি নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

'বললেন, হল না। আর কে ছিল?' বললুম, 'ঐ যে বললুম, এক গাদা এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরও গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূর্খ? আমি কালা না তোর মতো অমানুষ।'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই, জিজ্ঞাসা করুন না কেন পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চিনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা দিবান্ধ—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝাতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ-শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেণ্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কী বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার

মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে সেলাম টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা, লাট সাহেবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মতো কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটা ও গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিনি কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন. আমাদের সকলের জীবন-ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ-পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান?' আমি হতবাক।

'বল না।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মতো একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায়, বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে— কেউ বাদ যায়নি— পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস-শেষের ঘন্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন স্মৃতি আমার মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' 'silence golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা পাই।'

কেয়ার কাঁটা

বেগম সুফিয়া কামাল

বহুদিন পরে দেশে ফিরে এসেছি। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর। পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন হয়েছে— কত জায়গায় কত রকম, কত অভিনব ভাবে! যাকে গেছলাম রেখে সলজ্জা কুণ্ঠিতা কিশোরী, তাকে এসে পেয়েছি— সৌভাগ্য গর্বে গর্বিতা, তন্বী, সুন্দরী রাণীর মতো মহিমময়ীরূপে। ও যেন আমার দুঃখের দুয়ারে সান্ত্বনা। প্রবাসের জটিল পথ-রেখা আমায় কত রূপে পথ ভ্রান্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু ও কাজল আঁখির কোমল দৃষ্টির আলোক চকিতে আমায় সাবধান করে দিয়েছে ধ্রুবতারার উজ্জ্বল আলো দিয়ে। জীবনে যত জিনিস পেয়েছি তার মধ্যে ওকে পাওয়াই আমার চরম চাওয়ার পরম পাওয়া। ও যেন ঝরনা। দুঃখ ওকে কাতর করে নি, বেদনা ওর কাছে সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে, আঘাত ওর পরশে অলঙ্কার হয়ে বেজেছে! ও যেন পথ ভুলা কোন ছায়াপথের নীহারিকা। এত কাছে পেয়েও ও দু'বছরেও চিনি নি! তার পরে বিলেত গেলুম— ওকে রেখে গেলুম মামাতো বোনের কাছে।

দেশে ফিরে আত্মীয়-অনাত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের আপ্যায়নে এতটুকু সময় ছিল না, ও... একটুখানি নিরালা কাছে পাওয়ার!

পাঁচ সাত দিন পরে সন্ধ্যার আগে ও বললে 'চল, তোমায় 'লেক' দেখিয়ে আনি, তুমি তো দেখে যাওনি। বন্ধু-বান্ধব সন্ধ্যার পরই আসতে শুরু করবে, চল এই বেলাই পালান চলে।' কথামতো দু-জনায় মিলে বেরিয়ে পড়লুম!

ধূলি-ধূসর, ইট-কাঠের কারা-আবরণ ঘুচিয়ে এই 'লেক' দেখে মনটা সত্যি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—খুব খুশি হলুম। ও বললে 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চল ওই মসজিদে—নামাজ পড়ব!' বহুদিন পরে দু-জনায় এক সাথে নামাজ পড়লুম। শেষ 'রাকাত' শেষ করে ওর পানে চাইতেই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বুকটা আমার ভরে উঠল। দেখি, ওর সুপুষ্ট গন্ড বেয়ে অশ্রু-মুক্তা ঝর্ ঝর্ করে পড়ছে। 'মোনাজাত' করতে হাত দু-খানি তখনও তার মুখের কাছে তুলে ধরা! দেশ-বিদেশে কত ম্যাডোনা, কত ভেনাস, কত মেরীর, কত রূপের, কত উপাসনার বাস্তব-অবাস্তব ছবি দেখেছি, কিন্তু এ যেন কোন্ হারানো যুগের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন মূর্তি। মোনাজাত শেষ করে ও উঠে দাঁড়াল, ওকে বুকে টেনে নিয়ে ভাবলুম— আমি বুঝি রাজার চেয়েও সৌভাগ্যবান।

পুল পার হয়ে চলে এলুম। নর-নারীর ভিড় কাটিয়ে নিরালা একটা জায়গা বেছে বসে পড়লুম। ব্যাগ থেকে পানের ডিবে বের করে একটা আমার মুখে দিয়ে, আর একটা নিজে খেয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, 'তোমার শেষ চিঠিতে লিখেছিলে, আমার কাছে কি অপরাধের বোঝা নামিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইবার আছে!' মুহূর্তে আমার মনের

স্বপ্ন ডুবে গেল। তার তাপসীর মতো মুখের দিকে চেয়ে আমার অপরাধের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠল। তন্বী কোমলা এক নারী—তাঁর কাছে আমার পৌরুষ যে ধুলায় মিশে যেতে চাইল। কিন্তু ওর দৃষ্টির কাছে যেন কিছুই লুকানো যায় না! আমার মনের ভাব যেন মুখে ধরে ফেলে ও বললে, তোমার অপরাধ আমার কাছে সহজ করতে পারছ না, এতে কি আমাদের মধ্যে ব্যবধানেরই সৃষ্টি করছ না? যা তোমার অহেতুক ভীতির সৃষ্টি করছে, আমাকে বলে তার গুরুত্ব কমিয়ে ফেলাই ভালো।' শিশুর মতো অসহায় হয়ে আমি তার এলায়িত দেহের উপর নত হয়ে বললাম, 'সব শুনে যদি তুমি আমায় ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দাও?' দু-হাতে আমার মুখ তুলে ধরে সে বললে, 'পাপকে হয়তো ঘৃণা করব, কিন্তু পাপীকে নয়।' বলেই হাসল। গাছের ফাঁকে এক টুকরো জ্যোৎস্না ওর মুখের এক অংশে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ছে, তার আলোয় ওর হাসি দেখলুম আমি— সে এক অদ্ভুত হাসি! নারীর প্রাণের অনন্ত রহস্যের আভাস যেন এতে ঈষৎ ধরা পড়ে' মুগ্ধ আমি, আমার প্রাণের দু-কূল ছাপিয়ে ওর হাসির শোভা প্লাবিত করে গেল। কিন্তু অভয় পেয়ে আমি আমার ক্ষণিকের ভুলের কথা বলে গেলুম :

ওখানে গিয়ে তোমার মুখ আমাব মনে পড়ত সর্বদাই। তোমাকে আমি ভুলি নি, এ তুমি বিশ্বাস করো। প্রথম প্রায় বছরখানেক আমি শুধুই ভেবেছি, তুমি আমার সঙ্গে অহর্নিশ রয়েছ, আমার পদস্খলন হতে পারে না! নিয়মমতো পড়াশুনা ও তোমার চিঠির আশা এবং চিঠি পেয়ে তার উত্তর দেওয়া—এতেই আমার জীবনের পরিপূর্ণতা মনে হত। তারপর এক ছুটিতে গেলুম এক বন্ধুর বাড়ি। দবিদ্র গৃহস্থ। তাদের অনাড়ম্বর সহজ জীবনযাত্রা-প্রণালি আমায় তোমার কথাই মনে করিয়ে দিত। তার এক বোন ছিল—লুসি। তাকেও আমি দেখতাম সহজ শ্রদ্ধা সম্মানের চোখে! ছুটি ফুরালে আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে এলাম। তবুও বন্ধুর মায়ের সাদর আহ্বান আসত আমার কাছে প্রতি রবিবারে। আমিও যেতাম। দূর প্রবাসে মাতৃস্নেহের আভাস আমার মনকে লুব্ধ করত সন্দেহ নেই। এক রবিবার তাদের সবাইকে নিয়ে আমি গেলুম সিনেমায়। এক কুমারী-হৃদয়ের করুণ কাহিনী আমাদের বুকে মধুর বেদনা দিল। দেখলুম— সবারই চোখ সহানুভূতির বেদনায় সজল। লুসির দিকে চেয়ে দেখলুম সে যেন চিত্রে প্রদর্শিত কুমারীর শেষ দৃশ্যের মতোই ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে, আর বেদনা গলে গলে অশ্রু-রূপে ঝরে পড়ছে তার গাল বেয়ে। কী এক বেদনায় আমার মন ভরে গেল, আমি তাকে স্পর্শ করে কিছু অসুস্থতা বোধ করছে নাকি জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম। সে যেন অচেতন অবস্থা থেকে সচেতন হয়ে উঠল। তার শুভ্র কপোল উত্তেজনায় রক্তিমাভ হয়ে উঠল। থর থর কেঁপে সে বললে 'একটু বাইরে যাব— মনটা বড়ো অস্থির।' আমি ধীরে ধীরে তাকে ভিড় কাটিয়ে বাইরে নিয়ে এলুম। খালি একটা বেঞ্চ ছিল, তাতে বসিয়ে আমি তার পাশে বসলুম। আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।' এইটুকু বলে আমি ওর মুখের পানে চাইলুম! দেখলাম— কালো চোখে তার করুণা ঘনিয়ে উঠেছে।

আমি আবার বলতে লাগলুম, 'তারপর লুসির মা-ভাই বের হয়ে এসে ব্যস্তভাবে বললে, ওর ওইরকম মাঝে মাঝে হয়, ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে। আমি উঠে একটা মোটর ডেকে লুসিকে বাড়িতে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। একটু পরে ওডিকোলন-সিক্ত রুমালে মাথা-মুখ মুছিয়ে দিতে ও সুস্থ বোধ করল। পরে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। সারা পথ ও রাত লুসির ওই ভাব আমায় কাতর করে রেখেছিল। সাথে সাথে তোমার কথাও আমার মনে পড়েছিল।'

'পরের দিন সন্ধ্যায় আমার একবার মনে হল, যাই লুসির খবরটা নিয়ে আসি। গিয়ে দেখলুম, ওরা কেউ বাড়ি নেই, লুসি বারান্দায় একাকি বসে কী যেন ভাবছে। আমি কাছে যেতে ও এমনভাবে আমার দিকে চাইল যে আমার মনে হল যেন ও আমারই প্রতীক্ষা করছিল! আমি বললুম, 'কেমন আছ?' সাদরে আমার হাতখানা ধরে ও বললে, 'ভালোই— তবে একটু দুর্বল লাগ্‌ছে'। 'ও কিছুই নয়। কাল তুমি সেরে উঠবে'—বলে আমি একখানা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লুম। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব! কিন্তু এ নীরবতা নিতান্ত অশোভন ভেবে কি জানি আবার কেন বললাম, 'কাল তোমার হঠাৎ ও-রকম হল কেন লুসি?' সে ধীরে মুখ তুলে আমার পানে চেয়ে আবার মাথা নত করলে। তার গাল লাল হয়ে উঠল। সে কিছুই না বলে শুধু চক্ষের জল ফেলতে লাগল। গোধূলির স্তিমিত আলোকে সজলনয়না এই তরুণীকে দেখে করুণায় আমার মনে ভরে উঠল। তার হাতখানা ধরে ঈষৎ কম্পিত স্বরে আমি বললাম 'কী তোমার দুঃখ, আমাকে বন্ধু ভেবে বলতে পারো না লুসি?' সে আমার হাতখানা দু-হাতে মুখের উপর চেপে আবার কেঁদে ফেললে— অস্ফুটস্বরে বললে, 'সত্যি-সত্যি তুমি এই হতভাগিনী নারীকে একটু দয়া করে ভালোবাস—। বল, সত্যি বল— ভুল হলেও বল—আমার জীবন মুহূর্তের ভুলে সার্থক সুন্দর হয়ে উঠুক।'

'বিশ্বাস কর তুমি ভানু! সেই মুহূর্তটি শুধু তোমায় ভুললুম, আমি সব ভুললুম। শুধু রইলুম আমি তার এক বঞ্চিত ব্যথাতুরা আমার ভালোবাসা-ভিখারিণী নারী! আমি নত হয়ে তার তৃষিত অধরে আমার মুখ রেখে তাকে বললুম, 'হাঁ লুসি, তোমায় দিলুম আমাকে ভালোবাসার অধিকার।' সে বালিকার মতো উল্লাসিতা হয়ে আমার বুকে মাথা রেখে তৃপ্তির হাসি হাসলে।'

এইটুকু বলে ভানুর মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শরতের নির্মল আকাশে চাঁদের হাসির মতো ওর মুখ চোখ এক অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে জ্বলজ্বল করছে। ও বললে, 'চুপ করলে কেন, বল।' আমি বললুম 'কিন্তু এরপরও শুন্‌বে তুমি? দৃঢ় কণ্ঠে ও বললে, 'হাঁ, বল তুমি'। আমি বললুম, 'এরপর আমার কাছে ও সহজ হয়ে গেল। প্রতি শনিবারে রবিবারে ওদের ওখানে যেতুমই ; কিন্তু ওর অনুরোধে আমায় তাদের বাড়িতেই স্থায়ীভাবে থাকতে হল। আমিও ভাবলুম, এক গরিব গৃহস্থের দু-পয়সা আয় হবে—আর

আমার মনও টানছিল। এইভাবে ওদের সংসারে আমার পয়সায় এটা-ওটা কিনে দিয়ে আমিও অনেকটা অনুগ্রহের দায় এড়ালাম ভেবে তৃপ্তি পেতাম।

'তোমার চিঠি যখন যেত, তখন আমার মনে হত আমি যেন এ পাবার অধিকারী নই। কুণ্ঠিত লজ্জিত অন্তরে তোমাব চিঠিগুলি গোপন সম্পদ ভেবে আমার নিজস্ব থাকত। ওরা জিজ্ঞাসা করত 'কার চিঠি?' আমি বলতুম 'আমার বোনের!' এইভাবে প্রায় আরো এক বছর কেটে গেল। লুসি একদিন আমায় বলল, 'আমরা গরিব, কিন্তু আমাদের সম্মান আছে'— যদি আমার আপত্তি না থাকে তা হলে চিরজীবনের তবে আমায় সাথী বলে গ্রহণ করতে রাজি আছে। আমি চমকে উঠলুম। এক সঙ্গে আমি দু-জনকে ঠকিয়েছি। আমি ভন্ড প্রতারক, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।'

'সারারাত ও সারাদিন লুসিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চললুম। পরের দিন আনোয়ারের প্রেরিত পার্সেলে তোমার লেখা সবগুলি কবিতা-গল্প পেলুম। অনুশোচনায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হল— কিন্তু আমায় তা হতে রক্ষা করল তোমার লেখাগুলি। তুমি একটা গল্পে লিখেছিলে, 'পৃথিবীর দুঃখ হতে বাঁচতে আত্মহত্যা করে যে, সে কাপুরুষ!' আমি ভাবলুম হয়তো অপরাধের ক্ষমা তোমার কাছে পাব। তারপর সারারাত আমাব মন আমায় উদভ্রান্ত করে তুললে। প্রবঞ্চনা আর নয়। সেইদিনই আমি লুসিকে চিঠি লিখলাম। তোমার কথা লিখলাম, তার কাছেও ক্ষমা চাইলাম। উত্তরে সে নিজেই এল ধীর শান্ত মুখে। আমায় ডেকে নিয়ে এক পার্কে বসাল। খুঁটে খুঁটে আমার কাছে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল। সব শুনে সে বললে, 'তোমার স্ত্রী কবি, সে নিজে সুন্দরী, সে সৌন্দর্য বৃষ্টি করে। তাকে তুমি অপমান করেছ, আমাব এ অপমান তার তুলনায় তো কিছু নয়।' আমি যেন তীব্র কশাঘাতে চেতনা লাভ করলুম। বললুম, 'তুমি আমার ক্ষমা কবো।' সে বললে, 'আমি নিজে যেচে তোমায় ভালোবেসে ছিলাম। কিন্তু তুমি বিবাহিত এ কথা কেন গোপন করলে? আজ তবে বিদায়। তোমায ক্ষমা করব সেদিন, যেদিন তোমায় ভুলব! পারি তো চিঠি লিখে জানাব।'— সে চলে গেল! আমি সে পাড়া ছেলে অন্য জায়গায় এসে পড়াশুনা শুরু করলুম! এখন আমার বলা শেষ হল, তোমার ক্ষমা পাব কি না বল?'

ভানু শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'আমি হয়তো ক্ষমা করলুম। কিন্তু যাকে, যে নারীকে তুমি অপমান কবে এলে, তার ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত তুমি সারা নারীজাতির যে অপমান করেছ, তার ক্ষমা আমার কাছে নেই।' সে উঠে দাঁড়াল। তার মাথার কাপড় তখন খসে গেছে। আমি প্রত্যাশা ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলুম। তার শিথিল কবরীর ফাঁক থেকে কেয়ার রেণু আমার চোখ মুখে এসে পড়ল। আমি বললুম, 'তুমি আমায় দন্ড দাও ভানু! ভানু বললে, 'তুমি ভালোবাসার অপমান করেছ, তার বেদনা ভুলতে আমায সময় দাও।' তারপরে বললে 'ক-টা বেজেছে?' ঘড়ি দেখে বললুম, 'সাড়ে আটটা।' সে বললে 'সাড়ে ন-টা পর্যন্ত থাকলে কোনো রকমেই আপা রাগ করবেন না। আমি বলি একটি

রূপকথা— তুমি শোন। তোমরা পুরুষ তোমরা চাও বিস্মরণী। কিন্তু নারী চায় অতীতের মাধুর্য দিয়ে রচতে নব নব সৃষ্টি। তাই এক বিজয়িনীর কাহিনী তোমায় শোনাব, তারপর নর ও নারীর অপরাধের বিচার। তোমাদের পুরুষদের বড়ো বড়ো কবিরা যা কল্পনায় পাননি, নারী তার ক্ষুদ্র গন্ডী-ঘেরা ঘরের সীমানায় বসে রচনা করে সে কবিদের কল্পনার চেয়ে বেশি।' ও বলতে লাগল, আমি শুনতে লাগলুম। চাঁদ তখন ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সর্ব দেহে, মনেও বুঝি তার প্লাবন লেগেছে।

'এ কালের এক বাদশাজাদা রাজত্ব হারিয়ে চলেছিল উন্মনা উদাসী হয়ে যে কোনো এক দিক পানে। তার চোখের আগে পড়ল এক গরবিনী গেঁয়ো মেয়ে। লোকের কাছে শুনত, তার রূপ আছে, গুণও আছে ; তবু তার উপযুক্ত স্বামী মিলছে না। কিন্তু বাদশাজাদা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ভাবলে, নাই-বা আমার রাজ্য রইল, হিরা মুক্তার যা দাম আছে, তাই নিয়ে আমি ঘর বেঁধে একে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করব। সে যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ সে গেঁয়ো-মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেল নিজের দূর আত্মীয়ের গৃহে। আগেকার বাদশাজাদা মৃগয়ায় যেতেন, দিগ্‌বিজয়ে যেতেন, কিন্তু এ কালের শাহজাদা গেলেন কর্মজীবনে এক দিক বিজয় করতে। গরবিনী গেঁয়ো-মেয়ের হঠাৎ—শাহজাদার রঙিন স্বপন তখনো কাটেনি। ভীতা কুণ্ঠিতা নবোঢ়া সে স্বামীর এক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস করল না। বরং সে মনে করল দশ জনের একজন হয়ে শাহজাদা যখন ফিরে আসবে— সে হবে তার বুকের গর্ব, মনের তৃপ্তি। কুণ্ঠিতা সে বিদায়ের অশ্রু বুকে চেপে হাসিমুখে তাকে বিদায় দিল। অশ্রুসিক্ত অনুক্ত কথা তার বুকের মাঝে সংগোপনে সুখের আশার রঙে রঙিন হয়ে উঠতে লাগল।'

'কত দিন কেটে গেল। আধুনিক শাহজাদাব খবর দূত মুখে না এসে লিপিবাহকেব হাতে কথার গুচ্ছরূপে আসতেই ছিল তিথিতে তিথিতে। আর সে ছিল তারই আনন্দে মশগুল হয়ে। সহসা এল শাহজাদার শৈশবের সাথী দুর্দিনের বন্ধু—তার পরমাত্মীয় এক তরুণ। সে ছিল নারী বিদ্বেষী। নারীর অপমান ছাড়া, নারীর প্রতি অহেতুক কঠোরতা ভিন্ন তার আব কোনোই যেন সার্থকতা ছিল না। সে এসে ঠাঁই নিল শাহজাদির আশ্রয় গৃহেই। বলাবাহুল্য, এ কালের বাদশাদের সাত-মহলা প্রাসাদ নেই, সাততলা হলে হতে পারত ; কিন্তু তাও নেই। তবুও চক-মিলানো প্রকান্ড বাড়ির এক কোণে কথার মালা গাঁথা ও হৃদ দশায় সংসারের কাজ সারা করে শাহজাদী আপন মনে থাকে। পল্লিমায়ের দুলালী, পিঁজরার পাখির মতো সে থাকে না। তার কল-কাকলীতে গৃহ-পরিজন তাকে আদরই করে। রুদ্ধ গৃহকোণে আনন্দের প্রস্রবণ। তার দিন আনন্দেই কাটে, শুধু প্রিয়তমের বিরহে বেদনা জাগে— মনের কোণে অতি সংগোপনে।

আধুনিক এই শাহজাদির পায়ে পাওজেব নেই, কণ্ঠে মণি মাণিক্যের সাতনরী হার নেই, হাতে বাজুতে মণি-কঙ্কন, মতির বাজুবন্দ নেই। কালো চুলে শুভ্র সিঁথিতে টিকা নেই।

তবু সে সুন্দরী। তবু তার রূপের খবর পেয়ে পৌঁছে যায় সেই নারী-বিদ্বেষী তরুণের কানে। গৃহ-স্বামিনী তার নিকট আত্মীয়া, তার কথা তবু ভালো লাগে। কিন্তু হঠাৎ আসা এই তরুণীর কথায় তার সারা চিত্ত বিরূপ হয়ে ওঠে। সারাগৃহ যার প্রশংসায় মুখর কী এমন এক তুচ্ছ নারী সে। অহেতুক আক্রোশে তার সারা দেহমন ভরে উঠে। কিন্তু তার এই রুদ্ধ রোষের শুধু নিজেই মনে মনে জ্বলে উঠা ছাড়া প্রকাশের পথ ছিল না। বলাবাহুল্য, একালের এই শাহজাদির বানিগিরি ফলানোর উপাদান দাসী, বাঁদী, বান্দা, নফর, কিছুই ছিল না। অনটনের সংসারে সে তার নিজের হাতেই বাটনা বাটে, কুটনা কোটে।'

'ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাঁচা, রান্নাবান্না সবই করতে হত! এসে অবধি নিজের অনভ্যস্ত সকল কাজ তার হাতে দিয়ে গৃহস্বামিনী হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। ওর অভ্যস্ত হাতের কর্মপটুতায় সবাই তৃপ্তি হতো বলে ওর ওপর কারও কোনো বিদ্বেষ ছিল না। বরং সহজ প্রীতির আবরণ তাকে আরো মাধুর্য দিয়েছিল।'

যাক সে কথা। আপন রোষে আপনি ক্ষুব্ধ সেই তরুণটি একদিন বললে, তার ঘর গোছানব অছিলায় সে এসে আরো বিশৃঙ্খল করে দেয় এটা তার পছন্দ নয়। হুকুম হবার সাথে সাথে সে ঘরে যাওয়া বন্ধ হল; কিন্তু বিদ্রোহের এই আভাসে যে শাহজাদি এসেছিল দখিন হাওয়াব মতো নিঃশব্দে আপন মাধুর্য ঢালার খেয়ালে, এখন হল সে কালবৈশাখীব ঝড়ো-হাওয়া। যখন তখন সে বিদ্রোহীকে আপন অস্তিত্ব জানাবার জেদে চঞ্চলা হয়ে উঠল। এরই মধ্যে এক শ্রাবণ রাতের নিবিড় বারিধারার তালে তালে নীরব গৃহে সে আপন অন্তরের সংগোপন বিরহেব সুরটা ব্যক্ত কবেছিল আপনাকে নিরালা ভেবে। কিন্তু মৃগনাভি হলে যেমন মৃগ আপনাকে উন্মাদ করে অন্যকেও উন্মাদ করে আপনার অগোচরে, তেমনি হয়ত আপনার অজানতেই সেই বিদ্রোহীকে উন্মাদ করে দিলে কেমন করে, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু সে কথা পরে বুঝেছিল সকলেই।'

হঠাৎ একদিন এসে বিদ্রোহী বললে, তোমবা কেউ আমার ঘরটার দিকে দেখ না, এমনি আস্তাবলের অবস্থা সেটার হয়েছে যে আমার, থাকা অহস্য! অন্তরালে শাহজাদির কণ্ঠে সশব্দ হাসির কলরোল উচ্ছ্বাস উঠল। গৃহস্বামিনীর অধরে মৃদু হাসির আভাস উঠেই মিলিয়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে সে চলে গেল। কিন্তু এই টুকুতেই এক নারী-মনেব কাছে ধরা পড়ে গেল— পুরুষের পৌরুষ বজায় রাখার অথচ ছলনাময় পরাজয়ের আত্মসমর্পণ। এর পর এলে দেখেও না-দেখার ভান করা আর ক্ষণিকের আসা-যাওয়া দেখার এক মধুর তৃপ্তি। তাই নিয়ে চলল নিজের মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করা। পুরুষের এই পরাজয়ে নারীর তৃপ্তি সারা নারী জাতির গর্ব ভেবে আর পুরুষ শুধু যাকে না পাওয়া গেল, তাকে চাওয়ার স্বপ্নসুখে বিভোর। নরও নারীর এ এক চিরন্তনী খেলা— এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।'

একটুকু বলে ভানু আমাকে বললে, শুনছ তুমি। বিরক্তি লাগছে নাতো? আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তার কথা, কিন্তু অর্থ একটুও বুঝলাম না। ওর বলার ভঙ্গিমাটি এমন সুন্দর

যে অর্থ না বুঝলেও আমার ভালো লাগছিল। আমি শুধু দেখছিলুম, ওর মুখের ভাবটুকু কী সুন্দর, রহস্যময়। ও কবি, তাই ওর কথাও সুন্দর। আমি বললুম, হাঁ, বল, বিরক্ত লাগছে না মোটেই। ও আর একটি পান মুখে দিয়ে পরম আরামে খেতে খেতে আবার শুরু করল ঃ

আর বেশি ভূমিকা না করে বলে ফেলি, রাতও হচ্চে। হাঁ, তারপর এল এক মধুময়ী বাসন্তী নিশি, যা শুধু আকাঙ্ক্ষাটাকেই তীব্র করে তোলে। যাকে পেয়েছি, তাকেও যেন পাইনি পূর্ণতরভাবে, এই ভাব আসে অনেকেরই। কিন্তু যারা পূর্ণ করে নিতে জানে তারা এই সময়টিতে বিরহকেও মধুর করে তুলে নিতে পারে। কী করে পারে, তা বুঝবে না তুমি, কারণ তুমি কাব্যকলার ধার ধারো না।' বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'এ তোমার অন্যায় ভানু'! ও বললে 'চুপ! তারপর শোন। এমনি এক নিশীথে নারী তার সুদূর প্রিয়তমের বিরহ বেদনা কল্পনার আলপনায় সুন্দর করে এঁকে আপন মনে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল। এমন সময় এল তার কাছে এক মুগ্ধ পরাজিত প্রেম-প্রার্থীর নিবেদন আমি তোমায় ভালোবাসি। এই নিবেদন কী করে এল, তা না হয় নাই বললাম, তুমি বল, এ অবস্থায় তার কী করা উচিত।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, তা আমি জানি না ভানু। আমিতো কবি নই।

ভানু শান্ত হাসি হেসে বললে, এ কবিতার কথা নয়, এ বাস্তব! তা যাক তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না— নারী শুনলে, তার দ্বারে নবীন অতিথি, মনে প্রাণে ভিতরে বাইরে বসন্তের রঙিন হিন্দোল-হিল্লোল। কিন্তু প্রাণের পেয়ালা যার ভরা আছে, তার উপর আর এক ফোঁটা পড়লে গড়িয়ে পড়া ছাড়া সে বিন্দুটির আর কী গতি। তবু গড়িয়ে পড়বে বলে ও ফোঁটা ফেলাত দোষের নয়, তাই অনলস স্রষ্টা এই বিন্দুপাত করতে কার্পণ্য করলেন না। ভাব একবার, এক নারী তার জীবনে প্রথম যৌবনের এক বসন্তে ব্যর্থ বিরহ-নিশি যাপন করছে, আর তারই পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এক তরুণ তার প্রাণের পেয়ালার প্রীতি সুধারস অধরের আগে এনে নিবেদন করছে? তোমরা পুরুষেরা হলে কি করতে আমি জানি না, কিন্তু নারী সে নরকে নিরাশ করলে না, প্রতিদানও দিলে না ; তাকে দিলে আপন জয়ের গরবে বন্ধুর পদ। নারীর পুরুষ-বন্ধু শুনে অনেকে নীতিবিদেরা চঞ্চল হয়ে উঠবেন জানি, কিন্তু সে নারী সত্যই বন্ধু পদে বরণ করে এক অন্ধ দিকভোলা নরের প্রাণ বাঁচাল। যে সুরা সে হাতে ধরে এনেছিল, অবহেলায় সে সুরা তার কণ্ঠে বিষ হয়ে তার বুক অবধি দগ্ধ করে দিত। নারীর হাতের স্পর্শে সে রস অমৃত হয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে দিল।'

বিদ্রোহী বিদ্বেষী সে নরের যে অর্ঘ্য এসেছিল সাজানো সুখের সাক্ষী রূপে, তা থেকে সে বিজয়িনী নিলে অদিনে— দুর্লভ এক গুচ্ছ কেয়ার কলি। সার্থক হাসি হেসে পরাজয় স্বীকার করে সে বিদ্রোহীর বন্ধু হয়ে ফিরে গেল, পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে। রাতের পরশ লাগা

সে কেয়ার কলি ভোরে যখন তার কাছে ফিরে গেল, বন্ধুত্বের নিদর্শণ মনে করে সে তা মাথায় রাখল।

আমি চমকিত হয়ে ভানুর চুলে জড়ানো কেয়ার দিকে চাইলুম। সে মৃদু হেসে বললে, কী দেখছ? এটা নয়— এ যে একেবারে টাটকা। বলে আবার শুরু করলে, তারপর এল এমনি এক শারদ নিশীথিনী। বনের বুক তখন কেয়ার রেণুতে ছেয়ে গেছে। গন্ধে বিভোর জ্যোৎস্না রাতে সে বেদনা-সৌরভে কুণ্ঠিত পল্লিবালার বুক তখন কাব্যের সুষমায় ভবে উঠেছে। সে তখন কবি। দূর দেশ থেকে তাব প্রিয়তম অভিনন্দন পাঠিয়েছে— আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা লিপিতে। তরুণীর বুক তখন পূর্ণ। সে কবি, তার অভাব নেই কোথাও ; অপ্রতুলতা নেই কিছুতেই। নিজের মনের সাম্রাজ্ঞী সে, কল্পনার কাননে আত্মসমাহিতা। তার যশের সৌরভে কত মুগ্ধ প্রাণের প্রীতি তাকে স্নিগ্ধ করে দিল। প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশে তার প্রাণের সবটুকু সুধারস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, সে আপন মনে বললে, ওগো আমার প্রিয়তম, বিরহ-বেদনায় আমার প্রাণে যে কাব্য-কুসুম ফুটিয়ে গন্ধ ছড়ালে, সে তো তোমারই দান প্রিয়।' কথিত অকথিত বাণী তার প্রাণের পরে লেখা রইল প্রেমের রঙ্গিন রংয়ে রংরেজ হয়ে। নিরালা মনে সে রচনা করছিল কথাব পর কথার মালা। এমন সময় তার কাছে এল এক লিপি। লেখক লিখেছে বিজয়িনী বান্ধবী, আজকে তোমার প্রীতির জন্যে দিতে চাই তোমার প্রিয়তর একগুচ্ছ কেয়ার কলি। অন্তরাল হতে শুধু হাতখানি তুমি বাড়িয়ে দাও। তোমার হাতের উপর আমার দীন অর্ঘ্য যে সার্থক হয়ে উঠবে, তারই তৃপ্তিটুকু আমার পেতে দাও।' কবি সে, এই ফুলের প্রীতি ফিরিয়ে দিতে পারল না। যে নারী বিজয়িনী, তাব ভয় নেই কিছুতেই। তাই সে সেই পরাজিত বন্ধুর দ্বারে গিয়ে হাত বাড়াল। তার হাতে ফুলের গুচ্ছ ধরে দিয়ে সন্তর্পণে সেই হাতখানি সে মাথায় ঠেকাল। এ শুধু মুগ্ধ পূজারির ভক্তিভরা পূজার পবিত্রতা। এতে কি কোনো দোষ আছে, বল তো তুমি?' ভানু আমার মুখের পানে চাইলে। আমি বললুম, 'কাব্য-কল্পনা কখনও দোষের হতে পারে না।' ভানু অধীর হয়ে বললে, 'না না, এ কল্পনা শুধু নিছক এ তুমি বিশ্বাস করো।' আমি বললুম, 'নায়িকার মনের ভাব আমি জানিনে ; তা বলতে পারিনে। কিন্তু নায়ক যা করলে এ ঠিকই করেছে, এতে দোষ নেই কিছুই।' ভানু বললে হাঁ, 'আমি জানি দোষ নেই কিছুই। কিন্তু লোকের চক্ষে দোষ বলে ধরা হল একথা। ফুলের সুবাসের স্মৃতি মলিন করে লোকে কাঁটার কঠোরতা দিয়ে তাকে ঢাকল। পবিত্রতায় কালিমা দিয়ে কলঙ্ক রটাল। যে গৃহ-স্বামিনী ছিল পরম বন্ধু, সে হল চরম বিদ্বেষিণী। কিন্তু এ শুধু নারীরই উপর সবার বিষদৃষ্টি-দোষারোপ আর যা কিছু সব। পুরুষের পবিত্রতা তাতে আরও বেড়ে গেল। কারণ হাতে পেয়ে নারীকে সে শুধু প্রেম জানিয়েই নিষ্কৃতি দিলে। এতে তো তারই শুধু সচ্চরিত্রতা প্রমাণ হয়ে গেল। নারী হল লালসাময়ী-ছলনাময়ী, নরকে প্রলুব্ধ করতে দুঃসাহসিকা।'

'বিজয়িনী এসব শুনে অন্তরালে আপন খেয়ালের খুশিতে শুধু একটু হাসলে। তখন

তার প্রিয়তমের আগমন ঘনিয়ে এসেছে। সে ছিল তারই খেয়ালে মশগুল, তার প্রিয় এলে কী দিয়ে তার তুষ্টি সাধন করবে এই খেয়ালে! তার প্রিয়তম সব শেষে এল, কিন্তু সে এসে যে কথা তাকে শোনালে তাতে তার কী করা উচিত, তুমিই বল। যাকে সে শুধু 'আমারই বলে ভেবেছে, সে যদি অন্যের পূজারি হয়ে ফিরে আসে, কী তখন তার মনের অবস্থা হয় বলতে পারো?' আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'সে কি করে এসেছে বললেই তো পারো ভানু।' ভানু শান্ত স্বরে বললে, 'তুমি যা করে এসেছ। এক নারীর অপমান করে অন্য নারীকে বুকে নিয়েছিলে, কিন্তু দু-দিনের খেয়াল খেলা মিটতেই আবার অপরাধীর মতো ফিরে এলে এই নারীরই কাছে?'

কী সকরুণ মর্মন্তুদ কাহিনী। আমি অধীর হয়ে বললাম, 'এ সঙ্কটমুহূর্ত আমায় বাঁচাও ভানু। বলো, তোমার কাহিনীর মানে কি?' ধীর-শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে উত্তর দিলে, 'কাহিনী যা বললাম তার একবর্ণও মিথ্যা নয়— নায়িকা বল অথবা যা ইচ্ছা তাই বল, বর্ণিতা নারী আমিই। আমার প্রতি তোমার মনেব এক মুহূর্তে যা ভাব, তা ব্যক্ত করতে পার কি?' জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল হাসি আমার আঁখিব আগে নিভে এল মুহূর্তের তরে। পরক্ষণেই মনে হল, 'আমি অপরাধী, আর ও বিজয়িনী! আমি আগ্রহে ওর হাতখানি ধবে বললাম, 'আমার অপরাধ তুমি ভুলে যাও ভানু। আর তোমাকে যে অপমান করেছিল, তার নাম বল।' ভানু বললে, 'না, আমি তো অপমানিত হতে পারি নি ; সে আমাকে অপমান করতে চেয়ে পবাজিত হযে গেছে। তাকে আমি ক্ষমা করে বন্ধু বলেছি—তার সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্ব। তোমারও বন্ধুত্বই তার প্রার্থনায়। আব তাব নাম? তা নাই বা শুনলে। শুনে তুমি সহ্য করতে পারবে না। কারণ তুমি যে পুরুষ, তুমি যে স্বামী— আমি তোমার স্ত্রী! তোমার প্রতি হবে তার ভয় এবং তাব প্রতি হবে তোমার ঈর্ষা—এ নিশ্চয়ই হবে। তার নাম শুনে আর কাজ নেই।' বলেই ভানু উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আর নয়' চল রাত হয়ে গেছে, আপা নিশ্চয় বক্‌বেন।' আমি বাধা দিতে গিয়েও পারলুম না। সত্যিই তাব তখনকার ভঙ্গিটুকু রানির চেয়েও যেন গৌরবময়, পদক্ষেপও যেন সে রানির মতোই গরবিনী, দেবীর মতো মহিমময়ী! ওর পেছনে চলতে চলতে আমার মন যেন কী এক সুখে ও দুঃখে ভরে উঠেছিল। কতদূরে এসে গাড়ি ডেকে বাড়ি এলুম। আপা কৌতুকভরে বললেন, 'দুটিতে যাবে বলে আগে থাকতেই জোট করে সকালে বাঁধা বাড়া সেরে কাউকে না বলেই বেবিয়ে গেছ। ভয়—বুঝি আমরা কেউ পাছে সাথ নেই—নয়?' ভানু একটু হাসলে সেই নারীর লজ্জার মাধুর্যে রাঙা সলজ্জ হাসি। ওখান থেকে এসে এক বিজয়িনী নারী এক্ষণে গৃহস্থ-ঘরের লজ্জিতা বধূ! আমি মূক হয়ে গেলুম। আপা বললেন, 'খাবে এস, আমার ঘরে সবাই বসে আছে।'

খেতে গেলুম আমি, আনোয়ার ও দুলাভাই! আনোয়ার দুলা ভাইয়ের ভাই, আমার বন্ধু। আপা খাওয়াতে এলেন। ভানু দরজার কাছ থেকে সব এগিয়ে দিচ্ছিল, দেখলুম। বললুম,

'আপনি কেন কষ্ট করছেন, আপা! ওকেই দিতে বলেন না কেন?' আপা বললেন, 'ও কি যায় নাকি আনোয়ারের সামনে?' আমি বললাম—'ওকে লুকবার কোনোই দরকার নেই ভানু?' উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে নীরবে চেয়ে জানাল, সে রাজি নয়। আর আনোয়ারও চঞ্চল হয়ে বললে, 'না, না, আমার সামনে আসবার কোনো দরকার নেই, অহেতুক ওকে কেন বিরক্ত করছ!' কিন্তু দুলাভাই উল্লসিত হয়ে বললেন, 'বটে, তুমি লুকিয়ে বেড়াবে ভানু-বিবি, আমাকে তুমি জ্বালিয়ে মার, এবার দেখব দু-বাইর সঙ্গে কী করে পার।' বলে পলায়মানা ভানুর হাত ধরে তিনি টেনে আনতে আনতে ভানুর ঘোমটা সরে গেল। রাহু-মুক্ত চাঁদের মতো তার শরম রঞ্জিত মুখে তখন ঈষৎ হাসির আভাস। আনোয়ারও চঞ্চল হয়ে উঠেছে! দেখলুম, ভানু আমার দিকে চেয়ে আনোয়ারকে স্মিতমুখে সালাম জানালে। নিঃশব্দে প্রত্যভিবাদন করে আনোয়ার খাওয়ায় মন দিলে। দুলাভাই বললেন, 'কী বিবি সাহেবা, তোমার মুখ যে এখন একেবারে এঁটে গেল। বলছ না যে কিছুই।' ভ্রূভঙ্গি করে দীপ্ত গ্রীবা তুলে ভানু বললে, 'ইনি আমার বন্ধু—বন্ধুকে কী বলব। আপনি আমায় জ্বালিয়ে খান, আমিও আপনাকে পুড়িয়ে তুলি।' খচ করে আমার বুকে বিঁধল ভানুর কথার সেই কেয়ার কাঁটা। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখলুম— ভানু দাঁড়িয়ে, হাতে একখানা চিটি। সে বললে, 'নিশ্চয় লুসির চিঠি।' খুলে দেখলুম সত্যিই সে লিখেছে, 'তোমায় ভুলতে পারব কি না জানি না, কিন্তু ক্ষমা করতে পেরেছি। তোমার স্ত্রীকে সব বল, সে ক্ষমা করলে তার সঙ্গে আমারও ক্ষমা তুমি পাবে। দেশে ফিরে গেছ— অতীত পশ্চাতে ফেলে। তোমরা পুরুষ, চাও বিস্মরণী ; আমরা নারী, চাই অতীতকে নিয়ে স্মৃতির বেদনায় তাকে মাধুর্য দিয়ে নব-নব কল্পনায় আনন্দ পেতে।

আশ্চর্য হলুম! দু-জন নারীরই মুখে একই কথা। আমি ভানুকে চিঠি দেখালুম। রাতের কেয়ার কাঁটা বেঁধার ব্যথা ক্ষমার প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। ভানু নত হয়ে আমার বিশৃঙ্খল চুলের উপর তার স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে বলল, 'আমার মনে তখন কোথাও যেন গ্লানির যোগ ছিল না এতটুকুও'। তাই বললাম, 'তোমার তো অপরাধ নেই কিছুই, তুমি কবি— তুমি বিজয়িনী, তোমার একটা হয়ত খেয়াল, একটা ক্ষণিকের কল্পনাকে আরো রঙ দিয়ে তার কাছে ব্যক্ত করেছ, এর বিচার আমি কী করব!' নিমেষের পরে ভানু একটু অন্যমনস্ক হল। পরে বললে, 'তুমি স্বামী, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাথী, তাই বলা প্রয়োজন মনে করেই আমি বলেছি। আজ যদি তুমি এটা সহজভাবে না নিয়ে অন্যভাবে বুঝতে, ঠিক আমিও উল্টোভাবে এর ব্যবহার করতুম। কিন্তু এখন আমরা দু-জনেই দু-জনের কাছে সহজ অ-ভিন্ন হয়ে গেলুম, নয় কি?' আমি বললাম 'হাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু লুসির সঙ্গে যদি তোমার দেখা হত, কী করতে তুমি?'

ভানু বললে, 'তার প্রতি তো আমার বিরাগ বা বিদ্বেষ নেই, বরঞ্চ আছে শুধু সহানুভূতি। সে-ও তো মেয়ে-মানুষ। ও তোমাকে ক্ষমা করতে হয়তো পেরেছে, কিন্তু ভুলতে যে পারে

নি, এটা যে আমায়ও বেদনা দিচ্ছে।' আমি বললাম, 'ও দেশের মেয়েরা অনায়াসে ভুলে যাবে।' সিংহীর মতো গ্রীবা তুলে ভানু বললে, 'ও কথা কী করে বলো তুমি! ওতে নারীর অপমান করা হয় জান? ওকে তুমি যে বেদনা দিয়ে এসেছ, তার সে বেদনা হয়তো জুড়াবে, কিন্তু ঘা সারবে না কোনোদিন। ওর চিঠিটা কী করুণ ; তুমি বুঝতে পার নি?' আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম, 'আমি কী করতে পারি বল তুমি।' ও বললে, 'কিছুই নয়, লুসিও করতে পারবে না কিছু, আর তোমাকে ভুলবে না কোনোদিনই ; একদিন যে আনন্দের আঘাত ওকে বিকশিত করেছে, তারই সৌরভময় বেদনায় ও তোমাকে স্মরণ করবে চিরদিন! ওর চিঠিখানা তোমাকে শুধু সান্ত্বনা দিয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন—

'একদিন ফুল দিয়েছিল হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তার ;
তবু সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার!'

এ হচ্ছে নারীব চিরন্তনী কথা! নিজের বেদনায় অপরকে নারী ম্লান করে না। লুসির জন্য তোমার চিন্তা নেই, ও ঠিক থাকবে বেঁচে। তবে কখনও দেখা হলে তার সঙ্গে ভদ্রতা কি শিষ্টাচাব দেখাতে চেয়ো না ; ওর কাছে সহজ হয়ো, ও তোমাকে স্নিগ্ধ করবে।'

বিস্ময়ে ভানুর দিকে চাইলুম। দেখলুম নারী-হৃদয়েব অজানা রহস্য তার শান্ত মুখে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।

সংকট-বিহার

শওকত ওসমান

পরস্পরবিরোধী দুই সামাজিক শক্তি বা প্রবণতা যখন মুখোমুখি মোকাবিলায় দাঁড়ায় তখনই সংকটের সূত্রপাত হয়। মানুষ, ঘটনা, পরিস্থিতি— নানা উপাদান পেছনে থাকে। ফলে সংকটের তালিকা করা দায়। সেইজন্যে প্রধান কোনো একটি উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয়। এবং সেইভাবে সংকটের নামকরণ ঘটে। যথা, জাতীয় সংকট, রাজনৈতিক সংকট, পারিবারিক সংকট ইত্যাদি।

হাল আমলে নৈতিক সংকটের একটা বড়ো উদাহরণ : উৎকোচ বা ঘুষ। দেশী-বিদেশী বহু সমাজচিন্তাবিদ তথা অর্থনীতিবিদ অনুন্নত দেশে এই ব্যাধির উল্লেখ করে থাকেন। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মিরদাল একাধিক বার বলেছেন যে দুর্নীতি থেকে সূত্রপাত স্বৈরাচারের। অনুন্নত দেশে এই ফাটল ধরে হাজির হয় সামরিক শাসন।

উৎকোচ প্রধানত টাকা-পয়সা বা সম্পদের লেনদেন। কিন্তু তা অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিণাম সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যের দিগন্ত ক্রমশ সংকুচিত হয়। ব্যক্তিমানুষ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে আকারহীন পিণ্ডের দোসর বনে যায়। কবন্ধের জুলুম শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে।

সংকট-সমাধানের কথা বহুজন ভেবে থাকেন। কিন্তু সেইখানে পথও মসৃণ অথবা সমস্যা সহজ নয়। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে সম্পত্তি-সম্পদের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই গাজর গর্দভের সম্মুখে ইনসেনটিভ বা প্রয়োজক হিসেবে ঝুলন্ত না রাখলে তার চলৎশক্তি খোলে না। শাস্ত্রকারগণ কর্মযোগীর কথা বলেছেন যারা ফলের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই ব্রত সম্পাদনে সদা-মোতায়েন থাকেন। আদর্শ হিসেবে তোফা। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ প্রয়োজকের কথা ভাবতে হয়। তখন সামাজিক পুরস্কারের নিশান টানানো ছাড়া পথ থাকে না। ইউটোপিয়ার নকশা আঁকা সহজ। বাস্তব রূপে তা পাওয়া দায়। লোভ বজায় রেখে মানুষকে নির্লোভ করার দায়িত্ব হয়তো সকল যুগেই থাকবে। খ্যাতি, যশ, মান— গুণান্বিত লোভেরই এক দিক। সামাজিক পুরস্কার যতখানি নির্বস্তুক হয়ে উঠবে জীবনযাপনের বস্তুভিত্তির উপর, সেই সমাজের পরাকাষ্ঠা ততখানি। একথা বর্তমানে সকলে স্বীকার করেন।

উৎকোচ প্রসঙ্গে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

এতৎসঙ্গে অবিশ্যি স্মর্তব্য— বারাঙ্গনামাত্রেই একদা ছিল অরমিত কুমারী।

২

নায়কের নাম এই কাহিনীতে উহ্য। তাকে আমরা রাজপুরুষ বলব। বড়ো নয়, তবে পদ অফিসারের। যদিও কোনো এক বিভাগের কর্মচারী নিয়ে কথকতা, তবু এমন নৈতিক সংকট কেবল ওই এক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবিকার নানা পর্যায়ে এমন দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে। বেতনদাতাও এই গন্ডির মধ্যে পড়ে। তারও জীবিকা আছে। এমন ব্যাপক অর্থেই জীবিকা শব্দটি এখানে গৃহীত। লেখক, প্রকাশক, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক, ফার্মের স্বত্বাধিকারী, বিজনেস হাউসের পরিচালক অগয়রহ — যে কেউ বিভিন্ন রূপে এমন নৈতিক-সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। শুধু কাহিনী-কথনের সুবিধার জন্যে এক ব্যক্তি বা বিভাগের উল্লেখ আছে। তাই কারো নাম খুঁজতে যাবেন না। সব বিমূর্ত। কোথাও পেশা কোথাও সম্পর্কের সড়ক ধরে সকল সম্বোধন সম্পাদিত।

কলেজে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তারপর দশ বছর-লা-পাত্তা। রাজপুরুষ অবাক হয়ে যায়, এক সাবেক সহপাঠী বাড়ি এসে উপস্থিত।

কারো অবয়বে তেমন অদলবদল ঘটে নি। সুতরাং নিমেষে চেনা-পর্ব সমাপ্ত।

— তুমি!?!?!?

— তুমি!?!?!?

— বসো বসো। বাড়ি চিনলে কী করে?

— গেজেটেড অফিসারদের বাড়ি কাক-পক্ষী চেনে।

— কোথা ডুব দিয়ে ছিলে এতদিন?

বলব বইকি। সজনি, সব ধীরে-ধীরে।

সহপাঠী এবং রাজপুরুষ অনেক অতীত ইতিমধ্যে চায়ের কাপের উপব ছড়িয়ে দিয়েছিল।

রাজপুরুষ কমটিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছিল, ফল খুব ভালো হয় নি। শেষে কাস্টমস— শুল্কবিভাগে এক হিল্লে হয়। সহপাঠীর কোনো স্থায়ী জীবিকা নেই। যখন যা জোটে গা ভাগিয়ে দেয়।

ছুটির দিন ছিল না বলে সেদিন আসর জলদি ভেঙে যায়। পরবর্তী শনিবারের বিকেল, রোববার সব অন্ধকার দূরীভূত। দশ বছর আর গত দশ বছর থাকে নি। পুরাতন সাহচর্য নতুন হয়ে উঠল। এক মাসে উভয়ের আরো মজলিস বসল। সহপাঠী আসর-গুলজারে অদ্বিতীয়। পুরাতন সকলকেই পাকড়াতে কারো বিলম্ব হয় নি।

একদিন রাজপুরুষের আপিসে টেলিফোন বেজে উঠল।

— হ্যালো। রাজপুরুষের হাতে রিসিভার।

— অবসর আছে?

অন্যপারে প্রশ্নকর্তা সহপাঠী।

— আছে। তোমার জন্যে আছে।

— অফিসার মানুষ। আমাদের মতো টোটো কোম্পানি নও। তাই আগেভাগে নোটিশ।

— এসো। চা খেয়ে যাও।

— আচ্ছা। ছেড়ে দিচ্ছি।

সহপাঠী অতঃপর হাজিরা দিয়েছিল। হাতে এক সুশোভন ব্রিফকেস। যদিও চায়ের কাপের উপর বর্তমান রাষ্ট্রীয় পলিসি ঠিক হয়, সহপাঠী সেদিন তার উদ্দেশ্য উহ্য রেখেছিল। শুধু সাহচর্যের লোভেই তার উৎপাত— বিদায় নিয়েছিল এমন ভাব পেছনে রেখে।

তিনদিন পরে এবার আপিস নয়, বাড়ি চড়াও সহপাঠী।

— কী খবর ওল্ড বয়? রাজপুরুষ অভ্যর্থনা জানায়।

— খবর আছে বইকি।

— একটু বসো। চা আনিয়ে নিই।

পরিস্থিতি তরল করতে সেদিন সহপাঠীর কোনো সংকোচ ছিল না। শুল্কবিভাগে তার একটা জরুরি কাজ আটকেছে। জীবিকার কোনো বাঁধা রাস্তা নেই। ভাবনা অনুযায়ী বাথান বদল। বর্তমানে সে 'উজানী ট্রেডার্স' নামে এক ফার্মের সঙ্গে জড়িত। তাদের একটা কেস আছে কাস্টমসে।

— উজানী ট্রেডার্স? না, তেমন কোনো ফাইল এখনও আমার কাছে আসে নি।

— আসে নি। তবে আসতে পারে। তুমি ঠিক জান আসে নি? সহপাঠী সন্দেহ প্রকাশ করে।

— বহু ফাইল পাশ হয়। তবে ও-নামে কিছু আসে নি। যদি আসে—

— ধরে রেখো। আর আমাকে খবর দিও।

— কেসটা কী?

— কোন একটা অ্যানোমালি অর্থাৎ অসংগতি আছে। তোমার সব জানা নেই। পরে বলব।

রাজপুরুষ আশ্বাস দিয়েছিল 'তুমি ইন্টারেসটেড। উজানী ট্রেডার্স— নাম মনে থাকবে বইকি। তবে খোঁজ নিও।'

— তা নেব বইকি। আমার তো যখন-যা-পাই-ধরে-খাই-গোছের জীবিকা। খোঁজ নিতেই হবে।

— আমি চট করে কিছু করে বসব না, তুমি যখন ভেতরে আছ।

— ধন্যবাদ।

ধাইয়ের কাছে কোঁক চাপা থাকে না। রাজপুরুষের কাছে দু-তিন দিনের মধ্যে সব হদিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

দেখা যায়, 'উজানী ট্রেডার্স' লাইসেন্স-অধীন কিছু মাল আমদানি করে। পরিমাণে

অসংগতি তো আছেই, তা ছাড়া বাজারে মালের চলতি যা দাম ইনভয়েসে দাম তার চেয়ে ঢের কম। একে আন্ডার-ইনভয়েস বলে। ইনসপেক্টার এইসব গরমিল-অনুযায়ী রিপোর্ট দিয়েছে। আইনত অপরাধ। মাল বাজেয়াপ্ত, জেল, জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল— সব কিছু হতে পারে। অফিসার বিচারকর্তা।

সহপাঠী বাড়ি এসে ধরনা দিলে। একদম ককানো অনুরোধ ঃ বাঁচাও।

— আমি কী করতে পারি? বাঁধা আইন।

— তুমি পার।

— তোমার খাতিরে ওদের জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া যায়।

— তা হলে ব্যবসার আর থাকবে কী? লাইসেন্স বাতিল। আমারও রুজি গেল।

— ব্যবসা থাকবে না কেন?

— বাজারে সুনাম গেলে আর ব্যবসা থাকে?

— ইনসপেকশানের সময় ধরাধরি করে নি কেন, ভেতরে যখন গলদ?

সহপাঠী চেপে গিয়েছিল। ওদের চেনা ইনসপেকটর ইতিমধ্যে বদলি হয়ে যায়। ফলে এই গন্ডগোল। চোরের দশ দিনের জায়গায় এবার গেরস্থর এক দিন এসে গেছে। গেরস্থ এখানে শুল্কবিভাগ।

মাকু ঠেলাঠেলি চলল দু-তিন দিন।

পুরাতন ঘনিষ্ঠ সহপাঠীর অনুরোধ। ফাটা অসোয়াস্তির মধ্যিখানে পড়েছিল রাজপুরুষ।

ভালো ছাত্র ছিল কলেজে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রাজপুরুষের চোখ যায় নি, এমন অপবাদ কেউ দেবে না। সামাজিক সমস্যাবলী তার ধী-শক্তিসমীপে আছাড় খেত বইকি। কিন্তু তেমন আমল পেত না। তার সহপাঠী অনেকে রাজনীতি নিয়ে বেশ মশগুল ছিল। রাজপুরুষ তর্কচ্ছলে সময়-কাটানোর নিমিত্ত হিসেবে তাদের গ্রহণ করত। তার বেশি না। সামাজিক দায়িত্ব মানুষের আছে। কিন্তু সেই বোঝা বইতে লাখ-লাখ মাথা প্রয়োজন। সেখানে একটি মাথা না থাকলে কী আসে যায়? এবংবিধ আঁচড় লাগত রাজপুরুষের মনে। অন্যদিকে 'কেরিয়ার'-গঠনের উচ্চাশার কোনো ভেলকি তার সামনে ছিল না। চার বছর চাকরি হয়ে গেল। সে উপরি রোজগারের কথা কোনোদিন ভাবে নি। যদিও তার কানে পড়ত উধর্বতন-অধস্তন সহকর্মীদের কপাল-চমকানোর কথা। শুল্কবিভাগে আইন আছে। সেই মাপ-কাঠি দিয়ে ফাইলের উপর বিচরণ এবং মন্তব্য-দান ছাড়া একটি অফিসারের আর কী কাজ থাকতে পারে? অন্য কিছু ভাবত না রাজপুরুষ।

সহপাঠীর অনুরোধ তার কাছে প্রথম ধাক্কা এবং তা আশ্চর্যজনক। তার অধস্তন কোনো সহকারী তার কাছে বায়না ধরে নি কোনোদিন। যদিও স্বভাবে পরিহাসপ্রিয়, কিন্তু আপিসে রাজপুরুষ রীতিমত আমলা অর্থাৎ ব্যুরোক্র্যাট। আপিসে গল্প করা ছিল তার ধাতের বাইরে। সবাই জানত, বড়ো রাশভারি অফিসার।

সহপাঠী পরদিনই বাড়িতে এল ধরনা দিতে। অসোয়াস্তি আছে, তবু রাজপুরুষ কোনো ত্রুটি রাখে না অভ্যর্থনায়। অবিশ্যি সব কথা শেষে এককথায় গিয়ে ঠেকে।

— কী করবে ভাবছ? সহপাঠীর প্রশ্ন।

— কিছু করা যাবে না।

— আমার একটা অনুরোধ রাখো।

— অনুরোধ কী করে রাখব?

-— তুমি ইচ্ছে করলে পার।

অন্দর থেকে এই সময় একটা কালো রঙের পুড্‌ল্ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। এই জাতীয় খুদে সাইজের কুকুর কযেকবার রোয়াব ঝেড়েই ঠান্ডা হয়ে যায়। রাজপুরুষ ওটাকে সামলে নিজের কোলে তুলে নিলে। কুকুরের কালো পশমি জঙ্গলে বিচরণশীল তার পাঁচ আঙুল। যেন সে-মুহূর্তে তার সামনে আর অন্য কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু সহপাঠী তো বেকার নয়। সে এত্তেলা দিলে।

— তুমি পার। খুব ঠেকা। তাই তোমার কাছে এত অনুরোধ। নচেৎ—

রাজপুরুষেব জবাব দিতে বিলম্ব ঘটে। সময় যেন চোখ বুঁজে আছে, আদরলোভী পুড্‌লের তৎকালীন চোখের মতো।

কিন্তু উত্তর শেষ পর্যন্ত দিতে হয়। 'আমার পালটা অনুরোধ। উজনী ট্রেডার্স নিয়ে তুমি আমাকে আর কিছু বোলো না।' হাজার হাজার অসোয়াস্তি রাজপুরুষ গলা থেকে নিমেষে উগরে দিলে।

তারপর স্তব্ধতা পৃথিবীময়।

কিন্তু সহপাঠী নাছোড়বান্দা। সে বেশ শান্ত এবং জোরালো কণ্ঠে বললে, 'ওল্ড ফ্রেন্ড তুমি। আমি সব তাস খুলে ধরছি তোমার সামনে। তুমি আমার জন্যে একটা কিছু করবে— এই আশায়।'

— আমি—! রাজপুরুষ যেন ককিয়ে উঠল।

এই 'ডীল' যদি হয়, পার্টি বিশ হাজার টাকা খরচে রাজি। আমি ভেবে রেখেছি, আমার দিন-গুজরানের জন্যে পাঁচ হাজার রেখে দেব। বাকি পনেরো হাজার তোমার। এখন তুমি ভেবে দেখো। সহপাঠীর কণ্ঠস্বর আগের মতো শান্ত এবং জোরালো।

বক্তা চলে গিয়েছিল। সেদিন আর কোনো কথা হয় নি।

রাজপুরুষ ধাক্কা খেয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা একসঙ্গে রোজগার? বিনা মেহনতে! পৃথিবীতে এই জাতীয় ব্যাপার ঘটে সে শুনেছে, পড়েছে। কিন্তু এমন চাক্ষুষ দেখে নি। দেখার তো কিছু বাকি নেই। বাকি স্রেফ একটা 'নড'। বাকি স্রেফ সম্মতিসূচক ঈষৎ শিরোভঙ্গি।

দেওয়ালের কান থাকে। শত শত পোস্টার দেখেছিল রাজপুরুষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। লোকের কানাঘুষা তো থামবে না। পেছন থেকে মন্তব্য চলবে, সামনাসামনি না হোক। অধস্তন সহকর্মীরা কী ভাববে? তাদের ইঙ্গিতময় চোখ-ঠারাঠারি রাজপুরুষ তখনই দেখতে পেলে।

সহপাঠী এক ধন্দে ফেলে গেল। চব্বিশ ঘন্টা রেহাই নেই হাতছানি থেকে। পনেরো হাজার টাকা মানে অনেক কিছু। সাহিত্য-রসের প্রতি রাজপুরুষের তেমন আকর্ষণ ছিল না কোনোদিন। তাই বলে কল্পনাব দৌড় থেকে রইল না। পার্থিব কত সুখের হাতছানি সঙ্গে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বহু ধরনের নিরাপত্তা আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কৃতিত্ব ব্যক্তিত্বের পরিধি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক দূর ঠেলে দেয়। অন্যদিকে — আপিসের মধ্যে কানাঘুষা এবং হতাশ ব্যক্তিত্বের ওজন-চুপসানো কৃত্রিম ভার নিয়ে দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কশাঘাত। বহু মানুষের সামনে ছোটো হওয়া কি বিধেয়?

এককথায়, আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত রাজপুরুষ।

কয়েক দিনের মধ্যে এবং তা দৈব ব্যাপার বলা চলে রাজপুরুষ হঠাৎ কূল পেয়ে গেল।

হাতে কোনো কাজ ছিল না। তাই ছুটির ঘন্টা দুই আগে সে বাড়িতে ফিরেছিল। রাজপুরুষের পিতা ছিলেন গোছালো সংসারী মানুষ। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সদা-উৎকণ্ঠিত। রাজপুরুষের বর্তমান বাড়ি পৈতৃক-সূত্রে পাওয়া। উপর-নীচে চার-কামরার দোতলা। নীচে ডাইনিঙ রুম। অপর কামরা ভৃত্যাধীন। উপরে বেড-রুম। অন্য কক্ষ ড্রয়িংরুম। এখনও বাড়িতে কোন ছেলেপুলে আসে নি। সুতরাং প্রশস্ত বাসভূমি।

কড়া নাড়তে কিশোর ভৃত্য দরজা খুলে দিয়েছিল। রাজপুরুষ হনহন করে উপরে উঠে যায়। সিঁড়ি থেকেই তার চোখে পড়ল বেডরুমের দরজা ঈষৎ খোলা। অথচ এই সময়ে বন্ধ থাকার কথা। বাড়িতে কেউ এলে তা জানালা দিয়ে দেখার বন্দোবস্ত আছে। সেই অনুযায়ী উপরের দরজা খোলা হয়। একা-একা থাকার ঝামেলা অনেক। স্ত্রী রাজপুরুষের চেয়ে সেদিক থেকে ঢের বেশি হুঁশিয়ার। দরজায় পাল্লা ঈষৎ খোলা দেখে আশঙ্কিত কৌতূহলী ; সন্দিগ্ধ রাজপুরুষ সন্তর্পণে অকুস্থলের দিকে এগিয়ে গেল। তিন-চার ইনচি ফাঁক দুই পাল্লার মধ্যে। রাজপুরুষ দু-চোখ দূরবীন বানিয়ে নিলে। লং শটে ধরা পড়ল— গৃহিণী একদম বিবস্ত্র। দিগম্বরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে চিরুনি। শাড়ির স্তূপ, খাটের উপর। পাশে উবু বসে আছে কালো পুড্‌ল্, তার সারমেয়-দৃষ্টি নিয়ে মনিবের দিকে। চুলে চিরুনি চালানোর কালে মাঝে-মাঝে কুকুরের দিকে চেয়ে দিগম্বরী মুচকি হেসে আবার নিজেকে ড্রেসিং টেবিলের দর্পণে সোপরদ্দ করছিল। রাজপুরুষ হতভম্ব। নীরব দর্শক। ফোকাসের উপর অবিচল দৃষ্টি। এক সময় সেও মুচকি হেসে ফেলে। এমন দিগম্বরী সে দিনে কখনও দেখে নি। এক সময় ধৈর্য টলমল রাজপুরুষ দ্রুত পাল্লা ঠেলে হেঁকে ওঠে, 'আ রে, এ কী??'

সহধর্মিণী প্রায় আঁতকে উঠেছিল কোনো আততায়ীর আশঙ্কায়। কিন্তু ঝটিতি নিজেকে সামলে নেওয়ার পূর্বে শাড়ির স্তূপ সামলাতে থাকে এক কোণে সরে এবং মুখ খোলে, 'এ-ই তুমি। এমন হঠাৎ অসময়ে—।"

— দবজা খুলে রেখে- – এসব কী খেয়াল জেগেছিল—? অন্য জনের প্রশ্ন।

— দরজার কথা খেযাল ছিল না। গৃহিণী তখন দ্রুত বসনের তলায় প্রবেশার্থী। আরো যোগ করলে— তুমি বুঝি আড়ি পেতে দেখছিলে?

— দবজা খোলা। চোবেব ভয়। বদমাশের ভয—।

— বদমাশের ভয় নেই। এক তুমি ছাড়া। আর—। বাক্য অসমাপ্ত। সহধর্মিণী এবার হেসে উঠল স্বামীর দিকে চোরা চাউনি হেনে।

— কিন্তু দিগম্বরী হওয়ার সাধ কেন? রাজপুরুষের গলার আওয়াজ তরল হয় না।

— মানুষের কখন কী খেয়াল হয় তার বাঁধাধরা কোনো আইন আছে নাকি? প্রায়-সংযত-বসন স্ত্রী মুখ-ঝামটা দিযে উঠল।

— কিন্তু দিগম্বরী হওয়াব বাসনা কেন? বাজপুরুষ অস্বাভাবিকতা মেনে নিতে পাবছিল না।

গৃহিণী এবার গলায কিঞ্চিৎ ঝাল মিশিয়ে নিলে— কী ঘাট হয়েছে তাতে শুনি? বিবস্ত্র হয়েছি তো কুকুরের সামনে। মানুষের সামনে তো না।

ইতিমধ্যে পূর্ণ সংযত-বসন স্ত্রী স্বামীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং আপ্তকণ্ঠে বলে— কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে হলে ঘোর অপরাধ। বুঝেছেন, মিস্টার?

কৌতুক-দৃষ্টি আবার নিক্ষিপ্ত।

রাজপুরুষ হঠাৎ সঙ্গিনীকে আলিঙ্গনে বাঁধে। এবং একটু পরেই পাশ খানিক শিথিল করে বলে— আগে হাতে হাত মেলাও। তারপর স্ত্রীকে একদম আলিঙ্গন পাশ থেকে নিষ্কৃতি দেয় সামনাসামনি ঈষৎ তফাতে ঠেলে।

— হাত মেলাব? আমি?

— হ্যাঁ, তুমি লাখ কথার এক কথা বলেছ। রাজপুরুষ স্ত্রীর উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি অনুরোধ প্রসারিত রাখে— বাক্যিটা আবার উচ্চারণ করো।

বিস্মিত সহধর্মিণী ধীরে ধীরে বলতে থাকে পুনরায়— কুকুরের সামনে উলঙ্গ হওয়া দোষের কিছু না। মানুষের সামনে অবিশ্যি অপরাধ।

তারপর উভয়ের হাতের ঝাঁকুনি আর সহজে থামে না।

৩

সহপাঠী পরদিন হাজির হয়েছিল। একবার দুপুরে আপিসে, আবার সন্ধ্যায় বাড়িতে, ঘোড়েল ব্যক্তি। অনভ্যাসের ভয় থাকে। সহপাঠী হিম্মত জুগিয়েছিল। পনেরো হাজার টাকা তো নস্যি। যে-কোনো অফিসারের ঘর থেকে বেরুতে পারে। রাজপুরুষের ভয়টা কোথায়? সে ধনীর সন্তান। তার স্ত্রী ধনীর দুলালী। উপরন্তু চাকরি চার বছরের। পনেরো হাজারের হিসেব দিতে হবে নাকি? যদি কেউ লাগে। দুর্নীতি-দমন বিভাগেব কেউ? সই-করা-নোট-যোগে যদি ফাঁসিয়ে দেয়। পুরাতন সহপাঠীকে অবিশ্বাস? সে নিজে ট্যাকসি করে এসে পাওনা মিটিয়ে যাবে। সংকোচের কিছু নেই। আব নেহাত যদি রাজপুরুষ হতাশ করে উপরে ছুটতে হবে। কালেকটর আছে। সবার উপরে বোর্ড-অব-রেভেন্যু— রাজস্ব বোর্ড আছে। তখন খরচ হয়তো বেশি। কিন্তু তার পনেরো হাজার— আব থাকল না। অত টাকা কি বানে ভেসে আসে? লোকনিন্দার ভয়? কিন্তু লোক কোথায়?

কুকুরের সামনে বিবস্ত্র হওয়া অপরাধ নয়।

সহপাঠী জিতে গেল।

তবু কাহিনীর সামান্য জের আছে। তা-ই পরিশেষে বিবৃত।

অন্ধকারে বিরাট মাঠে ভয় পেলে মানুষ গান ধরে। হিন্দু মন্ত্র জপে, মুসলমান পড়ে দরুদ। দুই বাহনই জাগতিক কাজে জবর লাগে।

রাজপুরুষ নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন সহ-পাঠীর সঙ্গে রাখী-বন্ধন হল নতুন করে। কলেজ-জীবন আবার বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কত সন্ধ্যা অভিজাত হোটেলে কেটে গেল। রাজপুরুষ বীয়ার পান করে। সহপাঠী আরো কঠিন পদার্থে তৈরি। তার প্রয়োজন হয় আরো কড়া চোলাই। রাজপুরুযেব গৃহিণী এ-সবের শরিক নয়। টাকা বাড়ির মধ্যে কোথাও ছিল। কিন্তু সে জানে না। রাজপুরুষ একদিন ভাবলে, গৃহিণীকে সুখ-সন্ধ্যার ভাগী করা উচিত। কপোত-কপোতীর সংসার। এক সন্ধ্যা ঘরে উনুন না জ্বালিয়ে বাইরে দুজনে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিতে পারে। খরচ বেশি। সেই টাকায় ঘরে আরো ভালো খাওয়া যায়। তা্‌র জন্যে অত ভাবনার কিছু নেই আর। সেদিন সহপাঠী অবিশ্যি বাদ থাকবে। তাকে ছাড়াই একসন্ধ্যা নীড় ছেড়ে তারা বিবাগী ডানা মেলে দেবে। সেদিন আপিস থেকে ফেরার সময় রাজপুরুষ এক শিশি দামি পারফিউম কিনে ফেললে স্ত্রীর জন্যে। পরবর্তী সন্ধ্যার পরিকল্পনা বাড়ি গিয়ে করা যাবে। কোথাও ক্যাবারে নাচ দেখা যেতে পারে। না, একদম অদ্দুর লাফ দিলে গৃহিণী সন্দেহ করবে। তার চেয়ে কোনো অভিজাত হোটেলে দামি ভোজনই উত্তম।

পরদিন সকাল। ছুটির দিন। একটু দেরিতে দম্পতি চা খেতে বসেছিল। রোববার কি ছুটির দিন তারা নীচে ডাইনিং রুমে চা খেতে যায় না। উপরে ভৃত্য ট্রলিযোগে সাজিয়ে আনে। আহার্য তালিকা অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু লম্বা হয়। ভোজনে ব্যস্ততা থাকে না! ছুটির দিন। খ্রীষ্টান ঈশ্বরের মতো সবাই বিশ্রামার্থী।

কেটলি থেকে রাজপুরুষ চা ঢালছিল। ছুটির দিন রুটিন উলটে যায়। গৃহিণী যেন সম্রাজ্ঞী। হুকুম-তামিলের ভার মিস্টারের উপব।

— খুব ভালো, একঘেয়েমিও কাটে।

— গুড।

— কিন্তু খরচ?

— একবেলার লাট। কত আর যাবে?

— তোমার হিসেব তুমি বোঝ গে।

— তুমি প্রচন্ড বাক-পটীয়সী।

— সার্টিফিকেট দিচ্ছ?

— না।

— নমুনা কোথা থেকে পেলে।

— প্রতিদিন পাই। তবে সেদিন একটা কথা বলেছিলে বটে!

রাজপুরুষ এই সময চায়ের কাপ স্ত্রীর হাতে তুলে দিলে। অন্য কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললে— সেদিনের বাণীমন্ত্র আবাব শোনাও।

— কোন দিনের?

— সেই দিগম্বরী অপরাহ্নের। রাজপুরুষ স্মিত হাসির জের কক্ষময় ছড়িয়ে দিলে।

— যাঃ! অপরপক্ষ তাচ্ছিল্যতায় সব উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

— একবার বলো না। রাজপুরুষ গলায় মিনতি মাখায়।

সংকোচে আড়ষ্ট গৃহিণী প্রথমে আঁচল দিয়ে ঠোঁটের হাসি আড়াল করে। এবং হঠাৎ আঁচল সরিয়ে গড়গড় করে বেশ জোরেই বলে ফেলে— কুকুবের কাছে ন্যাংটো হওযা যায়, মানুষের কাছে না।

রাজপুরুষ অতি আনন্দিত, উৎসাহিত মন্তব্য যোগ করে— দামি কথা। দামি মন্ত্র।

স্ত্রী স্বামীর চোখে চোখ ফেলে বলে— স্যার, কথার আর-একটু বাকি থেকে গেছে।

— বলো, বলো। স্বামীর যেন তর সয় না।

— কুকুরের সামনে কুকুর নিশ্চিন্তে ন্যাংটো থাকে।

এটুকু উচ্চারণের পর স্ত্রী খিকখিক হাসি আরম্ভ করে।

— ও —। প্রলম্বিত এই স্বরবর্ণের উপর রাজপুরুষ গোটা বাক্যের মর্মার্থ উপলব্ধির চেষ্টা করতে লাগল সেই নির্বিবাদ ছুটির সকালে।

৪

পশুর নিকট উলঙ্গ থাকতে মানুষের কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।

পশু পশু-সমীপে বেমালুম ন্যাংটো থাকে।

লাখে না মিলয়ে এক

গোলাম কুদ্দুস

লাখে না মিলয়ে এক।

আমি যাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে। ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন? সে কি সতের বছর আগে? আর তাতে কি যাট লাখ কৃষক অংশ নিয়েছিল? মাথা গুনতি করে কি এই সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল? তবু এটাই চলে আসছে। এর সত্যিমিথ্যে আমি জানিনে। তবে বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এর খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আজ এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে?

অথচ তুমি বার বছরের কৃষক-বালক বই তো নও। কোন বৃহৎ কাণ্ডও তুমি ঘটাও নি, আর আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও মাত্র কয়েক ঘন্টার, তবু এমনটা কি করে হল?

তোমার নামটা ভাই আমি বেমালুম হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে যে নামে ডাকছি, ওটা আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর নাম। তাকে বহুকাল হারিয়েছি, কিন্তু নামটা স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই নামের লেবেলটা আজ আমি তোমার গায়ে সেঁটে দিলাম।

কিন্তু ভিখু, কানু ছাড়াও গীত আছে। ভাবতে বসলে ক্রমে ক্রমে আরো অনেক মুখ এবং ঘটনার কথা মনে পড়ে। কি করে ভুলি হেমন্তদাকে! কৃষক সমিতিতে যোগ দেওয়ার আগে সে নাকি ডাকাত ছিল। পৌষমাসের রাত্রিতে টর্চ জ্বেলে গ্রামের পথে চলেছি, সামনে খানিকটা জল জমে আছে, থমকে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে যাচ্ছি অমনি আমাদের নব-বাল্মীকি আমাকে পাঁজা-কোলে করে শূন্যে তুলে ধরল!—আহা কর কি! ছাড়ো! ছাড়ো!..... কে শোনে কার কথা। যতই বলি, আমিও গ্রামের ছেলে; ততই হেমন্তদা বলে, আহা আপনারা হলেন কলকাতার লোক; আপনাদের কি জলকাদা সহ্য হয়?.......... হেমন্তদা হিমশীতল জলাটা পার করে আমার বপুটাকে হালকা সোলার মতো ডাঙায় নামিয়ে দিল। পরে সেই হেমন্তদাকে আর একবার দেখেছি, তিনি তখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই লোহার মতো শক্ত শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে মানুষটাকে চেনাই যায় না।

সব আন্দোলনে যুবকেরাই থাকে সকলের পুরোভাগে। কৃষক আন্দোলনেও সেদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'এক ভাই, এক টাকা, এক লাঠি'—আওয়াজটা তাদেরই সব থেকে আকৃষ্ট করেছিল। তারাই দলে দলে ভলান্টিয়ার হয়েছে, তারাই গাথা বেঁধে ধান কেটেছে; তারাই

লাঠির ডগায় নিশান বেঁধে মিছিল করেছে, আর তারাই রাত জেগে পুলিশের হামলা ঠেকাতে পাহারা দিয়েছে। কিন্তু কৃষক-মেয়েরা তাদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি রানী-শংকাইনের মেয়েদের। তারা পুলিশের হাত থেকে চারটে বন্দুক কেড়ে এনেছে। পুরুষদের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড! কি করে বন্দুক ফেরত দেওয়া যায়, সেই এক ভাবনা। আর এই সময় মেয়েদের মারধোর করার সনাতন রীতিটা হঠাৎ যুক্তি বহির্ভূত বলে মনে হতে লাগল। তখন এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সমিতির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অভিযোগ করার দৃশ্য আমিও দু একটা দেখেছি।

ভাবলে অবাক লাগে তখন কত বড় বড় ঘটনা কত সহজে ঘটত। তোমার সে-সব বোঝার মতো তখন বয়সও হয়নি, সুযোগও ছিল না। তুমি যেখানে জন্মেছ, সেখানেই বড় হয়েছ। তুমি কোনো স্কুলে পড়নি, বাংলাদেশকে জানা তো দূরের কথা, একখানা মানচিত্রও দেখনি। তুমি কি করে জানবে, মস্ত অবিভক্ত বাংলাদেশে কি তোলপাড় কাণ্ড চলছিল। তোমার গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূরে কি ঘটেছিল, তার খবরই কি তুমি জানতে?

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মাস তিনেক আগে আমি সেইরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রূপনারায়ণ রায়ের নামটা হয়ত শুনে থাকবে। তোমাদের এলাকার এম. এল. এ.। আমি তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে কেরোসিনের ডিবের আলোয় খবর লিখতাম, আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামের রাস্তায় পাহারারত ভলান্টিয়ারদের মাতোয়ারা কণ্ঠের আওয়াজ—'জান দেব তবু ধান দেব না।' দাওয়ার আর এক পাশ থেকে উঠত কয়েকটা ছাগল, আর তাদের ডেকে পার্শ্বে শায়িতা বাড়ির বুড়ো-মা বিড় বিড় করে কি যেন বলত। সামনে লাউ-কুমড়োর নীচু মাচাটার মধ্যে জ্বলত জোনাকি। মাটির সানকীতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গরম খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপতাম, আর পাহারারত ভলান্টিয়ারদের নৈশ বিচরণের জামাকাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তারা অনেকে এসে আমাকে ঘিরে বসত, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার ওভারকোটের ওপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বলত,— কমরেট, এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না, — না?

মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া কি সোজা কথা? এই জামাকাপড়ের প্রাচীর একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। তাই বলে একে তো হঠাৎ বাদ দেওয়াও যায় না। ওদের যে বস্ত্রে যে শীত সহ্য হয়, আমি সে রকম করতে গেলে নিউমোনিয়ায় ভুগব। ওরাও তা আশা করে না। কলকাতা থেকে ভদ্রলোক 'কমরেট' এসেছে, এতেই ওরা খুশি। আর আন্দোলনের উৎসাহের জোয়ার আপাতত সব ব্যবধান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অথচ এই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আন্দোলন বুঝতে হলেও তার পিছনের কথাটা বুঝতে হবে। কারণ এই আলোড়ন আকাশ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো নিশ্চয়

ঝরে পড়েনি। এরকম আকস্মিকভাবে তো সংসারে কিছু হয় না। ১৯৪৩ সনের মারাত্মক দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এই আন্দোলনের একেবারে নাড়ির যোগ। সেকথা কৃষকেরা সবাই জানে, বোঝে এবং বারবার করুণ সুরে আমাকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছে। কত গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তারা আমাকে কবরের সারি দেখিয়ে দিয়েছে। শ্মশানে যারা পুড়েছে তারা তো স্মৃতি রেখে যায়নি। তবে সেদিন সবাইকে তো শ্মশানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রামের লোক বাধ্য হয়ে গ্রামান্তরে কোন জঙ্গল বা আমবাগান বা মাঠেই তাদের ফেলে দিয়ে গেছে। কৃষকরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে— ঐ যে ঐখানে! তিন বছর পরেও গাদা গাদা ভাঙা হাঁড়ি কলসী মালসা তার সাক্ষী হয়ে আছে।

দুর্ভিক্ষের সময় আমি ছিলাম শহরে, গ্রামের কান্না আমি কি করে বুঝব! শুধু সেটা যখন করুণ মিনতির মতো শহরের ফুটপাতে এসে মাথা কুটে মরেছে, তখন চোখের জল ফেলেছি। ক্রমে ক্রমে তাও শুকিয়ে গেল। তবু তখনকার একটা ঘটনা কি করে তোমাকে আমার নিকটবর্তী করেছে, সেই কথাই আজ অকপটে সব বলব।

একদিন রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছি। সিঁড়ির কাছটা রীতিমতো অন্ধকার। সেখানে প্রায়ই একটা কুকুর শুয়ে থাকে। সারমেয়-প্রীতি আমার নেই, আমি কতবার যে ওটাকে লাথি মেরেছি, তবু আপদটাকে দূর করতে পারিনি। সেদিনও কুকুর মনে করে কুণ্ডলী পাকানো একটা বস্তুর উপর পদাঘাত করলাম। অমনি মানুষ-কণ্ঠের দুর্বল আর্তনাদে চমকে উঠলাম।

— কে? কে ওখানে শুয়ে?

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করার পর একটি বালক কণ্ঠের উত্তর এল— আমি।

— আমি কে?

— আমি।

ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এক ভদ্রলোক টর্চ হাতে নামছিলেন, সেটা ফোকাস করতেই নামহীন গোত্রহীন 'আমি'কে দেখা গেল।

একটি বছর নয়েকের শীর্ণ কঙ্কালসার উলঙ্গ বালক, আর একটি বছর চারেকের অনুরূপ শীর্ণ এবং উলঙ্গ বালককে কোলে জড়িয়ে শুয়ে আছে।

— তোরা কোত্থেকে এসেছিস?

কোন উত্তর এল না।

— তোর বাবা নেই?

— মরে গেছে।

— তোর মা নেই?

— মরে গেছে।

— ওটা কে?

— আমার ছোট ভাই।

— কাঁদছে কেন?

— জ্বর।

ভিখু, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলব। টর্চধারী নেমে গিয়ে মোটরে উঠল, আর আমি হঠাৎ এমন ক্লান্ত বোধ করলাম যে সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভিতরটা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। গত দুসপ্তাহ ধরে শহরে মৃত্যুর মহোৎসব দেখছি। কি করতে পারি, কি করতে পেরেছি? কিন্তু মৃত্যু দেখতে দেখতে মনটা যে কেমন করে পাথর হয়ে উঠেছিল, সেদিন রাত্রেই তা টের পেলাম। অথবা আদৌ টেরই পেলাম না। তাই নির্বিবাদে ছেলেদুটোকে ফেলে আমি টলতে টলতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। একবার মনে হল, উলঙ্গ বড়ভাইটা শুধুমাত্র নিজের কঙ্কালসার দেহটার উত্তাপ দিয়ে জ্বরোত্তপ্ত ছোটভাইটিকে রক্ষার কী করুণ চেষ্টাই না করছে! একথা এমন স্পষ্ট করে যে তখন ভেবেছি, তাও নয়, তবু একবার মনে হল চাদরটা দিয়ে ওদের ঢাকা দিয়ে এলে হত। কিন্তু তক্ষুনি অবসাদের সুরে মন বলল, সব মরছে, ওরাও মরবে, মরতে দাও।

সকালে উঠে দেখলাম, ন্যাংটো ছেলেটার দুই বাহুর মধ্যে তার ছোট ভাইটি মরে রয়েছে।

জানো ভিখু, আজও চোখ বুঁজলে তাদের দেখতে পাই। নিজের চেহারাটা নিজে যখন দেখি তখন শিউরে উঠি। অথচ নিজেকে এতকাল কত উঁচুদরের জীব বলে মনে করে এসেছি। বিশ্বসংসারে দুর্ভিক্ষের প্রলয়ে যখন ঘরবাড়ি বাপ-মা সবই ভেসে গেল, তখনো ঐ ক্ষুদ্র বালকটি তার ক্ষুদ্রতর ভাইটিকে ছাড়েনি, দুই হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেয়েছে। আর আমি? সভ্যতার খোলস-পরা আমি মৃত্যুর মহোৎসব দেখতে দেখতে অবশ হয়ে ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে পেরেছি তো।

সে সময় তোমার বয়সও হবে ওরি মতো— বছর নয়।

— তুমিই বা দুর্ভিক্ষের কি বুঝবে? তোমার তো তখনো বোঝবার মতো বয়স হয়নি। গ্রামের সে ভয়ানক দিনগুলির মধ্যে যে না থেকেছে, সে কি করে বুঝবে কৃষক মেয়েদের মনের ভাব, যখন তারা ধানের আঁটির ওপর হাত বুলিয়ে বলে,— মা লক্ষ্মী, ঘরে এয়েচ? তোমাকে আমি ছাড়বো না।—'জান দেবো তো ধান দেবো না'র রহস্য এই।

কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল তোমাদের অঞ্চলের কৃষকনেতা কালী সরকার। তার ফলও সে ভোগ করেছিল। তার জ্যাঠামশায় জোতদার এবং ধনবান।

আন্দোলনের শুরুতেই বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাড়ির একমাত্র ইঁদারার জল বন্ধ করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবারে।

গ্রামের কৃষকেরা অবশ্য তার জবাব দিয়েছিল।

কোনো লোক তাঁর বাড়িতে খাটেনি, তাঁর ধান মাঠে পড়েছিল। তাঁর আলুর ক্ষেত চষা হয়নি। তাঁর গোয়াল-ভরা গরুর মুখে ঘাস বিচালি জোগাবার রাখাল পর্যন্ত জোটেনি। কালী সরকার আমাকে গম্ভীর মুখেই জানিয়েছিলেন,—ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দুই পক্ষের কেউই কাউকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

কৃষকদের মনের ভাব একটু একটু বুঝতে পারছি বৈকি। কি করে তারা ছাড়বে? দুর্ভিক্ষের পরের বছর সব জায়গায় ভালো ফসল হয়নি। তার পরের বছর বকেয়া বাকি ঋণের নামে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে শুষে নিয়ে গেছে। এই তৃতীয় বছরে সোনার ধান মাঠে মাঠে আশার বাণীর মতো হাতছানি দিচ্ছে।

আর আমার মনের ভাব শুনবে? আমি এসেছি সেই কলকাতা শহর থেকে, যেখানে কিছুকাল আগে মানুষ পশুর মতো আচরণ করেছে। তখন সেই দাঙ্গার দিনগুলি কতবার ভেবেছি এবং পরস্পরকে বলেওছি—এর চেয়ে মানুষের জন্য কিছু একটা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরাও ভালো। সেই কিছু একটা, আমার চোখের সামনে, মানুষ আর শস্যের যুগ যুগান্তরের নিবিড় সম্পর্কের রূপ নিয়ে উপস্থিত। মহানগরের অন্ধকূপ থেকে হঠাৎ আমি ছাড়া পেয়েছি গ্রাম গ্রামান্তরের দিগন্ত বিস্তারিত খোলা মাঠের মধ্যে। আমার মাথার ওপর রৌদ্রদীপ্ত ঘননীল উজ্জ্বল অনন্ত আকাশ, আর চারপাশে আশাদীপ্ত নক্ষত্রের মতো অজস্র মানুষের মুখ। এই সব আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, রোদে-পোড়া কালো মানুষের অঙ্গার স্তূপে।

বুঝতেই পারছ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনোভাব কৃষক-জীবনের কঠোর বাস্তবতার বিশ্লেষণের অন্তরায় ছিল। তবু মনে করো না একেবারেই চোখ বুজে ছিলাম।

নড়াইলে একজন কৃষক ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল— এটা তেভাগার ধানের ভাত।..... তাকে খুশী করার জন্য আমি সজ্ঞানেই এমন মুখভঙ্গি করেছিলাম যাতে তেভাগার ধানের ভাতের বিশেষ মিষ্টত্ব এবং রসাস্বাদনের প্রয়াস বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

দিনাজপুরে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগার ধান কাটা দেখলাম।

একটা লাল নিশান পুঁতে রেললাইনের ধারে ধান-কাটা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন লোক ভাত-রাঁধার আয়োজন

করছে। আজ মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। আমার পক্ষে খুশি এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। আমি কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

এই সময় দার্জিলিং মেল পাস করে। হঠাৎ সেই দুরন্ত গাড়িটা মাঠের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে ওরাও গাড়ি থেকে পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ির যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। হঠাৎ শুনলাম ধ্বনির ভাষাটা বদলে দিয়ে কে যেন বলে উঠল— কৃষক মজুর এক হও।....ওদিকে গাড়ির পিছন থেকে গার্ড ক্রমাগত তার ফ্লাগ নেড়ে বাঁশি বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়িটার নড়ার লক্ষণ নেই। কারণ তখন কৃষকদের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধা হচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল দার্জিলিং মেলের মতোই আন্দোলন বাঁধা লাইন দিয়ে দ্রুত সম্মুখে ধাবিত হবে।

কদিন পরে জেলা শহরে গিয়ে দেখি, সেখানে খুব উত্তেজনা। কোর্ট-কাছারিতে ঐ একমাত্র আলোচ্য বস্তু। আর ট্রেনে যেতে যেতে তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ধারণা ব্যক্ত হতে শুনলাম। কেউ তাদের রাক্ষসের মতো নৃশংস, কেউ বা তাদের অতি-মানব বলে বর্ণনা করছে।

ভিখু, সংস্কৃতি কি তা জানো? ঐ রকম শব্দ কখনো তুমি নিশ্চয়ই শোনো নি। তবু শোনো, শহরের এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এক সভার আয়োজন করল, তারা নাকি আমার কাছ থেকে আন্দোলনের কথা শুনতে চায়। আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু যেতে হল। কি যে বলেছিলাম আজ আমার বিন্দুমাত্র মনে নেই, শুধু মনে আছে সভাশেষে বেরিয়ে আসতেই কে একজন বলল— চিরির বন্দরে গুলি চলেছে।.....ঐটাই তেভাগা আন্দোলনের প্রথম গুলির খবর।

চিরির বন্দর জায়গাটা দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। ট্রেনে গিয়ে আবার কিছুটা হাঁটতে হয়। দলবল বেঁধে সেখানে যাওয়া গেল। যে জায়গাটায় গুলি চলেছে সেটা বিরাট এক মাঠের মাঝখানে। চারদিকে পাকা ধানের সমুদ্রে যেন ঢেউ খেলছে। একটা জায়গায় শুধু কিছু ধানের শিষ মাটি ছুঁয়েছে— সেটা বন্দুকের গুলিতে আহতদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগেকার ধড়ফড়ানির ফল। নোয়ানো ধানের গুচ্ছ তুলে দেখলাম তার নীচের মাটি রক্তে তামাটে হয়ে গেছে। কেউ কেউ সেই মাটি হাতে তুলে নিল। কৃষকরা আমার হাতে কয়েকটি বুলেট উপহার দিল। পুলিশ কৃষকদের তাড়া করে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল, তার কতকগুলো ঘরের মাটির দেওয়ালে ঢোকে। কৃষকেরা তা খুঁড়ে-খুঁড়ে বের করেছে। এদের

সবাই মুসলমান। তাদের ইচ্ছা আমি এগুলি কলকাতায় সোহরাওয়ার্দির হাতে তুলে দিই। তিনি তখন লীগ-মন্ত্রিসভার কর্ণধার।

বেলা বাড়ছে। একখানা মাঠ পার হয়ে আমরা এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি এসে উঠলাম। এখানেই আমাদের আহারের আয়োজন হয়েছে। অনেক লোক জমেছে, তারা শুনতে চায় অতঃপর কি করণীয়।

চিরির বন্দরের কৃষকরা সেদিন কি চেয়েছিল জানো? ধনুক। এ অতি সত্য কথা। তাদের কাছে 'এক লাঠি, এক টাকা, এক ভাই' চাওয়া হয়েছিল, তারা তা দিয়েছিল। এখন তারা নিজের চোখে দেখছে হাজার হাজার লাঠি দিয়েও কয়েকটা বন্দুককে ঠেকানো গেল না। তাহলে এখন কি করবে তারা? আমার কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি গ্রামেই বড় হয়েছি, কৃষকদের চিনি, একটা চরের লড়াইতেও তাদের দেখছি, কিন্তু সেখানেও কয়েকজন লাঠিয়াল প্রধান ব্যক্তি। কৃষকেরা শান্তিতে থাকতেই ভালোবাসে। এখন বুঝতে পারি মানুষ কখন চরমপন্থার কথা চিন্তা করে। চরম নির্যাতন হচ্ছে চরমপন্থার পরিপোষক।

ভিখু, তোমাকে আমি তত্ত্বকথা শোনাতে বসিনি, তেভাগার ইতিহাসও ব্যাখ্যা করছি না। এ কাহিনী আসলে তোমাকে নিয়েই রচিত। তবু যে কতকগুলো আনুষঙ্গিক ঘটনা এসে পড়ছে তার কারণ, এগুলি না বললে তুমি আমার মনে কেন স্থান নিয়েছ, তা বোঝা এবং বোঝানো যাবে না। এখন তোমার বয়স উনত্রিশ হওয়ার কথা। তুমি অনেক কথাই এখন বুঝবে।

এইবার অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাব তোমাকে। অথচ এক হিসাবে সেটা নিতান্তই এক মামুলি ঘটনা। শুধু দৃষ্টির হেবফেবের জন্য অদ্ভুতকে মামুলি, আর মামুলিকে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

চিরির বন্দরে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ভালোই হয়েছিল। কৃষকেরা উঠোনে, আমরা ভদ্রলোকের ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন অতি শীর্ণ অতি মলিনবস্ত্র পরিহিতা নারী একা একা খেতে বসেছে। তার খাওয়ার স্থান কোথায় জানো? পাশাপাশি দুখানি খড়ের ঘবের চালা থেকে বৃষ্টির জল পড়ে যে জায়গাটা ঢালু গর্তের মতো হয়েছে; সেইখানে গর্তের মধ্যে কলাপাতা ভাঁজ করে সে বসেছে।

আমি নিতান্ত মামুলিভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম— মেয়েটাকে সাঁওতাল বলে মনে হচ্ছে।

কে যেন স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল— হ্যাঁ, শিবরামের বৌ!

— মানে, যে শিবরাম শহীদ হয়েছে?

— হ্যাঁ তারই বৌ।

আমি হাতে ভাতের দলা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সেই ভাত আমাকে গিলতেও হল।

ভিখু, তুমি হয়ত জানো না, চিরির বন্দরে সেদিন শিবরাম আর সমীরুদ্দীন মারা যায়। সেই শহীদদের হত্যার প্রতিবাদেই আমাদের চিরির বন্দরে আগমন।

অথচ একজন শহীদের বৌ আজ সব থেকে নিকৃষ্ট জায়গায় কুকুর-বিড়ালের মতো খেতে বসেছে কলাপাতা বিছিয়ে। আর সেটা ঘটেছে সকলের চোখের সামনে এবং কারোরই তাতে কিছু মনে হচ্ছে না। এর নামই বোধহয় একাত্মবোধ?

অথচ মজা এই যে শিবরাম এবং সমীরুদ্দীন মরেছে, তাদের এই আন্দোলনে নিজেদের কোন লাভই ছিল না। তারা ক্ষেতমজুর। তবু তারাই প্রাণ দিল। আর এ-নিয়ে অনেক গবেষণাও শোনা গেছে— ক্ষেতমজুরেরা কেন এত ক্ষেপল।........কিন্তু সব সত্ত্বেও তলার মানুষ তো ওপরে উঠতে পারল না? তার উত্থান কে চায়? আমরা যে সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে খেতে বসেছি তাদের কাছে শিবরামের বৌ তো দুঃখী-কাঙাল বই কিছু নয়। কিন্তু অন্যেরা তা সহ্য করলে কি করে? অন্তত আজকের দিনটা ঐ শহীদের বৌকে কি ঘরের দাওয়ায এনে বসানো যেত না?

— না, যেত না; সে তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

এরপর সমীরুদ্দীনের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা আমার লোপ পেযেছিল। তবু যেতে হল। সেখানে শিবরামের বৌয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ম্লানমুখে উঠোনে বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, তাব চারপাশে চার পাঁচটি ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। খোলা উঠোনে চুলোয় একটা হাঁড়িতে কি যেন ফুটছে। ওপাশে একটা দাওয়ায় একটা ঢেঁকি শোভা পাচ্ছে। তাব ওপবের খড়ের চালা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে। বৃষ্টির জলে দাওয়াটাও ক্ষয়ে গেছে। আব একখানি মাত্র ঘর। তার অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছে। — এই হল আর এক শহীদের ডেরা। সমীরুদ্দীনের বৌ লোক দেখে মাথায় কাপড় দিতে গিয়েছিল, কিন্তু অতদূর ওঠানোর মতো কাপড় কোথায়? যা আছে তার ছিন্ন অংশের ফাঁকে দেহ অসংবৃত। কাজেই সে এবং আমরা আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। তারপর ফিরে এলাম।

কৃষকের সঙ্গে একাত্মবোধ? অত সোজা নয়।

তারপর কত জায়গায় গেলাম, কত কি দেখলাম, কত কি ঘটল, সে সব থাক। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কারণ আমি তার মধ্যে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সেখানকার কেউ আমার মনের গভীরে কেন স্থান পায়নি?

ডিমলার নাম শুনেছ? একবার এলাকাটা নাকি অসহযোগ আন্দোলনকালে ছ মাসের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। মনে করো না সেটার পিছনে খুব বেশী বীরত্ব ছিল। জায়গাটা এত

সভ্য জগতের বাইরে, এবং বর্ষাকালটায় এমন ডুবে থাকে যে ইংরেজরা ওর স্বাধীনতাকে গ্রাহ্যই করেনি। রাস্তাঘাট শুকিয়ে খটখটে হলে তারা ওখানে একজন দারোগা পাঠিয়েছিল, কেউ বাধা দেয়নি।

শুনে আমার ভারি হাসি পেয়েছিল। বক্তা রাগ করে বললেন— এতে হাসির কিছু নেই। আর এবার তো বাবুদের আন্দোলন নয়, এবার চাষা ক্ষেপেছে, কাজেই অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখলাম; কই তেমন তো কিছু নয়। শুধু কনকনে শীতে ঘুমনো দায়। যেখানে আস্তানা পড়েছে, সেখানে দুজন নেতার সাক্ষাৎ পেলাম। মাচার ওপর আমরা তিনজন, তার নীচে কটি ছাগল।

ধান কাটা শেষ হয়েছে, কৃষকেরা নিজের খামারেই সব তুলেছে, এখন জোতদারেরা পুলিশ এনে তা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কাল হাটবার, পরশু মিটিং ডাকা হয়েছে। কাজেই আপাতত আগামী কাল ছুটি।

সকালবেলা তামাকের ক্ষেতে জল দেওয়া দেখছি, এমন সময় পাশের গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা এসে বলল— বিকালে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

ঘটনাটা এতই নাটকীয় এবং আনন্দদায়ক যে তোমাকে তা বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। তুমি কি করে বুঝবে এক সপ্তাহ কারো পেটে চা না পড়লে বিশ্ব কেমন অন্ধকার দেখায়? কদিন আগে দীনেশ লাহিড়ী নামে এক কৃষক নেতাকে ঠাট্টা করেছিলাম, কারণ তিনি আমাদের ফেলে দশ মাইল পায়ে হেঁটে রুই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছিলেন। বলাবাহুল্য, ফিরতেও তাঁকে দশ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। লাহিড়ীমশাই জমিদার বংশের ছেলে বহুকাল জেল খেটে প্রৌঢ় বয়সে কৃষক-আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ভাষা তাঁর মতো কেউ আয়ত্ত করেনি ; অন্তত তাঁর মতো কাউকে জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে খাঁটি কৃষকসুলভ গালাগালির ভাষা প্রয়োগ করতে শুনিনি।

তাঁর পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা গরম জামা নেই, রুগ্ন শীর্ণ শরীর। কোমরে ব্যথা, আর গত দেড়মাস তেভাগা শুরু হওয়ার পর কৃষকদের বাড়িতে জলের মতো ডাল আর পাটশাকের বেশী আহার্য জোটেনি। কিন্তু ডিমলায় এসে আমরা যে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলাম। রুই মাছের ঝোলের চেয়ে চা আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় মনে হল।

যাঁর বাড়িতে আমরা হাজির হলাম তিনি একজন সম্পন্ন কৃষক, কিন্তু ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে জোতদারের চেয়ে কম নন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা ধান, বিরাট বিরাট আটচালা ঘর। এরকম পরিবার কৃষক সমিতির সঙ্গে আছে দেখে আনন্দ হল। এবং তা আরো বেড়ে গেল, যখন শুনলাম, আমাদের জন্যে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে চিঁড়ে ভাজা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে।

— গুলি চলেছে।

— কোথায়?

— উই, হোথায়!

— কেউ মরেছে?

তা সে বলতে পারে না। খবর শুনেই সে ছুটেছে। রইল আমাদের চা আর চিঁড়ে ভাজা। তার পিছন পিছন ছুটছি আমরা তিনজন। তখন লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ধান-কাটা মাঠে নাম-না-জানা একরকম ছোট ছোট লাল ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্যের ব্যাপার, কতবার ভেবেছি এই ফুলের নাম কাউকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দেখা গেল, গুলির যথার্থ ফলাফল কেউই জানে না। যতই এগুচ্ছি, ততই লোকের মধ্যে বেশি আতঙ্কের ভাব দেখছি। কেউ বলছে, দশজন মরেছে— কেউ বিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউ বলছে একশ, বন্দুকধারী পুলিশ, কেউ তার সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে পাঁচশ।

আমার সঙ্গী নেতাদ্বয়ের যিনি সিনিয়ার, তিনি তাঁর টর্চলাইটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন— আপনি রিপোর্টার মানুষ, আপনি গিয়ে দেখুন।

আমি তাঁর এই ব্যবহারে বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম। পরক্ষণেই মনে হল, আচরণটা হয়ত কারণ-সঙ্গত। কেননা পুলিশ তাঁদের দেখলে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবুও এই বিদেশ বিভুঁইয়ের সব কিছুই আমার অজানা অচেনা। আমি এখানে কি বলব, কি করব?

ছায়ার মতো দুজন কৃষক আমাব অনুগামী হল। তাদের না পেলে আমি যে কি করতাম জানিনে।

ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না। নির্জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে খড়ের আগুন জ্বলছে, আর তার পাশে কয়েকজন আহত কৃষক মাটিতে পড়ে আছে। হঠাৎ মনে হল যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পড়েছি এবং যেখানে কোনো বন্যপশুর ভয়ে মানুষ আগুন জ্বেলে নিজেকে রক্ষা করছে।

আসলে মৃতের সংখ্যা এক, গুরুতর আহতের সংখ্যাও এক। কিন্তু গুলিবিদ্ধ লোকের সংখ্যা বহু। তার কারণ পুলিশ বুলেট ব্যবহার করেনি, পাখি-মারা কার্তুজ দিয়ে মানুষ মেরেছে। মানুষও তাই ছররাবিদ্ধ হয়ে পাখির মতো দূর দূরান্তরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তাদের কতকগুলি পড়ে আছে এই মাঠে, আর কতকগুলি গ্রামে ঢুকতে পেরেছে।

মারা যে গেছে তার নাম তৎনারায়ণ। তার ঘরের মধ্যে ঢুকে ডোল থেকে জোতদাররা

ধান ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন তার চিৎকারে রাস্তা থেকে বহু হাটুরে লোক সেখানে ছুটে যায়।

আমি গিয়ে দেখলাম তৎনারায়ণের মৃতদেহের অর্ধেকটা মাচার ওপর, বাকী অর্ধেক শূন্যে ঝুলছে। মাথার খুলি ফেটে গেছে। পাশের বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে কাদের ক্লান্ত কান্নার স্বর ভেসে আসছে।

পুলিশ উঠোনে আর একটা লোককে এনে শুইয়ে রেখেছে, তার বাঁ চোখের মধ্য দিয়ে গুলি পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, তবু লোকটা মরেনি। লোকটির নাম গুল মহম্মদ। তাকে হাসপাতালে পাঠালে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল এখান থেকে কতদূরে?

পুলিশ বলল, সকালের আগে গরুর গাড়ি যোগাড় করা যাবে না।

রাত্রে আপাতত কিছু করণীয় নেই। পাশের গ্রামে আস্তানায় ফিরে গেলাম। রাত তখন দুটো। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে বরফ। একদলা ভাত খেয়ে নেতাদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে গেল। কি করতে হবে? সেই মামুলি মিটিং ডাকার কথা, গ্রামে গ্রামে খবর পাঠানোর কথা, লোকের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু আপাতত আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যাতে পুলিশ গ্রামের লোকের এজাহার ঠিক ঠিক লিখে নেয়।

গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্ষুস্থির। লোককে খবর পাঠাতে হয়নি, তারা নিজেরাই কাতারে কাতারে আসছে। নেতাদ্বয়ের কিছু হিসেবের ভুল হয়েছে। কিন্তু এদের হাতেই বা ওগুলো কি বস্তু? খুব কম লোকের হাতেই লাঠি, বেশীর ভাগের হাতে সড়কী, বল্লম, খাঁড়া, রামদা, মেয়েদের হাতে বঁটি খোন্তা। কারো কারো হাতে লাঙলের ফাল, কোদাল এবং কুড়ুল। আটটা নটার মধ্যে সমস্ত মাঠ ছেয়ে গেছে। মাথা গুনতি করলে হাজার দশেকের বেশী হবে না, তবে চর্মচক্ষে জনসমুদ্র বলেই বোধ হচ্ছিল।

মাত্র চারজন বন্দুকধারী পুলিশ, আর একজন দারোগা। তাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

দারোগাবাবু বললেন, আমি নিজে গরুর গাড়ি করে এক্ষুণি গুল মহম্মদকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে দেখবেন untoward কিছু না ঘটে।

— তাহলে আপনার বন্দুকধারীদের একটু পিছিয়ে রাখুন।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কাল যে দুজন কৃষক ছায়ার মতো আমার সঙ্গে এসেছিল তারা জিজ্ঞাসা করল— লোকেরা কি করবে?

— আমি তার কি জানি?

— ওরা আপনার হুকুম চাইছে?

— আমার!

— হ্যাঁ আপনার।

মুহূর্তকাল ভেবে যে সত্য আবিষ্কার করলাম, তা আমার পক্ষে আদৌ সুখদায়ক ঠেকল না। এখানকার নেতাদ্বয় আত্মগোপন করার ফলে প্রচার হয়ে গেছে আমিই তাঁদের প্রতিনিধি। ফলে এই দশ হাজার ক্রুদ্ধ বর্শা-বল্লমধারী লোক আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

আমি ছায়াসঙ্গীদের প্রশ্ন করলাম,— ওরা কি চায়?

উত্তর এল, ঐ যে সামনে জোতদারদের গ্রাম, ওটাকে আক্রমণ করতে চায়?

— তারপর?

— ওরা সব জোতদারদের মাথা কেটে আনবে।

— আর?

— ওদের মেয়েদের পুড়িয়ে মারবে।

— কি করে?

— সাবা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে।

— আর এ সব যদি আমি না করতে বলি?

ছায়াসঙ্গীবা নিশ্চুপ। একজন বলল, তাহলে কি হয বলা যায় না। তাহলে হয়ত এই পুলিশদের ওরা ছেড়ে দেবে না।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এত লোকের হাতে ধারালো অস্ত্র-শস্ত্র আমি কখনো দেখিনি। আর এতে আমার মনে পুলক সঞ্চার হচ্ছিল না। শুধু বোধহয় মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ধরে এনে আমার ঘাড়ে একশ মণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আমি কি কবি এখন? কি করে এদের থামাব? অথচ আমার মুখের একটা কথায় আজ এরা প্রলয় কাণ্ড ঘটাতে পারে। এতবড় শক্তি এবং সম্মান যে আমার ভাগ্যে জুটতে পারে, তা ভাবতে পারিনি। আমি যেন হঠাৎ সম্রাট হয়ে গেছি। এক্‌বার যদি চেঁচিয়ে বলি, তাহলেই ঐ যে সম্মুখে সবুজ ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, সেখানে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে ফুৎকাবে উড়ে যাবে মানুষের কাঁচা মাথাগুলো। অথচ এত বড় যে শাহানশাহ সম্রাট, সে কেন দুশ্চিন্তার ভারে এমন নুয়ে পড়েছে!

ছায়াসঙ্গীদের একজনকে পাঠালাম নেতৃদ্বয়ের কাছে নির্দেশের জন্য। সে লোকটা আধঘন্টার মধ্যে ফিরে এসে বলল, উপস্থিত যা ভালো বুঝি, তাই যেন করি।

আমি একথা গোপন করতে চাই নে, যে আমার ভারি রাগ হল এঁদের দায়িত্বজ্ঞান দেখে। আর যতই রাগ বাড়তে লাগল ততই আমার মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গেল। আমি যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। এটা বুঝতে পারছি, ঐ খুনখারাপির দায়িত্ব হঠাৎ আমি

নিজের স্কন্ধে নিতে পারব না। কিন্তু এদের থামাব কি করে? আওয়াজ মাঝেমাঝেই সমুদ্র গর্জনের মতো উঠছে, আর সেই সঙ্গে এদের মধ্যে থেকেই বেপরোয়া বক্তারও অভাব ঘুচে যাচ্ছে। কেউ কেউ উত্তেজিত লোকদের আরও উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু উত্তেজনার চেয়ে পেটের ক্ষিদে যে বড়, সেটা আমার মাথায় ছিল। সুতরাং কৌশল হবে কালক্ষয় করা। এইভাবে বারোটা-একটা নাগাদ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই সামলে দেওয়া যাবে। অতএব—

অতএব আমি বক্তৃতা করতে লাগলাম। কে একজন একটা চোঙ আমার হাতে দিল। তাতে মুখ লাগিয়ে যে সব আপাত সত্য কথা বললাম, তার যে ষোল-আনাই মিথ্যে, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। এই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, সুবিধাবাদী নেতারা কিভাবে অনর্গল বানানো মিথ্যা পরম সত্যের মতো জোর দিয়ে বলে যেতে পারে এবং কিভাবে তারা 'ম্যানেজ' করে। গ্লানি এবং ধিক্কারে আমার মন ভরে গেল। ভিখু, তুমি যদি সেখানে থাকতে, দেখতে পেতে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা প্রহসনে পরিণত হওয়া কত মর্মান্তিক!

যা ভেবেছিলাম তাই। দুপুরবেলা তিনভাগ লোক চলে গেল। বাকী যারা রয়ে গেল তারা অধিকাংশ আশপাশের গ্রামের লোক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু এমন সময়ে মূর্তিমান আর এক দুর্ভোগ এসে দেখা দিল।

উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত ব্যক্তি এসে হাজির। তাঁর নামধাম করতে চাইনে,— কারণ যে কাণ্ড তিনি করেছেন তা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অতি লজ্জাকর। কলকাতায় লোকটিকে দেখেছি, অল্পবিস্তর পরিচয়ও ছিল, খাঁটি লীগের লোক। এখানে এসেই শুনেছিলাম লোকটি সপ্তাহ দুই আগে এই এলাকায় প্রচণ্ড এক দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিলেন। হিন্দু মুসলিম কৃষক সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন দুই ক্রুদ্ধ জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন আজকের আত্মগোপনকারী নেতৃদ্বয়। তারপর তেভাগা শুরু হতেই কৃষকদের মধ্যকার ফাটল যখন জোড়া লেগে গেল, তখন উল্টোদিকে হিন্দু মুসলমান জোতদাররাও মিশে গেল ঝাঁকের পাখির মতো। আজ যিনি এসে উপস্থিত তাঁকেও জোতদাররাই পাঠিয়েছে কৃষকদের ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কৃষকদের স্তিমিত ক্রোধ তাঁকে দেখে আবার বেড়ে উঠল। আর কৃষকরা এতক্ষণ পর একটা কিছু নাগালের মধ্যে পেয়েছে। সববাই তাঁকে ঘিরে ধরল। কি করে তিনি গুলির খবর পেলেন? তিনি তো থাকেন দূরে শহরে। তাহলে গুলি চালানোর আগেই জোতদারেরা নিশ্চয় তাঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। লিগনেতা কৃষকদের এতগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। আর তাঁর পিঠের উপর কৃষকরা তখন সড়কি আর বল্লম উঁচিয়ে ধরেছে।

— দিই ব্যাটাকে শেষ করে। আপনি হুকুম দেন।

আমি জবাব দিলাম— এই যদি তোমরা কর, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

হঠাৎ সেই লিগনেতা কেঁদে ফেললেন, আর সেইসঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন— আপনি বাঁচান আমাকে।

আমি কি স্বপ্ন দেখেছি। এর নামই কি শ্রেণী সংগ্রাম? কিন্তু আমি যে কাণ্ড করলাম তা নিতান্তই মোলায়েম। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে ধরে বললাম,— আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।

তিনি তক্ষুনি সানন্দে জোতদারদের গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর অপসৃয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে আমার মনে হল, কেন কঠিন হতে পারলাম না। এদের মতো লোকেরাই তো দুর্ভিক্ষে মানুষ মেরেছে, আর এখন লোক একটা আন্দোলনের পথে এগুতে চাইছে বলে তাদের গুলি চালিয়ে মারছে। লোকটা যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই তো মৃত্যু। তবুও লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া কেন? আব আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি বলেই যে কৃষকরাও ছেড়ে দিয়েছে তাও তো ঠিক নয়। এত যে রাগ, তবু তারা মানুষের গায়ে সহসা হাত দিতে চায় না। আজ যে জোতদারদের গ্রাম জ্বলেনি, মানুষ মরেনি, তাতে তো তাদের একটুও নিরানন্দ দেখছি না, বরং তারা শেষ পর্যন্ত কি ব্যাপারটা এড়াতে পেরে খুশিই হয়নি? হিংস্রতা তো তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মাটির বুকে সন্তানের মতোই যত্নে তারা ফসল ফলায়। তবু আমি জানি ক'দিনের মধ্যেই আসবে আরো বন্দুক, আরো পুলিশ, জোতদারদের আরো গুণ্ডার দল। কিন্তু তার চেয়েও যে আরো কিছু ভয়ঙ্কর ঘটতে পারে, তখন তা কি ভেবেছিলাম?

বাংলাদেশে কৃষকদের জয় না হলে জাতি দুই টুকরো হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দাঙ্গার কলকাতা থেকে বেরিয়ে তো স্পষ্টই দেখলাম, ভাঙ্গা কি করে সহজে জোড়াও লাগে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, বাংলাদেশের সাহিত্যিক নাট্যকার যাঁরা এত করে সাম্প্রদায়িক মিলন চেয়ে এসেছেন, তাঁরা হয়ত আসল জায়গায় হাত দিতে পারেননি। কিন্তু আজ আর তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। কারণ কৃষকের জয় নামক বস্তুটার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছু জড়িত। সেদিন নিকট দূরে বহু শক্তি তাকে পিষে মারার জন্য তৈরি ছিল। তবু এর আর একটা দিকও ভাবতে ইচ্ছে করে। সময়টা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের বছর। কিন্তু স্বাধীনতার ছায়াটুকু যে কতদূরে তা কেউ জানত না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা অনির্দেশ উত্তেজনার ঢেউ বইছে। অন্তত কল্পনা করতে দোষ নেই যে, সেদিন ষাট লক্ষ কৃষক অন্যান্য বহু লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিলে দৃঢ়পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে বাংলাদেশের অন্য চেহারা হত— এসব এখন ভেবে লাভ কি? তখন সব ভাবনাই

ছিল অস্পষ্ট। শুধু তখন মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে, এসব কথা বড় বড় শহরের বড় বড় মাথাওলা নেতারা কি আর ভাবছেন না! তাঁদের উপরই ভার দিয়ে বসেছিলাম।

সরল বিশ্বাসের এই এক দোষ। কিন্তু ভিখু, তুমি কি এইসব বকুনির বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছ? পারলে সরল বিশ্বাস নামক দ্রব্যটা ত্যাগ করো! ওতে শুধু ভগবানই মেলে, আর কিছু না। তোমার আজ বয়স হয়েছে, ঘাড়ের উপরের মাথাটা দিয়ে কি কিছু ভাববে না?

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ডিমলা ত্যাগ করলাম। পথে কয়েকজন কৃষকের বাড়িতে বসতে হল। তাদের আমি চিনি না, কিন্তু তারা আমাকে একদিনের মধ্যেই চিনেছে। তাদের মুখ আমার আজ মনে নেই, কিন্তু সেদিন বিদায় নেওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের চোখেই জল দেখেছিলাম। এমন কি সুকৃতি আমি করেছি, যাতে এতটা আশা করতে পারি? কিন্তু মানুষ মানুষের বন্ধু হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আমার চোখের জল আসেনি; এরা আমাকে দেখলেও এদের তো আমি ব্যক্তি হিসাবে দেখিনি। এরা সারাদিন আমার চোখে সমষ্টির মধ্যেই মিশে ছিল! আমার বরং এদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কারণ জানি— দুদিন পরেই এদের উপর আসবে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ। ভিখু, এরপর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। বেশ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত কাটানো গেল। একদিন সকালে চা খেতে খেতে কাগজের প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই দেখি খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে আঠারো জন নিহত। আর অনেকে আহত হয়েছে।

কলকাতা থেকে ডাক্তারসহ কয়েক ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা দুদিন পরে ফিরে এলেন। পুলিশ তাঁদের ঐ এলাকায় ঢুকতে দেয়নি।

তখন আমার কাছে প্রস্তাব এল, আমি ঐ এলাকায় অন্য কোনো পথে ঢুকতে পারি কিনা। আমি সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে ছবিটা স্পষ্ট ছিল। বালুরঘাট স্টেশনে নেমে খাঁপুর যেতে হয়— মাত্র কয়েক মাইলের পথ। এই পথটাই পুলিশ আটকে রেখেছে। কিন্তু বালুরঘাট ছাড়িয়ে ফুলবাড়ি স্টেশনে যদি নামা যায় তাহলে মাইল দশেক হেঁটে হয়তো পিছন দিক দিয়ে খাঁপুরে ঢোকা যেতে পারে! এতেও পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এছাড়া অন্য পথ নেই। তবু ভাগ্যিস আমি রাজী হয়েছিলাম, নইলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।

আমি আবার সেই স্টেশনে নামলাম যার কাছে একদিন দার্জিলিং মেল থেমেছিল। আমি আবার সেই মাঠ দিয়ে হাঁটলাম যেখানে একদিন নিশান উড়িয়ে ধান কাটা হয়েছিল। আমি আবার সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম যেখানে এক সময় দিবারাত্র উৎসবের বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু এবার কেমন যেন সব নিঃঝুম। দুই একটা আধা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল, তারা পাশ কাটিয়ে গেল। ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে ছইওয়ালা একটা গরুর গাড়ি আসছে।

কাছে এসে থামতেই দেখলাম বসে আছেন কালী সরকার। তাঁর মুখচোখ শুকনো। আমাকে দেখে বললেন— আপনি! ও বুঝেছি।

কালী সরকারের শ্বশুরবাড়ি খাঁপুরে। গুলি চলার সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাপের বাড়ি। তারপর তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন কিছু দূরের একটা গ্রামে। এখন সেখান থেকেই স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসছেন আমাদের কালী সরকার। তাঁর কথা শুনে মনে হল না খাঁপুরে ঢোকা যাবে!

মাইল সাতেক হেঁটে সন্ধ্যার মুখে যে গ্রামে আশ্রয় পেলাম, সেখানে খাঁপুরের আরো কয়েকজনকে দেখলাম। তারা আত্মীয়-স্বজনর বাড়িতে স্থান পেয়েছে। পরিচয় হল প্রৌঢ় নীলকণ্ঠ বর্মনের সঙ্গে। ভিখু, তুমি তাকে নিশ্চয়ই চেন। এঁর স্ত্রী যশোদা বর্মন খাঁপুরে মারা গেছেন। পরদিন সকালবেলা এই শোকাচ্ছন্ন প্রৌঢ় মানুষটি আমাকে খানিক দূরে এগিয়ে দিলেন। তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালেন, ঐ যে গ্রাম দেখছেন, ওর পাশে আড়াআড়ি যে মাঠটা, সেটা পেরুলেই খাঁপুর। আমার আর এগুতে সাহস হচ্ছে না, আমি যাই।

নীলকণ্ঠ বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে কে যেন একজোড়া নতুন চটিজুতো কিনে দিয়েছে। সেটা পায়ে দিয়ে মাথা নীচু করে নীলকণ্ঠ ফিরে যাচ্ছেন, আর আমি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। নীলকণ্ঠ সহজে এলাকা ছাড়েননি। গুলি চলার পরেও কয়েকদিন আশেপাশেই ছিলেন, আর প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে তাঁকে শীত অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে এসে সটান শুয়ে পড়তে হত। কারণ পুলিশ হানা দেয় শেষ রাত্রেই।

আমি চলেছি একা। আশেপাশে অনবরত দৃষ্টি ফেলছি। আশ্চর্য, চোখে একটা লোক পড়ল না। মাঠ জনশূন্য, কেউ কোথাও কোনো কাজে আসেনি।

ক্রোশ খানেক এগিয়ে যে গ্রামে ঢুকলাম, সেখানেও সব নিস্তব্ধ। একটা সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিতে যাব— কেউ আছেন? এমন সময় তুমি কোত্থেকে এসে আমাকে দেখে বললে, আপনি কে?— তোমার কাছ থেকেই শুনলাম ঐ গ্রামেরও পুরুষ মানুষ সব পালিয়েছে।

এইখানে বলে রাখি, এতকাল পরে তোমাদের রাজবংশী কৃষকের ভাষা বেমালুম ভুলে গেছি। যাই হোক আমার সব কথা শুনে তুমি বললে, খাঁপুরে যদি ঢুকতে চান, এই তার সময়।

— বলো কি? এই দিন দুপুরে? খোলা মাঠ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে না?

— আমি তো দুপুরবেলাতেই গিয়েছিলাম সেদিন। এই সময়টা কেউ সন্দেহ করে না।

— কেন বলো তো?

— এই সময় কেউ আসতে পারে, পুলিশ ভাবতেই পারে না।

— কিন্তু পাহারা তো দেয়?

— না, কোন পাহারা থাকে না। সববাই তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যায়।

— তুমি ঠিক জানো?

— হ্যাঁ।

— তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

— হ্যাঁ।

— তোমার ভয় করবে না?

— আমার ভয় কিছু করে না, তবু মা শুধু বকে।

— তাহলে তোমায় যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

— না, আপনি সব চিনতে পারবেন না। ওরা টের পেয়ে যাবে। আমি হেসে বললাম— পেলেই বা।

— ওরা ধরতে পারলে খুব মারে।

— আমাকে মারবে না।

তুমি তবু আস্তে আস্তে বললে— আমি যাব আপনার সঙ্গে, আপনি কতদূর থেকে আসছেন।

তুমি আমার হাত ধরে টানতে লাগলে, চলুন নইলে মা টের পাবে, আমাকে যেতে দেবে না।

আমি তোমার সঙ্গে মাঠে নামলাম। হাঁটছি আর মনে হচ্ছে আমরা দুজনে যেন চক্রান্তকারী। আমরা পুলিশকে জানান দিয়ে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি লুকিয়ে। এক নিষিদ্ধ স্থানে ঢুকতে যাচ্ছি, পিছনের দরজা দিয়ে।

এই সর্বপ্রথম আমার মনে হল, আমি যেন কৃষকদেরই একজন। আগে আমি আন্দোলন দেখেছি একজন দর্শক হিসাবে। তাদের প্রতি আমার অগাধ সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমি আর তারা আলাদা। এমন কি ডিমলায় যখন হাজার হাজার কৃষক আমার ওপর অমন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তখনও কে যেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক অবরুদ্ধ গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছি।

আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের এই খাঁপুর যাত্রার সময় সব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এখন আর সেই সভা-শোভাযাত্রা নেই। লাল নিশানের ক্ষীণতম ইশারাও লুপ্ত। চারিদিকে সব

চাঞ্চল্য থেমে গেছে। সব আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। শুধু একটা বীভৎস ভয় বিরাজ করছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। হাজার হাজার মানুষের উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন শস্যশূন্য মাঠ, ভাষাশূন্য গ্রাম। যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে গেছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদায় নিয়েছে, পিছনের সাজঘরও নীরব, দর্শকের আসনগুলিও ফাঁকা।

এই অবস্থায় একজন নির্ভীক বালক এবং একজন তরুণ সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে দেখছিল। পিছনে মৃত্যু, সামনে নিষ্পেষণের যন্ত্র, আর মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য। তখন আচমকা মনে পড়ে গেল, তেভাগা আন্দোলনের প্রথম দিকে একজন আমায় কোলে করে শীতল জলের ছোঁয়া থেকে আমার পদযুগলকে রক্ষা করেছিল, আর আজ খাঁপুরে এগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন বয়স্ক লোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাঠের ওপার থেকে গান ভেসে এল! তুমি আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বললে, পুলিশেরা রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মাইল দুই দূরে লাউড স্পিকারের ধ্বনিতরঙ্গ এমনভাবে এসে কানে ধাক্কা দিতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা কি রোজই বাজায়?

— হ্যাঁ, প্রায় সব সময়। খাসি মেরে মেরে খায়, আর রেকর্ড বাজায়, আর তাস খেলে।

— খাসি পায় কোথায়?

— সব গ্রাম থেকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। আর জেলে এনে পুকুর থেকে সব মাছ ধরে।

গ্রামের কাছে এসে দেখি এপাশটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরেছে। বহু কষ্টে সেটা পার হয়ে তুমি আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বেশ গরম বাতাস দিচ্ছে। গ্রামের মধ্যে টুঁ শব্দ শোনা যায় না, কেবল ঝরা পাতা মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়ায় সরসর করে মাটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস থেমে গেলে সব নীরব। একটা মস্ত গোয়ালঘরের পাশে যেতেই পরিচিত একটা শব্দ কানে এল— গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কিন্তু জাবর কাটার এই ধরনের কোরাস কখনো আমি শুনিনি। কৌতূহলবশে গোয়ালঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গোটা কয়েক গরু চোখ বুজে মুখ নাড়ছিল, আমাদের পায়ের শব্দে নির্বোধের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, কারা এদের ঘাস জল দেয়?

— পুলিশ কটা রাখালকে ধরে এনেছে।

আমি বললাম, চল ভিতরে ঢুকি। বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। তকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠান এবং ঘরগুলি। কোথাও একটু মালিন্য নেই। শুধু কিছু শুকনো ঝরা পাতা পড়ে আছে।

এইভাবে অনেকগুলি বাড়ির ভিতরে ঢোকা গেল, বেশির ভাগ বাড়িতেই লোকজন নেই। শুধু দু একটা বাড়িতে বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে স্ত্রী কণ্ঠে ভয়ার্ত আওয়াজ শুনলাম— কে? কে?

তুমি আমার হাত টিপে দিলে, অর্থাৎ যেন শব্দ না করি। আমার ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠবে, কিন্তু সারা গ্রামে কেন একটা কুকুর দেখলাম না। অবশেষে তুমি আমাকে একটা বাড়ির উঠোনে এনে দাঁড় করিয়ে চাটাইয়ের দরজা ঠেলে ভিতরে গেলে। খানিক পরে তোমার সঙ্গে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। বুঝলাম এই বুড়ির সঙ্গে তোমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়।

বুড়ি হাত নেড়ে আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল, তুমি কার ঘরের ছেলে বাবা! কেন এই রাক্ষসপুরীতে এসেছ, পালাও শিগগির! নইলে এরা মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে আমার পা শিউরে উঠল। বাল্যকালের কোন রূপকথা শুনতে শুনতে যেন এইরকম এক বুড়ির কল্পনা করেছিলাম, আর তার মুখের ভাষাও যেন এইরকমই ছিল। আজ বাস্তবে তার নমুনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হল রূপকথার গল্পকারেরাও বোধ হয় এমনি করে অবরুদ্ধ জনপদের অভিজ্ঞতাই কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করেছিল। তাতে থাকত রাজকন্যা রাজকুমার তেপান্তরের মাঠ, জীয়ন কাঠি মরণ কাঠি। বুড়ি উঁচু দাওয়ার উপর বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,— আমাদের তুমি দেখতে এসেছ! আহা মায়ের বুকে ফিরে যাও বাবা, নইলে এরা তোমাকে খুন করবে বাবা।

বুড়ি ফিসফিস করে আরো কত কি বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তির করে বলল— পালাও!

আমি বললাম,— এই ভিখু তো প্রায়ই আসে, তাকে বারণ কর না কেন?

— ও কিছুতেই শোনে না, একদিন ছোঁড়া মরবে।

তুমি আমাকে বললে, ওদের স্নান বোধ হয় হয়ে গেল, এবার জলদি চলুন!

আমি ভেবে পেলাম না এই গ্রাম থেকে আর কি খবর সংগ্রহ করার আছে। আরো কিছু শূন্য বাড়ি আর ঝরাপাতা দেখবো শুধু। এর জন্যই এত পথ আসা?

তবু এঁকে বেঁকে পা টিপে টিপে গ্রাম পার হতে হল। আগের মতোই কাঁটাতারের

বেড়া পার হলাম। হঠাৎ পিছনে একটা গুলির শব্দ! আমরা প্রাণপণে ছুটলাম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম। কই কেউ তো তেড়ে আসছে না। গুলিটা আমাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়েছিল অথবা ঘুঘুজাতীয় পাখি মারাই তার লক্ষ্য ছিল, তা আমি আজও জানিনে। যে গুলি করেছে সে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ওটা যদি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে, সে কি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য? মাঠের মাঝখানে এসে দুজনে থামলাম। তখন বিনা কারণেই বোধ হয় আমাদের চোখেমুখে দিগ্বিজয়ের আনন্দ ছিল। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, ব্যাটাদের ফাঁকি দেওয়া গেল।

আমি বললাম,— ভালোই। কিন্তু পিঠে গুলি লাগলে লোকে কি আমাদের বীর বলত?

তুমি সেকথায় কানই দিলে না। তুমি নাম ধরে ধরে কত লোক সম্পর্কে কত কথা বলতে লাগলে। কে কোন গ্রামে পালিয়ে আছে, কার পরিবারের কে মরেছে, প্রথম দিন কী হয়েছিল— এমনি অজস্র কথা। এক সময় তোমাদের গ্রামে এসে পড়লাম। তোমাকে বললাম,— এবার তুমি বাড়ি যাও, আমি চলি।

তুমি বললে, ঐ বাবলাগাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। তারপর সে গাছটা ছাড়িয়েও যখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে থাকলে তখন আমি বললাম,— আর এসো না, এবার যাও।

হঠাৎ তুমি বললে,— আপনার তেষ্টা পায়নি?

— পেয়েছে। সামনের গ্রামে গিয়ে জল খাব।

— না, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে জল নিয়ে আসছি।

পাশেই একটা মরিচের ক্ষেত। চারপাশে উঁচু মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে কয়েকটি বাবলাগাছ যেন আমার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। তাদের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। বসে বসে তোমার ক্ষুদ্র মূর্তিটি ক্ষুদ্রতর হতে হতে হঠাৎ আমার মনে হল এই রকম এক একটি বালকই কি প্রাচীন কবিদের কখনো ধ্রুব, কখনো নচিকেতা, কখনো বা প্রহ্লাদ চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে? হয়ত নিষাদপুত্র একলব্য এইরকম কোন গ্রাম থেকেই দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল!

একটু পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার তেমনি করে দৌড়ে আমার দিকে এলে, তোমার গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

তেষ্টা পাওয়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে এবার বুঝলাম। মায়ের ভয়ে তোমাদের বাড়িতে ভাত খাওয়ানোর কথা বলতে পারনি। মুড়ি-মুড়কি আনা যাবে কিনা, তাতেও হয়ত তোমার সন্দেহ ছিল। এখন তুমি কোঁচড়ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড় এনেছ। হাতে পিতলের

ঝকঝকে মাজা বদনায় শীতল জল। খেতে খেতে এবার তোমাদের সংসার এবং গ্রামের অনেক খবর শোনা গেল। বিদায় নিতে গিয়ে বললাম,— আচ্ছা এবার যাই কেমন?

তুমি বললে,— আবার আসবেন!

— আসব।

তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কারণ তুমি আমার কথা সরল অন্তঃকরণ বিশ্বাস করছিলে। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিনি। আমার মনে পড়ল, ইতিপূর্বে কত জায়গায় কতজনকে বলেছি, আবার দেখা হবে। কিন্তু তাদের কতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে? অথচ এমনি করেই সারা জীবন বলতে হয়। তোমাকেও বললাম। আর মনে মনে এও জানি, কোন দিন দেখা হলে এই তুমি তো সেই তুমি থাকবে না।

আমি কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তুমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ। আমি যতই হাঁটছি, ততই বুঝতে পারছি আমার পিঠের উপর তোমার দৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। আমি আর তাকাতে সাহস করলাম না।

তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কলকাতায় কত চায়ের দোকানে 'বয়রূপী' কৃষক বালকদের মুখের দিকে তাকিয়ে কতবার তোমার কথা মনে পড়েছে। মাঝে মাঝে ওদের কারো মুখে হয়ত তোমার মুখের আদল লক্ষ্য করে চমকে উঠেছি। হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হলেও সেই পুরনো দিনের বালকটিকে দেখতে পাব না, কালের স্রোতে তোমাকে আজ যৌবনে উত্তীর্ণ করেছে। তবু তুমি এই সতের বছর ধরেই আমার চেতনায় বালকবেশে সেই মাঠের মধ্যেই একা দাঁড়িয়ে আছ।

তুমি যেন আমাদের এই বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের কৈশোর অবস্থার প্রতীক!

কতকাল ধরে কত ধার্মিক ভক্তকে বৃন্দাবনের এক বংশীধারী কিশোর মাতিয়ে রেখেছে। আমার মতো ঘোর নাস্তিককে না হয় মাতিয়ে রাখুক তোমার মতো এক রাজবংশী চাষার ছেলে।

তুমি বেঁচে আছ, কিন্তু তোমার যৌবনের দিনগুলি নিদারুণ রুক্ষ ধূসর পথ পার হতে হতে এমন কোথায় এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তোমার বুকের মধ্যেকার সেই সাহস এখনো অক্ষয় আছে কিনা, এসব আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, যতদিন কৃষক তার মুক্তি খুঁজে না পায়, ততদিন আমারও মুক্তি নেই, ততদিন বার বার তোমাকে আমায় খুঁজে ফিরতে হবে।

গাছটা বলেছিল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বুড়ি গিয়েছিল গাছটার তলায় পাতা কুড়োতে। গাছটা তাকে বলল, মর্ মর্ মর্! ভয় পেয়ে বুড়ি বাড়ি পালিয়ে এল আর মরে গেল।

আরও একটা বলার কথা পাতাকুড়ুনো ঝুড়িটা খ্যাংরা ঝাঁটাটা কুচুটে গাছটার তলায় পড়ে ছিল।

এমন ভঙ্গিতে পড়ে ছিল, যাতে সেই বুড়ির সহসা ভীষণ ভয় পেয়ে আর তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের তরুণ ডাক্তার বলেছিলেন, হার্ট অ্যাটাক। লোকেরা মুখ তাকাতাকি করেছিল। এক থুথুড়ে গাঁওবুড়ো বলেছিল, কোনও-কোনও গাছ কথা বলে। কোনও কোনও গাছ রাগী, কুচুটে আর নিষ্ঠুর হয়।

কিন্তু গাছেরা কি কথা বলে? বলতে পারে?

বুড়ো বলেছিল, পারে। তারা বাতাসের ভাষায় কথা বলে। ওই গাছটা বলেছিল।

আর তরুণ ডাক্তার শহরের মানুষ। তিনি নিজেকে ভাবতেন নির্বাসিত। দুদিন তিনদিন অন্তর তাঁর শহরের প্রেমিকাকে বিষাদপূর্ণ প্রেমের চিঠি লিখতেন। তিনি নিজেকে মেঘদূত কাব্যের বিরহী যক্ষ ভাবতেন। তাই ক্রমে, অবশযে তিনি প্রকৃতিমুখী হয়েছিলেন। হার্ট অ্যাটাক কথাটি বলার পরও সে-কারণে তাঁর একটু কৌতূহল জাগে। লোকজনের সঙ্গে গাছটার তলায় যান। পড়ে থাকা ঝুড়ি আর খ্যাংরা ঝাঁটার ভঙ্গিতে একজন মানুষের ত্রাসের টাটকা ছাপ আবিষ্কার করেন। তারপর গাছটার দিকে মুখ তুলে তাকান। উঁচু আর ঝাঁকড়া গাছটাকে ভয়াল জৈব মনে হয়। পারিপার্শ্বিক অন্যান্য গাছ থেকে ভিন্ন চরিত্রের এক সতেজ গাছ। এও মনে হয়, এমন কোনও গাছ তাঁর অভিজ্ঞতায় নেই। অন্যমনস্ক, ঈষৎ ভীত সেই তরুণ ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে ফিরে যান। কিন্তু তিনি গ্রামীণ মানুষ ছিলেন না বলেই বৃক্ষলতার নিজস্বতা থাকা সম্ভব, এটা তাঁর ধারণায় ছিল না। তবে ভারতীয় অবচেতনাবশে ফেরার পরও কতক্ষণ তাঁর চিন্তা ছিল, গাছটা বাতাসের ভাষায় তাঁকেও কিছু বলেছে কি না। আসলে তাঁর সামনে বিশাল যৌবন, অতৃপ্ত প্রেম। তাঁর হারানোর মতো অনেক কিছুই ছিল, যা এক পাতাকুড়ুনি গাঁওবুড়ির ছিল না।

আর তখন ছিল বসন্তকাল। হেমন্তের শেষ থেকে যে-সব গাছের পাতা ঝরে গিয়েছিল, তারা সবুজ উজ্জ্বল পাতায় জাঁকালো হয়েছিল। আর আধুনিক কৃষির কৃৎকৌশলে চারদিকে ভূপৃষ্ঠে গাঢ় শ্যামলতা। এ ছিল এক তীব্র লাবণ্যের কাল। এমন একটা কালে মৃত্যু অপ্রত্যাশিত

উপদ্রব। পাতাকুড়ুনি বুড়িরও আশা ছিল এবার সে ফসলের শিস কুড়ুতে মাঠে যাবে। কিন্তু মারাত্মক গাছটা নির্দয় বাতাসের ভাষায় তাকে বলেছিল, মর্ মর্ মর্। দারুণ ভয় পেয়ে সে মরে গিয়েছিল।

গাছেরা কথা বলে। গাছেরা বাতাস থেকে ভাষা শেখে। তাই বলে মানুষের ভাষা?

প্রাচীন মানুষ সেই প্রাজ্ঞ গাঁওবুড়ো বলেছিল, কোনও-কোনও পাখি যেমন মানুষের ভাষা শেখে, কোনও-কোনও গাছও মানুষের ভাষা শেখে।

কিন্তু সত্যিই কি গাছটা বুড়িকে বলেছিল, মর্ মর্ মর্?

গাঁয়ের সেরা অবিশ্বাসী, সতত উন্নাসিক আর সিনিক এক প্রৌঢ় প্রশ্নটি তোলে। শোনা যায়, তার সিনিসিজমের উৎস ছিল গাঁজা। যার ফলে অলৌকিকের লৌকিকতা অসহ্য হয়।

বুড়ির ছেলের বউ কেঁদে-কেঁদে চিড় খাওয়া গলায় কীভাবে তার শাশুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকেছিল, আর ধপ করে দাওয়ায় বসে জল চেয়েছিল, আর বলেছিল, ও বউ, আমি তবে মরি, কোন না মুখপোড়া গাছটা আমাকে বলল মর্, মর্ মর্, আর জলের গেলাসটা হাত থেকে পড়ে গেল, তার শাশুড়িও হেঁচকি তুলে সিঁটিয়ে পড়ল, ইনিয়ে-বিনিয়ে পুরো ঘটনাটি শুনিয়ে দেয়। সে অসংখ্যবার শপথবাক্যও আওড়ায়। হু হু করে চাপা শান্ত কান্না কাঁদতে থাকে, যদিও আর কান্নাকাটি নিষ্ফল ছিল।

সিনিক প্রৌঢ় নাক কুঁচকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে গাছটার তলায় যায়। চির-অবিশ্বাসী চোখে গাছটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। সে তার বহু লালিত বদ্ধমূল অবিশাসকে চাঙ্গা করতে পড়ে থাকা ঝুড়িটাকে যথেচ্ছ লাথি মারে। ভাঙচুর করে ছুঁড়ে ফেলে। খ্যাংরা ঝাঁটাকেও গাছটার গুঁড়িতে প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকে। বলে, এমন তো হওয়ার কথা ছিল। এমনটি হওয়ার কথা ছিল না।

আসলে তার চিরকালীন ধারণা এই ঘটনায় চোট খেয়েছিল। ধারণার অবস্থা হয়েছিল লেজে পা পড়া গোখরোর মতো। ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত এক মানুষগোখরোয় রূপান্তরিত সে। গাছটাকে শাসাচ্ছিল। মল্লযুদ্ধের ভঙ্গি করছিল। ভাঙা গলায় গর্জন করছিল, বল একবার মরার কথা। বলেই দ্যাখ্। যদি তোর সাহস থাকে, আমাকে একবার বল্, মর্, মর্ মর্।

আর সহসা মাঠের দিক থেকে একটা বাতাস এল। পারিপার্শ্বিকে, বৃক্ষলতায় আলোড়ন শুরু হল। তার তারপরই গাছটা শনশনিয়ে সত্যিই বলল, মর্ মর্ মর্।

চির অবিশ্বাসী লোকটি থমকে গেল। নিজের কানকেও তার অবিশ্বাস। অলৌকিকতার এ লৌকিকতা দুঃসহ। সে ক্লান্ত ততক্ষণে, অতিশয় আচ্ছন্ন সে, পুনঃ গর্জনের চেষ্টা করল, আবার বল্! আর গাছটা আবার বলল, মর্ মর্ মর্!

সে গাছটার গুঁড়িতে লাথি মারতে গিয়েই পড়ে গেল। মরে গেল।

লোকেরা পরে আবিষ্কার করে তার মুখের কষায় চাপচাপ রক্তাক্ত ফেনা। ঠিকারানো লাল চোখ। চিত হয়ে পড়ে আছে স্পন্দনহীন এক নশ্বর মানবশরীর।

তবে তার সেই শরীরে চির অবিশ্বাসের সমস্ত ছাপ খুব গাঢ় হয়েই ছিল।

।। ২।।

এ যাবৎ বেশ কয়েকটি গাছের গল্প বলেছি। সেই গাছগুলি জৈব চরিত্রের। তাদের কেউ-কেউ ভয়াল কি নিষ্ঠুর হলেও কেউ-কেউ ছিল দয়ালু সহৃদয়। কেউ জীবন আর পৃথিবীর একটা চমৎকার মানেও বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। এই গাছটার মতো তারা কেউ-ই মানুষের ভাষায় কথা বলেনি।

গাছ অনন্ত মৌনের সুন্দর প্রতীক। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত (যাঁর কথা আমি শুধু ছোটদের গল্পে বলেছি) অনেক পরে একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় আছে। মানুষের ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো। এই যে গ্যালাক্সির মধ্যে আমরা আছি, তার উল্টো একটা গ্যালিক্সও আছে। আয়নার ভেতর যেমন নিজেকে উল্টোমানুষ দেখতে পান, সেই রকম। কাজেই শব্দ যখন আছে, শব্দহীনতাও আছে।

শব্দহীনতাই মৌন। কিন্তু আয়নার কথা উঠলে বলব, একটি বল কিংবা গেলাসের উল্টো আছে কি?

চন্দ্রকান্ত দ্রুত বলেন, গড়ন অসমানুপাতিক হওয়া চাই। শব্দ অসমানুপাতিক।

মৌন?

হুঁউ। সেও অসমানুপাতিক গড়নের। ওই বৃদ্ধকে লক্ষ করুন। মৌনে রুক্ষতা দেখুন। আর দেখুন ওই তরুণকে। মৌনে মধুর হাস্যময়তা। ব্যাপারটা হল, পদার্থবিজ্ঞানের 'ল অব প্যারিটি' আপনার বিশদভাবে পড়া উচিত।....

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত এ রকম বলেন। তবে এটা ঠিকই, বৃক্ষেরা মৌনের প্রতীক। সেই মৌন যে সত্যি অসমানুপাতিক গড়নের, তাও ভুল কথা নয়। কিন্তু এই গাছটা, যার মৌন ছিল না শুধু তা-ই নয়, মানুষের ভাষা নকল করার ক্ষমতাও ছিল, কী বিপজ্জনক আর কী চিন্তাযোগ্য উদ্ভিদ, বলার নয়।

এই মারক জৈব উদ্ভিদটি ছিল আমাদের গ্রামের নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড্ সদৃশ জমিতে। কারণ একদিকে মুসলমানপাড়া, অন্যদিকে, হিন্দুপাড়া মাঝখানে পোড়ো, কাছিমের পিঠের গড়ন, আগাছা ঢাকা একটুকরো মাটি। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাতায়াতের রাস্তাটি ছিল তার নীচের দিকটায়। গাছটা ছিল একেবারে কেন্দ্রে। কখনও কেউ তাকে বিস্ময়কর ভাবেনি। সে কারও চিন্তার উদ্রেক করেনি কোনও দিনও। তার চেহারার জৈবতাও ধরা পড়েনি কোনও চোখে। গ্রামের আরও পাঁচটা সচ্চরিত্র গাছের মতো সেও ছিল একটি গাছ। কখনও রাখালেরা কি ছাগলচরানী মেয়েরা তার ঘনিষ্ঠ হত। তাকে বুড়ি করে খেলত সেই সব নিরক্ষর ক্ষুৎকাতর বালক-বালিকারা। আর গাছটা ছিল ফলহীন। কোনও ফুলও ফুটতে দেখা যায়নি তার ডালপালার ডগায়। তবু ওই বালক-বালিকারা তাকে ভালবাসত।

গ্রামের মানুষজন বৃক্ষলতা ভালবাসে। কিন্তু সকলকার নাম জানে না। বিশেষ করে

এমন একটা ফুল-ফলহীন বন্ধ্যা গাছের নাম কি জাতবিচার নিয়ে মাথা ঘামানোরও মানে হয় না।

আকন্দ-ফণিমনসা-কেয়া কালকাসুন্দের থরে-বিথরে প্রসারিত সজ্জার কেন্দ্রে এক সংহত উন্নত গাছ। নীচের রাস্তা দিয়ে জ্যোৎস্নার রাতে যেতে যেতে দৈবাৎ তাকিয়ে দেখেছি। সারা শরীরে চন্দ্রচূর্ণমাখা উজ্জ্বল সে। রহস্যময় সৌন্দর্য। নর নও, নারীও নও। তুমি কি বৃহন্নলা অর্জুন?

তো আমাদের পাড়াগেঁয়ে পৃথিবীতে এক সময় অসংখ্য ভূত ছিল। ভূতিনী ছিল। যোজনার করুণা আর জনপ্রতিনিধির তদবিরে বিদ্যুৎ আসে। ফলে ভূতেরা ভূতিনীরা এত ধারালো আলোর ঘা সইতে না পেরে কে কোথায় পালিয়ে যায়! ভোটকুড়ুনো রাজনীতি রীতিমতো বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের বাচ্চা প্রসব করে। এতে বুড়ো-বুড়িরা খুব চটে গিয়েছিল বটে; কিন্তু ওই বাচ্চাটি তত কিছু উপদ্রব বাধায়নি। পুজোআচ্চা, মিলাদ-ইদ-মুহররমের ধুমধাড়াক্কা বরং বেড়ে গিয়েছিল। মাইক্রোফোনের প্রচণ্ড নাদগুলি বস্তুতন্ত্রেই জয়জয়াকার। ভূত-ভূতিনীদের পালানোর এও কারণ। নো-মানস-ল্যাণ্ডটির গাছটিতে কোন অশরীরী আত্মার বসবাস হয়তো ছিল। কালক্রমে সেও পালিয়ে যায়, যদিও ওই গাছে তার এমন কোনও বসবাসের কথা শুনিনি।

তার-মানে এই গাছটা ছিল গ্রামের একেবারে ফালতু জিনিস। গ্রাহ্যের মধ্যে নয়। কেউ তাকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। অনাথ, আতর, একলসেঁড়ে, নি-জেতে, মুখ্যুসুখ্য, হ্যাংলা এক গাছ। হায় হায়। কেউ তার ডাল থেকে কুলে আত্মহত্যাও করেনি।

গাছটি ছিল যথার্থ প্রোলেটারিয়েট, যার শৃংখল বলতে ভূগর্ভে গ্রোথিত শেকড়বাকড় যা ছাড়া আর তার হারানোর কিছু ছিল না। এ ব্যাখ্যা কারও মনঃপূত না হোক, আমি এভাবেই ব্যাপারটা ভেবেছিলাম।

তা হলে সহসা এক বসন্তকালের দুপুরে সে কি অনিবার্য বিপ্লব ঘটাল? সে এক পাতাকুড়ুনি বুড়িকে বলল, মর্ মর্ মর্! আর বুড়িও দিব্যি মরে গেল! এক চির-অবিশ্বাসী প্রৌঢ় তার সঙ্গে লড়তে গেল এবং সেও বেঘোরে মারা পড়ল।

সেই দিন সন্ধ্যার মুখে মরীয়া হয়ে, অথচ ভয়ে-ভয়ে, একটা জটিল মানসিকতায় আক্রান্ত আমি, গাছটির কাছে সাবধানে গেলাম। পুরনো স্থাপত্যের মতো গুল্মগুলির নির্মাণশৈলী। দিন-শেষে যেন কোনও বৌদ্ধ চৈত্য-পুঞ্জে অনুপ্রবেশ করছি। প্রকৃতই নির্বাণকামী। বলা দরকার, সেদিন আমি মনে-মনে মরতেই চেয়েছিলাম। বুড়ির মতো মরতে। কষ্টহীন শান্ত মৃত্যু। আমি চেয়েছিলাম, গাছটি আমাকে মর্ মর্ মর্ বলুক আর আমি তক্ষুনি সিঁটিয়ে মরে যাই। সেটাই নির্বাণ। কিন্তু কেন?

ব্যর্থ প্রেমে?

ধুস!

তা হলে কী?

জানি না। সত্যিই জানি না। মৃত্যু-ইচ্ছা বলে নাকি একটা ব্যাপার আছে। এক অতর্কিত মুহূর্তে নাকি জীবনের মানে হারিয়ে যায় হয়তো তা-ই। আসলে সারাটা দিন আমার মন ভাল ছিল না। কেন যেন মনে হয়েছিল, পিছু হটতে হটতে কিংবা সামনে যেতে যেতে একটা দেয়াল। আর এ. তো স্বাভাবিকই, যখন প্রিয়তমা নারী, সন্তানেরা, বইপত্তর, সঙ্গীত, খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি এ যাবৎ কোনও দুর্জ্ঞেয় কারণে নিজস্ব অর্থগুলি খুইয়া বসে, আর রাবীন্দ্রিক চূড়ান্ত প্রশ্নটি সামনে ফণা তোলেঃ 'কিন্তু কেন', তখন জীবন্মৃত্যু একাকার হ-য-ব-র-ল হয়ে ওঠে না কি? কোনও এক মুহূর্তে মনে হয় না কি সমস্ত সভ্যতা বারবার প্রকৃতির কাছে নতজানু হয়ে ভেঙে পড়ে?

গাছটির তলায় আচ্ছন্নতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দিনশেষের বাতাস জনমজুরের ক্লান্তিতে আড়ষ্ট, অতিশয় চুপ। প্রগাঢ় মৌন চারপাশে, এ এক দম আটকানো ক্রান্তি-মুহূর্তে, যেন পারমাণবিক অস্ত্রের উৎক্ষেপণকেন্দ্রে কাউন্ট ডাউন পর্যায় শুরু, এক......দুই....তিন....

কিন্তু কিছু ঘটছে না। গাছটার অসমানুপাতিক মৌন অসমানুপাতিক শব্দে রূপান্তরিত হচ্ছে না। বলছে না, মর্ মর মর্। আমি আশা করে তার দিকে তাকিয়ে আছি। সে চুপ। বৃহন্নলা! কথা বলো!

ডাইনে দূরে সিংহবাহিনীর মন্দিরে কাঁসরঘন্টা বাজল। বাঁয়ে দূরে মসজিদমিনার থেকে আজান ধ্বনিত হল। কোথায় বাজতে থাকল বাছুরের গলার ঘন্টা আর তার মায়ের হাম্বা ডাক। কোন বালিকা কোন পুকুরের দিকে তাকিয়ে তই তই করে হাঁসগুলিকে ডাকতে লাগল। নীচের রাস্তা দিয়ে নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে খাটিয়ে কিছু লোক চলে গেল। আর এইসব অসমানুপাতিক শব্দ আমাকে অন্যমনস্ক করায় গাছটার দিকে তাকিযে ভাবলাম তার মৃত্যুদণ্ড মিস করলাম না তো? সে কি ওই আলোড়নের মধ্যে মর্ মর্ ধ্বনি উচ্চারণ করেছে, আমি শুনিনি?

ম-ম-র ধ্বনি!

আরে তাই তো। অতি-অতি-অতি প্রাচীন এই ধ্বনি। এই ধ্বনাত্মক শব্দ প্রাকৃতিক ধ্বনির প্রতিফলন মানবিক ভাষায়। গ্রিক-লাতিন-ফা-র্সি সংস্কৃতি আরবিতে। মৃত্যুর পাশাপাশি সমান্তরাল হেঁটে চলা ধ্বনিপচ্চঞ্জ। গাছেরা বলে। চলমান জল বলে। মরুভূমির বালি বলে। পাথরের বুক ঘেঁসে যাওয়া বাতাস বলে। আকাশের মেঘ বলে। মর্মর আর মৃত্যু হাতে হাত।...

ওহে গাছ! নো-মানস-ল্যাণ্ডের বৃহন্নলা গাছ! তুমি সেই অমোঘ ধ্বনি উচ্চারণ করো! বলো, মর্ মর্ মর্!

হতচ্ছাড়া চুপ। মৌন মানেও নিষ্ঠুরতা। সম্মতি নয়। কদাচ নয়। পাষাণও তো মৌন। কে ওখানে?

চমকে উঠে পিছু ফিরে নীচের রাস্তা থেকে জোরালো টর্চের আলোয় ধরা পড়ি। নিষ্ফল মায়া ছত্রভঙ্গ হয়। পুনঃ কেউ বলে, ওখানে কী করছেন? তখন বড়ো লজ্জায় পড়ে যাই।

স্কুলশিক্ষক মনজুর হোসেন আলো ফেলতে ফেলতে উঠে এসে খি খি করে খুব হাসেন। তিনি বলেন যত্তোসব। এই নাইনটিন এইট্টি এইটেও! বলে পুনঃ শিশুহাস্যের পর সহসা চাপা স্বরে প্রশ্ন করেন, কিছু টের পেলেন নাকি?

নাঃ।

মনজুর হোসেন এবার খাপ্পা হয়ে বলেন, গুজবে কান দেবেন না। এর মধ্যে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত তো?

স্রেফ রটনা। মনজুর হোসেন চাপা স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাসে জড়িয়ে বলেন। এটা একটা সরকারি মাটি। সাধারণের ব্যবহার্য। আমি পুরনো রেকর্ড দেখেই বলছি। আপনাকে এই যে আমার স্কুল থেকে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। কেন জানেন? লাটুবাবুদের ওখানে তর্কাতর্কি। ক'বছর ধরে এখানে একটা ক্লাবঘর করার কথা। ক্রমাগত বাধা আসছে বেপার্টি থেকে। এ নাকি লাটুবাবুদের মাটি। মন্দির ছিল। আচ্ছা, বলুন তো, এক টুকরো ইট দেখেছেন এখানেও আর এই গাছটা!

তিনি টর্চের আলোয় গাছটাকে জ্বালিয়ে দিতে দিতে বলেন, গাছটার বদনাম দিয়ে হাপিজ করার তাল। বুঝলেন তো? ঝুরনবুড়িকে টাকা খাইয়েছিল। সে পাতাকুড়ুনি। হার্ট অ্যাটাকে তার মৃত্যু নেহাত কো-ইনসিডেন্স। আর ওই নোলেদা আপনি তো জানেন, সে ছিল মহা গাঁজাড়ু মাথাখারাপ আধপাগলা একটা লোক। এমনিতেই মরত। ম-রে-ছে!

মনজুর হোসেন মায়াজাল ফালাফালা করছিলেন। কী আর বলব? চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

স্কুলশিক্ষক বলেন, দুঃসময়! বেতো নরেন আবার বলে কী, গাছটা দেবতা। পুজো দাও ঢাকঢোল বাজিয়ে। এটাই নাকি রফা! তা হলে বুঝুন কী অবস্থা। সাধারণের ব্যবহার্য মাটি দখলের চক্রান্ত। এটা হ-তে দে-ও-য়া যা-য়-না। যায় কি?

অগত্যা বলি, না।

স্কুলশিক্ষক আমার হাত ধরে অন্তররঙ্গভাবে বলেন, চলুন। ফেরা যাক।....

।। ৩ ।।

সেই রাতে আবার একটা ঘটনা।

কৃষ্ণপক্ষ। একটু দেরি করে চাঁদ উঠেছিল। পাঁচু চোর তোরাপ হাজির খামার বাড়িতে একটা মরাই ফুটো করে ধানের বস্তা ধরেছিল। ঝরঝরিয়ে ধান ঢুকছিল বস্তায়। চাঁদ আর একটু উঠলেই তার অল্প জ্যোৎস্নায় ধরা পড়ার ভয়। তা ছাড়া পুরো বস্তা বয়ে আনার জোরও পাঁচু চোরের পাঁকাটি শরীরে নেই। সে আধ বস্তা ধান পিঠে ঝুলিয়েছে, তখন

ফুটো থেকে ঝরঝর ধান ঝরার শব্দ। তোরাপ হাজির ঘুম চটে যায়। ধান তাঁর প্রাণভোমরা। মশারি ফাঁক করে টর্চ জ্বালে। তারপর তুলকালাম। ধর ধর, মার মার। পাড়াসুদ্ধ এই চিৎকার।

পাঁচু চোর বেগতিক বুঝে বস্তা ফেলে পালায়।

সে আত্মগোপনের জন্য নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডের জঙ্গলে ঢুকেছিল। নীচের রাস্তায় লোকজনের ছুটোছুটি। সে গাছটার গুঁড়িতে সেঁটে অপেক্ষা করছিল সুসময়ের। তার মনে দুঃখ ছিল ব্যর্থতার। নিঃশব্দ হাহাকার ছিল।

সহসা আবার সেই বাতাস এল মাঠের দিক থেকে। আর গাছটা বলল, মর্ মর্ মর্।

পাঁচু চোর আঁতকে উঠে পালিয়ে এল। আর বাড়ি ঢুকেই সেই বুড়ির মতো ধপাস করে বসে বলল, ও বউ পানি দে শিগগির। আমি মরি।

মরণ! প্রতীক্ষায় থাকা তার বউ ফিক করে হেসে বলল কথাটি। পাঁচু চোর হলেও রগুড়ে মানুষ ছিল।

পানি দে বউ! আমি মরছি।

পাঁচুর বউ অনিচ্ছা আর অবিশ্বাসে অন্ধকারে গেলাস খুঁজে কলসি থেকে জল ঢেলে এসে দ্যাখে, তার চিত্‌পাত্ মরদের বুকে দুই হাত। শরীর কোঁকড়ানো। দাওয়ায় আলতো জ্যোৎস্না পড়েছিল সবে। পাঁচুর মুখে কালো ছোপ।

আর সংশয়াকুল স্ত্রীলোকটি দ্রুত লম্প জ্বেলেছিল। পাঁচুর মুখ দিয়ে নাক দিয়ে রক্ত। পাঁচু চোর মরে গেছে।.....

পিচ রাস্তায় ধারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাইস্কুল, ফাঁড়ি, ডাকঘর, এক চিলতে বাজার। চায়ের দোকানে বসে ছিলেন স্কুলশিক্ষক। আমাকে দেখে বললেন, বুঝলেন কিছু?

কিসের বলুন তো?

বিরক্ত মনজুর হোসেন বললেন, পাঁচুর কথা বলছি।

হুঁ, বেচারা মরে গেল।

টি বি রুগি ছিল সে। জানেন কি?

নাঃ।

আপনি ডক্টর বোসকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। বলে স্কুলশিক্ষক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে তর্জনী তুললেন।

কিন্তু ওর বউ বলছে.....

বোগাস! মনজুর হোসেন চাপা গর্জন করলেন। হয় লাটুবাবুরা, নয়তো বেতো নরেন মেয়েটাকে টাকা খাইয়েছে। গাছটার নামে বদনাম রটাচ্ছে। রীতিমতো রাজনৈতিক চক্রান্ত।

চাওলা ঘোঁতন বলল, আপনাগো হাজিসায়েবও আছেন লগে।

ঠিক। স্কুলশিক্ষক সায় দিলেন। ঘরের শত্রু বিভীষণ। আপনি জানেন, এক নম্বর স্মাগলার?

কে?

আবার কে? ওই হাজি। ওর হজ কবুল হবে ভাবছেন। জাহান্নামি।

বাঁশবাতার বেঞ্চের একধারে বসে ছিলেন রাজনৈতিক হোলটাইমার স্বপন রুদ্র। তিনি স্থানীয় কৃষক সেলে সদ্য এসেছেন। বাঁকা হেসে বললেন, কমরেড। কুসংস্কার জিনিসটা এক শ্রেণীর ভাইরাস। মহামারী বাধায়।

কথাটা আমাকে নয়, মনজুর হোসেনকে। আর এর পর দুজনের মধ্যে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হল। কিন্তু আমি চমকে উঠেছিলাম। কুসংস্কার মহামারী বাধায়! তিনটি মৃত্যু ঘটল। ক্রমে আরও কি.....

বিভীষিকা আমাকে শিহরিত করেছিল। পরবর্তী বাক্যগুলি মন থেকে মুছে দিলাম।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন রোগীর ভিড়। তরুণ ডাক্তার অসীম বোস আমাকে দেখে বললেন, কী? আবার পেট? তিনি হাসতে লাগলেন। পুনঃ বললেন, জাস্ট্ আ মিনিট।

নাঃ। পেট নয় ড. বোস। ওই গাছটা।

একটি স্ত্রীরুগি তাঁর সামনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে মা কালীর মতো জিভ বের করেছে। খুদে টর্চে ভেতরটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক ডাক্তার বললেন, কোন গাছটা!

নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডের।

ডাক্তার অবাক হলেন। বুঝলাম না।

যে গাছটা তিন-তিনটি মানুষকে মরতে বলেছে....

তরুণ, নির্বাসিত, সতত অভিমানী চিকিৎসক ফিক করে হাসলেন। তাঁর সঙ্গে কালক্রমে অন্তরঙ্গতার দরুন গোপন প্রেমের কথা আমাকে ফাঁস করেছিলেন। আসলে বসন্তকালের বিকেলে এই পিচ রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথাই ফুল ফোটার মতো বেরিয়ে পড়ে। আর প্রেম জিনিসটা মানুষের কাছে ফুল ফোটার মতোই প্রদর্শনযোগ্য অহঙ্কারের বিষয়। অন্যকে জানিয়ে-দেখিয়েই সুখ। ব্যাপারটা এরকম : 'দ্যাখ্যো, দ্যাখো, আমি প্রেম পেয়েছি! আমার মানবজীবন ধন্য। তুমি কী পেয়েছ? কাঁচকলাটি!'

তো ওঁকে হাসতে দেখে বললাম, আপনার কী ধারণা?

কী বিষয়ে?

গাছটা।

তরুণ প্রেমিক ডাক্তার বললেন, তিনটি কেসই দেখেছি। প্রথম দুটি হার্ট অ্যাটাক। তৃতীয়টি লাংস্ বার্স্ট্। টি. বি-র লাস্ট্ স্টেজ আর কী।

কিন্তু তিনটি কেসের সঙ্গেই ওই গাছটা জড়িত ডঃ বোস।

ডাক্তার কৌতুকহাস্যে বললেন, কতরকম শুনছি মশাই। গ্রামের এত জটিলতা থাকে জানতাম না। শুনেছিলাম ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়....মাই গুডনেস! এসে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি ক্রমশ। পলিটিক্যাল চক্রান্ত, মাটির লড়াই, হেন তেন। একটু আগে শুনলাম, থানার দারোগাবাবু এনকোয়ারি করবেন। গভমেন্ট চান না, মিথ্যা অজুহাতে হাঙ্গামা বাধুক।

রোগী দেখতে দেখতে ডাক্তার এই কথাগুলি বলছিলেন।....

দুপুরে খবর পেলাম, সত্যি দারোগাবাবু এনকোয়ারিতে এসেছেন। ঝুরনবুড়ির বউমা, নোলেবাবুর স্ত্রী, পাঁচুর বউ, আরও-আরও লোকের সাক্ষ্যসাবুদ নোট করে নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডের নীচের রাস্তায় জিপ দাঁড় করালেন। বেটন হাতে গাছটার দিকে উঠে গেলেন। একটু মর্যাদাজনক দূরত্বে লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করছিল।

গাছটার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে আইনরক্ষক বললেন, হুম্! এই গাছটা?

লোকেরা কোরাসে বলল, হ্যাঁ স্যাব! এ-ই সে।

গাছটার গায়ে বেটন ঠুকঠুক করে ঠুকে আইনরক্ষক বক্রহাস্যে বললেন, গাছের আবার মুখ থাকে নাকি? কথাও বলে?

সেই গাঁওবুড়ো নড়ি হাতে কয়েকপা এগিয়ে বলল, হুজুব! ভয়ে বলি, কী নির্ভর? সে প্রাচীন মানুষ। তার বাক্‌রীতি ভিন্ন।

আইনরক্ষক গাছটার গুঁড়ির নীচে একটা মোটা শিকড় বুড়োকে দেখতে দেখতে বললেন, ঝেড়ে কাশো!

হুজুর দারোগাবাবু! এই গাছ গাছ নয়।

তবে কী?

হজুর দারোগাবাবু! এই গাছ আরও অনেক রক্ত খাবে।

আইনরক্ষক অট্টহাস্যের পর বললেন, তার মানে তুমি বলতে চাইছ, এখানে পুজো হোক। বলিদান হোক। এই তো?

প্রাচীন মানুষটি কিছু বলতে যাচ্ছিল, হইহল্লা করে তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। তারপর দেখি, লোকেরা দুরকম কথা বলছে। অথবা তিনরকম কথা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। পুজোআচ্চা হবে কি গাছটা কেটে ফেলতে হবে কি স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে, এই সব। হল্লাটা প্রচণ্ড বাড়ছিল। হাতাহাতির মুখে আইনরক্ষক গর্জন করলেন। কনস্টেবলরাও লাঠি তুলে তাড়া করল। আমি একটু আড়ালে কেয়াঝোপে আশ্রয় নিলাম। গাছতলায় এখন একা আইনরক্ষক। রুদ্ধ চেহারা। গোঁফ তিরতির করে কাঁপছিল।

আর এই সময় একটা বাতাস এল। বৃক্ষলতা শনশন করতে থাকল। এ এক চূড়ান্ত মুহূর্তে। সহসা দেখি, আইনরক্ষক গাছটার দিকে মুখ তুললেন। তাঁর মখ পাণ্ডুর হতে দেখলাম। তিনি হন্তদন্ত ঝোপঝাড় ঠেলে নীচের রাস্তায় নেমে গেলেন।

আমি যখন গাছটার কাছে, তখন জিপের গরগর ধ্বনি। গাছটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে বললাম, তুমি কি ওঁকেও মরতে বললে? তা না হলে কেন উনি অমন করে পালিয়ে গেলেন?

গাছটা চুপ করে রইল। আবার সেই বিরাট ভয়াল মৌন।.....

বিকেলে পিচরাস্তায় ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। ঘোঁতনের চায়ের দোকানের

কাছে গেলে ঘোঁতন চাওলা ফিক করে হেসে বলল, ডাক্তারবাবু, শুনছেন নাকি? দারোগাবাবু মরছে।

দুজনেই ঘুরে বললাম, কী?

হুঃ! ঘোঁতন দাঁত বের করল। থানায় ফিরছে, বুকে প্যান। সদরে নার্সিং হোমে....

আমার হাত ধরে টেনে ক্ষিপ্ত ডাক্তার বললেন, আসুন তো মশাই! যত্তোসব।

কিন্তু আমি দেখেছি!

কী দেখেছেন? ডাক্তার চার্জ করলেন। আপনিও দেখছি এক গাইয়া। বলুন, কী দেখেছেন?

হাঁটতে হাঁটতে আস্তে বললাম, কিছু না। চলুন।....

আমাদের প্রতি বিকেলের দৌড় ক্যানেলের ব্রিজ পর্যন্ত। প্রায় এক কিমি দূরত্ব। ব্রিজের কালভার্টে বসে বসন্ত বিকেলের চমৎকার বাতাসে সিগারেট টানতে টানতে প্রেমিক ডাক্তার হৃদয় উন্মোচন করলেন। তাঁর ফুরফুরে নাগরিক চুলগুলি যথার্থ ফিল্মি হিরোর মতো উড়ছিল। তাঁর কপালের বিষাদরেখা এ সময়ে বেশ স্পষ্ট হয়। ধোঁয়ার রিঙ পাকানোর ব্যর্থ চেষ্টার পর বললেন, আপনি সকালে যাওয়ার একটু পরে টিনির চিঠি এল। ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না আই'ম্ সো হেল্পলেস। বণ্ডে সই করতে হয়, নয়তো একগাদা টাকা ফেরত, উইথ পেনাল্টি। এদিকে ও আসবে না গ্রামে। আপনি বলুন, কোয়ার্টারটা কি খারাপ? জাস্ট আ নেচার্স ডেন্ কি না? একটু গার্ডেনিং করলে-টরলে কী লাভলি হয়! আর দেখুন, ক্রমশ বুঝেছি নেচারের মধ্যে কী একটা আছে। আই ফিল ইট। হয়তো আউটসাইডার বলেই প্রথম-প্রথম একটু আনক্যানি ফিলিং হত। রাতের দিকটা অসহ্য লাগত। এখন মনে হয়, সাইলেন্স ইজ রিয়্যালি গোল্ডেন। হ্যাঁ, লোকজন একটু বেয়াড়া। দলাদলি, পলিটিক্স, খুনোখুনি আছে। কিন্তু কোথায়, নেই, বলুন? মশাই, আমি ডাক্তার। মানুষের বডি নিয়েই আমার জব। প্রায়ই রক্তমাখা বডি আসে। আসবে। রক্তটক্ত কোনও ডাক্তারের কাছে ব্যাপারই নয়। তবে দেখুন, হিয়ার ইজ দা নেচার্স ল। নেচার ডাজনট্ কেয়ার অ্যারাউট এনিথিং। একটা মানুষ খুন হল, কি মরল, কি যন্ত্রণা পেল। সো হোয়াট?

ব্যর্থ, নির্বাসিত প্রেমিক ডাক্তারটি এভাবে দার্শনিক হন। আমি চুপচাপ ওঁর কথা শুনি। মাঝমাঝে বলি, তা-ই। বললাম, আচ্ছা ড. বোস।

চিকিৎসক দ্রুত আমার একটা হাত নিলেন। অসীম বলো! আজ থেকে 'তুমি'। উই আর ফ্রেণ্ডস।

আচ্ছা অসীম, জীবনের মানে বলতে কি সত্যি কিছু আছে?

চিকিৎসক একটু হাসলেন। ফ্রয়েড লিখেছিলেন বোনাপার্টের বোনকে, যে-মুহূর্তে মানুষ জীবনের মানে খুঁজতে চায়, অ্যাটওয়ান্স হি বিকামস্ সিক্। কিন্তু আমি অন্য কথা বলি। জীবনের মানে নিয়ে তুমি এই যে প্রশ্নটা তুললে, এতেই বোঝা গেল, তুমি রিয়্যালি সুস্থ। সুস্থ বলেই প্রশ্ন তুলছ।

প্রশ্নের উত্তর না পেলে?

ডাক্তার আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, একটা শক্ত পয়েন্ট তুমি তুলেছ। উত্তর না পেলে? ভাবার মতো কথা। তবে আমার মনে হয়, নিশ্চয় মানে একটা আছে দা নেচার নোজ দা মিনিং অব লাইফ।

আবার আস্তে বললাম, প্রকৃতি রহস্যময়ী।

ডাক্তার বিষন্ন হাসলেন। তুমি নেচারে ফেমিনিন জেণ্ডার বসালে। সায়েবরাও বলে মাদার নেচার। আসলে মেল শোভিনিজম।

চমক খেলে গেল এ কথায়। বললাম, অসীম। তুমি ঠিকই বলেছ। ওই গাছটার কথা মনে পড়ে গেল। প্রকৃতির প্রতীক। না পুরুষ, না নারী। ফুল-ফল কিছুই দেখি না। মহাভারতে পড়েছি, অর্জুন উর্বশীর শাপে....

আই নো, আই নো! বৃহন্নলা!

বৃহন্নলা!

ডাক্তার কালভার্ট থেকে নেমে বললেন, চলো, ফেরা যাক। তুমি ছিলে বলে মনটা ভাল হয়ে ওঠে। অন্তত বিকেলের দিকটায়। কিন্তু রাত্রে একটু লোনলি ফিলিং। অবশ্য ভালও লাগে! মনে মনে কত কিছু ভাবি।

তোমার প্রেমিকার কথা?

ধুস! শি ইজ হোপলেস! ওকে ভুলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কয়েক পা হেঁটে প্রেমিক ডাক্তার গলার ভেতর বললেন, ফ্রম নাও অন আই'ল হেট হার।

মুখের জঘন্য বিকৃতি দেখে বললাম, অসীম! অসীম!

ডাক্তার থুথু ফেলে বললেন, সব বুঝতে পেরেছি। সেই রমেনটা আবার জুটেছে। শি ইজ আর হোর!

অসীম! অসীম!

কিছু দূর চলার পর তরুণ চিকিৎসক সহসা কৌতুকে বললেন, চলো, বরং তোমাদের সেই গাছটার কাছে যাই। দেখি, সে আমাকে কিছু বলে নাকি।

অসীম! অসীম!

ডাক্তার খ্যা খ্যা হেসে বললেন, তুমি সত্যি গাইয়া! চলো না, ব্যাপারটা দেখি। আসলে বৃহন্নলাকে নিয়ে একটু জোক করে আসি। আজ সত্যি কিছু ভাল্লাগছে না। জাস্ট ফর আর ফান। চলো!...

বাকি ঘটনা লিখতে আমার হাত কাঁপছে। কিন্তু মৃত্যুর আগে আমাকে এ সব কথা লিখে যেতেই হবে। আমি যে সত্যিই একমাত্র সাক্ষী।

গতকাল দিনশেষে গাছটার কাছে একা এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ আমার সঙ্গে এক সুশিক্ষিত ডাক্তার নাগরিক। গাছটার কাছে গিয়ে তিনি সকৌতুকে বললেন, হ্যাল্লো বৃহন্নলা!

হোয়াট ডু য়ু স্যে? হোয়াট অ্যাবাউট মি? ডোন্ট য়ু আন্ডারস্যান্ড্ ইংলিশ? ওকে। বাংলা বোঝো। বলো, কী বলতে চাও।

ওঁর কাঁধ ধরে বললাম, অসীম! অসীম! তুমি যে নোলেদার মতো পাগলামি শুরু করলে!

সহসা তরুণ ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন, শুনছ, শুনতে পাচ্ছ? বলছে মর্ মর্ মর্!

এই বলে তিনি ঝোপঝাড় ঠেলে প্রায় দৌড়ে গেলেন। অন্ধকারে তাঁকে হারিয়ে ফেললাম। ডাকাডাকি করে গলা ভেঙে গেল। এই সময় ঝোড়ো হাওয়ায় বৃক্ষলতা তুমুল আলোড়িত হচ্ছিল।

ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এলাম। সারাটি রাত ঘুমোতে পারিনি।

সকালে ডাক্তার অসীম বোসের মৃত্যুর খবরে গ্রামে হইচই পড়ে যায়। এই মৃত্যু একটু অন্য রকম। কারণ বিছানার পাশে স্যুইসাইড্যাল চিরকূট ছিল। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

তিনি ডাক্তার। সাইনাইড খেয়েছিলেন।.....

।। ৪।।

এরপর গাছটি বিপজ্জনক ঘোষিত হয় পঞ্চায়েত আপিস থেকে। গাছটি কেটে ফেলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু স্থানীয় কোনও কাঠুরিয়া ঝুঁকি নিতে চাইল না। দূরে সদরের কাঠগোলার করাতিদের ডেকে আনা হয়েছিল সে-কারণে।

তারা সবে এসে পৌঁছেছে, পঞ্চায়েত প্রধানরা খ্যাতির করে তাদের নিয়ে আসছেন, সহসা গাছটার তলায় ঢাকঢোলের শব্দ। কাঁসির শব্দ। বেতো নরেনবাবু ছড়ি নেড়ে বললেন, পুজো হচ্ছে। দেব্‌তা কাটা চলবে না।

স্কুলশিক্ষক মনজুর হোসেন চ্যাঁচামেচি করে বললেন, রেজোলিউশন! আনঅ্যানিমাসলি অ্যাক্সেপ্টড্ রেজোলিউশন! লাটুবাবুও সই করেছেন।

লাটুবাবু বেগতিক দেখে কেটে পড়েছেন। ঢাকঢোল কাঁসিওলারা হাত থামিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। আমি সেই কেয়াঝোপের আড়ালে। চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য কাউন্ট-ডাউন শুরু। এক....দুই...তিন....

বৃহন্নলা! তুমি কথা বলো! বৃহন্নলা! এই সব দ্বিপদ প্রাণীগুলির তড়পানি কেন সহ্য করছ তুমি? তুমি স্বয়ং প্রকৃতি। এ দৌরাত্ম্য অসহ্য।

বৃহন্নলা! মুখ খোলো!

আর প্রত্যাশিত বাতাসটা এল। বৃক্ষলতা জুড়ে নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে বিশাল স্লোগান। মার, মার শালাদের। মার, মার, মার.....

আচম্বিতে একটি বোমা ফাটল। আবার বোমা ফাটল। হল্লা, রণহুঙ্কার, ক্রমাগত বোমা বারুদের কটু গন্ধ। ধোঁয়া। গাছটা নিশ্চয় বলছিল, মর, মর, মর। আর লোকগুলি মরছিল।

গাছটা বারবার বলে থাকবে, মর্ মর্ মর্। কারণ লোকগুলি বারবার মরছিল। চাপ চাপ রক্ত। নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড রক্তে লাল হচ্ছিল। প্রকৃতিতে তখন বসন্তকাল। এ সময় মৃত্যুও রক্তিম সৌন্দর্য হয়।

দেবেন পরামানিক

আবদুল আজীজ আল-আমান

আজও 'দেবেন কা' এসে বসল বটগাছের তলায়। সেই পরিচিত জায়গায়, সেই পরিচিত ভঙ্গিতে। তারপর ধীরে ধীরে পাশে রাখল যন্ত্রপাতি— একটা কাঁচি, বাঁটে সূতো বাঁধা একটা ক্ষুর, খানিকটা শ্লেট ভাঙা আর পিতলের একটা ছোট্ট বাটি। এই বাটিটা তার ঠাকুর্দার আমলের। ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন রসুনের খোলা। দেবেন কা বলে, যাদু করা বাটি। ঐ বাটির জলে চুল ভেজাও। চুল একেবারে গলে মোম। তারপর এই ক্ষুর দিয়ে মার টান— খদ্দের ঘুমিয়ে পড়বে। দাড়ি কাটা হ'য়ে গেলে জাগিয়ে দাও, তবে গিয়ে তোমার বাড়ি যাবে।

এতক্ষণে উপরের দিকটা খেয়াল হল দেবেন কা-র। এবং সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। কোত্থেকে একপাল বন-টিয়া এসে জুটেছে বটগাছটায়। তারা কিছুটা নীরব হ'ল। কিন্তু গোটা দুই কাক ঠিক ডাল চেপে বসে রইল মাথার উপর। কাল মুখুজ্যে মশাই চুল কেটে উঠতে যাবে— দিলে পিঠটা নোংরা করে। সুতরাং ও-দু'টোকে তাড়াতে হয়। আরও একটু উড়ন্ত ভঙ্গি করল যেন এখুনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু নড়ল না। ঘাড় বাঁকিয়ে সতর্ক হয়ে ঠায় বসে রইল চুপচাপ।

কে আসছে বটে!

চোখটা ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দেবেন কা। উত্তরপাড়ার করিম শেখের ছেলে আসলাম। কে জানে চুল কাটবে কিনা। নিকটেই আসতেই এক গাল হেসে দেবেন কা শুধান, কোথায় যাবে গা বাবাজী?

কথা বলার আগেই দেবেন কা মাথা দেখে নিয়েছে। চুল ঠিক কাটার মত হয়নি এখনও।

এবার কে আসবে কে জানে!

পথের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকল দেবেন কা।

দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। খদ্দের একেবারেই কমে গেছে। ইটের উপর বসে আর কেউ চুল কাটতে চায় না। সবার বারমুখী টান।

বারমুখী টান!

নিজের মনে প্রশ্ন করে দারুণ সচকিত হয়ে উঠল দেবেন কা। নয়ত কী। এই ইটে উবু হ'য়ে বসে আর কে চুল কাটবে বল। পাকা রাস্তাটাই হল কাল। কী যেন আবার নাম— ন্যাশনাল হাইওয়ে! সকালে উঠে দলে দলে ছেলে বুড়ো এই বটতলা পেরিয়ে যাবে ওখানে। মোড়ে বসে চা গিলবে। তারপর বসবে গিয়ে সেলুনে।

সত্যই বড় খারাপ চলেছে দিনকাল। কাল সারা দিনে মাত্র আশি পয়সা— একটা টাকাও পোরেনি।

তবু দেবেন কা-র চোখে মুখে আজ খুশি খুশি ভাব। অন্যদিন এতক্ষণ দুটো-একটা খদ্দের না হলে অস্থির হয়ে পড়ত দেবেন কা। দশবার উঠত, দশবার বসত। বারবার পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত, আজ নিগ্‌ঘাৎ উপোষ! সকাল টানেই যদি খদ্দের না হল—

সেই উচাটন ভাবটা নেই আজ। কদিন ধরেই নেই। বিগত কয়েক দিন ধরে এই শুভ মুহূর্তটির জন্যে অস্থির হয়ে আছে দেবেন কা। মোটামুটি আদায় করবে। আর কিছু পরেই যাবে বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে। আঁতুড়ে মাথায় মারবে টান। একটু আদর করবে। তারপর মা-জননীর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, দুখানা কাপড়ের কম—

ঘোষ পাড়ার অনাথ এসে বসল। বসতে বসতে বললে, দাও তো কাকা ভাল করে ফেসিয়ান ছেঁটে।

স্পষ্ট দৃষ্টি মেলে তাকাল দেবেন কা। বেশ চেহারা হয়েছে ছেলেটার। উঠতি যৌবনের ল ল করা চেহারা। কিন্তু ফেসিয়ান ছাঁটার বাতিক কেন? শ্বশুর বাড়ি যাবার আগে ঐ ইটের উপর এসে বসে সুবল। কিন্তু অনাথ?

বেশ রহস্যজনক হাসি হেসে কাঁচি তুলে নিল দেবেন কা। তারপর পোঁচ চালিয়ে শুধাল, কেন গা বাবাজী— যাবে কোথা?

অনাথের সখা নরেন এসে গেছে ততক্ষণে। বললে, গাঁয়ে বাস কর দেবেন কা— খবর কিছু রাখ না। ওকে যে আজ দেখতে আসবে।

ও তাই বল। এক গাল হেসে দেবেন কা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচি চালায়। কাটতে কাটতে শুধোয়, তা কদ্দিন চুল কাটনি গ— এযে একেবারে গয়াব মারির জঙ্গল—

নরেন হাসে, কিন্তু অনাথ রাগ করে। বলে, জঙ্গল বলে সব উপ্‌ড়ে দেবে নাকি— দু মিনিটেই মাথা ব্যথা হয়ে গেল—

কেন, বাবা, কেন বাবা! মুহূর্তে সমব্যথী হয় দেবেন কা। দেখবে, আর লাগবে না। এই ত গেল হপ্তায় শান দিয়ে গেল—

কেন বাবা, কেন বাবা! মুহূর্তে সমব্যথী হয় দেবেন কা। দেখবে, আর লাগবে না। এই ত গেল হপ্তায় শান দিয়ে আনলুম।

এখন দেবেন কা স্থির দৃষ্টিতে মাথার দিকে তাকিয়ে। অত্যন্ত মনোযোগী। কাঁচি চালায় ধীরে ধীরে। সাবধানে। এবং সাবধানে চালাতে গিয়ে অনুভব করে হাত কাঁপছে। আঙুলের ডগায় আগের মত কাঁচি আর নিথর হয়ে থাকে না।

বেল বাজতেই ঘাড় বাঁকিয়ে পথের দিকে তাকাল দেবেন কা। অনাথের ঘাড়টা নিচু করে ধরা। ঘাড়ের উপর শূন্য বাতাসে কাঁচিটা কিচ্‌ কিচ্‌ করছে সমানে। দেবেন কা দেখলে সাইকেল চলে বিমল যাচ্ছে চৌমাথার 'দি নিউ হেয়ার কাটিং সেলুনে।' গিয়ে চায়ের দোকানে চা গিলবে। তারপর— ফোঁস করে তপ্ত শ্বাস ছাড়ল দেবেন কা, আজ তুই বাবু হয়েছিস— না? তোর বাবা এই ইটের উপর বসে বসে—

একসময় শান্ত হয় দেবেন কা, যাগ্‌গে— যার যেখানে ইচ্ছে যাক। অনাথের চুল প্রায় কাটা হয়ে এল। কেবল ক্ষুরের কাজটুকু বাকি। আবার পথের দিকে তাকায় দেবেন কা। ডাকতে আসার সময় হয়ে গেছে। বাঁড়ুজ্যে বাড়ির লোক এই এল বলে।

আজ কদিন ধরে কত কথাই ভাবছে দেবেন কা। কি বলবে, কেমন ভাবে কতটা চাইবে। বাড়ির ত সবাই চেনা । আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বাঁড়ুজ্যে পরিবারে চুল কাটছে দেবেন। এই দেবেনের হাতেই হরি বাঁড়ুজ্যে বুড়ো হয়ে এল। মাথায় এখন মস্ত টাক— চুল কাটার দরকারই হয় না। তার ছেলে কমল হতে আঁতুড়ের চুল কেটেছে, তিন বছর আগে কমলের 'বর-কামান' করেছে। সেই কমলের ছেলে হয়েছে। আজ তিন পুরুষ ধরে দেবেন কা ওদের পরামাণিক। সুতরাং—

দুখানা কাপড়, পাঁচটা টাকা, পাঁচ সের চাল, পাঁচ পো ডাল— কি ডাল, মুসুর না মুগ— শূন্য বাতাসে দেবেন কা মাথা দোলায়—

বেশ চলছিল। ঐ পুঁচকে ছোঁড়া কোথা থেকে এসে দিলে দোকান। আবার নাম কি— না 'দি নিউ হেয়ার কাটিং সেলুন'। প্যান্ট পরে জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল কাটে। ডাঁট্ কি! গদি দেওয়া চেয়ার, সাবান, স্নো, পাউডার—

ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো—

প্রথম প্রথম দেবেন কা-র সারা শরীরটা জ্বলে উঠত। মনে হত পুড়ে যাচ্ছে। এখন কেবল বিষণ্ণ চোখে পথের দিকে তাকায়।

। মাথা, দাড়ি— গোঁফ কামান হয়ে গেছে অনাথের।

নগেন বলে, কামাতে হয় তা কামা দেবেন কা-র কাছে। তোর ঐ সেলুন-ফেলুন এ-সব কাজ করে না—

ভারি উৎসাহিত হয়ে ওঠে দেবেন কা, বগল হল গিয়ে গরম জায়গা— অনেকেই ওখানে ক্ষুর নিয়ে যেতে ভয় পায়। আর 'আঁতুড়ে কামান'— পারবে তোমার ঐ ফুচকে ছোঁড়া। আজ দু বছর দোকান করেছে— কই একটা আঁতুড়ে মাথাতে হাত দিতে পেরেছে? না কেউ ডেকেছে? কেমন মদ্দর বেটা মদ্দ— কাটুক দেখি। কচি মাথা— একেবারে ফুলের মত নরম। সে ক্ষুর ধরাই আলাদা— শিখতে হয় বাবা, শিখতে হয়।

পয়সা মিটিয়ে উঠে গেল অনাথ।

আবার চুপচাপ বসে থাকল দেবেন কা। মাথার উপরে সেই কাক দুটো আবার এসে বসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে ও দুটোকে তাড়িয়ে দিলে। তারপর বটগাছের কোটর থেকে একটা মুড়ো ঝাঁটা বার করে চুলগুলো ঝেঁটিয়ে এক পাশে রাখলে। ওতে পা দিতে নেই। কত গুণীজনের মাথার চুল—

কিন্তু এখনও এল না কেন? আর দেরি করা ঠিক নয়। কচি বাচ্চা। এত বেলা করা অন্যায়। হঠাৎ বাঁড়ুজ্যে বাড়ির মানদারকে দেখে আশান্বিত হল দেবেন কা। পলকে নিচু

হয়ে বসে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিলে। কিন্তু মানদারকে সোজা পথ বেয়ে মাঠের দিকে চলে যেতে দেখে বললে, শোন শোন— মাঠে যাচ্ছ যাও। কিন্তু এখুনি ফিরে এসে কচি নিমপাতা ভেঙে দিও। মা জনুনী যেন এক হাঁড়ি নিমপাতার গরম জল করে রাখে—

ভারি রাগ হল দেবেন কা-র। এরা সব মানুষ। বলি বেলা বারটার সময় কচি বাল্লোকের মাথা কামাবি— এ্যাঁ!

একবার ভাবলে এখুনি চলে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্মানে দারুণ ঘা খেল। না— কেন যাবে। এসব কাজে না ডাকলে যেতেই নেই।

আজ কত কথাই মনে পড়ছে দেবেন কা-র।

সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে বিচার-সভায়। গভীর রাতে রায় বেরুল বিচারের। তখন সবাই ছুটল দেবেন কা-র কাছে। ডাঁটের মাথায় দেবেন কা বলে দিলে, এত রাতে যাব না। আবার লোক এল বিচারসভা থেকে। মোড়লের নাম করতে তবে উঠল দেবেন কা। বললে, পাঁচ টাকা চাই। তারপর বুক ফুলিয়ে এল বিচার স্থলে। সবাই তার প্রতীক্ষা করছে। সে নিজেও যেন একজন মোড়ল। কী? না পরের মেয়ের গায় হাত দিয়েছে হারামজাদা— দাও মাথা নেড়া করে।

তখন গর্ব ছিল, সম্মান ছিল, অর্থও ছিল!

সেই পরিচিত ভঙ্গিতে দেবেন কা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসল আবার। তারপর চেয়ে থাকল রাস্তার দিকে।

কে যায় বটে!

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে জ্বল জ্বল চোখ তাকায় দেবেন কা। অবিনাশ! চুল কেটে ফিরছে না? হ্যাঁ কামিয়েছে ত! বড় পয়সার গরম হয়েছে— না! তোর বাবা-ঠাকুর্দা এই অধমের হাতে মানুষ হল আর আজ তুই—

অবিনাশ!

শান্ত গলায় ডাকল দেবেন কা।

হাইস্কুলের ছাত্র অবিনাশ। কাছটায় এসে বললে, তোমার ও ইটালিয়ান সেলুন এখন অচল। তার থেকে বরং—

হৈ হৈ করে উঠল দেবেন কা, ও কথা বল না। কারটা সচল, কারটা অচল সে ভগবান জানে। কিন্তু তোমার ও চুলটা কেটেছ কোথায়? সামনেটা তো ঠিক তেমনি, পিছনটাও তাই। একেবারে চুলের বস্তা। তা হলে কাটলে কি?

অবহেলার হাসিতে মুখ ভরিয়ে অবিনাশ বললে, এ হল গিয়ে কাকা 'উত্তমকুমার ছাঁট'— সারাজীবন যদি তুমি চেষ্টা কর তা হলেও—

কানের গোড়া দুটো রি রি করে ওঠে দেবেন কা-র। এক ফোঁটা ছোঁড়া— বলে কী? আজ যদি থাকত রে সেই দিন—

সেদিনও এখানে চুল কাটতে বসেছিল দেবেন কা। একজন কাটতে বসেছে— আরও জন চার-পাঁচ বসে আছে। তখন এখানে চারদিকে ইট ছড়ানো থাকত। ইট ছাড়াও গাছের শিকড় চেপে উবু হয়ে বসে হত্তে দিত কতজন। এল হরদয়াল সাঁপুয়ের ছেলে কৃপানাথ। হরদয়াল তখন সাঁপুই পাড়ার মাথা। দেড় শ বিঘে জমি নিজে চাষ করে হালে, তা ছাড়া ভাগে-ভিতেয় আছে আরও শ-খানেক। বললে, দেবেন কা— ফেসিয়ান।

সবার চুল কেটে তবে কৃপানাথের মাথায় হাত দিলে দেবেন কা, ফেসিয়ান ছাঁট চাই, তাই হবে বাবাজী। এখন বস দেখি থির হয়ে। কাট হয়ে যেতেই যে দু-চারজন দাঁড়িয়েছিল— হেসে উঠল সমস্বরে। ফেসিয়ান ত দূরের কথা, দশ আনা ছ আনাও নয়— একেবারে আগে-পিছে সমান করে দিয়েছে। কটু ভাষায় গালাগালি দিলে কৃপানাথ। দেবেন কা-রও মাথা গেল গরম হয়ে। উঠে আচ্ছা করে দিলে কান মলে। শুধু কান মলা নয়— বললে, ন মাসের ছেলে— তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে গলায় দুধ বসে যায়, তার আবার ফেসিয়ানের সখ। মারি টেনে এক চড়—

কৃপানাথ কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার কানে হাত দিয়েছ তুমি— চল বাবার কাছে—

দেবেন কা-ও বললে চল্ তোর বাবার কাছেই বিচার হবে—

কিন্তু সাঁপুই পাড়ায় আসতে আসতে মুখটা শুকিয়ে গেল দেবেন কার-র, সত্যই কানে হাত দেওয়া ঠিক হয়নি। অত বড় মানী লোকের ছেলের, সম্মানীয় বংশ! কিন্তু কী আশ্চর্য, সব শুনে হরদয়াল বাবু বললেন, শুধু তুমি কান মলে দিলে দেবেন— কেন সেখানে কঞ্চি ছিল না!

কী দিনই গেছে! চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে দেবেন কা-র। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন নিথর হয়ে গেল!

নিমাই এসে বসল ইটে। দাড়ি কাটবে।

ভাল করে দাড়িটা ভিজিয়ে নিল প্রথমে। তাবপর ক্ষুরটা খুলে উলুটি পালুটি করল হাতের তালুতে। অবশেষে কপালে ঠেকিয়ে তবে পোঁচ দিলে দাড়িতে। দাড়ি কাটতে কাটতেও দু একবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল দেবেন কা। এত বেলা হল, অথচ—

যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল নিমাই।

আহা-হা সমব্যথী হল দেবেন কা, লাগল নাকি গ বাবাজী?

অসহিষ্ণু গলায় নিমাই উত্তর দিলে, লাগবে কেন? দেবেন কা একদিকে টানছে, যমে একদিকে টানছে। আরামে ঘুমিয়ে পড়ছি আর কি—

নিমাইকে ছেড়ে দিয়ে শ্লেট ভাঙাটা নিয়ে বসল দেবেন কা। জলে ভিজিয়ে ক্ষুর ঘষছে। আহা—কচি ফুলের মত মাথা!

নানান ভঙ্গিতে ক্ষুর ঘষে আর মাঝে মাঝে আঙুলের আগায় পরখ করে। মাঝে মাঝে আশান্বিত দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকায়। মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচু করে ডালপালার ভিতর দিয়ে সূর্য দেখার চেষ্টা করে।

কি ব্যাপার— এখনও আসে না যে! না আসুক— তা বলে আঁতুড়ে চুল যেচে কাটতে যাবে না!

এদিকে আর বসে থাকা যায় না। দুপুর হয়ে গেছে। বাড়ি যেতে হয়। যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নেয় দেবেন কা। তারপর অহেতুক পা ঘষে। হৈ হৈ করে অনর্থক কাক দুটিকে তাড়া করে। বটের শীর্ষে বনটিয়ারা এখন নিশ্চুপ একটু আগে এই বট আর ঐ ঝাউয়ের মাথায় দুটি ঘুঘু পাখি বসে দীর্ঘলয়ে আলাপ করছিল। তারাও থেমে গেছে এখন। পথঘাটও আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে এল। সব দেখতে দেখতে কয়েক পা এগিয়ে গেল দেবেন কা। কি মনে করে আবার ফিরে এসে বসল সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। বসেই থাকল।

বড় রাস্তা থেকে দুজন লোক ফিরল। সড়ক বেয়ে বিড়ি টানতে টানতে তারা এগুচ্ছে। দেবেন কা দেখল ওরা চুল কেটেছে। পিছনে ঘাড়ে, কানের দু'পাশে পাউডারের ছোপ। দাড়ি কামিয়ে ডেটল না কি একটা লাগিয়ে দেয়। বাতাসে তারই ফিকে ফিকে গন্ধ।

দেবেন কা-র নাকটা এই মুহূর্তে দারুণ গন্ধলোলুপ হয়ে ওঠে। দারুণ সতর্কতার সঙ্গে বাতাসে কি যেন অন্বেষণ করে আর ঘৃণা ভরে থুথু ফেলে, ছোহ্-বাবার জন্মেও ত এসব দেখিনি।

দেবেন কা!

উঁ মুখ তুলে তাকিয়ে পুলকে-উল্লাসে ব্যাকুল হয়ে উঠল দেবেন কা। ক্ষণিক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তাই দেখতে পায়নি। আজ তিন দিন ধরেই ত এই শুভ মুহূর্তের প্রত্যাশা। যন্ত্রপাতি গোছানই ছিল। হাতে নিয়ে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির ছেলেটাকে বললে, তা বাছা এত দেরি করলে কেন গ?

ছোট ছেলেটা অভিমান ফুলিয়ে বলে, বারে— কাকা ত তোমার জন্যে সেই ককোন থেকে বসে রয়েছে।

তাই বুঝিন!

দেবেন কা দারুণ ভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে, চল-চল।

ছোট ছেলেটা নিবিড় হয়ে দেবেন কা-র হাত ধরে। বলে, জান কাকা— তোমার জন্যে এই এত আলু, এত্তো ডাল, নতুন কাপড়—

বল কী গ? চল-চল।

মনে হয় যেন চারটে পা গজিয়েছে দেবেন কা-র। বাকি পথটুকু মুহূর্তে চলে এল।

সত্যই ছেলেটা মিছে বলেনি। বংশের প্রথম আলো। নতুন কাপড়, কুলো ভরা চাল, ডাল, আলু আর ঝক ঝকে রূপোর টাকা— একটা নয়, তিনটে। বৈঠকখানাতেই বসে অপেক্ষা করছিল সকলে— বাঁড়ুজ্যে বাবু, কমল, কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আর ছেলেপিলের দল—

বাঁড়ুজ্যে বাবুই হাসতে হাসতে প্রথমে কথা বললেন, কি গ দেবেন— মনঃপূত হল ত?

দেবেন কা তখন লুব্ধ দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে। বললেন, আমি ত জানি গ— মা জনুনী কিছুতেই বৈমুখ করবে না—

ঐ নতুন কাপড়টাতেই সব বেঁধে সেধে নাও দেখি। বড্ড দেরি করে ফেললে।

ততক্ষণে বাঁধাবাঁধি আরম্ভ করেছে দেবেন কা। মহাখুশি, সত্যই এতখানি সে আশা করেনি। বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল দেবেন কা। তারপর দারুণ খুশিতে মুখ উজালা করে বললে, চল গ বাবাজী— আগে আমার মানিকের—

যেন রজনীর প্রারম্ভ হতে সহস্র ঝাড় লণ্ঠনের অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় সমগ্র জলসাঘর আপন গরিমায় ঝলমল করছে। দেবেন কা সেই জলসাগরের মূল গায়েন। অমূল্য সাজে সজ্জিত হয়ে আপনভোলা গায়েন সেই সভামঞ্চে প্রবেশ করছে। জলসা নীরব। এবার শুরু হবে মহাসংগীত—

বাঁড়ুজ্যে বাবুই কথা বললেন, পরেশের বাচ্চাটা আজ দু মাস ভুগছে। তুমিই ত কামিয়েছিলে— সেপ্‌টিক হয়েছে। তাই কাজটা সেলুনের ছেলেটিকে দিয়েই করিয়ে নিয়েছি—

মুহূর্তে ম্লান প্রাণহীন একটা শবে পরিণত হল দেবেন কা। অকাল বৈশাখীর উত্তাল উন্মত্ত ঘূর্ণিতে ঝাড লণ্ঠন বিচূর্ণ হয়ে গেল। মহাঅমাবস্যার অতল অন্ধকারে সমগ্র জলসা জুড়ে ভয়ঙ্কর কুৎসিত প্রেতাত্মার তা-থৈ নৃত্য শুরু হয়েছে। ন্যুব্জ দেহটাকে আস্তে আস্তে সোজা করে দেবেন কা একবার করুণ চোখে বৈঠকখানার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে ন্যুব্জ দেহ আরও ন্যুব্জ হয়ে গেল। বেশ কিছু পরে মূক দেবেন কা দানসামগ্রীগুলি কম্পিত হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির পথে পা বাড়াল। সবার অলক্ষ্যে সজল চোখ দুটি একবার মুছে নিল। তারপর বাঁড়ুজ্যেদের আম বাগান পার হতে এতিম কাঙালের মত শব্দ করে একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার মনে হল, ক্ষৌর কর্মের এই সুদীর্ঘ জীবনে এমন নিষ্ঠুর অপমান তাকে আর কেউ কোন দিন করেনি।

দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো

আবদুল জব্বার

কানাই ঢোল খাটো ময়লা ধুতি পরে গায়ে গামছা জড়িয়ে ন্যাং ন্যাং করে পাৎলাটে চেহারায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাতের ক্ষুরকাতার বাক্সটা নিয়ে মাঠের পথে খই ঠেক্‌রানোর ভঙ্গিতে যেন চলতে থাকে। গান ধরে ঃ 'হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে'— কার গান এটা ক'জন বাঙালী জানে? পণ্ডিত হরিনাথ দে'র লেখা। যদি বলে কেউ, তুমি কি করে জানলে? বলব, 'হেঁ হেঁ জানি বাবা, আমি যে বিশ্বভুবন ঘোরা লোক!'

আপন মনে বকতে ভালবাসে কানাই। কথাই তার বন্ধু। সে তর্ক বাধিয়ে মাথা গরম করে দেয় না। তবে বিবেক— বোধহয় পিত্তের থলির মধ্যে যার সিংহাসন— সে মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলে বটে।

ঢোলের বুলি খুবই অশ্লীল বলে বাবা নয়, ঠাকুদ্দা তা শেখায়। ষোল থেকে আঠারো বছর বয়সে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ফিরেছে— শহরে নগরে—বড় পুজো-কালীপুজোর সময় বাপ আর ঠাকুদ্দার সঙ্গে। তারপর হঠাৎ সে হাওয়া। বৃন্দাবনে দশ বছর খেউরি করেছে মানুষের। সেখান থেকে দিল্লি, আগ্রা, যোধপুর, সোমনাথ ঘুরে পাটনায়। তারপর বাড়ি এসে বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করে। সে হাওয়ায় ওড়া চিচিঙ্গে হলে কি হবে তার বউ পিঁটুলীবালা ঢোল দোহারা গড়নের, মাথা সমান ঝাড়াই মেয়ে—তাকে চর্কিপাক ঘুরিয়ে দিতে পারে। ধান কাটে কচকচ্, ধান ঝাড়ে পটপট। ড্যাবাড্যাবা চোখ। তিন তিনটে ছেলে। নাম হুড়কো, দেড্‌টা, কটাশ।

মান্না পড়ায় ছান্দবাড়ি। নাতি-বাপ-খুড়ো-খুড়তুতে, জ্যাঠতুতো ভাই-ভগ্নর মিলে তিরিশজন— ক্ষুর টেনে কেবল খেউরি করা। ন্যাড়া পিছু দু-টাকা আর ধুতি-গামছা। ভরদম খাওয়া তো আছেই। তবে নিরামিষ। তাহোক, পটল-ধোঁকা, আলুপোস্ত, ডালের বড়া, খেজর-লাউ কত কি খাওয়া! শানের ঘাটে এক একটা ন্যাড়া করে ছাড়া আর গুনে রাখা— তার মধ্যে বকমবাজি করা। মান্নাবুড়ো বটগাছ—ডালপালায় বিস্তর।

ষাট টাকা ট্যাঁকে, গামছায় বাঁধা চারজনের মতে নুতন মালসায় এক মালসা খাবার বাঁধের পথে আলো-ছায়ায় পাখির গানের মধ্যে মন যেন উতালা হয় এই আটচল্লিশ বছর বয়সে। 'হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে!'

পিঁটুলীবালা তার ছেলে তিনটেকে নিয়ে সনাতন মান্নার ছান্দ খেয়ে নেয় লম্প জ্বেলে মনের আনন্দে। আজ আর রাতের রান্না করেনি। জানে তো ছান্দবাড়ি থেকে ফিরবে।

হুড়কো বলে, 'রোজ-রোজ বেশ ছান্দ হয় বড়লোকদের বাড়িতে। মরুক না, লোক তো বেশি হয়ে গেছে।'

দেড্‌টা বলে, 'চীন আর ভারতে এত লোক পিঁপড়ের মতো জন্মাচ্ছে যে ভগবান-

মশায় কাঁধ দিয়ে হেইয়ো হেইয়ো করে পৃথিবীর গোলাটাকে পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ বচ্ছর পরে ঘোরাতে পারবে না।'

'তখন ভগবানের কাছা খুলে যাবে।' বলে কটাশ নিজেরই কাছা খুলে দিয়ে এক ডিগবাজি খায়।

বাপ এসে পড়লে চুপচাপ।

ষোল, বারো আর আট বছর বয়স ওদের। ক্লাস টেনে পড়ে হুড়কো, ভাল নাম শংকরপ্রসাদ ঢোল। সিক্সে পড়ে দেড়্টা, আনন্দগোপাল। আর কটাশ— শ্রীদাম পড়ে— তৃতীয় শ্রেণীতে।

কানাই ঢোলের আশা তার মতন হতমুখ্যু সে ছেলেদের কববে না— লেখাপড়া শেখানোর জন্যে হাতে-পায়ে ধরবে লোকের— ধরেও। বড় বড় বাড়িতে খেউরি করতে যায় সে— বইপত্তর আর মাইনের টাকা চেয়ে আনে। দেশ-দুনিয়ার গল্প বলে তোয়াজ-তোষামোদে আমড়াগাছি না করলে ট্যাঁকের কড়ি সহজে ছাড়ে না কেউ।

হঠাৎ বাবা ঘোষণা করে, 'কাল আবার একটা ছান্দবাড়ির নেমতন্ন আছে।'

'ইয়া!' বলে ছেলেরা দু'হাত তুলে আনন্দ করে ওঠে।

মেজো দেড়্টা বলে, 'তারা মুসলমান নয় তো বাবা?'

'আরে ধ্যেৎ! মুসলমান-খ্রিস্টানদের ছান্দবাড়ি নেই, তারা 'খানা' খাওয়ায় বটে তবে 'ন্যাড়া-গাড্ডুম' হয় না।'

হুড়্কো বলে, 'হিন্দুদের মেয়েরাও যদি ন্যাড়া হতো, নাপিতরা বেশি পয়সা-টাকা পেত।'

'আর বাবা, ন্যাড়া হওয়া! অনেক আগে বামুনের বালবিধবারা পর্যন্ত ন্যাড়া হতো। এখন আধুনিক সেলুন হয়ে আমাদের মতন নাপ্তেদের কাছে আর আধুনিক ছেলেরা ফেসিয়ান ছাঁটে না কেউ। বড় বড় চুল রাখে অনেকে। শুধু বুড়োরাই খেউরি করে কেউ কেউ। এ কাজ করে আর সংসার চলবে না।'

পিঁটুলীবালা পাছায় চাপড় মেরে দেখিয়ে বলে, 'ঢোল আছে বাজাও।

'হ্যাঁ বাবা, আমাদের ঢোল তো পড়ে আছে, বাজানোর বুলি শিখিয়ে দাও না— বড়পুজোর সময় ডাক-ঢোল-চচ্চড়ি-কাঁসি-শানাই নিয়ে সবাই বাজনা বাজাতে বেরোব। ফটকা উপায় হয়ে যাবে।'

'ঢোলের বুলি খুব খারাপ, বাপ শেখায় না— ঠাকুরদা শেখায়। যাকগে ওসব, তোরা মন দিয়ে লেখাপড়া শেখ।'

'আমার স্কুলের দু-মাসের মাইনে বাকি— কবে দেবে বাবা?' বলে হুড়কো।

'তাও তো হাফফ্রি করিয়েছি সেক্রেটারির হাতে-পায়ে ধরে। তিনি আবার যে পার্টির লোক তাদের মিছিলে চিৎকার করে 'শোলোগান দিতে যেতে হয়।'

''পাত্কুয়া' বা কুবোপাখি প্রহরে প্রহরে ঘন ঘন স্বর তুলে ডাকে কি বলে?'

পিঁটুলীবালা পাশে শুয়ে ডাকটা শোনো মন দিয়ে। বলে, 'কুব্ কুব্ কুব্!'

'না, দু-অক্ষরের অশ্লীল শব্দ!'

'তোমার যেমন রুচি।'

'আসলে শব্দ— তাতে ছন্মমাপা যে কথাই বসাও, খেপে যায়।'

সাড়ে সাতটার খবর হয় রেডিও থেকে। 'আবহাওয়ার খবরে জানানো হয়েছে রাত নটার পর একশো পঞ্চাশ মাইল বেগে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বিহার, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া হয়ে কলকাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওপর দিয়ে তুমুল বেগে ঝড় বয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এইসব জেলার অধিবাসীদের সতর্ক থাকতে হবে। প্রশাসনও যেন সতর্ক থাকে। মাটির বাড়ি, গাছপালা, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি ছেঁড়া-ভাঙার কথা আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে।'

খবর শোনার পর কানাই আর তার পিঁটুলীবউ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ছেলে তিনটেকে বলল পাড়ার স্বর্ণব্যবসায়ী রবীন ঢোলের পাকাবাড়িতে পালাতে।

'বিছানাপত্র নিয়ে পালাব বাবা?' শুধোলে বড় ছেলেটা। তার আবার ঝড় আর বজ্রপাতকে ভয় বেশি। ওসব হলে ঠাকুদ্দার আমলের পুরোনো তালকাঠের ভারী তক্তাপোশের নিচেয় লুকোয় সে। আর ছোট ভাই দু-জনকে খুব চেঁচামেচি করে ডাকে।

রাত নটা যখন বাজে সত্যিই উত্তর-পশ্চিম দিকে মেঘ দেখা দিয়ে ঘনঘন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হতে থাকে। ঝড়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

ছেলেরা তো পালিয়ে বেঁচেছে কিন্তু ভাঙাচোরা টালির এককামরা আর দু-পাশে দুটো দাঁড়-ঘরের মায়া ছেড়ে যাবে কোথায় কানাই আর পিঁটুলীবালা? উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। পশ্চিম-উত্তর দিকে অনেকগুলো গাছপালার আড়াল আছে— ঝড়ের বেগ সামলায় তারা। নারকোল গাছ আছে তিন-চারটি। বড় নিমগাছ আছে দীর্ঘ বছর পনেরোর খোপঘরের কাছেই। বেড়ার পাশ দিয়ে মেহগনি আব মাঝারি সুপারিশ্রেণী। জিউলি আর ফরোদ বা মড়কা পারিজাতের মাথায় প্রচুর ফুল-ফোটা বোগেনভিলা আর লবঙ্গ-লতার স্তূপাকার আড়াল।

ঝড় উঠল। পাক খেয়ে ছুটতে লাগল। বৃষ্টিও আরম্ভ হয়েছে। বোশেখ মাসের কালবোশেখী। গাছপালা ভাঙতে লাগল। তবু তারা তুমুল যুদ্ধ করছে। কাদের টালির ঘর পড়ার 'হড়-হড়-হড়—গড়াম!' শব্দ হলো।

'সামাল সামাল— হায় ভগবান— হায় মহেশ্বর! রক্ষা করো, রক্ষ করো এই গরিবদের! আমাদের পাপ-অন্যায় মার্জনা করো।'

তিন-চারবার দম্কা মারার পর ঝড় হাল্কা হয়ে গেল। বৃষ্টি নামল হাল্কা ধরনের। রেহাই— এবার রেহাই।

উঠোনে কাঁচাপাতার রাশি।

বাড়ির চারদিকে ঘুরে দেখল কানাই। আধখানা কাটা ঘর পুবদিকে। জোড়াঘর কেটে

নিয়েছে তার ভাই বলাই। দেয়ালে বোম মেরেছিল অন্য পাড়ার গুণ্ডারা। সেদিকে হোগ্‌লার বাতা দেওয়া। দেয়াল বাঁচানোর জন্যে পেরেক পুঁতে প্লাসটিক আঁটা। ঘরের নিচের দেয়াল নোনা। গত বর্ষায় নিচের গা-ছাল সব ধসে পড়ে যায়। ত্রাণ অফিসে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল রাইটার্স বিলডিংসে। তার প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন পদাধিকার বলে উপসচিব। তিনি জানিয়েছেন, 'আপনার দরখাস্ত উত্তর চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের অফিসে বারাসাতে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সাথে আর কোনো রকম যোগাযোগ থাকল না; যা কিছু করার জেলাশাসকই তা করবেন।'

কানাই তার অল্প বিদ্যেতেই বুঝতে পারল পদাধিকার বলে উপসচিব মশায় তাকে 'গো টু হেল' করে দিয়েছেন— কেননা তার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়— তার জেলাশসক বসেন আলিপুরে— দরখাস্ত পাঠানো হলো তিনমাস পরে উত্তর চব্বিশ পরগনার সদর বারাসাত অফিসে!

কানাই দশটাকা দিয়ে প্রাইমারির প্রাক্তন প্রধান শিক্ষককে দিয়ে বহুৎ অনুনয়-বিনয় করে উপসচিবের দৈবাৎক্রমে ভুলের জন্য নিজগুণে মার্জনা চেয়ে জানিয়ে দিয়েছে কিন্তু কোনো উত্তর পায়নি একবছর পরেও।

এ কথা সে অনেক ভদ্রবাড়ির বুড়ো মানুষদের নখ-চুল-দাড়ি-গোঁফ কাটতে গিয়ে সবিস্তারে বলে এসেছে। তাঁরাও বলেছেন, 'যতসব পাগলের আখড়া ওটা, অবশ্য কেউ কেউ ভালমানুষও আছেন কিন্তু তাঁদের অতসব ছোটখাটো ব্যাপার দেখার সময় নেই। মন্ত্রী মহোদয়দের সালাম বাজাতেই দিন ফুরিয়ে যায়। এখন আবার কোন পার্টির লোক তুমি, কাকে ভোট দাও, স্থানীয় নেতারা দেখবেন ইত্যাদি।...

ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার বিরুদ্ধে এহেন দরিদ্র দেশের মানুষদের জন্যে ভগবান ছাড়া আর কি ভরসা আছে।

পরদিন কানাই ঢোল আবার দেড়কুড়ি লোকের মাথা মুড়িয়ে পেটপুরে খেয়ে গামছায় করে এক মালসা খাবার বয়ে আনল।

বৌ আর ছেলেদের খুব আনন্দ।

কিন্তু গ্রামের মোড়ে মোড়ে যেখানেই যাও গোটা পশ্চিমবঙ্গেই আধুনিক সেলুন ছাড়া ইটে বসে আর কেউ চুলদাড়ি কাটে না। ব্লেড আমদানি হবার পর ভদ্রলোকরা বেশির ভাগই বাড়িতে শেভ করেন।

সেলুনে কাজ চেয়েও পায়নি কানাই ঢোল। কারণ সে আধুনিক হেয়ার কাটিং জানে না। তাছাড়া চেহারা-পোশাক সেই পুরোনো কালের।

রোদে পুড়েও তার আধভিজে গামছা ছাড়া মাথা ঢাকার ছাতা নেই। বর্ষাকালে ছেলেদের ছাতা কিনে দিতে পারে না। বইপত্র প্লাসটিকে মুড়ে নিয়ে কারো ছাতায় ঢুকে পড়ে স্কুলে যায় বর্ষাকালে। হাইস্কুলের পোশাক-পরিচ্ছদও আলাদা এখন।

হুড়কো প্রায়ই মার খায় মাস্টারদের হাতে কারণ তার প্রত্যেক স্যাবজেক্টের আলাদা

আলাদা খাতা নেই। ভূগোলের টিচার খাতা ছুঁড়ে ফেলে দেন। কচ্ছপের আকারের ম্যাপ এঁকেছে সে ভারতের? টিউশনি পড়ে না কেন সে? যে মাস্টারের কাছে না পড়বে সেই প্রায় সাবজেক্টে নাকি ফেল করবেই করবে।

'গরিব লোকের ছেলে তো লেখাপড়া না শিখে দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করো গিয়ে। ঝাণ্ডা বওয়ার লোক পাবে কোথায়?' একজন ধনীলোক উত্তর দেন।

হুড়কো স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অনেক হাতে-পায়ে ধরার পর টেস্টে অ্যালাউ হলো, তিনমাস টিউশনিও পড়ল তার মায়ের জল-খাটা আর হাঁস-মুরগি বেচা পয়সায় কিন্তু কাঁসার থালা-ঘড়া বিক্রি করার টাকায় ফাইনাল দিয়ে ইংরেজিতে ব্যাক পেলে। পরের বছরে আবার সব সাবজেক্টে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ইংরেজি তো ফেলই আবার অঙ্কেও ব্যা'ক পেলে টেস্টেই। লেখাপড়া মিটে গেল।

ঠাকুরদাদার ঢাক-ঢোল পেড়ে সাফ করে ধুলো ঝেড়ে সে বাজাতে শুরু করল।

কানাইও ঢোল নিয়ে বসল। ছেলেকে শেখাতে লাগল, তবে অবসর সময়ে, কারণ নাপিতের কাজ পায় না বলে সে চাষের জন খাটতে যায় যখন যার যে-কাজ পায়। জলসেচের কাজ, বোরোধান রোয়া, নিড়েন, ধান ধানঝাড়ার মেশিন চালানো। পিঁটুলীবালা নার্শারির জল বইতে যায়। মেজো ছেলেটারও পড়াশুনা হলো না। বড় বড় বই, বড় বড় সাবজেক্ট, পেটে খোরাক নেই, গায়ের ড্রেস নেই, খাতা নেই, মাইনে বাকি— কতদিন এই করে চলবে? মার খেয়ে সেও আর স্কুলে গেল না।

অবসর সময়ে সন্ধ্যার পর কানাই তিন ছেলেকে নিয়ে ঢাক, ঢোল, চচ্চড়ি, কাঁসি বাজাতে চাইলেও ছোটছেলে হাঁসাচোখো কটাশ কিন্তু বাজনার ধারে কাছে ঘেঁষে না। কারণ সে পড়াশুনোয় ভাল। থার্ড হয় সে। এ বছর সেকেণ্ড হবেই। টিউশান তার দরকার নেই।

পিঁটুলীবালা কখনো কাঁসি বাজায়, শানাই বাজায় কিন্তু তার সময় কোথায়? রান্না করবে কে? জ্বালানী-কাঠ-পাতা যোগাড় করতে হয়। জমির নাড়া, তাও বিক্রি হয়ে যায় লোকের।

একদিন বাবা বড়-কাছারীর মেলায় সন্তানকামী মায়ের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেড়শো টাকায় যাওয়া-আসার সময় ঢোল বাজানোর নেমতন্ন পেলে কানাই ঢোল। গাড়িতে নয়, মানসিক করে কষ্ট ভোগের দ্বারা হেঁটে হেঁটে পাঁচ মাইল না গেলে বাবা পঞ্চানন্দ সন্তান দেবেন কেন?

শনিবার, মঙ্গলবার বাবা বড়-কাছারীর মেলা। ঢুলীদার কানাই ডাক পাবার জন্যে স্কুলের গায়ে একটা হাতে লেখা বিজ্ঞাপন সেঁটে দেয় অথবা মেলার কাছে এসে মানতকারীদের ধরাধরি করে। অন্তত বাচ্চা হলে বাজি-বাজনা নিয়ে যখন বাবার কাছে আসবে তখন যেন কানাই ঢোলকে ডাকে। দু-চার টাকা কম দিলেও চলবে।

কিন্তু কবে কে ডাকবে তার জন্যে বসে থাকলে কি সংসার চলবে? তাছাড়া কানাই

ঢোলের ষাট বছর বয়স হতে না হতেই হাঁটু আর কোমর ধরে যেতে লাঠি ছাড়া আর গতি নেই।

পিঁটুলীবালার গতর কিন্তু ঠিক আছে। সে ছোবড়া পিষতে শুরু করে মৌলানা সাইফুল সাহেবের। পাশের গ্রামেই বাড়ি। ভদ্রলোক লম্বা পাঞ্জাবি আর জালিদার টুপি পরে অন্য আর একটি গ্রামের মসজিদে ইমামতি করলেও দূরে দূরে প্রায়ই মিলাদে বক্তৃতা করতে যান। অবসর পেলে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বসে হাতুড়ি দিয়ে ছোবড়া পেষেন। লোকটির ব্যবহার খুবই [illegible]। কানাইও বসে বসে ছোবড়া পেষে, অথবা পেষাই-করা ছোবড়া নুচে নুচে শুকোতে দেয়। [illegible] মাল বেশি পাওয়া যায় না ডাব বেচার জন্যে।

পরপর সাত বছর গেল বাঁখারি-বাঁশ বদল করে। সামনে আবার বর্ষা আসছে। এ বর্ষায় ঘর তাদের থাকবে না। বাঁশও নেই। বিস্তর দাম এখন বাঁশের। চল্লিশ বছরের দেয়াল আর ছাউনির ঢাকা খারাপ হয়ে গেছে। জল পড়ে নানান জায়গা দিয়ে। লাঠি দিয়ে টালি উঁচু করে ধরে থাকলে নালা পরিষ্কার হয়ে যায় জেনেও তা করা যায় না, কারণ বাঁখারির বাটাং পচে গেছে— মড়াং করে ভাঙলেই গড়গড় হড়হড় করে সব টালি নেমে আসবে।

দুর্ভাবনার স্তূপের ওপরে যেন বাস করছে কানাইরা। অথচ ঘর না পড়ে গেলে পঞ্চায়েত থেকে কিছুই সাহায্য পাওয়া যায় না। শুধু পড়ে গেলেও হবে না, অন্তত দশ বছরে এর-ওর বাড়িতে বা রাস্তায় জীবন-যাপন করা চাই। তারপর হাজার কুড়ি টাকা। মিলতে পারে একখানা মাত্র ইটের ঘরের জন্যে। তাও ক্ষমতাসীন দলের পিছনে অনলস কর্মী হয়ে লেগে থাকা চাই।

হুড়কো নানান জায়গায় ঘুরল একটা কাজের জন্যে। অনেক কষ্টে যে টুকু বিদ্যে সে শিখেছিল কয়েকটা নম্বরের জন্যে কোনো কাজেই লাগল না।

শেষে একদিন কাজ পেলে মাইল দুই দূরের একটি আধুনিক সেলুনে। জুটমিল এলাকার বড় আকারের বাজারে সেলুনটি। বহু খদ্দের। প্রথম দাড়ি চাঁছার কাজ করবে। তারপর চুলকাটা শিখে নেবে। মাসে তিনশো টাকা পাবে। দোকানে সব সময় পাখা আর রেডিও বা টিভি চলে। দেড়টারও কাজ জুটল সেখানে। প্রথমত দোকানের ফাই-ফরমাস শোনা, চা আনা-জল আনা, বাচ্চাদের ন্যাড়া করা। দুশো টাকা মাইনে তার। তবু যাহোক, জাত কাজটা না পেলেও এক প্যাঁচে হাজার চুল তো কাটবে।

একবছর যেতে না যেতেই পাকা কাজের লোক হয়ে গেল হুড়কো। হিন্দুস্তানী বা হিন্দিভাষী বেহারী জুটমিল শ্রমিকদের চৈতন রেখে ঘাড় তুলে মাথার প্রায় মাঝখান পর্যন্ত মিহি থেকে মোটা করে চুল ছাঁটতে সে ওস্তাদ কারিগর হয়ে গেছে। ছ-শো টাকা মাইনে হয়ে গেল। তার আর একটা কারণও আছে, সে হিন্দি গান গাইতে পারে। বাজনা বাজলেই সে গান গায়। আর অঙ্গভঙ্গি করে নাচেও। সে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। তাকে আলাদা বখ্‌শিস্‌ও দেয় খদ্দেররা।

একদিন পাঁচজনেই হায় হায় করে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল রাতভরে বৃষ্টি হয়ে ঘর পড়ার ভরে। ছিটোবেড়া বসে যেতে পুবদিকের ছাউনিটা ঝুঁকে যেতে আরম্ভ করেছে।

তাড়াতাড়ি পড়শিদের বাড়ি থেকে বাঁশ-কাঠ এনে ঠেক দিয়ে সবাই মিলে হাতে হাতে ঘরের সব টালি নামিয়ে ফেলল। স্কুল ফাইনাল পাশ করে এইচ এসে ভাল রেজাল্ট করে বি এসসিতে পড়ছে তখন হাঁসাচোখো কটাশ। সে উঠল ঘরের মট্‌কায়। কারণ সে হিসেব করে বলল যদি দু-হাজার টালি নেমে যায় তাহলে ভার অনেক কমে যাবে— দেয়াল পড়বে না। কিন্তু তাকে ঘরের মট্‌কায় তুলতে মা-বাবা দু-জনেরই রাজী নয়, কারণ সে তাদের কাছে রত্ন। পড়াশুনা করছে।

দাদা দু-জনও অবশ্য চায়নি, অবশ্য.....দ্বিধা দেখে কটাশ চার হাতে-পায়ে ভর রেখে খুব সাবধানে মাঠগুদামের ভেতর দিয়ে টালি নামিয়ে দিতে লাগল তারপর দেয়ালের মাথার দাঁড়াল ভাই দুজন।

টালি সব নামানো হতে যেন স্বস্তি।

অনেক বাঁশ বাঁখারি— ডাঁসা, পাড়, বাটাং পচে উঁই ধরে নষ্ট হয়ে গেছে— খুলে ফেলে দিল। কি করে যে এই ঘর খাড়া ছিল সেটাই আশ্চর্য হয়ে ভাবে সবাই।

টানা তিনদিনের লাগাতার বৃষ্টি নামল তারপরে। চারদিকের দেয়াল মাঠগুদাম স্তূপাকার হয়ে পড়ে গেল। শব্দে মাটি নেচে উঠল।

চার বাপ-বেটায় কিছু বাঁশ কিনে অনেকটা মজবুত মতো পুরনো বাঁশ নিয়ে একজন ঘরামি মিস্ত্রিকে নিয়ে আবার দু-কামরা ছিটেবেড়ার খুঁটি-পোঁতা বাড়ি খাড়া করল।

জাব্‌ করে কাদা ধরিয়ে লেপা-পোঁছা করে বাস করার মতো ঘর তৈরি হলো।

পঞ্চায়েত মেম্বার বলেছিলেন অপেক্ষা করতে, তাহলে সরকারি সাহায্যটা হয়তো পেয়ে যেত কিন্তু কানাই বলল, 'কোথায় থাকব, কার গোয়াল ঘরে, তুমি জায়গা দেবে ভাই? আসলে সরকারি অনুদানের যোগ্য আমরা নই কারণ আমাদের মতন বহুলোকেই এখন দেশ ভরে গ্যাছে। শুধু শহরের চকচকে আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলো দেখলেই কি দেশের অবস্থা বোঝা যাবে?'

তালকাঠের তক্তাপোশটা ভারী দেয়াল পড়ে ভাঙেনি! আড়াও ঠিক ছিল।

হুড়কোর বিয়ের প্রস্তাব আনল তার সেলুনের মালিক বৃন্দাবন পরামানিক। শংকরপ্রসাদ ঢোলকে সে জামাই করবে। পিঁটুলীবালা জানত তার বড়ছেলের হিন্দি গান শুনে আর রংঢং করে নাচা দেখে বৃন্দাবন-কন্যা গুগ্‌লিবালা প্রেমে মাতোয়ারা। তাকে ছাড়া অন্য কাইকে বিয়ে করবে না সে। না হলে গলায় ফাঁসি।

হুড়কো বিয়ে করল। সে শ্বশুরবাড়িতেই রয়ে গেল। কারণ বৃন্দাবনের ঐ এক মেয়ে ছাড়া ছেলে নেই।

কানাই বা পিঁটুলীবালা খুশি হলো না।

মেজোছেলে দেড়্টা যা রোজগার করে আনে তাতে চলে না। পাঁচশো টাকা পায় মাত্র সে। হুড়কো আর টাকাপয়সা দিতে চায় না। সে নাকি আলাদা একটা সেলুন দোকান খুলবে উপশহর এলাকায়।

দেড়্টা শুধোয়, 'তাহলে সংসার চলবে কি করে? মা-বাবাকে দেখবি না, তারা তোকে খাইয়ে-ধুইয়ে মানুষ করেনি?'

'তোকে জ্ঞান-উপদেশ দিতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দে। আমি বাড়িতে খেতেও যাব না, আর কিছু দিতেও পারব ন। কিসের আইন কববি তুই?'

'তোর মতন অমানুষের মুখ দেখতেও ঘেন্না করে। ঠিক আছে, পৈতৃক ভিটেতেও তুই আর উঠবি না। আমি আর তোর শ্বশুরের দোকানের কাজ করব না। তুই তোর বউয়ের 'ভেড়ুয়া' হয়ে জল তোল।'

দেড়্টা সপ্তাখানেক ঘোরাঘুরির পর আরো শহরে চৌমাথানী রাস্তার বহু বাস-লরি-ট্রেকার-অটোর ভিড়ে সরগরম জায়গায় বড় সেলুনে কাজ পেলে। মালিক এক মহিলা। তাঁর বিউটি পার্লার আছে। মিষ্টি আর ঠাণ্ডা পানীয়ের দোকান আছে। পাঁচতলা বাড়ি। সন্তানাদি নেই তাঁদের।

দু-হাজার টাকা মাইনে ঠিক হলো আপাতত তার কাজ দেখে।

কটাশ ক্রমেই ভাল রেজাল্ট করে এম এসসি করতে গেল। বেহালা অঞ্চলের চারটি ছাত্রছাত্রীকে পড়ায় সে এক বাড়িতে থেকে—খাওয়া-খরচ বাদে শুধু টিউশনি করে দু-হাজার টাকা পায় সে।

কিন্তু বাড়ির ভাবনা রয়েই গেল কানাই ঢোলের। মেজোছেলের বিয়ের কথা উঠলে সে ক্ষেপে যায়। বলে, 'কেন সুখ সহ্য হচ্ছে না তোমাদের? বউ করলে আমিও তো গাড়োল হয়ে যাব। ওসব কারবারে নেই।'

তিনমাস চলে গেল কটাশ আর আসে না। হঠাৎ একদিন এসে বাপকে দু-হাজার টাকা দিয়ে গেল। তার কথায় জানা গেল এম এসসির রেজাল্ট ভাল করতে পারলে যে কোটিপতির বাড়িতে থাকে তাঁদের দ্বারা বিদেশে পড়তে যাবে, তারপর দেশে ফিবে তাঁদেরই ব্যবসা-বাণিজ্য দেখার চাকরি করবে।

এই ছেলেটাকে 'যাও পাখি' বলে উড়িয়ে দিতে কানাই ঢোল বা পিঁটুলীবালার অন্তরে স্নেহের টান তেমন পীড়া দেয় না।

দেড়্টা আস্তে আস্তে এক হাজার করে মাঝে মাঝে ইট কিনতে থাকে। সেলুন ছেড়ে সে মিষ্টির দোকান চালায়। মালিক মহিলাটি তাকে প্রায় আপন ভায়ের মতো নাকি ভালবাসেন।

বাবার ঢোলটা পেড়ে কানাই বসে বসে একাই সন্ধ্যার পরে বাজাতে থাকে আস্তে আস্তে আর গান করে, 'হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে।'

পিঁটুলীবালা আলো নিভিয়ে দিয়ে ছিটেবেড়ার ঘরের তক্তাপোশে শুয়ে দেখল চাঁদ উঠছে

পূর্ণিমার পরের দিন। ডাকল 'কই গো, শুতে আসবে, নাকি সারারাত ঢোল বাজাবে? একবস্তা ধান পাছড়ে আমার গতর কনকন করছে— দয়া করে একটু তেল মালিশ করে দেবে এসো।'

কানাই উঠল। বলল, 'জয় রাধে, রাধাই হলো কৃষ্ণপ্রেমের জন্মভূমি।'

কিন্তু দেড়্টাও আর আসে না কেন? এক মাস পার হয়ে গেল। কানাই হাঁটু-ধরা মানুষ, গাড়ি-ঘোড়ায় উঠতে তার কষ্ট হয় তাই পিঁটুলীবালা ছেলের খোঁজ নিতে এসে বেশ কিছুক্ষণ মিষ্টিদোকানে বসে থাকার পর একটি চটকদার মেয়ে তাকে বিউটি পার্লারের মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে তখন মালিক মহিলাটির প্রসাধন-সাজগোজ চলছে। বয়স বছর চল্লিশ হলেও বেশ ভরাটি চেহারা। দেড়্টাও নটবর সেজেছে। তাঁরা এখন কলকাতায় এক হোটেলে নাকি ফাংশান দেখতে যাবেন। বাইরে মোটর তৈরি।

দেড়্টা খুব অখুশি। মাকে বলল, 'এখানে তোমাকে কে আসতে বলল? যাও যাও, বাড়ি যাও। আমি কবে যাব ঠিক নেই। বড়বেটার কাছে যাও।'

গাড়ি বেরিয়ে গেল। মেয়েটির চেহারা চোখমুখ দেখে পিঁটুলীবালার ধারণা হলো ইনি একটি সাক্ষাত রাক্ষসী। তার ছেলেকে শোষণ-মোক্ষণ করছেন। কানাই ঢোল সব শোনার পর বলল, 'রক্ষে করো রাধামাধব! চলো আমরা বৃন্দাবন-ধামে চলে যাই— সেখানে ক্ষুরকাতা নিয়ে বসব, না হয় হরিনাম গেয়ে ভিক্ষে করব দু'জনে— থাক ঘরকন্না পড়ে— আর কার জন্যেই বা থাকব— কে খেতে-পরতে দেবে? ছোট খোকার টাকাগুলো আছে, চলো এইবেলা চলে যাই।'

সত্যিই তারা গাঁটরি পিঠে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। হাঁটাপথে উদোম হাওয়া। তারা গাইতে গাইতে চলেছে, 'হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে।.. ...'

হরেনের মাথার চুল

খায়রুল বাসার

সংসারের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন জেগে থাকেন শুধু অবিনাশ একা। নিদ্রিত সংসারের একটা শব্দ আছে। শোনেন। নিদ্রিত পরিপার্শ্বও নয় শব্দহীন। খুটুস্ খাটুস্। দূরে বোম্বাই রোডে গাড়ির ভোঁ-ভোঁ, ট্যাঁ-ট্যাঁ। আরও দূরে দামোদর বা রূপনারায়ণ ব্রিজে রেলগাড়ির ঘড়ঘড়ানি। এসবও তাঁর কানে আসে। আর ভাবেন। যেমন তেমন, যা মনে আসে।

মনে আসে। বস্তুত তিনি ভাবেন না। ভাবনাগুলো তাঁর মনে এসে যায়। যেমন, হরেনের মাথার চুল!

ছোঁড়াটা মাথার উপরে অত বেশি করে চুল রাখে কেন? দুকোন ঢাকা পড়ে যায়। ঘাড়ের উপরে যেন চুলের বোঝা। তেল মাখে না। আজকাল নাকি তেল মাথার চল নেই। শ্যাম্পু করে। তা করুক। কিন্তু কী যে মানান দেয় তাতে!

বলা হয়েছে, চুলগুলো দয়া করে ছেঁটে ফেলো। একটু তেল মাখো। তাতে শ্রী তোমার বৃদ্ধি পাবে। ছোঁড়া ফিক্ ফিক্ হাসে। হাসবেই তো। আরে, এসব কথা বলতে হয় ছেলের বাপ মাকে। ছেলের বাপ বলতে নরেন। ওটাকে কী একটা পুরুষ মানুষ বলা যায়? সকালে ঘুম থেকে ওঠে। দাড়িটা নিজের হাতে কামায়। চাট্টি গরম ভাত খায়। হাতে করে ব্যাগটা নিয়ে ল্যাদাডুর মতো হেঁটে হেঁটে গিয়ে বাস ধরে। তার পরে ট্রেন। এইভাবে নরেনের অফিস যাওয়া। এইভাবেই রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসা। হাত মুখ ধোয়া। আবার চাট্টি গরম ভাত খেয়ে শুয়ে পড়া। শুধুমাত্র মুখ ধোয়ার সময় অনেকক্ষণ করে কুলকুচি করা আর গলা খাঁকারি দেওয়া ছাড়া নরেন তেমন কোনো শব্দটব্দ করে না। জীবনযাপনের এই রকম একটা ছকের বাইরে মানুষটা আর কিছু ভাবতে পারে বা করতে পারে, তা তো বিশ্বাস করা দায়।

ছেলের মা—বড় বৌ! এখনও যার সিনেমা-পত্রিকা ছাড়া সময় কাটে না, চোখে ঘুম আসে না, সে আর ছেলের মাথার চুলটুল নিয়ে ভাববেটা কখন! সামনাসামনি অবিশ্যি খুবই ভক্তিমতী। তা, ভক্তি ব্যাপারটা কী নিছক আপনি, আজ্ঞে—বাবা, আর একবার চা খাবেন—ওরে খোকা, দাদুর ট্যাবলেটটা যেন আনতে ভুলিস না— ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদিকে, তোদের মেয়ে দুটি যে ধ্যাধ্যাড় করে বড়ো হয়ে উঠছে, সে কথা ভাবিস? কখন ভাবিস? ভাবিস যে, তা আমি জানতে পারি না কেন? আমার সামনে আলোচনা করলে মাথা হেঁট হয়ে যায়? চোখে তা দেখতে পাই, নিত্য নতুন ডিজাইনের জামা কাপড় কিনে পরাচ্ছিস। স্কার্ট ফ্রক, সালোয়ার কামিজ, মিডি, ম্যাক্সি, শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। হুঁশ নেই, ঐসব অপব্যয় কাট ছাঁট করে মেয়ে দুটোর বিয়ের জন্য সঞ্চয় বাড়াতে হবে! প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের লোনের টাকায় আজকাল বিয়ে হয়? গর্দভের দল!

এবং ইজিচেয়ারে শুয়ে অবিনাশ মাঝে মাঝে পড়াশুনা করেন। এখন গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন আসায় ঝলমলে আলো। পড়তে অসুবিধা হয় না। বই-এর তাকে কয়েকখানা ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এমনকি বেদ, গল্পে উপনিষদ। আজকাল বাংলায় কোরান, বাইবেল পাওয়া যাচ্ছে। ছেলে দুটোকে বলে বলে হদ্দ— আনিস তো কিনে। আরে, নিজের ধর্ম তো জেনেও মানতে হয়, না জেনেও মানতে হয়। ও আর নতুন কথা কী! জানতে হয় অন্য ধর্মের কথা। আমাদের সময়ে এসব বই এত এত পাওয়া যেত না। যেত হয়তো, খেয়াল করিনি। তখন আমার এসব খেয়াল করার কথা নয়! এখন ইচ্ছে করে। খুব প্রবলভাবে ইচ্ছে করে। মানুষ এমন জন্তু-জানোয়ারের মতো হানাহানি করে মরছে কেন? ধর্মের বই-এ এরকম লেখা আছে নাকি? তা, এখন আর কলকাতা যেতে পারি না। তোরা যাস। একটু খেয়াল করলেই দু'একখানা বই অফিস ফেরতা হাতে করে নিয়ে আসতে পারিস। কিন্তু আমার ইচ্ছে-টিচ্ছের তোয়াক্কা তোরা করিস? তবেই হয়েছে!

কতকটা অভিমান ভরেই যেন অবিনাশ রাতদুপুরে সকালের বাসি খবরের কাগজটা খুলে বসেন। দেশটা গোল্লায় যেতে বসেছে। কোনোরকম নিয়ম শৃঙ্খলা, আভিজাত্য, আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাসের বালাই-টালাই নেই। কে কী করছে, কেন করছে তার কোনো মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

অবিনাশ তাকিয়ে থাকেন ফুল সাইজ ফটোখানার দিকে। প্রত্যেক ছেলের ঘরেও একখানা করে আছে। প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি। এটা তাঁর হরহামেশার কাজ। সরলার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর জগৎটা হঠাৎ ছোটো হয়ে গিয়ে দোতলার এই চোদ্দ বাই দশ আয়তনের কামরায় রূপান্তরিত হয়েছে।

তিনি এবং সরলা। ভালই তাঁরা। এখন যেন তাঁরা পরস্পরকে আরও বেশি করে চেনেন। সরলা বেঁচে থাকতে থাকতে অবিনাশ তাঁর অনেক কাজ মেনে নিতে পারতেন না। কাজ, যেটা তিনি ছাড়া আর পাঁচজনেও দেখতে পেত। কাজের বাইরে যে সরলা, তাঁকে তিনি তখন একটা খুব বেশি দেখতে পেতেন। অভ্যাসের অভাব, অনুশীলনের অভাব, সুযোগের অভাব। এখন বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। এখন তিনি অনায়াসে বুঝতে পারেন সরলার প্রসন্নতার খাঁজ-ভাঁজ-জোয়ার ভাঁটার বিভঙ্গ সমূহ। ভারি তৃপ্তিদায়ক। সরলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি যথারীতি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শুষে নিতে পারলেন তাঁর এখনকার মতো প্রয়োজনীয় প্রসন্নতা। চুলোয় যাক্ খবরের কাগজ এবং বাসি খবরের রাশি রাশি জঞ্জাল।

তিনি তাক থেকে কথামৃত তুলে এনে যথাসম্ভব সুশান্ত ঋজুতায় পাঠে মনোনিবেশ করলেন।

২

সবাই যখন জেগে ওঠে, অবিনাশ প্রায়শ তখন জেগে থাকেন। বড় বৌ হরেনের মায়ের— দিনের প্রথম কাজ, তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে যাওয়া। ইদানীং চিনিবিহীন। সাংসারিক কাজের এই পাঠটি সরলার কাছ থেকে পাওয়া। মুখ হাত ধুয়ে হাতে হাতে চায়ের কাপটি নিয়ে অবিনাশ প্রত্যহ বড় বৌকে আশীর্বাদ করেন। মুখ ফুটে নয়, একটু হেসে। মেয়েটি যথারীতি তাঁর শরীরের কুশলাদি জানতে, রাত্রে সুপরিমিত ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করতে কদাচ ভুল করে না। এতে তিনি চা-এ চুমুক মারতে মারতে বেশ খুশি হয়ে ওঠেন। সমস্ত কৃতিত্ব সরলার, এটা তিনি প্রত্যহ প্রাতে স্মরণ না করে পারেন না। নরেনের বিয়েতে দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি ফর্দ তিনিই রচনা করেছিলেন, কিন্তু পাত্রী নির্বাচনটা করেছিলেন সরলা স্বয়ং।

যথানিয়মে একটু বেলায় জল-খাবার নিয়ে আসে ছোট বৌ। একেবারে ছকে বাঁধা। অবিনাশের উপরে উপরে এইটুকু জানা আছে, সরলার মৃত্যুর পর থেকে দুই ভাই পৃথগন্ন। সমস্যা বা সমাধান, কোনটাই তাঁর গোচরীভূত ছিল না। ছেলেরা বা দুই বৌ— কেউ তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলেনি। হয়তো তাঁর উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। হয়তো তিনি ব্যাথা পাবেন। কারণ কিছু না কিছু ছিল নিশ্চয়। ওরা যে সবলার জীবদ্দশায় কাজটা সারার চেষ্টা করেনি, এই যথেষ্ট। এতেই তিনি পরিতৃপ্ত। তাছাড়া, তাঁর তো কোনরূপ অসুবিধাও হচ্ছে না। সংসারের সংঘাত সংঘর্ষের কষ্টদায়ক শব্দ থেকে তিনি মুক্ত। হরেন গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছে। তাব দুই বোনের একজন পড়ে কলেজে এগারো ক্লাসে, অপরজন ক্লাস নাইনে। ছোটছেলের ছেলে আর মেয়ে পড়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ইস্কুল থেকে বাক্সর মতো রিক্সা গাড়ি এসে বাড়ি থেকে তাদের নিয়ে যায়, বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

তার নিজের হাতে এবং অবশ্যই সরলারও, রচিত সংসারের এই চিত্রপট তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক, আদৌ তা নয়। অবিনাশ প্রাতঃভ্রমণ করেন না। অবসরপ্রাপ্ত প্রাতঃভ্রমণকারিদের বরাবরই তাঁর কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, অপরিতৃপ্ত, পরচর্চাপরায়ণ, ছিদ্রান্বেষণপ্রিয় বলে মনে হয়। তাছাড়া, এই মফস্বল-ঘেঁষা গ্রামাঞ্চলে চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত মানুষও বিরল। ঐ কানাইবাবু, উমেশবাবু, সনাতনবাবু আর তাঁদের সঙ্গী কেশব নন্দী যিনি ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবসা পরিত্যাগ করে প্রাতঃভ্রমণবাদী হতে বাধ্য হয়েছেন। হয়তো একরকম বহিরাগত বলে চারজনের এই দলটা তাঁকে কেমন যেন এড়িয়ে চলে। পিচ-রাস্তায় গা-ঘেঁষা তাঁর স্বনির্মিত নতুন বাস্তু বসতের প্রতিবেশে তিনি এখনও প্রায় আগন্তুক। এখানকার পড়শিদের সম্পর্কে কোনদিনই তেমন আগ্রহ বোধ করেননি। জমিটা পেয়েছিলেন সস্তায়। এখন জমি, যার দর অচিরেই আকাশচুম্বি হয়ে উঠবে এই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর হিসাবে এতটুকু ভুলচুক হয়নি, এটা দেখে তিনি অতি সহজেই ভুলে যেতে পেরেছেন কয়েক মাইল ভিতর দিকে অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁর পৈতৃক জন্মভিটার দুর্মর আকর্ষণটাকে।

তাঁর নিজের তৈরি এই নিচে তিন কামরা, উপরে তিন কামরা মায়-বারান্দা দোতলা বাড়ির সংসার এবং বিশেষভাবে দোতলার এই একশ চল্লিশ বর্গফুট কামরায় সীমাবদ্ধ নিজস্ব জগৎ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সূর্যাস্ত তিনি দেখতে পান না ঠিকই, তবে নিত্য দিনের সূর্যোদয়ে তাঁর প্রায় অবাধ অধিকার। ওদিকটায় একসারি সুপুরি গাছ। এই বাড়ির সমবয়সী এবং অবিনাশের বড় কাছাকাছি। ইচ্ছা করলেই অবিনাশ তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তারা নির্বাক ধৈর্যশীল শ্রোতা। শুধু ভয় হয়, আর একটু মাথা চাড়া দিলে গাছগুলো সূর্যোদয়ের প্রথম আলোকে ঢেকে দেবে। তিনি কি বারণ করতে পারবেন? যেমন, এখন কি তিনি তাদের উদ্দেশে বলতে পারবেন, হরেনের মাথায় কেন এত চুল?

অবিনাশ মনে মনে প্রাণ খুলে হো হো করে হেসে ওঠেন। যেন আচমকা এক অভাবিত বিস্ফোরণ। সরলার ফটোর দিকে তাকিয়ে তিনি লজ্জিত হন। বড় ছেলের ছোট মেয়ে রিনি এসে তাঁর সামনে আজকের খবরের কাগজটা রেখে দেয়।

তিনি আনমনে জিজ্ঞেস করেন, তোর দাদা কোথায় রে?

— নিচে আছে। ডেকে দোব?

— না।

রিনি চলে যাচ্ছিল। অবিনাশ ডাকলেন, এই শোন্। রিনি মানেটা কি বল্ দিকি।

রিনি হেসে ফেলে।

— জানিস না তো? জেনে নিস। আর শোন্—

এ কি! কাগজের ভাঁজ খুলে অবিনাশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পাঞ্জাবে আবার খুন! চব্বিশজন! বাস থেকে নামিয়ে!

ঘাড় তুলে তিনি শশব্যস্ত হযে রিনিকে বললেন, তোর দাদাকে একবার ডেকে দিস তো।

এরকম অনেকবার চেয়েছেন। হরেনের মুখোমুখি হতে। হরেনকে তিনি গড়েননি। তার বাবাকে গড়েছেন। বি. এ. পাশ। বোধহয় তাঁর অভিরুচির অনুরোধে নরেনের মাথার চুল সাবেক কালের মতো সভ্যভব্য। পরিধানে সতত ফুল প্যান্টের সঙ্গে ফুলহাতা সার্ট। তাঁর মৃত্যুতে যথারীতি' তাঁর মুখাগ্নি করবে। কিন্তু হলে কি হয়, তাঁর এই ছেলে বস্তুত একটা ল্যাদাড়ু এবং স্ত্রৈণ। হরেনের কাকা নগেনকে অবিনাশ গড়েছেন। এল. এম. ই পাশ, হাফ ইঞ্জিনিয়ার। চটপটে, কায়দাবাজ। ঘন ঘন জামার ডিজাইন বদলায়। কলারওয়ালা রঙ্গিন গেঞ্জি পরেও অফিসে বেরোয়। তিনি ডাকলে কাছে আসে। একটু দেরি করে। না ডাকলে কখনও আসে না। শোনা যায়, বউ-এর নামে একটা ছোটখাটো কারখানা ফেঁদে সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করে। উপায়-সুপায় ভালই। শুনতে মন্দ লাগে না।

কিন্তু হরেন? তাকে তিনি গড়েননি। তার মাথায় কাকের বাসার মতো চুলের বোঝা। তিনি মাঝে মাঝে ইচ্ছুক হয়ে পড়েন তার মুখোমুখি হতে। যেন মাঝে মাঝে তাঁর জেদ চেপে যায়।

৩

বেশি দেরি হয় না। হরেন আসে। বেশ একটু সেজে-গুজে। যেন কোথাও বেরোবে। মুখে লাজুক লাজুক হাসি।

সুতরাং অবিনাশ প্রথমেই জানতে চাইলেন, কোথাও যাবি না কি?

— হ্যাঁ। আজ তো আমার ব্যাঙ্ক-ক্লার্কশিপের পরীক্ষা।

অবিনাশ অনাগ্রহী। কিছুদিন যাবৎ হরেন এই রকম পরীক্ষা-টরিক্ষা দিয়েই চলেছে।

— পরীক্ষা তো দিচ্ছিস, পাসটাস করতে পারবি?

অবিনাশ উদাসভাবে জানতে চাইলেন। আসলে হরেনকে এখন তিনি ডেকেছিলেন তো অন্য কারণে। তার মুখোমুখি হতে। কিন্তু লগ্ন প্রতিকূল।

— মাথা খারাপ?

অবিনাশ চমকে ওঠেন। কিন্তু হরেনের মুখে লাজুক লাজুক হাসি। অসৌজন্যের অভিযোগটা আনা যায় কি!

— কেন?

— পাস করলেই চাকরি হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর অবিনাশের ঠিক জানা নেই।

— আপনাদের আমলে হতো?

অবিনাশ উত্তরপুরুষের মুখের দিকে তাকালেন। না, সেই মার্কামারা লাজুক লাজুক হাসিটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

অবিনাশ সরলার ফটোর দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, আমাদের যুগে চাকরির জন্য এসব পরীক্ষা-টরিক্ষা ছিলই না।

— ছিল না? তাই বুঝি? গ্র্যাজুয়েট উত্তরপুরুষ উদাসভাবে বলে। অবিনাশ সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। কী বলতে চায় হরেন?

— আজকের কাগজ?

হরেন ছোঁ মেরে কাগজটা হাতে তুলে নেয়।

— দেখছিস? পাঞ্জাবে আবার চব্বিশজন খুন!

অবিনাশ ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলেন। লক্ষ করলেন, হরেন খুব দ্রুত খবরের কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। ওকে এখন মন্দ দেখাচ্ছে না।

হাতে সময় থাকলে এখুনি ওর মুখোমুখি হতেন।

— দেখলাম।

হরেন তাঁর সামনে কাগজটা নামিয়ে রেখে বলে, এসব তো দেখতেই হয়, কেননা, চাকরির পরীক্ষায় এসবের উপরেও প্রশ্ন পড়ে। আপনাদের আমলটাই ছিল ভাল। চাকরির জন্যে পরীক্ষা-টরিক্ষা দিতে হতো না।

হরেন হাসে। লাজুক লাজুক নয়। শব্দ হলে এই হাসিকেই অট্টহাসি বলা যেত। অবিনাশ একটু ক্ষুণ্ণ হলেন।

— আর হাতে সময় নেই বলে হরেন নিচু হয়ে নিয়মিত তাঁকে প্রণাম করল। আবার সেই লাজুক লাজুক হাসি।

অবিনাশ মনে মনে আশীর্বাদের ভাষা খুঁজে পাবার আগেই হরেন ভদ্রভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আবার রাত্রি আসে। সকালটা যেরকম প্রসন্নতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, দিনটা অনিবাশের সেভাবে আর কাটল কই! 'আপনাদের আমলটাই ছিল ভালো—' এই কথার মধ্য দিয়ে কী বলতে চেয়েছিল তাঁর তৃতীয়পুরুষ! নেহাৎ কথার কথা, না, আর কোনো নিগূঢ় তাৎপর্য আছে? ঘুরে ফিরে তাঁর মনে কথাটা প্রশ্নের আকারে হানা দিয়েছে বারবার। তবু ভালো, তাঁর এখন আর কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রশ্নে দীর্ঘক্ষণ নিবদ্ধ থাকার সামর্থ নেই।

রাত্রির প্রথম ভাগে সংসারেব অনুচ্চ কলরব। দু'ছেলের দু'ঘরে রেডিও। ছোটো ছেলে নাকি শিগ্‌গির একটা টেলিভিশন আনবে। দুই মেয়ে শহরবাসিনী। একজন হাওড়ায়। একজন কলকাতায় দু'জনের বাড়িতেই টিভি এসে গেছে শুনেছেন। ভাল। সরলার মৃত্যুর পর থেকে এই ক'বছরে তাদের কারও বাড়িতে আর যাওয়া হয়নি। তাদের ভরভরন্ত সংসারে কুশলাদি তিনি যথাযথভাবে পেয়ে আসছেন, এতেই তিনি সন্তুষ্ট। সুতরাং মেয়েরা বা ছেলেরা কেউ তাঁকে তেমন একটা সম্পৃক্ত, চিন্তান্বিত বা উৎকণ্ঠাগ্রস্ত রাখতে চায় না। তাঁর এই চার দেওয়াল ঘেরা একশচল্লিশ বর্গফুটের জগতটাকে উপদ্রবমুক্ত রাখতে সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টাশীল। এখানে তিনি প্রায়ই জেগে থাকেন আর তাঁর সঙ্গে নিরন্তর জেগে থাকেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি সরলা— সংসারের এই পরিপাটি নয়নাভিরাম দৃশ্যপট রচনায় যাঁর শরিকানা প্রশ্নাতীতভাবে সমান সমান বা আর একটু বেশি।

তবু হরেনের মাথার চুল! এই প্রশ্নের মোকাবিলায় উত্তেজিত হতে থাকেন। এবং আজ সারাদিনই তিনি নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন— আপনাদের আমলটাই ছিল ভাল— এ কথার মধ্য দিয়ে কী বলতে চায় হরেন?

৪

সব সময় জেগে থাকতে পারেন না অবিনাশ। মাঝে মাঝে তন্দ্রায় আক্রান্ত হন। মাঝে মাঝে অত্যল্পক্ষণের জন্য গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হন। সন্ধ্যার কিছুটা পরে ছোটো বউ এসে তাঁক খাইয়ে দিয়ে যায়। সচরাচর তন্দ্রায় আক্রান্ত হন এরপরেই। ইজিচেয়ারটায় গা এলিযে। তিনি ছোটো বউ মারফত জানিয়ে দিয়েছেন, হরেন বাড়ি ফিরলে যেন তাকে তাঁর কাছে একবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি সুনিশ্চিত, তাঁর নির্দেশ পালিত হবেই। হরেন না এসে পারবে না। তিনি তার মুখোমুখি হবেন।

হরেন এলো। এ কি! কোথায় গেল হরেনের এক বোঝা মাথার চুল! শুকনো, শ্যাম্পু করা।

হরেনের মাথার চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। রীতিমত সভ্য-ভব্য মানানসই।

— কী ব্যাপার হরেন?

— চাকরি পেয়েছি।

— না, না, তোর মাথার চুল?

— মাইনে শুরুতেই দু'হাজার টাকা।

— কিন্তু, তোর মাথার চুল?

— পরীক্ষা-টরিক্ষায় আর বসতে হয়নি।

— কেন? কেন?

— ফ্রন্ট ডোর, ব্যাক ডোর সব দেদার খোলা। অঢেল চাকরি। মুড়ি মিছরি একদর। যাও ঢুকে পড়, খাতায় সই কর। হিহি হিহি।

— তা না হয় হলো। কিন্তু তোর মাথার চুল? শুকনো, খটখটে, শ্যাম্পু করা?

— আরে, ট্রেনে কাগজ পড়ে পাঞ্জাব সমস্যার সর্বশেষ পরিস্থিতি ভালো করে বুঝে নিলুম। আর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেই শুনি, সমস্যাটা বিলকুল মিটে গেছে!

— ও-ও, ইয়ারকি মারা হচ্ছে! আমি জানতে চাই, কোথায় গেল তোর মাথার চুল?

— ধ্যাত্তোর ছাই, চুল, চুল, আর চুল। আপনারা কী যে পেয়েছেন না! দেখতেই তো পাচ্ছেন চুল আর নেই। খুশি তো? চাকরি পেয়ে গেছি। খুশি তো? দু'হাজর টাকা স্টার্টিং পে। খুশি তো? পাঞ্জাব সমস্যা মিটে গেছে। দার্জিলিং সমস্যা মিটে গেছে। খুশি তো? হিহি। হিহি। হিহি।

সামান্য একটু শব্দেও অবিনাশের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ইজিচেয়ারে খাড়া হয়ে বসে দেখলেন, হরেন এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জামাকাপড় ছাড়েনি এখনও।

— আমাকে ডেকেছিলেন?

— হ্যাঁ, অবিনাশ আশ্বস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, কখন এলি?

— এইমাত্র।

— পরীক্ষা কেমন হলো?

— মন্দ নয়। তবে হবার তো আশা নেই।

হরেনের মুখে সেই মার্কামারা হাসি।

— কেন?

— দেড় লাখ ক্যাণ্ডিডেট। বড়ো জোর আটশ ভেকেন্সি।

— তাহলে?

— সামনের বছর আবার পরীক্ষায় বসতে হবে।

হরেন দু'হাতে তার মাথার চুল মুঠো করে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

ভঙ্গিটা অবিনাশের আশ্চর্যরকম ভালো লেগে গেল। সরলার ফটো থেকে এক চুমুক প্রসন্নতা শুষে নিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, হ্যাঁ সকালে যেন বলছিলি পাঞ্জাব সমস্যা-টমস্যার উপরেও প্রশ্ন পড়ে। পড়েছিল?— পড়বে না আবার? যতদিন পরীক্ষা দেবে, ততদিন পড়বে।

হাসতে হাসতে হরেন বলে, জামাকাপড়টা ছেড়ে আসব? আপনি জেগে থাকবেন?

ইলেকট্রিক আলোয় চুনকাম করা দেওয়ালের প্রেক্ষাপটে হরেনের ঝাঁকড়া চুলের কৌণিক ছায়াছবি যেমন কিম্ভূতকিমাকার, তেমনি আকর্ষণীয়। অবিনাশ চোখ ফেরাতে পারেন না। আর সেইভাবেই বলেন, না না, তুই এবার জিরোগে যা। আমারও ঘুম ধরেছিল। একটু ঘুমোই। কী বল্?

অবিনাশ সত্যি সত্যি অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পাতার শিহরণ

আল মাহমুদ

বাঁধাছাদা হয়ে গেলে পাতা ঘেমো কপালটাকে একটা ভেজা টাওয়েল টেনে মুছল। আনিস এতক্ষণ পাতার ট্রাঙ্ক-সুটকেস গুছিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গোটানো বেড রোলটার ওপর পা মেলে বসেছে। সেও ঘর্মাক্ত কলেবর। পাতার বইপত্র, খাতা-পেন্সিল সাজিয়ে দিতেই আনিস বেশি ব্যস্ত ছিল। মফস্বল অর্থাৎ রংপুরের মতো জায়গায় একজন শিক্ষিকার যা যা প্রয়োজন আনিস এর সবকিছু আজ নিউমার্কেট থেকে খুঁজেপেতে কিনে এনেছে। পাতার এই হঠাৎ সরকারি কলেজে চাকরি পাওয়াটা আনিসকে খানিকটা হতবুদ্ধি করে ফেলেছে বলেই মনে হয়। লালমাটিয়া গার্লস কলেজে বাংলা পড়াচ্ছিল পাতা। বেতনও খারাপ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার কী হল সে সরকারী কলেজে চাকরি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করল। দরখাস্তে কোনো ফল হবে না ভেবেই রেখেছিল পাতা। কিন্তু হঠাৎ ইন্টারভিউ কার্ড এসে হাজির। পাতা বোর্ডের সামনে ইন্টারভ্যু দিতে গিয়ে একটু ভয়ও পেয়েছিল। ভেবেছিল চাকরি তো হবেই না, মাঝখানে থেকে কয়েকজন প্রবীণ জ্ঞানীগুণী মানুষের প্রশ্নের সামনে নাজেহাল হওয়া। হলও তাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বোর্ড-সদস্যদের প্রশ্নের জবাব মোটামুটি দিতে পারলেও 'কাঁদো নদী কাঁদে' কার লেখা পাতা বলতে পারল না। আন্দাজ করে বলল, 'আবু ইসহাকের।' প্রশ্নকর্তা হাসলেন, 'আপনি সৈয়দ ওয়ালিউল্লার কোনো বই পড়েননি?'

এতক্ষণে পাতার মনে পড়ল সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের লেখা উপন্যাসটা সেও পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ এতগুলো চোখের সামনে পড়ে সে ক্ষণবিস্মরণে নামট হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

'হ্যাঁ পড়েছি। কাঁদো নদী কাঁদো বইটাও আমার পড়া কিন্তু এখন লেখকের নামই গোলমাল করে ফেলেছি।'

পাতা লজ্জিত হয়ে হাসল।

পাতার হাসিটাই হল তার এক প্রবল সম্মোহনী শক্তি। ছোট মুক্তোর মতো দাঁতের মাড়িতে মুখের বাঁ গালের ওপরের পঙক্তিতে একটা বেঢপ অসমান দাঁত থাকায় তার মধ্যে হাসি লুকানোর কেমন যেন এক ধরনের সহজাত চেষ্টা আছে। এই বিব্রত অবস্থায় পাতাকে অপূর্ব সুন্দর দেখায়। আকর্ষণীয় একটা লাবণ্যে ভরে যায় সে। মুখের হাসিটা মনে হয় পাতার নাভি থেকে পেঁচিয়ে উঠে এসেছে। আর চেহারাটা হয়ে ওঠে একটা পুলকের ফোয়ারার মতো।

'সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের আর কি বই পড়ছেন?'

প্রশ্নকর্তার কৌতূহল একটু নরম হয়ে এল। পাতার হাসির রোদ তখন বোর্ড সদস্যদের বদনমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

'চাঁদের অমাবস্যা, বহিপীর।'

জবাব দিল পাতা। এখন আর কোনো দ্বিধা নেই। তার হাসিই তাকে সহজ করে দিয়েছে। এখন বাংলা সাহিত্যের ওপর প্রশ্ন করে পাতাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না।

'আপনি তো বিবাহিত। চাকরি পেলে ঢাকা ছেড়ে মফস্বল শহরে যেতে হতে পারে। তখন কি করবেন?'

একজন প্রশ্ন করল।

'চাকরি যদি হয় তো ঢাকাতে হলেই ভালো হয়।' অত্যন্ত নরম হয়ে বলল পাতা। চোখ নামিয়ে নিল। পাতার শরমটা বেশ উপভোগ করলো বোর্ডের সদস্যরা।

একজন বলল, 'আমরা ঢাকায় পোস্টিংয়ের কোন গ্যারান্টি দিচ্ছি না। ধরেই রাখুন সিলেক্ট হলে মফস্বলে যেতে হবে। ঢাকার অবস্থাতো আপনি জানেনই। কেউ ঢাকা ছাড়তে চায় না। আচ্ছা আপনি আসুন।'

পাতা উঠল। একবার সব সদস্যকেই চকিতে দেখে নিয়ে মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে সালাম বলে বেরিয়ে এল। পাতা ধরে নিল চাকরটা তার হবে না। হলেও হবে মফস্বলে। আনিসকে রেখে সে কোথায় যাবে? আনিস তো আর ঢাকার চাকরি ছেড়ে তাকে পাহারা দিকে মফস্বলে পাড়ি জমাবে না।

এর মধ্যেই তার কলেজের এক বান্ধবী হঠাৎ তার চাকরি হওয়ার খবরটা নিয়ে বাসায় হাজির হল।

সে নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকায় কি করে যেন পাতার নাম দেখে এসেছে। সিলেকশন বোর্ড তাকে রংপুর কারমাইকেল কলেজে বাংলার শিক্ষয়িত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে। বান্ধবী বলল, 'তোর নামের পাশে কারমাইকেল কলেজ, রংপুর লেখা আছে। যাবি?'

'দেখি।'

খুশি ও দিশেহারা হয়ে ছোট্ট জবাব দিল পাতা। মনে মনে ভাবল চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয়েই গেল? আনিস অবশ্য খবর শুনে আনন্দে আটখানা।

'যাবে বৈকি! নিরাপদ সরকারি চাকরি মুফতে পায় নাকি কেউ? এতে ভাবনার কি আছে? আগে তো গিয়ে জয়েন করো। মাস ছয়েকর মধ্যে বদলি করে ঢাকার নিয়ে আসব। আমার জন্য ভেবো না। আমি ঠিক একটা বছর চালিয়ে নিতে পারব। সাফিয়ার মা বুড়িই রেঁধে দেবে।'

বলল আনিস।

যাকে নিয়ে এত ভাবনা, তার এই সাহস দেখে পাতা 'থ' হয়ে আনিসকে দেখতে লাগল।

'আমাকে ছাড়া তোমার চলবে?'

মুখ টিপে একটু হাসল পাতা।

'একটু কষ্ট হবে। তবে কিছুদিন পরে একটা স্থায়ী নিরাপত্তার কথাও তো ভাবতে হবে। কয়েকমাস পরে তুমি তো ফিরবেই।'

'কয়েক মাস? কয়েকদিনও কি তুমি তোমার অভ্যেসগুলো না মিটিয়ে থাকতে পরবে?'

পাতার কথায় এবার উভয়েই শব্দ করে হেসে ফেলল।

দুদিন পরেই পাতার নিয়োগপত্রটি এসে হাজির।

সে কলেজের ঠিকানা দিয়েছিল। কলেজেই পিয়ন চিঠি পৌঁছে দিয়ে গেল। সহশিক্ষয়িত্রীরা চিঠি দেখে কতক্ষণ কিচির-মিচিব করল বটে কিন্তু কেউই পাতার সৌভাগ্যে তেমন পুলকিত হয়নি। প্রাইভেট কলেজে বেতন খুব একটা ভালো হলেও কত আর বেশি? ছুটিছাটার ব্যাপারেও নানা ঝামেলা। তাছাড়া চাকরির নিরাপত্তা সরকারি কলেজে যতটা আছে প্রাইভেট কলেজে এর সিকিভাগও নেই।

চিঠিটা নিয়ে যখন পাতা প্রিন্সিপালের কাছে গেল তখনই বুঝতে পারল মানুষের ওপর মানুষের খবরদারির চিরন্তন ব্যবস্থার ঈষৎ পরিবর্তনেও মানুষ কেমন বিগলিত হয়ে যায়।

পাতা বিনীতভাবে বলল, 'আপা, আমার চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয়েছে। ইন্টারভিউর কথা তো আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছিলাম। ভাবিনি বোর্ড আমাকে পছন্দ করবে। এখন আপনার দোয়া চাইতে এসেছি। আমি আগামী সপ্তাহেই কারমাইকেলে জয়েন করব।'

পাতার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে প্রিন্সিপাল ভদ্রমহিলা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। চোখের চশমটা টেবিলে খুলে রেখে বলল, 'ঢাকা ছেড়ে যাবেন? আপনার সাহেব রাজি হবে? আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে তো আমাদের কলেজেরও সরকারি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

পাতা হাসল।

'যদি হয়ে যায় তখন না হয় চেষ্টাচরিত্র করে আপনার কাছেই ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে যান। আপনার মতো বাংলা টিচার তাড়াতাড়ি পাব না। মেয়েরা শুনলেও দুঃখ পাবে। তবে যাবার আগে আর একবার ভেবে দেখুন।'

পাতা কোনো জবাব না দিয়ে বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমি তাহলে আসি।'

প্রিন্সিপাল তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

পাতা টাওয়েলটা এগিয়ে দিল আনিসের দিকে। টাওয়েলটা নিয়ে আনিসও তার ঘাড়-গর্দান মুছে নিয়ে পাতার দিকে তাকাল, 'এককাপ চা পেলে ভালো হত। তুমি তো এতক্ষণ বিছানা গুছিয়েই হয়বান। তোমাকে বলতে মায়া হচ্ছে।'

'থাক, আর মায়া দেখাতে হবে না। একটু সবুর করো, চা দিচ্ছি।'

পাতা উঠে দাঁড়াল।

আনিস বলল, 'এ সময় কাজের বুড়িটাকে তোমার ছুটি দেওয়া উচিত হয়নি।'

'আমি কি জানতাম চাকরিটা হয়ে যাবে? আর যাই বলো, এই বুড়ীকে দিয়ে রান্নার

কাজ চলে না। ধোয়া-মোছার কাজতো পারেই না। সারাদিন কলেজে বকবক করে এসে আমাকেই সব করতে হয়। বলে, 'আপা আমার একটা জোয়ান বিধবা মেয়ে আছে গাঁয়ে, নিয়ে আসি। এজন্যই তো ছুটি দিলাম। আজই তো সকালের লঞ্চে ফরিদপুর থেকে আসার কথা।'

'এখন যদি মেয়েটাকে নিয়ে আসে, কি করবো?'

জিজ্ঞেস করল আনিস।

পাতা কিচেনের দিকে যেতে যেতে বলল, 'কি আর করব? তোমার জন্য রেখে যাব।'

আনিস কিচেনের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমার কাজ বুড়িই সামলাতে পারবে। তুমি বরং রংপুর গিয়ে থিতু হলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।'

আনিসের কথার কোনো জবাব পাওয়া গেল না। পাতা তখন রান্নাঘরে কেতলিতে পানি ভরতে ব্যস্ত।

চা খেয়ে দুজনেই গোসলখানায় গিয়ে ঢুকল। এখনই তৈরি না হলে বিকেলের নাইটকোচে আরামে যাওয়া যাবে না।

গোসল সেরে সেজেগুজে পাতা ও আনিস যখন খাবার টেবিলে বসল তখন বেলা তিনটে। খাওয়ার পর পাতার একটু বিশ্রাম দরকার। সারারাত তো আর ঘুমোতে পারবে না। ঢুলতে ঢুলতে যেতে হবে। এখন খেয়ে-দেয়ে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিতে পারে। ভাবল আনিস। সেজন্যই তাড়া দিয়ে পাতাকে সে খাবার টেবিলে টেনে এনেছে। পাতার ঐ এক দোষ, কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে তার প্রসাধন আর ফুরোয় না। গোসলখানা থেকে বেরুতেই দেড়ঘন্টা সময় নেয়। তারপর শুরু হয় শাড়ি পরা। শাড়িতে সাজতে গেলে পাতার আব তৃপ্তি হয় না। একবার পরে, একবার খোলে। আনিসকে বলে, 'দেখোতো ঠিব হল কি-না?'

আনিস অবশ্য অবলীলায় চকিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই বলে দেয়, 'না ঠিক হয়নি। তুমি কোনোদিন একাজটি শিখলে না। আবার খুলে পরো। এক তাড়া কাপড়ের ভাঁজ বুকের ওপর জমিয়েছ। তোমার গেঁয়োমি সত্যি অসংশোধনী।'

'শাড়ি-পরা শিখতে তোমার বোনদের এখন কোথায় পাবো বলো? সবই তো সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারে।'

পাতা আনিসকে তার প্রবাসী বোনদের কথা তুলে খোঁটা দেয়। নিজের বোনদের উচ্চশিক্ষা ও বিয়ে দিয়েছে আনিস। একটা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে আনিস এত দূর এসেছে। পিতৃমাতৃহীন দুটি বোনকে প্রায় বিশ বছর সে লালনপালন করেছে। বহুকাল যাবত সে সেন্ট জোসেফ স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। এ স্কুলেই তার বোনরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বিয়ে অবশ্য তারা ভাইয়ের ইচ্ছেয় করেনি। দু'জনেই করেছে নিজেদের

পছন্দমতো বরকে। তবে বিয়ের আঞ্জামটা করতে হয়েছে আনিসকে। বিয়ের পর দু'বোনের বরই চেষ্টা-চরিত্র করে, একজন জার্মানীতে অন্যজন মধ্যপ্রাচে পাড়ি জমিয়েছে। বোনরা বহুদিন যাবৎ ভাইয়ের কোনো খোঁজখবর নেয় না। এমনকি আনিস ও পাতার বিয়ের সময়ও নাহিদ ও নাদিরা আসেনি। অথচ এদের বিয়ে দেবার জন্য আনিস ও পাতাকে কতটা বছরই না অপেক্ষা করতে হল।

পাতাকে এখন খাবার টেবিলে পরিবেশন করতে দেখে আনিসের খুব ভালো লাগল। অপূর্ব লাগছে পাতাকে। আটপৌড়ে একটা টাঙ্গাইল শাড়িতে নিজের স্ত্রীকে যে এমন সতেজ আর সৌম্য দেখায়, এ যেন আনিস এই প্রথম দেখল। শাড়িটাও পাতা আজ নিখুঁত পরেছে। বুকে ভাঁজ জমে নেই। ব্লাউজের সাথে মানিয়েছে শাড়ির ধূসর হলদেটে রংটা। বুকের মাঝারি গড়ন হালকাভাবে ছড়িয়ে দেওয়া শাড়ির জমিন ও পানের সোনালি আবরণে সোচ্চার।

বহুদিন পরে হঠাৎ আজ পাতা কান, গলা ও হাত থেকে গয়না খুলে ফেলেছে। সম্ভবত রাতের বাসযাত্রী বলেই পাতার এই বৈরাগ্য। তা না হলে পারতপক্ষে পাতা জেওর খোলে না। নাকে অবশ্য সকালের শিশিরের মতো টোপাজের নাকফুলটা এখনও আছে।

পাতার নড়াচড়া থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না আনিস। তরকারির রেকাবটা টেনে নিতে নিতে বলল,

'তোমাকে সুন্দর লাগছে।'

'দেখো, আমি দেখতে তেমন খারাপ নই। সারাদিন তোমার একটু চোখে পড়ে না, এই যা আফসোস।'

পাতার কথা শুনে হেসে উঠল আনিস, 'আমিতো রূপ দেখেই মজলাম।'

'শুধু রূপ না, বিদ্যা দেখেও মজেছিলে যে গাই দুধ দেয় তার লাথিটাও ভালো— প্রায়ই তো বন্ধুদের কাছে আমার মেজাজের বদনাম করো। অথচ পান থেকে চুন খসলে আমার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়ো।'

হেসে ভাত মাখাতে মাখাতে বলল পাতা।

'যাওয়ার দিন ঝগড়া করে যাবে নাকি?'

'এতেই বুঝি ঝগড়ার গন্ধ পেলে? না হয় একটা দিন ঝগড়া বাঁধিয়েই যাই। ধরো, বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে যদি কোনো অসুখ-বিসুখ বা দুর্ঘটনায় আর না ফিরি? তবেতো আমার এতদিনের সম্পর্কের কথা মনে নাও থাকতে পারে। ঝগড়ার কথা কিন্তু পুরষেরা কোনোদিনই ভোলে না। ভোলে?'

আনিস আগের মতোই হাসল। মুরগির একটা রাঙ তুলে নিল পাতে। বুঝল পাতার এই মুহূর্তে আনিসকে ফেলে যাওয়াটা খারাপ লাগছে। একারণে উল্টোপাল্টা কথা বলে অযথা নিজেকে ঢাকতে চাইছে। আনিস ব্যাপারটা বুঝে কথা ঘোরাতে চেষ্টা করল, 'রংপুর শহরটা খুব সুন্দর! তোমার একটুও অসুবিধে হবে না। যার বাসায় গিয়ে উঠবে সেতো তোমারই আত্মীয়। হারুন চাচা। তোমাকে এসে বাসস্টেশন থেকে বাসায় নিয়ে যাবে। চাচীও

ডাক্তার মানুষ, তোমাকে পছন্দ করবে। ইচ্ছে হলে ওদের বাসায় থেকেও কলেজ করতে পারো। অসুবিধে হলে নিজে বাসাবাড়ি ভাড়া করে নিও। আমিও কয়েকদিন পরেই আসছি। তোমার সবকিছু ঠিক করে দিতে আসব।'

'আমি আমার অসুবিধার কথা ভাবছি না।'

মাথা নুইয়ে খেতে খেতে জবাব দিল পাতা। বলল, 'মুরগিটা আরও একটু নাও। ঝাল হয়েছে?'

'না, ঠিক আছে। তুমি নাও।'

একটা বুকের হাড্ডি তুলে নিয়ে বাটিটা পাতাকে ঠেলে দিল আনিস।

খাওয়া হয়ে গেলে দু'জন শোয়ার ঘরে এসে পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। পাতা সটান হয়ে শুয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে। আনিস তাকে বুকের কাছে টানল। পাত বাধা না দিয়ে বলল, 'নাওয়া-খাওয়া ঠিকমতো করো। আর বই টেবিলের ওপর এলোমেলো করে রেখো না। চিঠির জবাব দিও।'

আনিসও পাতার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আবেগে পাতাকে বুকের ওপর টেনে রাখল। তারপর দুজনই দুজনকে নিবিড় চুম্বনে ভরিয়ে দিতে লাগল।

যাবার সময় আনিস লটবহর তিনতলা থেকে গেটে এনে জড়ো করল। দুটি বড় স্যুটকেস, একটা বইয়ের ট্রাঙ্ক ও গোটানো লেপতোষক। শেষ মালটা নামাবার সময় পাতাকে দরজায় তালা মেরে নিচে নামতে বলে আনিস যখন গেটে ফিরে এল ঠিক তখনই একটা রিকশা আনিসের সামনের এসে দাঁড়িয়েছে। আনিস দেখল সাফিয়ার মা বুড়িটা রিকশা থেকে নামছে। সাথে কে এক যুবতী। মেয়েটি নেমেই আনিসকে দেখতে পেয়ে মাথায় কাপড় তুলে দিল। আনিস বুড়িকে জিজ্ঞেস করল, 'ফিরতে এত দেরি করলে কেন?'

'লঞ্চ ছাড়তে দেরি করল সাব। আমরা তো বিয়ানবেলায় ঘাটে আইসা রইছি। এইডা আমার মাইয়া।'

জবাব দিল সাফিয়ার মা। মেয়েটি লাজুক চোখে, মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। সাফিয়ার মা রিকশাভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওপর দিকে তাকাল, 'বিবিসাব কলেজ থিকা ফিরে নাই'

'বিবিসাব ওপরেই আছে, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। নইলে তালা লাগিয়ে এক্ষুনি নিচে নেমে আসবে।

আনিসের কথায় সাফিয়ার মা মেয়েটিকে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। আনিস দেখল যুবতীটি বেশ সুন্দরী। বয়স কুড়ির কম হবে ন। সে যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আনিসের দিকে তাকাল তখন আনিস তার মুখখানি দেখল। বেশ ফর্সা চেহারা। একটু আগে মেয়েটি যখন মাথায় ঘোমটা তুলে দিচ্ছিল তখন তার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি আনিসের নজর এড়ায়নি। এখন সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে মেয়েটির সুগঠিত কোমর, নিতম্বের

নিম্নমুখী সুডৌল জঙ্ঘার আভাস আনিসের চোখে মূর্ত হয়ে উঠল। এর নামই কি সাফিয়া? বুড়ির মেয়েটিতো ভারি সুন্দরী! বিধবা?

কৌতূহলী হল আনিস।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওপর থেকে কেউ নামল না। ব্যাপার কি, পাতা এখনও নামছে না কেন? সাফিয়ার মাকে ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে পাতার নিচে আসতে কতক্ষণ লাগে। আনিস পাতাকে গেট থেকেই চেঁচিয়ে ডাকবে কি-না চিন্তা করতে লাগল। না দৃশ্যটা খুব হাস্যকর হবে। প্রতিবেশিরা উঁকি দিয়ে দেখতেও পারে। ভাবল আনিস। একবার ভাবল মালপত্র গেটে রেখেই সে ওপরে উঠবে কি-না। এই ফাঁকে কেউ যদি একটা স্যুটকেস তুলে নেয়?

আনিস অধৈর্য হয়ে পড়ল। এ সময় দেখা গেল যুবতীটি সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। আনিসকে দেখতে পেয়েই সে সিঁড়িতে দাঁড়াল, 'আপনারে মেমসাব উপরে যাইবার কয়।'

বেশ লজ্জিত ও সপ্রতিভভাবে হেসে বলল মেয়েটি।

'কেন কি হয়েছে?'

'মেমসাব আইজ যাইব না। মাথা ধরছে। মালপত্র উপরে নিতে কইছে।'

বলল মেয়েটি। তার সপ্রতিভ ভাবটি এখন আরও স্পষ্ট হয়েছে। আনিসের সাথে সে সহজভাবেই কথা বলছে।

'এতগুলো মাল আমি একলা ওঠাতে পারব?'

'আমারে স্যুটকেস দুইটা দেন, আমি পারুম।'

হেসে বলল মেয়েটি।

আনিস এখন মেয়েটির সর্বাঙ্গ ভালো করে দেখল। সুন্দর দেহবল্লরী মেয়েটির। ফর্সা ঠোঁটের পাশে একটা ছোট লাল তিল। চোখ দুটি বেশ বড় আর গভীর। ভ্রূরেখাও নিখুঁতভাবে উড়াল দেয়া। পরনে কমদামী শাড়ি। ব্রেসিয়ারহীন, মোটা অরেঞ্জ রঙের ব্লাউজে মেয়েটির ফর্সা হলদেটে গাত্রবর্ণ ফুটে বেরুচ্ছে।

একটানে মেয়েটি স্যুটকেস দুটির টানা ধরে তুলে নিল। ভার তুলে নেওয়ায় তার অটুট স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির চমকে আনিসকে আকর্ষণ না করে পারেনি।

'এই, তোর নাম কিরে?'

'সাফিয়া।'

নাম বলেই সাফিয়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। আনিস মেয়েটির যাওয়ার দিকে কতক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থেকে বেডরোলটা তুলে নিল হাতে।

ওপরে উঠে দেখে পাতা বিছানায় সটান শুয়ে আছে। তার সাজানো খোঁপা খুলে সাফিয়ার মা চুলে বিলি কাটছে আর আঙুল দিয়ে কপাল টিপে দিচ্ছে।

'কালই তোমার মেয়েকে গাঁয়ে রেখে আসবে। আমি তোমাদের যাতায়াত খরচ দেব।' বলছে পাতা।

'আপনার কষ্ট দেইখাই তো মাইয়াডারে আপনার বাসায় লইয়া আইলাম। এখন আপনি কি কন বিবিসাব? আপনের ভরসা না পাইলে এমন জোয়ান মাইয়া কেউ শহরে আনে?'

পাতার কথার কোনো আগামাথা না পেয়ে সাফিয়ার মা বুড়ী আক্ষেপ করল। আনিসকে এইমুহূর্তে ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াতে দেখে সাফিয়ার মা প্রশ্নবোধকের মতো তার সমর্থন চাইল, 'এহেন আনি কোন্‌দিকে যাই কন্‌ত সাব?'

আনিস হঠাৎ পাতার আচরণের একটা কারণ আঁচ করতে পেরে বিষয়টাকে হাল্কা করার জন্য বলল, 'তোমার বিবিসার নতুন চাকরি পেয়ে রংপুর চলে যাচ্ছে। এখন এ বাসায আর দুজন কাজের লোকের দরকার নেই, বুঝলে? কালই সাফিয়াকে তুমি দেশে রেখে এসো।'

আনিসের কথা শুনে বুড়ি যেন অকূলপাথারে পড়ল। সাবও এককথাই কয় কেন্‌? অবাক হয়ে সে একবার আনিস ও একবার পাতার দিকে তাকাতে লাগল।

'তুমি রান্নাঘরে যাও বুড়ী। আমি বিবিসাবকে দেখছি।'

আনিসের কথার বুড়ি বিছনা ছেড়ে উঠল। সে বুঝতেই পারছে না আজ এ বাড়িতে কি হয়েছে? বুডি চলে গেলে আনিস বিছানায় উঠে পাতার কপালে হাত রাখল। আর সাথে সাথেই পাতা বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে আনিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। পাতা সত্যি কাঁপছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনিস পাতার হৃদয়ের ধুকপুকানি বুঝতে পারল। পাতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে মাফ করে দাও। আমি দুদিন পরে রংপুর যাব। এখনও তো সময় আরও কয়েকদিন আছে। আমার শরীরটা ভালো নেই।'

'ঠিক আছে, তাতে কি? আমি জানি আজ কেন তুমি এমন করেছ। তুমি মেয়েটাকে দেখে ভয় পেয়েছ। মেয়েটাকে এ বাড়িতে একা রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছ না।'

বলল আনিস। বেশ সহানুভূতি মিশিয়ে। পাতাকে জোরে বুকের ওপর চেপে ধরে দোলাতে লাগল। যেন একটা অবুঝ শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

'মেয়েটি অবশ্য খুবই সুন্দরী। আমার জন্যও একটু ভয়েরই কথা বৈকি।'

আনিসের কথা শুনে পাতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'না না আমি তোমাকে সন্দেহ করি না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'বিশ্বাস করলেই সন্দেহ জাগবে না এমনতো কথা নেই পাতা। এটুকুই তো আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা, টান। আর তোমার সন্দেহ যুক্তিহীন বা ভিত্তিহনও নয়। মেয়েটাকে একা পেলে আমিও যে লুব্ধ হতাম না, একথা মেয়েটাকে দেখে জোর করে বলতে পারছি না। তবে একটা কাজের মেয়ের কাছে আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়ে দেয়ার আগে দশবার চিন্তা করতাম। নিজের সাথে লড়াই করতাম। কে জানে জিততাম কিনা? তুমি আগবাড়িয়ে বাধা দিয়ে অন্যায় কিছু করনি। তোমার এটুকু দাবি তো আছেই।'

হাসল আনিস। আনিসের কথায় পাতা দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠল। যেন একটা আদুরে কিশোরী। তার শরীর আনিসের বুকের ভেতর আচমকা শিহরিত হতে লাগল।

মন তার শঙ্খিনী

হাসান আজিজুল হক

শাদুর মনটা আজ ক'দিন থেকে ভাল নেই। এটা অবশ্য খুব একটা বড় খবর হল না। ওর আশেপাশে যারা রয়েছে, এতে যে তাদের কিছু এসে যাচ্ছে, তাও নয়। কিন্তু শাদুর মনটা ভাল নেই। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে না, মাথা ধরেনি, কিছুই নয়, কিন্তু সে দুনিয়ার ওপর চটে আছে, বিরক্ত হয়ে আছে, ভ্রূ কুঁচকে আছে, এক কথায়— সে ভীষণ রেগে আছে। ওর কাছে যাওয়া চলছে না, ওর বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, মনটা হু হু করছে। খবার দিনের সন্ধ্যায় শস্যহীন মাঠের মত ওর মনটা ধূসর ঝাপসা। এমন শরতের উজ্জ্বল সকালে গ্রামের প্রান্তে পগারের ওপর বসে বসে শাদু মরা ঘাস ছিঁড়ছে, একটা মরা পাখির পালক থেকে শিশির ঝাড়ছে।

শাদুর মনটা খারাপ।

ওকে এমনি করে বসে থাকতে দেখে কেউ হয়তো বলে, কি বাপধন, এমন করে বসে কি?

শাদু জবাব দেয় না, গুম হয়ে থাকে।

কি বাপ, কথা বলছ না ক্যানে?

জানটো ভালো নাই বাপু!

জানের আবার কি হল তোমার?

না, বাপু জানটো ত্যামন ভালো নাই।

শাদু আবার স্তব্ধ হয়ে যায়। স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয়, কথা বাড়াতে চায় না সে। হিতাকাঙ্ক্ষী আরও কিছু জিগগেস করলে সে হয়তো খেপে উঠল, মানে মানে কেটে পড়ো দিকিন। বলছি, ভাল লাগছে না, ভ্যালা বেপদ বটে।

হিতাকাঙ্ক্ষী সত্যিই বিপদ গোনে। শাদুর রাগটা একটু বিপজ্জনকই বটে। শরতের উজ্জ্বল সকালে ওর মনটা কেন খারাপ, সে কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রসন্ন শীত-বাতাস বইছে, রোদ যেন সোনা, মাঠভর্তি সবুজ ধানের ওপর রোদের সোনা-কিন্তু কদম তার কাছে বিষাদ।

শাদু আপন মনে বিড় বিড় করে, রাককুসী, রাককুসী মানুষ-খেকো রাককুসী, আমার জানটো খেলে, আমাকে খেলে। আমাকে বরবাদ করলে।

ঠিক এই সময়ে পগারের আর এক প্রান্তে একটি মেয়ে দেখা যায় কোমরে একটি ঝুড়ি, তাতে গোবর, কাঠি খোঁচা, শুকনো পাতা। মেয়েটির তৈলহীন রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে, শাড়িটা এমন করে পরা যে, মনে হয়, ছোবল দেবার আগে লেজের ওপর ভর

দিয়ে একটি কালো সাপিনী দাঁড়িয়ে দুলছে। অলংকারহীন মিশমিশে কালো মেয়েটি যেন এই পগারের শর্তে যে সব সাপ পাওয়া যায়, তাদেরই একটি।

শাদু আড়চোখে চাইল ওর দিকে। চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে ঘাড় ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। এদিকে ওদিকে চেয়ে শাদু ডাকল, এই হামি, ইদিকে শোন। মেয়েটি স্রেফ নাকচ করে দিল এই আহ্বান।

হামি।

হামি অর্থাৎ হামিদা নিরুত্তর।

এই হামি!

ঝংকার দিয়ে উঠল হামিদা, কি?

শোন ইদিকে।

কি বেপার?

কাছে আয়, বলছি।

আমার শোনবার দরকার নাই।

আমার কি কুনো কতাই শুনবি না তু?

কি শুনবো!

কাছে আয়।

হামিদা কাছে আসে। শাদু চেয়ে থাকে ওর দিকে, আবার একটি বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে চোখ নাচিয়ে হামিদা বলে, সং।

সত্যিই সং-এর মত বসে থাকে শাদু। তার মনে হয়, হামিদার সঙ্গে এখন দেখাটা না হলেই ভালো হত। সে ওর ঘুম কেড়ে নিয়েছে, শান্তি কেড়ে নিয়েছে, ওর মনটা যে এমন খরার সাঁঝের মাঠের মত— এর সব কিছুর জন্যে দায়ী এই মেয়েটির সঙ্গে এখন ওর দেখা না হলেই ভালো হত। কিন্তু ওকে দেখেই ওর বুকের রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, একটা ভীষণ আবেগে সে নিশপিশ করে।

বাক্যহীন আবেগে থমথমে মুখটির দিকে চেয়ে কৌতুক উচ্ছল হয়ে ওঠে হামিদা, ভ্যাবার মতন বসে বসে ভাবছিস কি? তোর কত ক্ষ্যামতা জানা আচে। যত লাফানি আমার কাছে। উদিকে কি ব্যাপার হচে দেখগা!

কি বেপার?

রহম মালামো করচে বর্গীতলায়। তিনটোকে চিৎ করলে আমার ছামনে। লাগগা দিকিন অর সাথে। জানে শ্যাষ করে দেবে। ব্যাটা ছেলেরা যা করে তার খোঁজ নাই, মেয়ে মানুষের কাচে বাহাদুরি।

শাদু বলল, মারামারি করে লাভটো কি বলতে পারিস! ই-গাঁয়ে কুন শালা আচে আমার সাতে পারবে— জানটো খেয়ে লোব।

হামিদার নাকের পাশটা কুঁচকে উঠল, তোর খালি বোলচাল, খালি বাহাদুরি। ক্ষ্যামতা থাকলে লাগগা না!

লাভটো কি হবে?

তুতো ভীতু, পারবি না তাই বল।

শাদুর দুচোখ জ্বলে উঠল। ওর পিংগল চোখের তারা দু'টি যেন আগুনের ফুলকি ছিটোল। ঠোঁট টিপে মুচকি হাসল হামিদা। সে হাসিটাও চোখে পড়ল শাদুর, দ্যাখ হামি, মাথাটো খারাপ করে দিস না সকালবেলা; আজ যদি লাগি, রহমের জান লিয়ে লোব।

তাই যা না।

যদি পারি?

যদি পারিস তো কি?

যদি পারি তো কি দিবি?

আমি থাকব এখানে।

ঠিক?

নিয্ যস।

চোত্ মাসের দুপুরে গাদা করা কাঠে আগুন লাগলে যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, শাদুর বুকে যেন তেমনি আগুন ধরে যায়। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ায়। ওর চোখের একগুঁয়ে মোষের মত চাহনীটা দেখে এক মুহূর্ত ভয় পায় হামিদা, তারপরেই আবার কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাকাইচে দ্যাকো দিকিন? ইখানে কি, যা না বর্গীতলায়।

শাদু কথা না বলে চলে গেল।

বর্গীতলায় তখন একটা ভিড় জমে উঠেছে বলা যায়। রহম ধড়াস করে একবার মাটিতে আছাড় খেল, মোষের মত কালো শরীরটায় দু'হাতে ধুলো মাখাল, চুলটাকেও ধুলো মাখিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল, তারপর গরিলার মত বুক পিটোতে পিটোতে ঘ্যাষ ঘেষ গলায় চিৎকার করে উঠল, আয় ইবার ক্যা আচিস।

দু'নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ধুঁকছে। দুই হাঁটু থর থর করে কাঁপছে তার। পয়লা নম্বর তখন একটু সামলিয়েছে, দুই পায়ের ফাঁকে ল্যাজ গলিয়ে দিয়ে পরাজিত কুকুর যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি করে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

জুল জুল করে তাকিয়ে দেখচিস কি? আর একবার লাগ্‌গা না।

পয়লা নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্লান হাসে, কালো কালো মাড়ি বের করে বলে, উ শালোর সাতে কি পারা যায়!

হুঁ হুঁ, শালো যে বাঘের দুধ খায়।

অপরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী রহম আর একবার হাঁক দেয়, ক্যা আচিস, আয়।

অর সাথে কেউ পারে গো, গতরটো দেখচ না!

হ্যাঁ বাপু থোড় পারা গতরটো হইচে বটে।

ঠিক এমনি সময়ে শাদুকে দেখা গেল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল দর্শকের দল, আয় বাপ, একবার দেখিয়ে দে একহাত।

শাদু একবার কারো দিকে চাইল না, কারও কথায় কান দিল না, একটা ভীষণ মরণ প্রতিজ্ঞায় চোখে প্রতিহিংসার কঠিন আলো জ্বেলে সে রহমের মুখোমুখি দাঁড়াল। হবে লিকি স্যাংগাত, লাগবি লিকি একহাত?

শাদুর চোখের দিকে চেয়ে প্রায় শিউরে উঠে রহম। একটা অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা স্রোত যেন মেরুদণ্ড দিয়ে নীচের দিকে নেমে যায়।

লড়াই করবার প্রবৃত্তিটা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় ওর।

ইতস্তত কণ্ঠে সে বলে, সেই লেগেই তো দাঁড়িয়ে আচি, তা ব্যালা হোল এ্যানেক, এ্যাকন—

শাদু লোহার সাঁড়াশীর মত আংগুল বাড়িয়ে মুঠো করে রহমের ফ্যাঁপানো চুলের মুঠি ধরে বার দুই ঝাঁকি দেয়, তারপর চুল ছেড়ে দিয়ে ওর বুকে দুটো থাপড় দিয়ে বলে, শালা ভয় পেলি?

রাঢ়ের লড়াই-এর ইতিহাসে এর চাইতে অপমান আর কিছু নেই। রহম যদিও তার বুকের হাড়ের শাদুর থাপড় দু'টো তখনও অনুভব করে, মাথার চুলের যন্ত্রণায় ওর হাতের কঠিন শক্তির পরিচয় পায়, তবুও সে ক্ষপে ওঠে, এ্যাই খবরদার, গায়ে হাত দিবি না, পারিস তো চলে আয়।

আজ কিন্তুক সাবধান— মারাত্মক ও ঘোরাল গলায় বলল শাদু।

তু সাবধান হ আগে।

সকলে সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দেয়। একটা নিদারুণ লড়াই হবে এই আশায় সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নানা রকম মন্তব্য শোনা যায়। আজ আর শাদুকে পারতে হবে না— রহম ক্ষেপেছে।

তা ক্ষেপুক— শাদুর কাছে উ কিছুই নয়।

দু'জনে দু'টো বুনো মোষের মত সামনাসামনি দাঁড়াল। ঘাড় বেঁকিয়ে ছোট ছোট লাল চোখে রক্তাক্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। শাদুর কৌশলটা রহম জানে, এঁকে বেঁকে ধুপ করে সে পড়বে, সবার ধারণা হবে, শাদু নীচে পড়েছে, এর পরেই বোধহয় হার স্বীকার করবে সে। যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করতে করতে শাদু লড়াই করে, হারও স্বীকার করে না, লড়াইও বন্ধ করে না— সে যেন সুযোগের অপেক্ষা করে বনবেড়ালের মত। তারপর কেন এক মুহূর্তে গর্জন করে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর পড়ে। সে আক্রমণ আজ পর্যন্ত কেউ সহ্য করতে পারেনি।

শাদুর মনে মনে চিন্তাটা প্রায় একটা বিড়বিড় শব্দে পরিণত হয়, রাক্কুসী, তোর লেগে আজ মানুষ খুন করব আমি, তা বাদ তোকে ধরব আজ, ইদুর ধরা করব আজ।

রহম লাফ দিয়ে পড়ল শাদুর ওপর। শাদু নীচে গড়িয়ে পড়েছে। রহম ওর বুকে বসেছে, গলাটা টিপে ধরেছে শাদুর— দুচোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে ওর। আশে-পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের কেউ চেঁচিয়ে ওঠে, ছাড়িয়ে দে র‍্যা, মরবে যি, শাদু মরবে যি।

রুদ্ধকণ্ঠে শাদু গর্জন করে, খবরদার!

এবপর যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত এসেছে বলে মনে হয়, সমকক্ষ দুটি শক্তি যখন নিঃশব্দ দ্বন্দ্বে লিপ্ত, নিঃশ্বাস ছাড়া অন্য শব্দ নেই যখন, দর্শক যখন নিরুদ্ধশ্বাস, তখন সেই আতংকিত নৈঃশব্দ চিড়ে একটি দীর্ঘ জান্তব শব্দ ভেসে এল, ভেঙ্গে দিয়েচে গো, কোমরটো আমার ভেঙ্গে দিয়েছে, শালো শাদু আমাকে মেরে ফেললে— অর রক্ত দেখবো আমি।

শাদু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রহম তখনও মাটিতে পড়ে চিৎকার করছে।

অর রক্ত দেখব আমি, শালো আমার কোমরটো ভেঙ্গে দিয়েছে।

ইকি র‍্যা, কোমরটা অর কি ভেঙ্গে দিলি লিকিন?

শাদু বলল, বললোম আজ সাবধান, আমার কিরে আচে।

কিরে? কিসের কিরে র‍্যা?

হ্যাঁ আছে— আমার কিরে আছে।

আর কোনও কথা না বলে শাদু গেল। পগারটার দিকে সোজা এগিয়ে গেল সে। ওকে ফিরতে দেখে হামিদার চোখ চিক-চিক করে ওঠে, হেরে এলি তো?

শাদু চুপ করে থাকে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সে। কথা বলচিস না যি, হেরে এলি লয়?

গম্ভীর মুখে শাদু বলে, দেখে আয় গা যা।

কি?

রহমের কোমরটা ভেঙ্গে দিইচি আজ।

সত্যি?

কোমরটো ভেঙ্গে দিইচি শালোর। শালো দশদিন উঠতে পারবে না ; চেরজন্ম সোজা হয়ে হাঁটতে পারবে না।

হামিদার দুচোখের কোণ আর্দ্র হয়ে ওঠে করুণায় আর রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সে। আই সব্বনাশ, আইন সব্বনাশ, কোমরটো ভেঙ্গে দিয়ে এলি তু?

তু যি বললি!

তা বলে কোমরটো ভেঙ্গে দিবি তু?

তু বললি ক্যানে?

হ্যাঁ যমের অরুচি, তা বলে মানুষ খুন করবি তু মানুষটো। আই সব্বনশ, মানুষটোর কোমার ভেঙ্গে দিলি তু? লে এ্যাকোন আমাকে লিয়ে কি করবি কর, ধুয়ে ধুয়ে খা আমাকে।

তু বল আমি কি করবো? আমি যে তোর কথা মন থেকে তাড়াইতে পারচি না, আমার ঘুম লষ্ট হচে, আমার কাজে মন যেচে না, আমি কি করি তু বল।

আমি কি বলবো?

আমি তোকে বিয়ে করবো!

মরণ, আমার সোয়ামি বেঁচে নাই লিকিন! সোয়ামী থাকতে তোকে বিয়ে করব ক্যানে? মরণ!

তাইলে আমি কি করব আমাকে বল।

খা দা আর ঘুমো, কাজকম্ম কর।

তু যি বলিছিলি ভালোবাসিস।

বলেছেলোম একদিন।

আজ কি ভালোবাসিস না?

না।

দেহটি মোচড়ায় শাদু, হাতে ধরা কাঠিখোঁচাগুলো মরমর করে ভাঙ্গে, নিশপিশ করে, তারপর বলে, ক্যানে তবে বলেছিলি?

হামিদা চুপ করে থাকে।

ক্যানে আমার মনটো ভাঙ্গলি?

মেয়েটি তবু চুপ করে থাকে।

আমি তোকে বিয়ে করি।

না।

ক্যানে?

আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

তু সোয়ামির বাড়ি তো গেলি না, সে শালোর ঘাড়টো আমি ভাঙবোই গাঁয়ে শালো যেন না আসে। তু সোয়ামির ঘরও করবি না, আমার ঘরও আসবি না, আমি ঠিক তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো।

আমাকে তাখন বিয়ে করলি না ক্যানে? খেতে দেবার ক্ষ্যামতা নাই তো। তোর বিয়ের শখ ক্যানে?

শাদু অসহায় চোখে চেয়ে থাকে। শরতের রোদ প্রখর হয়ে ওঠে। অনেক দূরে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায়। মনটা কেমন করতে থাকে। মরা পাখিটার ভিজে পালক শুকিয়ে গিয়েছে। ওর মত চোখ বন্ধ করে ঘুমোতে ইচ্ছা করে শাদুর।

হামি?

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ওঠে মেয়েটি। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে, আমার যে সোয়ামি আচে!

তাকে তো তু ভালোবাসিস না।

না।

ভালো না বাসলে আর সোয়ামি কি? আর ভালোবাসলে সোয়ামি না হলেই বা কি?

ছি, উ কথা বলিস না।

ক্যানে বলব না, ইটা নেয়ম। তু যি বলেছিলি ভালোবাসিস।

ছাগলের খোঁটা পুঁততে পুঁততে একদিন বলেছিল ভালোবাসে। সেদিনও এমনি প্রথম শরতের সকাল ছিল। পিছন থেকে শাদু এসে ডেকেছিল, হামি?

ফিরে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলি হামিদা।

শরতের সেই সকাল সেদিন তাদের জন্য একটা আড়াল রচনা করেছিল। বুক উঁচু ধানের জমির ভিতর সারস চরছিল। প্রকৃতি যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তারপব ঝরাৎ করে একবার বাতাস বইল দক্ষিণ দিক থেকে, হলদে পাতা উড়তে উড়তে এসে হামিদার খোঁপায় আটকে গেল।

শাদু ডাকে, হামি।

উ!

এ্যাই!

উঁ।

বল।

কি?

বল, ভালোবাসি।

ভালোবাসি।

আবার বল।

ভালোবাসি।

আবার।

বাসি।

আর একবার।

মরণ! খবরদার, ছুঁবি না, ছুঁবি না খালেভরা।

ওরা পরস্পরে দিকে চেয়ে থাকে। উজ্জ্বল রোদের মধ্যে ওদের মাথার ওপর শরতের একখণ্ড মেঘ জমে ওঠে, হঠাৎ বর্ষণ শুরু হয়। রুপোর মত সাদা বড় বড় বৃষ্টিবিন্দুগুলি দেখা যায়, ধানের পাতায় পানি জমে থাকে। একটা সোঁদা গন্ধ ওঠে।

সেই যে হামিদা বলেছিল ভালোবাসি, তখন থেকেই শাদুর মন খারাপের রোগটা

দেখা দিল। মেয়েটা রাক্‌কুসী, মেয়েটো শনি, শাদু ভাবে। বললে, ভালোবাসে— বলে আবার বিয়ে করলে আর একজনকে। ওর বুড়িদাদিকে বলতে গ্যালোম, তা সে হারামজাদি তেড়ে এল আমাকে, বিয়ে তো করবি, খেতে দিতে পারবি আমার লাতিনকে? তোর নিজের আজ খেতে কাল জোটে না, তোর আবার বউয়ের শখ ক্যানে! হামিকে বলতে গ্যালোম, তা সে চোখমুখ ঘুরিয়ে বললে, আমাকে বিয়ে করবি তো খেতে দিবি কি?

সি কথাটো সত্যি, সি কথাটো বাপু সত্যি, আমার জমি যা তাতে মায়ের আর আমার তিনমাসের খোরাকিটো কোন রকমে হয়, তা বাদ সারা বছরটো মুনিষ খেটে, অ্যানেক ধান্দায় চালাতে হয়। আমার নিজের ভাত জোটে না, তা তোকে মাহারানীর মত রাখি ক্যামোন করে।

ভেবে কোন সুরাহা হয়নি। হামিদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ট্যারার সঙ্গে। বাড়ি ন্যা গ্রামে। লোকটা ট্যারা, মিশমিশে কালো, ঘাড় গর্দানে।

ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পরেই শাদুর রোগটা শুরু হয়। বুকটা জ্বালা জ্বালা করে, মনটা হু হু করে— খরার শস্যহীন মাঠে ধূসর সন্ধ্যার মত। ওর ব্যবহারও কেমন যেন হয়ে আসে। বুড়ি মা শাদুর চালচলের অর্থ খুঁজে পায় না মাঝে মাঝে কাঁদে, ছেলেটো আমার বেবাগী হবে ক্যানে গো?

অনেক রাত হলে শাদু বাড়ি ফিরে আসে। প্রদীপের নিরানন্দ আলোয় মা একা একা ঢোলে, ছেলের প্রতীক্ষা করে, তারপর এক সময় মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ে।

শাদু ভাবে, মায়ের দুখটো আর এই জনমে ঘুঁচুইতে পারলোম না, ভাতের কষ্টই গেল না শালোর! অনেকদিন বাড়ি ফিরে দেখে, ভাত ঢাকা দিযে মা বসে আসে। শাদু জিগগেস করে, তু খেলি মা?

খেয়েচি বাপ, তু খা।

মা তু মিচে কথা বলচি, তোর ভাত নাই লয়?

কপালে চড় মারে মা। চড় মারার তালে তালে বলে, হায়, আমি কি মরব! তোর বাপ যে একবিঘে জমি রেখে ড্যাঙ্গ ড্যাঙ্গিয়ে চলে গেল, তা আমি কি করি! বলি বাজেপড়া, লিজে এগু খেয়ে লিয়ে আমাকে শুধুইতে পারিস না!

আধপেটা ভাত খেয়ে অন্ধকার ঘরে ছেঁড়া কাঁথার ওপর শাদু শুয়ে পড়ে। ঘরের ফুটো চাল দিয়ে শীতার্ত হিমেল আকাশটা চোখে পড়ে। আকশের ঠিক সেই অংশেই গোটা কয়েক তারা নিদ্রাহীন স্তিমিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। আকাশটা যেন হামিদার শখের শাড়ি, যে শাড়ি সে কোনদিনই পরতে পারেনি, যে শাড়ি সে একদিন পরবে— আকাশটা যেন সেই শাড়ি। তারাগুলি সেই শাড়ির চুমকি। মাটির দেয়ালের খাঁজে খাঁজে ইঁদুর দৌড়ে বেড়ায়, অন্ধকারে ভিতর থেকে টিকটিকি ডেকে ওঠে— শাদু এপাশ ওপাশ করে। কত

রাতে পরিচিত স্পর্শে চোখ মেলে চায়, ফাটা শীর্ণ হাতে কপালে হাত বুলোয় মা— বাঁ হাতে নিভু নিভু প্রদীপ।

হাঁ বাপ, তু ঘুমুইচিস না ক্যান? তোর কি হয়েচে আমাকে বল।

সি তু জানিস না মা।

বিয়ে করবি তু?

না।

ক্যানে?

না।

মায়ের হানটোরও ত্যালে শ্যাষ হয়ে আসবে— শাদু ভাবে। মৃদু আলোয় বুড়ির মুখের অসংখ্য বলিরেখা জটিল জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সি তু জানিস না মা। তু ঘুমোগো।

মা আস্তে আস্তে উঠে যায়।

ঐঃ, উ হোনেই আমার এমন হোল, ই সব্বনাশী আমার সব্বনাশ করলে। ক্যানে সি আমাকে বলেছিল ভালোবাসি— তা লইলে তো এ্যামোন হোত না। আমাকে বললে ভালোবাসি, কতদিন ডাকলে অর ঘরে, তা বাদ আবার বিয়ে করলে। বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি গেল না— তাই যা, শ্বশুরবাড়ি যা— শ্বশুরবাড়িও যাবি না, আমার ঘরেও আসবি না, তোকে লিয়ে তো ভারি বেপদ হোল।

হামিদার বিয়ের ক'দিন আগে মরিয়া হয়ে ওর কাছে আরও একবার গিয়েছিল শাদু। অনুনয় করেছিল, মিনতি করেছিল, তাদের ভালোবাসার দোহাই দিয়েছিল।

দোহাই দিয়েছিল। হারামী মেয়েটো আমাকে আচ্চার্যি করলে।

উকি বোঝলোম না আমি, উকে বোঝলোম না।

হামিদাকে বুঝে ওঠা সত্যিই মুশকিল হয়েছিল শাদুর পক্ষে। সে বলেছিল, হামি, আমি একটো উপেয় করলোম। বিয়েটো আমরা করেই ফেলি।

তা বাদ?

তা বাদ আবার কি? তুও এক আধটু খাটবি, চলে যাবে যেমন করে হোক।

আ হারে, ওরে আমার গোঁসাই— চোখ ঘুরিয়ে কোমর দুলিয়ে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করে উঠেছিল হামিদা— যিখানে আমার বিয়ে হতে সেখানে আমাকে কি কি গয়না দিচে জানিস? জানিস কয়টো শাড়ি দিচে? তোর আজ খেতে কাল নাই, হাড়হাবাতে, তোর বাড়ি যেয়ে তোর মায়ের বাঁদী হবো লিকিন?

ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল শাদু, ন্যাকার মত প্রশ্ন করেছিল, ভালোবাসাটো কিছু লয়?

অতো পিরীত আমি বুঝি না— কোমর দুলিয়ে চলে যাচ্ছিল হামিদা। চিৎকার করে উঠল শাদু, দূর হ দূর হ, চোখের সামনে থেকে দূর হ, যমের অরুচি, চক্ষের শূল।

মেয়েটিকে শাদু বলে, হারজ্বালানি বিয়ে করল ট্যারাকে। হ্যাঁ, সেই-ই বিয়ে করেছে বলা চলে। কারণ তার এক পোষা কালা দাদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, বিয়ের পর হামিদা শ্বশুরবাড়ি গেল না। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতো স্বামীর সঙ্গে। ট্যারা মাঝে মাঝে আসতো, নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতো। না যেতে চাইলে চিৎকার করতো, যাবি না ক্যানে হারামজাদি, তোর বাপ যাবে, চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে যাব।

মাঝখানে থেকে খন খন করে চেঁচিয়ে উঠত হামিদার দাদি, এ্যাদা ম্যালা চেল্লাস না, যাবে না আমার লাতিন— কি করতে পারিস তু? তোর বড্ড বাড়, দশকে ডেকে জুতিয়ে তোকে গাঁ থেকে তাড়াব।

ছোকরা আর বেশি গোলমাল করতে সাহস করত না। সেও যেন আস্তে আস্তে কেমন হয়ে গেল— নিজের গ্রামে আর বড় একটা থাকত না। শ্বশুরবাড়িতে জায়গা না থাকলেও এর ওর বৈঠকখানায় শুয়ে থাকত, দিনমজুরী করতো, যার তার সঙ্গে মারামারি করত আর মাঝে মাঝে আকণ্ঠ তাড়ি গিলে অন্ধকারে, হামিদার বাড়ি গিয়ে চিৎকার করত, যাবি না ক্যান হারামজাদি, ক্যা আচে তোর ইখানে, যেতে হবে তোকে, বল কুন কুন শালো আচে তোর ইখানে, সে শালোর ঘাড় ভাংব আমি।

ওর চিৎকারের উত্তরে হামিদা তার দাদিকে লেলিয়ে দিত। পাড়া মাথায় করত হামিদার দাদি। মাঝে মাঝে নরম সুরে জিঙ্গেস করত ট্যারা, আমার দোষটো কোতা হ্যাঁ দাদি? বিয়ে করলোম, বউ লিয়ে যাব না লিজের বাড়িতে, নিজের বউয়ের সঙ্গে ঘর করব না, ই কতা কুন রাজ্যে ক্যা সুনচে। ইতো মাহা ফ্যারের কতা বটে।

হামিদার বুড়ি দাদির কথা একটাই, থাকবে না আমার লাতিন তোর সাথে, তু আপনার মানে মানেই দূর হ।

নিদারুণ প্রতিহিংসায় যেন ক্ষেপে উঠত ট্যারা, দাঁড়া হারামজাদিরা একদিন রেতে গলা টিপে যদি লিকেশ না করি, আমার নাম ট্যারা লয়।

এই গোটা ব্যাপারটার কোন হদিস পায় না শাদু। একটা অজুহাত তুলে শাদুকে বিয়ে করল না হামিদা। মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত হাসি চিক চিক করে ওঠে হামিদার চোখে। গভীর কালো সেই চোখের রহস্য ছাপিয়ে হাসিটা দুর্বোধ্য একটা ধাঁধার মত হকচকিত করে দেয় শাদুকে। সেই হাসিটুকু সে বুঝতে পারে না। কেমন যেন ভয় ভয় করে তার। ওর মনে হয়, হামিদাকে একটুও চেনে না সে। এ সন্দেহও তার মাঝে মাঝে হয় যে, হামিদা আসলে ডাইনি কিংবা সাপিনী— তার মত একটা জোয়ান পেয়ে খেলা করছে, ইচ্ছে হলে মাসটা চিবিয়ে খাবে না হয় মোক্ষম ছোবল দেবে। তাই যদি না হবে, সে শাদুকে বিয়ে করলে না কেন। মেয়েটা ওর চোখের সামনে থেকে ওকে যেন প্রতিমুহূর্তে পুড়িয়ে মারছে,

শাদুর মনটা তাই হু হু করে, বুকটা পুড়ে যেন খাক হয়ে যায়। অথচ ওকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না, কখন হয়ত সেই দুষ্টুমিভরা তীক্ষ্ণ সূচীমুখ চকচকে হাসিটা প্রেয়সীর পরিচিত কোমল প্রশ্রয়ের অশ্রুতে গলে যায়, চোখের মণি দুটি ভরপুর অশ্রুর মধ্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে, ওর ভিতরের ভালোবাসাটা যেন চোখে দেখা যায়, ভালোবাসার যে পরশমণির স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে ওঠে, ওর চোখের মণি যেন সেই পরশমণি— দুহাতে বুকে টেনে ফিস ফিস করে বলে, ভালোবাসি, তোকেই ভালোবাসি। তারপর কেঁদে বলে, আমার যি বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আমি কি করি। আমি ক্যানে যে বিয়োটো করলোম! কি ঢুকল আমার মাথার ভ্যাতরি, তু ক্যানে কেড়ে আনলি না আমাকে।

কথা শুনে শাদু ভীষণ অবাক হয়ে যায়। মেয়েটা বলে কি! দোষটা এখন তার ঘাড়েই চাপাতে চায়। সে বলে, তাইলে এখন তালাক দে ক্যানে?

না, তা হয় না।

ওদের গ্রাম্য নীতিবোধে শাদু ভাবে, কাজটো বড্ড খারাপ হবে। ও সোয়ামির ঘরেও যেবে না, আমার ঘরেও আসবে না, অথচ আমাকে কি রেতেই পেরায় ভালোবাসচে। ই সাংঘাতিক বেপার।

সেদিন রহমের কোমর ভেঙ্গে এসে একটা হেস্তনেস্ত করার মনোভাব নিয়ে এল শাদু। সে বললে, ভালো না বাসলে স্বামীর মর্যাদা দেবার দরকার নেই।

আবার ওদের অদ্ভুত গ্রাম্য নীতিবোধে নড়ে চড়ে হামিদা বলে, ছি, উ কথা বলিস না। সোয়ামি সব সোমায়েই সোয়ামি।

একটু আগের লড়াই-জেতা শাদু যেন বিমুগ্ধ অসহায় একটি পতঙ্গ। কিন্তু আমি কি করি আমাকে বল। আমার একটো বেবস্থা কর।

আবার যেন হামিদার ভালোবাসাটি শাদু চোখে দেখতে পেল। ওর চোখের মণি যেন ভালোবাসার পরশমণি— সে যেন এক গভীর বৃহৎ মমতায় গলে যেতে লাগল। সে বলল, আজ রেতে আসিস আমাদের বাড়িতে, মনের জ্বালা জুড়োবো তোর কাছে। সব কথা বলব তোকে। শেতল হবো, আমি আর সইতে পারচি না। আসবি তো আজ রেতে? আসিস, আজ লিচ্চয় আসিস।

শাদু তাকে কথা দেয়। ভাবে, জানটো জুড়োতে চায়, শেতল হতে চায় হামি আমার কাচে, আমি না গেলে চলবে ক্যানে! তবে শালোর আমিও আজ একটো হেস্তোন্যাস্তো করব, হাড়জ্বালানি আমার জানটোকে খেলে।

রাত একটু বেশি হলে শাদু পায়ে পায়ে এগোয়। শাদুদের সময় পরিমাপের রীতি অনুসারে তখন ভাতঘুমের সময়, অন্ধকার ঝেঁপে আছে গ্রামটিকে। যেন একটি বিরাটকায় কালো বাদুড় তার ডানা মেলে অন্ধকারে গ্রাস করেছে গ্রামটিকে। রাস্তার উঁচু-নীচু, ইট-পাথর শাদুর পরিচিত। বিশেষ করে অন্ধকারে এই রাস্তাটা তার এত বেশি পরিচিত যে, চোখ বন্ধ করে যেতেও অসুবিধা নেই।

হামিদাদের বাড়ির পাঁচিল পড়ে গিয়েছে। মাটির বারান্দায় মাথামুড়ি দিয়ে ওরা শুয়ে আছে, দূর থেকে বোঝা যায়। অভ্যস্ত চোখে অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। শাদু জানে সে গেলেই দাদির ঘুম ভেঙ্গে যাবে, একটুও ব্যস্ত না হয়ে বুড়ি জিগগেস করবে, ক্যা ও শাদু লিকিন? আমি ভাবলোম আর কেউ। কাল যাব তোর মায়ের কাচে— ও হামি ওঠ টি, শাদু আইচে,— বুড়ি আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

উঠোনটুকু পার হয়ে শাদু বারান্দায় উঠে পড়ল। দাদির ঘুম আজ আর ভাঙ্গে না— হামিদার শিওরের কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে শাদু ডাকল, হামি!

মেয়েটা অঘোরে ঘুমিয়ে। শাদু আবার ডাকে, হামি, এই দ্যাখ আমি এয়েচি, হামি। এ্যাই হামি!

যেন আঁতকে উঠে ঘুম থেকে জেগে উঠল হামিদা। আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে, ক্যা গো।

চুপ চুপ, আমি শাদু।

হাঁ ওলাউঠা, হাঁ মরণ, আমি চুপ করব? ক্যানে। দাদি, দাদি, ওঠ শিগগির, শাদু আইচে আমার বাড়ি এই রেতে, শাদু আইচে আমার সব্বনাশ করতে।

শাদু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। অন্ধকারে হামিদার মুখটা দেখা যায় না। কিন্তু বোধ হয় আন্দাজ করা যায়, সাপিনীর সেই হিসহিসে হিংস্র হাসিটা ওর চোখে চক চক করে উঠেছে। ফণা তুলে দুলছে মেয়েটা, এক্ষুণি ছোবল দেবে।

দাদি ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে। সেও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। শাদু এসেছে এজন্যে চেঁচামেচি কেন, তা তার নিদ্রাস্থূল নির্বোধ মাথায় ঢুকতে চায় না। তারপর সেও যেন হামিদার প্রতিধ্বনি করে ওঠে। আই সব্বনাশ, শাদু আইচে এই রেতে আমার বাড়ি, লাতিনের সব্বনাশ করতে। হায়, ই কি কথা গ! চিলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে তখন হামিদা। ক্যা কোতা আচো গো, দ্যাখোসে, শাদু এসে আমার কাপড় ধরে টানচে।

হতভম্ব শাদু দেখল অন্ধকার ফুঁড়ে তিনটি ছায়ামূর্তি বাড়ি ঢুকল, ওরা কাছে আসতে একজনকে চিনতে পারল— গড়ে-গর্দানে ট্যারা। ট্যারা আসতেই হামিদা আর একবার চিৎকার করে ওঠে, এ্যা দ্যাখো, শাদু এই রেতে এসে আমার কাপড় ধরে টানচে, আমি কিছুই জানি না, আমি তোমার বিয়ে করা বউ।

ওরা এসে যখন শাদুকে ধরল, সে ব্যাপারটার তখনও যেন মর্ম নিতে পারে না। দারুণ আক্রোশে ট্যারা ওকে যেন খুন করেই ফেলতে চায়, শালো ঘুঘু, বারে বারে ধান খাও তুমি, শালো আজ তোমার হালোয়া বার করব আমি।

শাদু স্থির হয়ে বসে থাকে। ওর চোখের সামনে আকাশের তারাগুলি থির থির করে কাঁপে। গাছ-কোমর করে কাপড় পরা হামিদার মূর্তি ফিকে অন্ধকারে ভয়ংকর একটা সাপের

মত দুলতে থাকে। নিজের রক্তে বিষের ক্রিয়া সে অনুভব করে। ছুরির ফলার মত চকচকে চাপা হাসিটা সে অনুভবে দেখতে পায়।

তারপরের দিন সন্ধ্যায় বিচার বসে। মাতব্বর জিগগেস করে, হামিদার দাদি, শাদু কি কাপড় ধরে টেনেছিল হামিদার?

সি কতা আবার শুধুইচো গ— আমি কি মিছে কতা বলছি?

আচ্ছা হামিদা, ঠিক করে বলত বাপু, শাদু কি রেতে তোমার কাপড় ধরে টেনেছিল?

হ্যা, টেনেছিল।

ঠিক বলছ তো?

অয়, আমার কাপড় ধরে টানলে আর আমি বুঝবো না, কি কথা বলছ গ?

বাস বাস— আর একটি কথা, ট্যারা ইদিকে এসো দিকিন!

ট্যারা মাতব্বরের সামনে দাঁড়ায়।

তুমি তো বাপু, হামিদার কাছে থাকো না, উ বাড়ি যাও না তুমি, কি করে তুমি বাপু ঠিক পেলে আজ রেতে শাদু আসবে।

আমি জানতোম।

কি করে জানতে?

আমি জানতোম।

একটি কতা একশোবার বল না বাপু, জানতে কি করে সেটি তুমাকে বলতে হবে।

বউয়ের সাতে আমার ভাব হইচে, বউ বলেছিল আমাকে।

সভায় একটা গুঞ্জন শোনা যায়, ই তো ভারি মজার কতা বটে!

মাতব্বর এবার শাদুকে ডাকে। শাদু, তুমি কাল রেতে হামিদার বাড়ি গেইছিলে?

গ্যাসলোম।

ওরে শালো, শালো আবার বলে, গ্যাসলোম— কোন নীতিবাগীশ মন্তব্য করে।

ওর কাপড় ধরে টেনেছিলে?

টেনেছেলোম।

মাতব্বর শান্ত কণ্ঠে বলে, তাইলে আর কি, সবই স্বীকার যেচে। মানে কতা হোল কি, শাদু অন্যায় করেছে, অর বিচের দরকার।

শাদুর সমর্থক কেউ চিৎকার করে ওঠে, বিচের আবার কি, হামির বাড়ি শাদু আজ ক্যানে কতদিন ধরে যেচে। বোধহয় আরো কেউ যায়; সি কতা আমরা জানি। মাতব্বর বলে, বেশ না হয় জানলে, কিন্তুক হামিদা তো কুনদিন বিচের চায় নাই। বিচের চাইলে বিচের হোত তার।

অ, সেটোও তো একটো কতা বটে— সমর্থক যুক্তি পেয়ে আশ্বস্থ হয়। মাতব্বর রায় দেয়, তাইলে অন্যায় একটো শাদু করেচে, অকে দশজুতো মারা হোক না কি বা?

নিশ্চয় সেইটোই লেজ্য হয়।

আমি দশের কাচে দশ জুতো খ্যালোম— অন্ধকারে অশ্বত্থ গাছটার মোটা গুঁড়িটায় বসে শাদু ভাবে, উ কি ভালোবাসতে আচে, উ পাপ, উ কি কেউ ভালোবাসে, উ যে সাপ।

ওর পিছনে একটি ছায়া এসে দাঁড়ায়।

শাদু বিড় বিড় করে, আমার লেজ্য বিচের হয়েছে! দশের কাচে আমি দশজুতো খ্যালোম। আমার জানটো লিয়ে লিয়ে না ক্যানে অরা!

পিছনের ছায়া মৃদুকণ্ঠে ডাকে, এ্যাই!

শাদু পিছন ফিরে তাকায়। হামিদা দাড়িয়ে আছে। মাথার কাপড় তোলা, জড়সড় হয়ে নববধূর মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখদুটো হাসছে। এ্যাই, শুনতে পেচিস না?

শাদু চুপ করে থাকে।

আর ভালোবাসবি না? মন জুড়োতে যাবি না আমার কাচে, শেতল হবি না? ম্লান হাসে হামিদা।

শাদু কথা বলে না।

আমার সাতে কথা বলবি না, লয়? গাল দিচিস আমাকে? মানুষটা তবু কথা বলে না।

বলিস না, বলিস না, কথা বলিস না। যমের অরুচি, চক্ষের শূল— হু হু করে কেঁদে ভেঙ্গে পড়ে মেয়েটা। ঐ যে ওর ভালোবাসাটো ওর চোখে আশ্রয় করে— যেন চোখে দেখা যায়।

আজ যেচি আমি সোয়ামির বাড়ি, তোর ছেলে রইল আমার প্যাটে। খনিকটা শোধ দেলোম।

যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

গলির চোখ

আবদুর রাকিব

দুপুরের খাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে কী ঘুম! কী ঘুম!

চোখের পাতা খোলা যায় না। কিন্তু কানে আসে খড়্‌র খড়্‌র— যেন ধানঝাড়া কলের আওয়াজ! সমানে বকে যাচ্ছে মা, কতক্ষণ থেকে, কে জানে! 'সূরজ' নাকি ডুবতে যাচ্ছে। অথচ তার, মানে, 'নিঁদপাড়ানির নিঁদ ভাঙছে না। না ভাঙে না ভাঙুক। সে চলল 'না-পারা' জুবেদাকে দেখতে। এবং দড়াম্ করে দরজাব পাল্লা টেনে দিয়ে চলে যায়।

দিলারা বিছানায় উঠে বসে। আর ঘরের বাইরে ঝকঝকে বিকেল দেখে তার ঘুম-ভাঙা মূঢ় চোখ রূঢ় হয়ে আগুনের ফুলকি উড়ায়। ঠোঁটে দাঁত রেখে অদৃশ্য জননীর উদ্দেশ্যে বিড়্ বিড়্ কবে। ভাত-ঘুম কেন মরণ-ঘুম হয় না, হায! বাইরে যদি রাঙা বিকেল, তো ঘরে কোন সাঁঝ ঘনায়! আমি যদি নিঁদপাড়ানি তো, তুইও পাড়াবেড়ানি। তোর চোখে ছানি বলে কি 'সূরজ' ডোবে সময়েরও আগে? অত ঘ্যান্ ঘ্যান্ কেন? দিনে কি কেউ ঘুমায় না?

বাঁ-হাতেব তালু দিয়ে সে একটা হাই আটকায়। আর আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে জানালার ওপাশে, দূরে কোথাও, কী দেখে যেন থেমে যায়। দূর মানে গলির মোড়— এ ঘরের জানলা দিয়ে যা স্পষ্ট দেখা যায়। সেতুর মুখ থেকে গড়িয়ে-আসা মোরাম রাস্তায় এসে, অচেনা কেউ, পথের দিশা নিতে, ওখানে কিছুক্ষণ থামে। এখন যেমন, ঘোমটা-টানা এক বউ, মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মেয়ে বুলাকে কী যেন বলে। আর বুলাও আঙুল দিয়ে কারও বুঝি বাড়ি দেখায়।

গলিও নাকি অন্ধ হয়। কিংবা ভুলভুলাইয়া। সেখানে কত মানুষের কত কী— টাকা, নাম, মান, অহংকার, আদর্শ, চরিত্র ইত্যাদি হারিয়ে যায়। কিন্তু এ গলি চক্ষুষ্মান— দিনেও যেমন দেখতে পায়, তেমনি রাতেও। কারও কিছু খোয়া যায় না। বরং খোয়া জিনিস পাওয়া যায়। এ গলি সদ্য গজিয়ে-ওঠা উপনিবেশের শিরদাঁড়া। দু'পাশে মোট আটখানা বাড়ি। শেষেরটি দিলারাদের। ওপাশে জলাভূমি, কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ জটিলতা। বুলার আঙুল কোন্ বাড়ির দিকে, বোঝা যায় না। কিন্তু ঘোমটা-সুন্দরীকে এদিকে আসতে দেখে দিলারা একটু ত্রস্ত হয়। যদি সে থেমে যায় ওই বাড়ির দরজায়! 'যদি'র ওপর নির্ভর করে দিলারা দ্রুত গুছিয়ে নেয় একমাথা এলোচুল। জানালা দিয়ে তার আসা দেখে। পা-পা করে হাঁটছে। মাথা নীচু করে। কী ফর্সা মুখ! চোখ তুলে তাকালে চোখের রঙও দেখা যেত। কিন্তু যাচ্ছে না। পরনে তাঁতের শাড়ি। বুটিদার আঁচল। শাড়ির রঙ বুঝি

কলাপাতার! নাকি তুঁতের? শরীরে মানায়, সরু গলিতে নয়। যদি উল্টোদিক থেকে এসে পড়ে কেউ (যার সমূহ সম্ভাবনা), তবে, দিলারা ভাবে, তাকে পথ দিতে, ক্ষুন্ন হবে না তার শরীর ও শাড়ির ঠমক? দিলারা মনে মনে হাসে, আর ছড়া কাটে : বউ কথা কও পাখি/কাকে খোঁজে তোমার পোষ-মানা আঁখি। তারপর কলতলায় গিয়ে চটপট চোখ ধুয়ে নেয়।

তখন সত্যিই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। খুলে দিয়ে দিলারা দেখে, হ্যাঁ, সে-ই। যে চোখ সে দেখতে পায়নি, এখন সেই গভীর ও কালো চোখ তুলে বলে, 'এটা দিলারাদের বাড়ি?'

'জি।'

'তুমিই বুঝি দিলারা?'

'জি, কিন্তু আপনি?'

'পরিচয় না দিলে ভেতরে বুঝি আসতে বলবে না?'

দিলারা লজ্জা পায়। 'তা কেন? আসুন না।'

তাকে এনে সে ঘরে বসায়। আর কেউ নেই। সেখানে তবুও, বোধ হয় অভ্যাসবশে (যে অভ্যাসে ক্ষৌরিক ফাঁকায় কাঁচি চালায়, ব্যাটসম্যান ব্যাট ঘোরায়, বল-ছোঁড়ার ভঙ্গী করে বোলার), আরেক দফা মাথার কাপড় আর শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলে, 'আমার বাড়ি বাণীপুর। তোমার তো ওখানেই বিয়ে হচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও দিলারা থেমে যায়। খুবই গোপন খবর। কারও জানার কথা নয়। তাই তার পাল্টা প্রশ্ন, 'আপনি কার মুখে শুনেছেন?'

সে দিলারার অস্বাভাবিকতা উপভোগ করে। খবরটা যে গোপন, তা-ও অস্বীকার করে না। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও বলে যে, বিয়ের ব্যাপারটা কাউকে না কাউকে বলতেই হয়। কমপক্ষে কাজী, উকিল, সাক্ষীদের। 'ধরে নাও, ওদেরই কেউ একজন বলেছে। কিন্তু ও নিয়ে ভেবো না, আমি তোমার হবু বর রিয়াযের মামাতো বোন, শাকিলা। এসেছিলাম ডা. মোল্লার কাছে। তো, মনে হল, হবু ভাবীকে এক নজর দেখে নিই। কেমন সে দেখতে! কাজিয়া করতে জানে কিনা। বিয়ের পর তো ননদভাজে ঝগড়া হবে!'

দিলারার ঠোঁটে হাসি আসে। কিন্তু মুমূর্ষুর হাসি। এ রসিকতাও তেঁতো মনে হয়। কেননা, শাকিলার ইশারা কোন্ দিকে, সে বোঝে। আসলে রিয়াযের বউ-বাচ্চা আছে। এ বিয়েতে তাই ঢাক-ঢোল বাজবে না। কিন্তু বিয়ের পর, যদি কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়, তো সে সতীন, নিশ্চয়ই ননদ নয়। শাকিলা দিলারার চোখমুখের ভাষা পড়ে নিয়ে বলে, 'শোন, মেয়েদের মাঝে মাঝে কাজিয়া করতেই হয়। মুখ বুজে থাকলে চলে না। ঝগড়া করে অধিকার আদায় করতে হয়। ও বাড়িতে কেউ তোমাকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছেড়ে দেবে না। তোমাকে তা পেতে হবে নিজের জোরেই।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে দিলারা বলে, 'কিন্তু আমি তো ও বাড়িতে থাকব না। উনি বলেছেন, উমরপুরে ঘর ভাড়া নেবেন।'

শাকিলা এবার দমে যায়। তাকে একথা কেউ বলেনি। এ-ও যেন সময়ের ভ্রূকুটি। নোনা সাগরের কোথাও বুঝি বাষ্পীয়ভবন শুরু হল, সে টের পায়। অচিরে ঘনীভূত হবে জলগর্ভ মেঘ। আর, সব না হোক, কোন-না-কোন মেঘ তো অবশ্যই বৃষ্টি ঝরায়। কিন্তু বৃষ্টিসিক্ত হওয়ার আগে সে বলে, 'তার মানে তুমি রিয়াযকে তার পরিবার থেকে কেড়ে নিচ্ছ?'

বটে! তাহলে শাকিলা তাকে দেখতে আসেনি। এসেছে নালিশ জানাতে? কৈফিয়ৎ নিতে? দিলারা শক্ত গলায় বলে, 'না, আমি তাঁকে কেড়ে নিচ্ছি না। তাঁর পরিবারই তাঁকে ধরে রাখতে পারছে না। আমার কী দোষ?'

শাকিলা চোখ নীচু করে। এভাবে সব মানুষ বুঝি তা দেয় যে যার যুক্তির ওপর এবং কেউই নিজেকে দোষী মনে করে না। শরীরের সঙ্গে ছায়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু নিজের ছায়া দেখে না। যুক্তি দিয়ে অপরের অন্ধতা দূর করে, কিন্তু নিজেকে ডুবিয়ে রাখে অন্ধতায়। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে দিলারা আরও কিছু বলার সুযোগ পায়। বলে, উনি বলেন, 'তাঁর স্ত্রী নাকি আনপড়। গোঁয়ার। ঝগড়াটে। মুখরা। স্বামীকে সন্দেহ করে। স্বভাব-চরিত্রও সুবিধের নয়। বিয়ের আগে নাকি দু-তিনটি ছেলের মাথা খারাপ সুবিধের নয়। বিয়ের আগে নাকি দু-তিনটি ছেলের মাথা খারাপ করে দেয় একজনকে তো আজও আদর করে বাড়িতে ডেকে আনে।'

শাকিলার সব হাড় কন্ কন্ করে। তার বলতে ইচ্ছা হয়, তুমি জানো না দিলারা, তোমার হবু বর একটা চালুনি। অসংখ্য ছিদ্র সেখানে। নারী-শিকারী। রিয়ায বলেনি, কেন তাকে রতনপুর স্কুল ছাড়তে হয়। এক ছাত্রীর সর্বনাশ করে সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে, প্রাণ নিয়ে। রিয়ায বলেন, কখন, কেন, কার হাতে তাকে মার খেতে হয়। কোন্ বাড়ির বউয়ের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে তার অমন দশা হয়। রিয়ায বলেনি, আজ যে গড়বাটি স্কুলে সে চাকরি করে, সেটা পাইয়ে দেন তার ওই স্ত্রীরই বাপ। তিনি তখন স্কুলের সেক্রেটারি। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বহু বাধা সত্ত্বেও রিয়াযকে স্কুলে ঢুকিয়ে দেন। শাকিলার আরও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা হয়। বলে না। যে মেয়ে রিয়াযকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, তার ঘুম ভাঙাতে সে আসেনি। সে থাকুক তার মিথ্যা নিয়ে। তা মুছে দেওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। দিলারা কিংবা রিয়ায জানে না, মিথ্যা যদি গলিত-পচা মাংস হয়, তবে তা প্রিয় খাদ্য শকুনির, মানুষের নয়। শাকিলা উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'তোমার কথাই ঠিক। রিয়াযের বউ সত্যিই তার উপযুক্ত নয়। জানে না কী করে স্বামীকে ধরে রাখতে হয়। আমার কথায় রাগ করো না। আমি বয়সে বড়। তুমি আমার ছোট বোন। আমাকে মাফ করে দাও।'

'উঠছেন যে! একটু বসুন, চা খেয়ে যাবেন।'

'বেশ তো, চল না, আমিও তোমার চা বানানো দেখি।'

দিলারা হেসে বলেন, 'আসুন।'

বারান্দার কোণে টেবিলের ওপর গ্যাসের উনুন। শাকিলাকে একটি টুল এগিয়ে দিয়ে দিলারা উনুন ধরায়। টুলে বসে শাকিলা বলে, 'বাড়ির আর কাউকে দেখছি না?' সে জানাল, তার মা গেছে অসুস্থ খালামাকে দেখতে। ভাইবোনেরা বাইরে কোথাও খেলছে। বাবা বাস-চালক। ফিরতে রাত হয়। আর শাকিলা ভাবে, যেন লটারির টিকিট কেটে সে এ নিরিবিলি জিতে নিয়েছে। খুশি হয়ে বলে, 'শোন, রিয়াযের চায়ে এক চামচের বেশি চিনি দেবে না। সুগার ওর বড় ভয়। পানি না ফুটলে চা-পাতি দিও না। আর চা ফেলে দিয়েই ঢাকনা দেবে। আর ওই অবস্থায় রাখবে এক মিনিট। তারপর ছাঁকবে।'

'বাব্বা! আপনি তা-ও জানেন?'

'জানব না? মামাতো বোন বেটে! রিয়ায চা-রসিক। কিন্তু খুব খুঁত-খুঁতে। ও কী কী খেতে ভালবাসে, কী কী খায় না— তাও বলে দেব কি?

'বলুন না।'

শাকিলা তার লম্বা ফিরিস্তি দেয়। তারপর দিলারাকে সতর্ক করে দিলে বলে, 'ওর লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি, রুমাল পরিষ্কার করে আলনায় গুছিয়ে রাখবে। বিছানার চাদর, বালিশ যেন এলোমেলো না হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই রেগে কাঁই হবে। বাচ্চাদের মতো ছুঁড়ে ফেলবে সবকিছু।

দিলারা মজা পায়। বলে, 'আর?'

'শীতের সময় গরম পানিতে গোসল করে। পানি গরম করে দিতে ভুলো না।'

'আর?'

'ভুলেও কখনও ওকে নামায় পড়তে বা রোযা রাখতে বলো না। ওসব বললে ও খুব রেগে যায়।'

'আর?'

'ভাবীর মুখে শুনেছি, রাতে দেরি করে শুতে গেলে ও নাকি পাশ ফিরে শোয। রাগে কথা বলে না।'

দু'জনেই শব্দ করে হাসে। দিলারা চা ছেঁকে এক কাপ অতিথিকে দেয়। নিজেও নেয়। তাক থেকে বিস্কুটের কৌটোও নামিয়ে আনে। চায়ে চুমুক দিয়ে শাকিলা একটি নতুন নিবিড় কণ্ঠ পায়। বলে, 'ও যত মেজাজীই হোক, আশা করি তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। কেন না, ও তোমাকে ভালবাসে। না বাসলে নিশ্চয়ই বিয়ে করতে চাইত না। এতদিনে হয়তো তুমিও তা টের পেয়েছ। পাওনি?'

দিলারা শুধু হাসে, উত্তর দেয় না।

'তোমাদের শুরুটা কিভাবে হয়, এট্টু বলো না ভাই! শুনতে ইচ্ছে হয়।'

'ওনার কাছে ট্যুইশানি পড়তাম তো। একদিন বাড়িতে এসে দেখি, আমার বইয়ের ফাঁকে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখেছেন : দিলারা, আমি তোমাকে ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই। তুমি রাজি কিনা, জানাও।'

'তুমি কী করলে?'

'আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। তার দু'দিন আগে হুবুহু একই ভাষায় আমার এক সহপাঠীর একখানি চিরকূট পাই। তার নাম ওয়াসিম। খুব সুন্দর। দুর্দান্ত বল খেলে। খেলার নেশায় পড়ে পড়া ছেড়ে দেয়। কলকাতার কোন্ ক্লাব থেকে নাকি তার ডাকও আসে। আপাতত সুপার মার্কেটে একটা স্টেশনারী দোকান দেয়।'

'তার-মানে, ওয়াসিমের চিরকূটও তোমাকে নাড়া দেয়। হয়তে প্রথম বলেই।'

'কেন জানে', বলে দিলারা কাপে ঠোঁট রাখে। শাকিলার আবার্য বলতে ইচ্ছা হয়, 'দেখেছ দিলারা! ভালবাসার প্রতিক্রিয়া ভালবাসাই হয, আর কিছু নয়। তলে তলে তুমিও ওয়াসিমের প্রতি দুর্বল হও। কেননা, ওই চিরকূট তোমার স্বীকৃতিপত্র। রিয়াযেব লিপি না এলে তোমাব মন হয়তো ওয়াসিমকে ছুঁয়ে থাকত। ভালবাসা এভাবে ঘুবে বেড়ায়ে। তাকে ধরে নিতে হয়। আমাদের মতো সামান্য লোকের মন বড় স্বার্থপর। তুল্যমূল্য বিচাবে কাউকে খাটো দেখি, কাউকে বড়। তুমিও হয়তো এখন রিয়াযকে মারুতি ভাবছ, আর ওয়াসিমকে সাইকেল। সাইকেল ফেলে মারুতির আরোহী হতে চাও।' এসব বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলে না। বরং চায়ের কাপ নামিযে বেখে উঠে দাঁড়ায।

'চলি দিলারা। রিয়ায হয়তো সত্যিই স্ত্রীর কাছে কিছুই পায়নি। হয়তো সব দিক দিয়ে অতৃপ্ত। তুমি ওকে খুশি রেখো। কখনও ব্যথা দিও না।'

দিলারা বোবা হয়ে শাকিলাকে দেখে।

'ওকে বলো, যত দূরেই থাক, যেন ছেলেমেয়েদের খবর রাখে। যদি পায়, দূরে থেকেও, তুমিও ওদের মা হওয়ার চেষ্টা করে।' বলতে বলতে শাকিলার স্বর কেঁপে যায়। দু-এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে আসে চোখ থাকে। তারপর রুমালের ভাঁজ খুলে এক শিশি আতর বার করে দিলারাকে দেয়। 'বিয়ের দিন তো থাকতে পারব না। বুবুর এটুকু নাও। দু'জনেই ব্যবহার করো। আল্লাহ তোমাদের খুশি করুন।' তখনও দিলারার মুখে কথা নেই। শাকিলা তার চিবুক ধরে কাছে এনে আলতো করে কপালে চুমু দেয়। তারপর 'আসি' বলে দ্রুত চলে যায়। আর দিলারা দরজায় দাঁড়িয়ে গলির মোড় পর্যন্ত তার চলে যাওয়া দেখে।

রিয়ায এ বাড়িতে আসে সন্ধ্যার পর, এক ঝলক আলোর মতো। কিংবা একটি উচ্ছল ফোয়ারা। সঞ্জীবিত হয় সারা পরিবার। মা দাঁড়িয়ে থাকে ঘরে দরজায়। বাবা বিড়ি টানে বিনোদনী মেজাজে। ছোটোরা ঘুর্ ঘুর্ করে হবু দুলা ভাইকে ঘিরে: আর দিলারা ব্যস্ত

হয় অতিথি আপ্যায়নে। এখানে সময় সুসময়— খুশির দোলনা দুলিয়ে দেয়। গুন্ গুন্ গায় ঘুমপাড়ানি গান।

কাজের ফাঁকে দিলারার কানে আসে রিয়াযের ঘোষণা। মা-বাবাকে বলা হচ্ছে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, মৌলবি সাহেব আর দু'জন সাক্ষী নিয়ে উনি আসবেন আসছে মঙ্গলবার, মাগরিবের নামাযের পর। এখানে যেন একজন উকিল ঠিক করে রাখা হয়। উমরপুরে ঘর পাওয়া গেলেও, কিছু কাজ বাকী আছে বলে সেখানে যেতে হপ্তাখানেক দেরি হবে। তার মানে, ওই রাতেই তিনি দিলারাকে নিয়ে যেতে পারছেন না। 'ঠিক আছে', ঠিক আছে' বলে বাবাও বড় উচ্ছ্বসিত। দেখে দিলারার হাসি পায়। সামান্য বাস-চালক। বরাত জোরে সুউপায়ী শিক্ষক-জামাই পাচ্ছে। খুশি হওয়ারই কথা।

খালি চোখে দেখা যায় না, এমন সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথেও নাকি হাওয়া গলে। মনে হয়, তেমন কিছু ঘটছে দিলারার পুলক-চঞ্চল স্নায়ুকোষেও। সেখানে একরত্তি হিমেল হাওয়ার দৌরাত্ম কমছে না। বার বার কেন ফুটে ওঠে একজোড়া ভেজা চোখ, আর বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়! মনে হয়, সেদিন অমন হুট্ করে এ বাড়িতে এসে শাকিলা ভাল করেনি। সুগন্ধ বিলিয়ে সে চলে যায় বটে, কিন্তু হিমকণাও রেখে যায়। এটুকু তো তার প্রাপ্য ছিল না।

দিলারা জানে, এরপর রিয়ায আসবেন এ ঘরে। আর মা তখন ইশারায় ভাইবোনদের ডেকে নেবে। দিলারা বিছানায় বসে বইয়ের পাতা ওল্টায়। আর কান রাখে দরজায়। ওখানে পায়ের শব্দে পায়ের মালিককে চেনা যায়।

একটু পরে রিয়ায এসে বলে, 'শুনলে তো সব!'

'জ্বি।'

'তুমি কি এখনও 'জ্বি' বলবে?'

দিলারা মাথা নীচু করে।

'ওই রাতে এ বিছানা হবে আমাদের বাসরশয্যা। তখন্য কি বলবে, স্যার, একটু সরে যান?'

এ কথায় যেন এক ঝাঁক পায়রা ওড়ার শব্দ হয়। আরও ঘন হয়ে রিয়ায বলে, 'ওইদিন আমি ছাড়া আমার কেউ থাকছে না। শুধুই তুমিই হবে আমার।'

'না, আপনি শাকিলা বুবুকে সঙ্গে আনুন।'

'কে সে?'

'কেন, আপনার মামাতো বোন!'

'দূর! মামাতো তো দূরের কথা, আমার নিজেরও কোনো বোন নেই।'

'তবে যে উনি—'

রিয়ায এবার সোজা হয়ে বসে 'ব্যাপার কী, বলো তো!'

দিলারা সব খুলে বলে। কিন্তু রিয়ায তখন ফ্রেমে-বাঁধা ছবি। আর তার হবু বধূ,

এই প্রথম, ভুরুর ধনুর থেকে তীর ছুঁড়ে দেয়। 'থাক্, আর ভান করতে হবে না। এবার যা যা বলছি, তার উত্তরে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'-র ঘরে টিক্ দিন।'

'কিন্তু—'

'না, আমাকে বলতে দিন। আপনি গুঁচি মাছ খান না। কেননা, মনে করেন গুঁচিরা বানভাসি মরা মানুষের পেটের ভেতরে ঢুকে নাড়ি-ভুঁড়ি খায়। ছুটির শাক খান না, কেননা, ওতে নাকি বেশি মল হয়। কুমড়ো, কালো কলাইয়ের ডাল ছুঁয়েও দেখেন না। কাঁকরুল খান, করলা নয়। পটল খান বিচুন বেছে ফেলে। টক, ঝাল সহ্য করেন না। পাকা পেঁপে আর কাঁঠাল মুখে দেন না। পোস্তর বড়া পছন্দ করেন—'

'সব ঠিক, কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে?'

'শীতে গরম পানিতে স্নান করেন।'

'হ্যাঁ, করি তো।'

'নামায-রোযার কথা বললে রেগে যান?'

'কে বললে তোমাকে?'

'শাকিলা বুবু।'

রিয়ায বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'বলেছি না— শাকিলা নামে কাউকে চিনি না।'

দিলারাও বিছানা থেকে নেমে আসে। 'তাহলে উনি কী করে বলেন যে, রতে যদি আপনার স্ত্রীর শুতে দেরি হয়, তো আপনি পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন, রাগে কথা বলেন না।'

রিয়ায আবারও স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে। কে সে? কে তাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে দিল সার্কাসের দড়ির ওপর?— যখন সে জানে না, ভারসাম্য বজায় রেখে কিভাবে দড়ির ওপর হাঁটতে হয়?

দিলারা বলে, 'আশ্চর্য! আপনি তাঁকে চেনেন না, অথচ তিনি আপনাকে কী ভালই না বাসেন। আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনাকে খুশি রাখে। কখনও যেন ব্যথা না দিই। তাঁর অনুরোধ, আপনি যেন বাচ্চাদের খবর রাখেন। দূরে থেকে আমিও যেন ওদেব মা হই। বিয়ের উপহার হিসেবে তিনি এক শিসি আতরও দিয়েছেন।'

রিয়াযকে বড় করুণ আর অসহায় দেখায়। মরিয়া হয়ে বলে, 'বিশ্বাস কর দিলু। ও নামে আমি কাউকেই চিনি না।'

দিলারাও হতভম্ব হয়ে বলে, 'তাহলে কে তিনি?'

'কেমন দেখতে বলো তো?'

দিলারা শাকিলার বর্ণনা দেয়। আর তা শুনে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো রিয়ায বলে, 'মনে হয়, আমি তাকে চিনেছি।'

কিছুক্ষণ কী ভেবে দিলারাও বলে, 'আমারও মনে হয়, অমি তাঁকে চিনতে পারছি।'

দু'জনের চোখ দু'জনকে দেখে। কিন্তু তারা যাকে চিনেছে বলে দাবি করে, কেউই তার নাম উচ্চারণ করে না, কিংবা করতে পারে না। খুব একটা দেরি না করে রিয়ায চলে যায়। আর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দিলারা গলির মোড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরদিন সকালে ওই গলির মোড়েই দু'জনের দেখা। রিয়ায বলে, 'এই তো তুমি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। জানো, গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। ভেবে দেখলাম, আপাতত বিয়েটা বন্ধ থাক। পরে দেখা যাবে।'

পরে আর দেখার দরকার নেই স্যার। আপনি তো ওয়াসিমের চিরকূট দেখেছেন। সেটির জবাব দিতে ওখানেই যাচ্ছি।'

'তার মানে—'

'হ্যাঁ, স্যার,' দিলারা বলে, 'আমি ওর প্রস্তাবে রাজি। গত রাতে আমিও দু'চোখ এক করতে পারিনি।'

'চল, আমিও যাই। তোমার স্যার হয়ে আমি ওয়াসিমকে বলব, শুভ কাজে সে যেন দেরি না করে।'

দিলারা হেসে বলে, 'চলুন।'

কোলকাতা '৯২ এবং একটি শিশু

আবু আতাহার

॥ এক ॥

শিশুটি কাঁদছিল। হাত-পা নেড়ে কাতর আর্তনাদ। খোলা আকাশের নিচে একা। একটা শিশু। কেউ শুনছিল না ওর কান্না। কেউ দেখছিল না ওকে। তার নাদুস-নুদুস চেহারা। ভোরের ফোটা গোলাপের মতো ওর মুখ! নরম পাপড়ির মতো ওর শরীর। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ খেয়াল করছিল না ওকে। যে যার জান বাঁচাতে ব্যস্ত। ছুটছিল সবাই।

কোথায়? কাশ্যপ পাড়ায়! মেটেবুরুজের অন্য কোন গলিতে? নাকি তপসিয়ার! বিবি বাগানে, ধোবিতলায় অথবা ট্যাংরার অন্য কোন বস্তিতে। ঠিক মনে করতে পারছি না কোথায় দেখেছিলাম। তবে এই দৃশ্যটা এখনো আমার চোখে ভাসছে।

তারিখটা আমার মনে আছে। ৬ থেকে ১২ ডিসেম্বরর যাবতীয় কলঙ্কিত ঘটনা মনে আছে। ৯২-এর ডিসেম্বরের কালো বাদুড়ের ডানামেলা অন্ধকারের দিনগুলোও ছবি হয়। সেই আঁধারে হিংস্র হায়েনা, বাঘের থামা, লোভী কুকুরের দৌড়াদৌড়ি। কাদের যেন সমস্বর চিৎকার; আগুন লাগা, লুঠ কর, মার।

আগুন তখন সর্বগ্রাসী। শিখাগুলার সর্বনাশা দাউ দাউ। পালাচ্ছে বস্তির মানুষ। যে যেদিকে পারছে। কেউ কিছু নিচ্ছে, কেউ কিছুই নিতে পাবছে না। তারি মধ্যে লাল সবুজে মাখামাখি একটা শাড়িপরা যুবতী মেয়ে কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে দৌড়লো। আর একটু এগিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল পথে। কিসের স্তূপ যেন। খড়, বিচালি, চামড়া, রাবার কি জানি কি! লাগলোনা কিন্তু ছেলেটা ছিটকে গেল কোল থেকে। তখনো সেই শব্দ আসছে পেছন থেকে— মার মার, আগুন লাগা। অনেকে দৌড়চ্ছে। কে যেন ডাকলো, ওঠো ওঠো, চলো চলো, পালাও।

ভিড়ের চাপে মানুষের ঠেলায় সেই নদীর স্রোতের মতো জনস্রোতে তখন হারিয়ে গেল মেয়েটি। প্রাণ ভয়ে ভুলে গেল বাচ্চাটির কথা। তার আর্তনাদ খোলা আকাশের নিচে সেই মুহূর্তে কানে গেল না কারো। সামনে পালাচ্ছে ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ, পেছনে হু হু করে জ্বলছে বস্তি। মাঝে সেই শিশু কাঁদছে।

— কার বাচ্চা?

এবার যেতে যেতে একজন শিশুটাকে দেখে প্রশ্ন করলো।

— বোধ হয় রাবেয়ার। উত্তর দিল আর একজন।

— না অনিতার। অন্য একজন বললো।

মন্তব্য করলো কিন্তু কোলে তুলে নিল না কেউ। রাবেয়ার অথবা অনিতার। অনিতার কিংবা রাবেয়ার। শিশুটি সেই ধ্বংসের মধ্যে একটা কেঁদেই চললো ডিসেম্বরের কোলকাতায়। সেই নৃশংসতার মধ্যে নিরীহ শিশুটি তখনো পড়ে রইলো একা।

শীতে কাঁপছে কি, না কান্নায়? একজন দেখে একটা কাপড় ছুঁড়ে দিল। আগুনের আঁচ অদূরে। কিছু মানুষ লুটপাটে ব্যস্ত। কিছু আগুন লাগাতে। প্রাণ ভয়ে বস্তি খালি করেছে বাসিন্দারা। দাপটে তড়পাচ্ছে সমাজবিরোধীরা। তাদের একজনের চোখ পড়লো শিশুটির দিকে, আয় শালা একটা জ্যান্ত বাচ্ছা রে।

— কার! শালা ওদের হলে তো ঝেড়ে দিতাম। একটা কমতো।

— বোঝা তো মুশকিল। দ্বিতীয় মাস্তান বললো, এ বস্তিতে তো সব জাতের মানুষ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান—।

— সেটাই তো ঝামেলা, শালা ঘর জ্বালাতে গিয়েও দশবার ভাবতে হয়। এ বাচ্চা মুসলমান না হিন্দু? আরে এই— প্রথম জন ডাকলো।

— কি?

— ল্যাংটো করে দ্যাখ তো ইয়েটা কাটা না—

— ধ্যুৎ শালা, এত ছোটতে কাটা-ফাটা হয় না।

এই সময় একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। পুলিশের গাড়ি। বেশ কয়েকটি গাড়ি। পেছনে দমকল। পালিয়ে গেল সবাই। দমকল ব্যস্ত হয়ে পড়লো আগুন নেভাতে। কিছু মানুষ উঁকি ঝুঁকি মারলো। দু'-পাঁচজন বেরিয়ে এলো। পুলিশের কাছে অভিযোগ করলো। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়লো।

ক্রমশ আরো লোক এলো। ভিড় বাড়লো। পুলিশ শূন্যে গুলি ছুঁড়লো। ভয়ে লোকগুলো পালাতে শুরু করলো। জায়গাটা পুনশ্চ ফাঁকা। শিশুটি তখনো সেখানে। একা সে এবার কান্না আরো জোর করে দিল মটরের হেডলাইটটি গিয়ে পড়লো তার উপর।

।। দুই ।।

তখন বিকেল ছুঁই ছুঁই শেষ দুপুর। এবার ফিরতে হবে— মিনু বললো। মিনতি মিত্র। আসগার ওর দিকে চেয়ে হেসে মন্তব্য করলো, চাকরি কবছো তবু তোমার পায়ে বেড়া।

— এটাই বাড়ির শাসন। মিনু হাসলো, যখন তোমার বাড়িতে যাবো তুমিও এমনি বেড়া না হলেও বেড়ি পরিয়ে দেবে মশাই। মিনু হাসলো।

অফিস পালিয়ে এলেও বাড়ি ফেরার সময়টা ঠিক রাখতে হয়। আসগার সেটা জানে! আর কথা না বাড়িয়ে সার কথাতে সোজা চলে এলো, তাহলে ভবিষ্যৎ কি?

— শূন্য।

— মানে?

— মনে আমার এই সামান্য চাকরি যার মাইনে হাস্যকর। তোমার প্রাইভেট ফার্মে পরিশ্রমের বিনিময়ে যা পাও সেও ভালো নয়। কারখানার শ্রমিকও এর চেয়ে বেশি টাকা পায়।

— এক্সপ্লয়টেশন। সুযোগ পেলে সব মালিকই ঠকায়।

— সর্বত্র। সুযোগ পেলে সবাই শোষণ করে এতো নতুন কথা নয়।

— তবু আমরা বিয়ে করব। আসগার বললো দৃঢ়কণ্ঠে।

— ভালো কথা। মিনতি মিষ্টি হাসলো।

— তুমি রাজি তো?

— সব সময।

— তোমার বাড়ি!

— বাধা দেবে, বারণ করবে সে তো জানা কথা। তোমার বাড়িও সহজে মেনে নেবে না এও নতুন কথা নয়। তা বলে—।

— তা বলে? আসগারের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসা।

— তা বলে নীরব হয়ে বিরহের গান গাইব? বড় বড় ডায়ালগ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব, এই ভালো। না তা কখনো নয়। মিনুও দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল। বুঝলে মশাই ভালোবাসা নিয়ে খেলাধুলো আমার পছন্দ নয়।

অতএব। বিকেল এবার ছুঁতে চলেছে সন্ধেকে। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে ডুব দিচ্ছে সূর্য। আজকাল কোথাও নিরালায় দু'দণ্ড বসার উপায় নেই। গত ১০/১৫ বছরে কোলকাতার চেহারাটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। সবাজবিরোধীদের দাপটে অস্থির সবাই। গড়ের মাঠে ছেলেমেয়েরা বসতে ভয় পায়। ইডেনে, লেকে, গঙ্গার ধারে সর্বত্র। ভিড় বাড়ছে মহানগরে। কোথা থেকে আসছে এতলোক! দু'জনেই আলোচনা করে। একটু কাছাকাছি এলেই যাদের চোখ হেডলাইটের মতো এসে পড়ে তাদের উপর। তীক্ষ্ণ নজর। কাদের এই দৌরাত্ম!

সূর্য ডুবলো। হাঁটতে হাঁটতে হিসেব করলো আসগার। আমার বারোশো, তোমার সাতশো। মোট উনিশশো। চলে যাবে কি বলো!

— সেভিং! মিনু বললো।

— দুশো। তার মানে সতেরোশো। একদা কমার্সের ছাত্র আসগার হিসেব করতে লাগলো। বাড়িভাড়া।

— হাজার।

— ওরে বাবা!

— তার কমে কোথায় বাড়ি হবে এই কোলকাতায়, এই উনিশশো নব্বইয়ে। তাও সেলামী, অগ্রিম।

— পাঁচশো দেওয়া যায়। বাকী বারোশোতে চালাতে হবে পারবে না? চলবে চলবে।

এবার মনে মনে হিসেব। দ্বন্দ্ব, বয়সও হচ্ছে। দশ বছর ধরে মেলামেশা। আটত্রিশ, বত্রিশ আর দেরি করা উচিত নয়। ভালো অফিস হলে এবং ভালো স্কুল বা সরকারি স্কুল হলে দু'জনেরই প্রায় তিন সাড়ে তিন হাজার মাইনে হতো। অর্থাৎ ছয়-সাত হাজার। কিন্তু! না, সেই কিন্তুর বাধা পেরোল না। কিন্তু ভালোবাসা পরিণতিতে এসে সানাই বাজলো। অনেক কষ্টে অল্প টাকা ভাড়ায় খুঁজে পাওয়া বাসায় টেপের সানাই।

।। তিন ।।

ফাল্গুন। ফেব্রুয়ারি। সুন্দর মাস। বসন্তের বাতাস। উনিশশো নব্বই। রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। সই, মালা বদল, মিষ্টি। পাঁচজন বন্ধুর উপস্থিতি। ইমরান, অরিন্দম, আসাদ, মৌসুমী, রেহানা। রাতের হোটেলে মাটন-বিরিয়ানি। চিকেন চাপ। তারপর।

তারপর তিনশো টাকা ভাড়ার এই ঘরে। ১০ ফুট বাই ১২ ফুট। বাইরে একফালি রান্নাঘর। কমন বাথরুম। অনেক খুঁজে, অনেক ঘুরে বাজেটের মধ্যে এই ঘর। ভাড়া করা খাট। সেই খাটকে সাজানো হয়েছে। সেখানেই আজ সুহাগ রাত। সেখানেই ফুলশয্যা। এ বাড়ি ও বাড়ি কোন বাড়ির আত্মীয়রা আসেনি। কিছু স্বজনের উপস্থিতি। পড়শী কিছু। সবাই চলে গেছে। এখন দু'জন। মিনতি আসগার। আসগার মিনতি। এই একবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি আসা নারী-পুরুষ বত্রিশ আটত্রিশও যৌবন হারায় না। বরং এখনো আগুনের আঁচ পরস্পরের শরীর ছুঁলেই। যে মিনুকে আসগার প্রায় বলতো কোল্ড গার্ল। সে আজ এই রাতে প্রেমিককে স্বামীরূপে পেয়ে বুঝিয়ে দিল, এখনো যুবতী শরীবে কোমলতার পাপড়ির আড়ালে গোপনকাম রেণুর মতো লুকান।

খাটে সাজানো ফুলগুলোর সুরভিতে মধ্যে একসময় হারিয়ে গেল আসগার আলি। মিনুর শরীরে এখন সুখের স্বর্গ।

কিন্তু বাতাস বারুদের গন্ধ কেন! সারাদেশে এ কোন আগুন জ্বালানোর প্রচেষ্টা! হাহাকারের পূর্বাভাস। আমরা তো মিলিত হলাম মিনু, কিন্তু আমাদের মধ্যে এত অমিল কেন?

— অমিল! মিনতি আসগারের চোখে চোখ রাখলো, কোথায়ঃ এই তো তোমার এত কাছে, মন, শরীর—।

— আহা সে কথা বলছি না। আমরা দু'জন দুজনকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। দু'জনের ধর্মের প্রতি দু'জনের কোন ঘৃণা নেই। বরং মনে পড়ে—

— কি?

— তুমি পূজার সময় আমাকে প্যান্ট-শার্ট করে দিয়েছ আর তখন তুমি শাড়ি না নিয়ে বলেছ, ঈদের সময় দিও।

— হ্যাঁ। আমি তোমার পুজোর উৎসবকে আমার করে নিয়েছি। তুমি ঈদের দিনে সেই শাড়ি পরে বিকেলে ঘুরেছ আমার সঙ্গে। বিরিয়ানি, ফিরনি খাইয়েছি।

— তা এখন এসব কথা কেন।

— কেন বুঝতে পারছ না। সারাদেশে তুষের আগুন।

— তোমার আমার মধ্যে তো প্রেম।

প্রেম কখন বিদ্বেষে পরিণত হয় কেউ বলতে পারে! রাজনীতিবিদরা তো এ ব্যাপারে ওস্তাদ। ওদের এই বিদ্বেষের রাজনীতি তো ক্রমশ সফল। তুমি কি অস্বীকার করতে পারো! আসগারের কণ্ঠে উত্তেজনা। আজ কয়েকদিন ধরে ও শুধু এসব নিয়েই কথা বলছে, বলতে পারো মিনু, তোমার আমার ভালোবাসায় চিড় ধরবে না কখনো। আর ইউ সিউর এ্যাবাউই ইট?

— ইয়েস, মিনতি হাসলো।

— সবাই বলতো ওদের ক্ষমতা। কজন ভোট দেয় ওদের। আজ সেই দলের সেকেণ্ড পজিশন। কাল ফাস্ট হবে না কে বলতে পারে! বিদ্বেষের রাজনীতি, মসজিদ ভাঙ্গার রাজনীতিও সফল হয়। দেখছ কেমন উত্তেজিত ওরা। কি যে হবে!

— থামো তো। অনেক হলো। ওরা মসজিদ মন্দির নিয়ে থাকুক আমরা ভালোবাসা নিয়ে থাকি। শুধু প্রেমে। মিনতি জড়িয়ে ধরলো আসগরকে, সবার উপর ভালোবাস সত্য। বুঝলে!

— বুঝলাম।

— যে আসছে তাকে তাই অন্যভাবে গড়ে তোলার কথা ভাবো।

— কে আসছে? কে আসছে? আসগার ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

— মানুষ। কথাটা বলে মিনু চলে গেল পাশের ঘরে আন্টি মিসেস ডি সিলভার কাছে। প্রতিবেশী প্রিয়জন।

।। চার ।।

মানুষেরা যখন অমানুষ হয় সম্ভবত হিংস্র পশুরাও হাসে এবং ভয় পায় অবশ্যই। আর এই বস্তির লোকদের চোখে মুখে বাঘ-দেখা আতঙ্ক। মিসেস ডি সিলভার ঘরে আসগার আলি, অসীম চক্রবর্তী দীপক দত্তের ঘরে আবদুল করিম, হরি সিং, অতুল পট্টনায়ক। আনিসুর রহমানের ঘরে ম্যাথু ব্রাউন, রামপ্রসাদ কৈরালা, সবিতা সাক্সেনা। সবার আলোচনা একটাই। এবার কি হবে! কি হতে পারে!

কাল রাত থেকে বেড়ে গেছে পুলিসের টহল। আজ বাংলাবন্ধ। কিন্তু আগামীকাল কি হবে? সোমবার সকালে চিন্তিত সবাই। আসগর ছটফট করছে। মিনুর মুখে কালো মেঘ। বাচ্চাটা বিছানায় ঘুমাচ্ছে। তার কোন ভাবনা নেই। পাশেই খবরের কাগজে ভাবনার বোঝা

নিয়ে কালো অক্ষরগুলো বিষাক্ত পোকার মতো কিলবিল করছে। কোলকাতা বাদ যায়নি অশান্তি থেকে। কিন্তু এই বস্তিতে এখনো সেই অশান্তির আঁচ লাগেনি। পাঁচমিশেলী মানুষের বসবাস। জাত, ধর্ম, ভাষা সব একাকার হয়ে এ এক ছোট্ট ভারতবর্ষ। ভাবনা না হলেও আতঙ্ক আছে। কেননা, বিবিধ মিলনের মহান ভারতবর্ষকে ওরা অন্যভাবে দেখতে চায়।

মঙ্গলবার। ৮ ডিসেম্বর ১৯৯২। ভারত বন্ধ। আজো অচল সবকিছু। মিনু বললো, খাবে কি!

— হাওয়া।

— দুদিন তো এটা ওটা দিয়ে চললো, এবার?

— অন্যের যদি চলে আমাদেরও চলবে। আসগর বললো, দেশ জাহান্নামে যেতে বসেছে এখন খাওয়ার ভাবনা।

খাওয়ার চেয়ে এখন বাঁচার ভাবনা বেশি। এক একটা রাত, এক একটা দিন যেন দুঃস্বপ্নের মতো। পুলিস টহল। কার্ফু তবুও। এদিক ওদিক দাঙ্গার খবর আসছে। কখনো গুজব। কখনো সত্য।

বুধবার। ৯ ডিসেম্বর। না, কাল রাতেও কিছু ঘটেনি এই বস্তিতে। নিঝুম, কিন্তু অশান্তি হয়নি। পুলিশ সুনাম করে গেছে। সবাই মিলেমিশে থাকলে দাঙ্গা কেন, কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর ছেলেকে আসগারের কোলে দিয়ে মিনু বলেছে, যেখানে মানুষ থাকে সেখানে কোন অশান্তি হয় না বুঝলে মশাই।

এখানে মানুষ। অন্য কোনখানে! কার্ফুর আঁধার। থমথম করছে শহর। শীতে নয়, ভয়ে থরথর কাঁপছে কলকাতা। অন্য মানুষের চোখে লোভ। মাটিব লোভ। আরো জায়গার লোভ। আরো বাসস্থান বানানোর লোভ। তাই সেই আঁধার রাতে আগুন জ্বলে উঠলো বস্তিতে। দাউ দাউ লেলিহান শিখা মুহূর্তে গ্রাস করলো মিসেস ডি সিলভার ঘর, অসীম, হরিসিং, আব্দুল করিমের আশ্রয়।

— মিনু। এই মিনু।

বাচ্চা বুকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিল মিনু। আসগারের আওয়াজে ধড়ফড় করে উঠলো, কি হ'লো?

— আগুন।

ততক্ষণে ঘরে আগুন এসে গেছে। বাইরে কিছু কান্নার শব্দ। পালানোর শব্দ। দিশেহারা হ'য়ে ছুটছে মানুষ। যে যেদিকে পারছে। আগুন পেরিয়ে আসগার ওদের নিয়ে এলো। এবার অন্য শব্দ। মার শালাদের—

কাদের! কাদের মারা হবে! কারা আক্রমণ করেছে! আসগার বললো, মিনু পালাও।

— কোথায়?

— সবাই যেদিকে যাচ্ছে।

— তুমি?

— ঘরে টাকার বাক্স তোমার গয়না। খোকার—

— থাক্, তুমি চলো।

— টাকা ছাড়া এক পাও চলা যায় না।

— জান বাঁচাও আগে। মিনু হাত ধরে টানলো আসগারের।

— জান বাঁচলে কাল খাবো কি! তুমি এগোও।

এই সময় কে যেন ডাকলো। সম্ভবত আব্দুল করিমের মেয়ে, ও মিনু আপা, জলদি আইয়ে—

— যাও। আসগার ভেতরে ঢুকলো।

ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা নেমে পড়েছে ময়দানে। মেয়েদের দিকে এগিয়ে আসছে। মিনু দৌড়ালো। প্রাণ ভয়ে ভীত হরিণীর মতো। একটা নয় একাধিক হিংস্র পশু পেছনে। অশ্লীল শব্দ ভেসে আসছে। আক্রমণের ভাষা। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়লো মিনতি। বাচ্চা ছিটকে গেল বুক থেকে। অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাত বাড়ালো মিনু। একটা শক্ত পুরুষের হাত। ভীষণ ভয় পেল। মাথার মধ্যে দ্বিতীয় ভাবনা এলো না। হাত ছিটকে দৌড়লো ও। ইজ্জত বাঁচাতে প্রাণ বাঁচাতে।

।। পাঁচ ।।

কার বাচ্চা! হিন্দু না মুসলমান! এ এক ঝামেলা রে বাবা। সম্পত্তি উদ্ধার হ'লে না হয় রাখা যেত। এ বাচ্চা কি হবে! সারারাত জ্বালিয়েছে। বস্তি তো পুড়ে ছাই। এখন কি হবে! অফিসার ইনচার্জ বললেন। সাব ইনস্পেক্টর জবাব দিলেন, একে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিন স্যার।

— না, না। কথায় কথায় অনাথ আশ্রম বোল না তো। যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানেই ওর বাপ-মা আছে। ভয়ে পালিয়ে গেছে হয় তো।

— হ্যাঁ, স্যার!

— সেখানেই চলো।

— ইয়েস স্যার!

— কাপড় এনেছ? এই। বড়বাবু একটা কনস্টেবলের দিকে চাইলেন, বললাম না (যালে টোয়ালে আনতে, ও তো হিসি করে সব ভিজিয়ে দিয়েছে।

— এনেছি স্যার।

তোয়ালে জড়ানো হ'লো। কনস্টেবলের দিকে চেয়ে বড়বাবু বললেন, তুমি তো এটাকে রেখে দিলে পারতে হে। তোমার ছেলেমেয়ে নেই।

— রাখতাম স্যার, কিন্তু কোন জাতের বাচ্চা!

— চোপ। ভীষণ জোরে হেঁকে উঠলেন ও.সি— এই তোমারই যতো অশান্তির মূল। বাচ্চার আবার জাতি ধর্ম, ভাষা কি। এ্যা?

গাড়ি বেরোল। ও.সি. ইনস্পেক্টর, কনস্টেবল। সেই কনস্টেবলও। ও.সি. বললেন, চলো বাপ-মা খুঁজে না পেলে তোমাকেই নিতে হবে। বুঝেছ।

— হ্যাঁ স্যার।

— থানা পুলিশের এসব ব্যাপারে খুব বদনাম। আমরা নাকি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের উপর গুলি ছুঁড়ি।

— না স্যার।

— তোমাকে দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে।

চলতে চলতে বড়বাবু ইনস্পেক্টরকে প্রশ্ন করলেন, চৌধুরী পাঁচমিশেলী বস্তি। আন্দাজ করতো বাচ্চাটা কোন ধর্মের।

— হিন্দু।

— মুসলমান।

— খৃষ্টান।

— শিখ

গাড়ির মধ্যে পাঁচজন এবং শিশুকোলে নিয়ে একটি মেয়ে। ও.সি-র আত্মীয়া। চারজন আন্দাজে মন্তব্য করলো। ও.সি হাসলেন। আচ্ছা দেখা যাক কে ঠিক। আবার হাসলেন উনি।

— হাসছেন কেন স্যার?

— তোমরা তো আন্দাজে বললেন, আমি কারেক্ট বলব!

— বলুন, বলুন।

— গম্ভীর হয়ে ও.সি বললে, মানুষ।

গাড়ি বস্তিতে পৌছলো। এখান থেকে স্কুল বাড়িতে। বস্তির আশ্রয়হীনরা এখন এখানে, আহতরা হাসপাতালে। ধ্বংসস্তূপে আপাতত ভয়ে কেউ যাচ্ছে না। বড়বাবু রিপোর্ট লেখাব আগে বললেন, আগে খোঁজ করো, বাচ্চাটি কার।

ততক্ষণে দৌড়ে এসেছে মিনতি। আমার আমার। বাচ্চাকে টেনে নিয়েছে বুকে। কান্নায় চুম্বনে সে প্রায় পাগলের মতো।

— নাম? ও.সি জিগ্যেস করলেন।

মিনতি। অন্য একজন বলে দিল। যে কনস্টেবল বাচ্চাটিকে হিন্দু বলেছিল তার দিকে চাইলেন। এমন সময় আসগার ছুটে এলো। বৌয়ের কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে চুমু খেতে লাগলো।

— নাম বলুন। ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করলেন। কলম বের করলেন।

— আসগার আলি।

ও.সি খানিক অবাক হ'য়ে যে কনস্টেবল বাচ্চাটিকে মুসলমান বলেছিল তার দিকে চাইলেন।

মিসেস ব্রাউন, মিসেস সিং অনেকেই এসে শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন। এই দুঃখ-কষ্ট, শোক, যন্ত্রণার মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। ও.সি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধবালেন, টানলেন, ধোঁয়া ছাড়লেন এবং বললেন, শালাবা কেন যে দাঙ্গা লাগায়!

বাবা হারিয়ে গেছেন

এ. মান্নাফ

বাবা নিখোঁজ।

তত্ত্বতল্লাসি চালিয়ে কয়েক মাস হল বাবার সন্ধান মেলেনি। নিরুদ্দেশের পাতায় বাবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিল, অনেকেই, আমি তা করি নি।

বিজ্ঞাপন দেওয়াটা সহজ সরল ব্যাপার, এমন কিছু নয়। কিন্তু এই অস্ত্র প্রয়োগ মোটেই সহজ ছিল না। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যেসব শব্দ ব্যবহার হয়, যেমন— সত্বর ফিরে এস, আমরা আর তোমার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হব না...... ইত্যাদি গোছের শব্দগুলো বাবার ক্ষেত্রে শুধু হাস্যকরই হবে না, রীতিমতন বেমানান, লজ্জার। দৈনিক কাগজে এমন বিজ্ঞাপনে হেঁট হয়ে যাবে বাবার মাথা। বাবাকে ছোট করার মত কোন কাজই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবা তো হেজিপেজি মানুষ নন, নামী মানুষ। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পথ ভুল করে বাবা অন্য জায়গায় আটকে পড়েছেন, বা বাবাকে কোন দুষ্টচক্র জোর করে আটকে রেখেছে তা তো নয়ই। কানা খোঁড়া হলে অন্য ভাবনা ভাবতাম। বাবা পাচার হয়ে গেছেন আরবে, এমন ভাবনাও অমূলক।

বাবা প্রশাসনিক বিভাগের মস্ত চাকুরে ছিলেন। মাত্র দুই বছর হল রিটায়ার করেছেন। অধিকাংশ স্টাফ এখনও তাঁর ছেড়ে আসা চেয়ারের আশেপাশে বিদ্যমান।

বাবা স্ব-ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছেন। গৃহত্যাগের চিল্লাচিল্লি, চেঁচামেচি ঝগড়া বিবাদ হয়নি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ, অভ্যাসবশত বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে আর ঘরে ফেরেন নি। উনি যে আর ঘরে ফিরবেন না, তাতো কারুর জানার কথা নয়। বাবার ঘরে ফেরার, সম্ভাব্য সময় পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ বাড়ির কারুও হুঁস হয়নি। কেউ জানতেও চায়নি, বেড়াতে বেরোনো মানুষটা— এখনও ঘরে ফিরল না কেন? লক্ষ্মীমাসীর নজর ছিল। সকলের খাওয়া সমাপ্তে আমাকে ভাত খেতে ডাকতে এল যখন, ধপ্ করে আমায় বিছানায় বসে মাসি বলল— বিশু, তোমার বাবা যে এখনও ঘরে ফেরেন নি? ওনার ফিরতে আজ এত দেরি হচ্ছে কেন? উনি তো এত দেরি করেন না।

তখনও আমি গুরুত্ব ফেলিনি কথাটাতে। ভেবেছিলাম পরিচিত মানুষের পাল্লায় পড়ে হয়তো একটু দেরি হচ্ছে। আশা ছিল বাবা এসে পড়বেন, আর একটু পরেই। তাই বললাম— মাসি বাবার ভাতটা ঢেকে রাখো বাবার ঘরে।

মাসি জানালো— অনেকক্ষণ হল সে ভাত ঢাকা দিয়ে রেখেছে। তবু কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা ছড়ালো— বিশু বেরিয়ে একটু দেখ না বাবা।

লক্ষ্মী মাসি আমাদের বাড়ির পুরানো ঝি, মা আমাকে প্রসব করেই খালাস। আমার মায়ের শরীর বরাবর খারাপ, আমি লক্ষ্মীমাসির কাছেই মানুষ। লক্ষ্মীমাসি এখন এ বাড়ির একজন। লক্ষ্মীমাসি তার মনের উদ্বেগের কথা যত সহজে আমার কাছে প্রকাশ করতে পারে, মা, দাদা-বৌদির কাছে তা পারে না। তারা তো সকালের আগে বুঝতেই পারলো না, বাবা ঘরে ফেরেন নি রাতে।

সকালে চায়ের টেবিলে, শুনলো তারা সংবাদটাতে তেমন চমক ছিল না।

বড়দা চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললেন— তাই নাকি, বাবাটা না দিন দিন যাচ্ছেতাই হয়ে যাচ্ছেন, কোথায় রাত্রি কাটালেন?

বৌদি বললেন— কোলকাতায় তাঁর কি এখন রাত্রি কাটানোর জায়গার অভাব।

মা কণ্ঠে একরাশ ঘৃণা ছুটিয়ে বললেন— বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।

প্রাতঃরাশ শেষে ডাইনিং হল ছেড়ে একে একে ফিরে গেলেন নিজের নিজের ঘরে।

আমি বসেই আছি ডাইনিং টেবিলে। নীরব শ্রোতা। আমি যেন একটা ভগ্নস্তূপ। বেশ বুঝতে পারছি, বাবাকে নিয়ে ভাববার মত এখন আর এ ঘরে কেউ নেই। ভালোবাসাব সোপানগুলো ভেঙে পড়েছে। জামাইদার বিশাল কারবার। দিদির দুই ছেলেমেয়ে। দিদি বছরে একবার আসেন নিজেদের গাড়ি করে।

বড়দাও একটা বড় কারখানায় উঁচু চেয়ারে আসীন। সকালে নিজের গাড়িতে বেরিয়ে, মধ্যাহ্ন আহার অফিসেই করেন। ঘরে ফেরেন রাতে। সংসারের প্রতি চোখ তুলে দেখার তাঁর ফুরসৎ কোথায়। এ বাড়ির সবকিছু আকাশ ছোঁয়া; কেবল আমারই কিছু হল না। পড়াশুনাতে আমি বরাবর বিবাগী, কেবল বাবার কঠোর তত্ত্বাবধানে, এল. সি.-টা পাশ করে ওভারশিয়ার। এমন চাকরি, এ বাড়ির পক্ষে রীতিমতন লজ্জার। কয় টাকাই বা মাইনে পাই, তাই ভয়ে বিয়েতে তীব্র অনীহা।

মা আমাকে নিয়ে বীতশ্রদ্ধ। বাবা কয়েকবার প্রস্তাব রেখে ব্যর্থ। ধীরে ধীরে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছি। যা একটু যোগসূত্র তা বাবার সঙ্গে। বাবার ন্যায়পরায়ণতা, নীতিবোধ, বাবার আদর্শে আমি আকৃষ্ট। নীতিবাদী, ন্যায়পরায়ণ মানুষরা এমন এক শ্রেণীর জীব। আদিকাল থেকেই এরা গবেষণার সম্পদ। এদের সংখ্যা আগের মতই আঙুল গোনা। বাবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা আসুক, তা তো আমার কাম্য নয় কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ ঠেকাবে কে?

আমার ছোট বনে সতী। মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে, পরীক্ষাকেন্দ্রেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, পেটে যন্ত্রণা, হাসপাতালে পাঠানো হল। চব্বিশ ঘন্টা কাটে নি। এ বাড়ির শান্তির প্রদীপ নিভে গেল। সতী বিদায় নিল। সতীর মৃত্যুতে কে কতখানি কাতর তা জানা নেই। মা তো কেঁদে কেটে সারা। বাবা যেন পাথর। সতী আমার বৈরাগ্যের চেতনা উস্কে দিল দাউদাউ করে।

আমাকে খাবার খেতে ডাকতে এসে ঝরঝর করে কেঁদে বলল লক্ষ্মীমাসি— বিশু,

তুই কি সত্যিই বিবাগী হয়ে যাবি। জবাবে বলেছি— কেন বিবাগী হব। আমি তো তোমাদের মাঝেই আছি।

লক্ষ্মীমাসি, আমার মায়ের মত, তার দৃষ্টি আমার উপর। লক্ষ্মীমাসি, বাবাকে দেখে না। শুধু লক্ষ্মীমাসি কেন, ঘরের অন্যান্যরা দাদা বৌদির কথা ছেড়েই দিলাম; মা, তিনিও তো তাই বাবা তো আজ হারিয়ে যাননি। বাবার দেহটা ঘরে থাকলেও, তাঁর মন কিন্তু হারিয়ে গেছে অনেকদিন আগেই।

বাবা এ সংসারে এক নির্জন ঘরে পড়েছিলেন বটে, বাঁচার চেষ্টা তো চালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। চরম আঘাত এল মায়ের কাছ থেকেই, সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর অপবাদের আঘাত। এই বয়সে এত বড় আঘাত খেয়েও কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে?

বাবা তো দৃঢ়চেতা মানুষ। তাঁর পক্ষে এই অবহেলার সংসারে আর পড়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না।

আমি মনে মনে বলি— বাবা, তুমি গৃহত্যাগ করে ঠিকই করেছ। শুধু আমাকে যদি ইঙ্গিতে তোমার গন্তব্যস্থলটা জানিয়ে দিতে।

বাবা কি অঙ্ক কষে ঘর থেকে বের হয়েছেন? যাঁরা রাগের বশে গৃহত্যাগ করেন, তাঁরা সাধারণত ঘরে ফেরেন না। আমার বন্ধু নিশীথ, আমার বাবার গৃহত্যাগের খবর শুনে করুণ স্বরে বলল— তার দাদুও নাকি এ সংসারে মানিয়ে চলতে না পারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু আর ফেরেন নি, শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল মর্গে।

উঃ মাগো! এমন ঘটনা যেন আমার বাবার জীবনে না ঘটে। আমার বাবা তো, এই ধর্মান্ধ সমাজব্যবস্থায় অচল, বাবা যা চান অন্যরা কি তা চান। দাদার বিয়েতে পণ নেবার ইচ্ছা বাবার ছিল না। বাবা ছিলেন পণ প্রথার তীব্র বিরোধী। তিনি কথায় কথায় বলতেন— পণপ্রথা একটা জঘন্য প্রথা। সমাজের দুষ্টক্ষত।

মা ছিলেন পণের পক্ষে। তিনি বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যুক্তি খাড়া করলেন, তুমি তো পণ নিতে অনিচ্ছুক। ওরা যদি ওদের মেয়েকে খুশি করে কিছু দেন, তাতে তোমার আপত্তি কেন? বাবার আপত্তি টেকেনি। বাবার আদর্শ এ সমাজে অচল। কথায় আছে— টাকায়, টাকা আনে। বৌদির বাবা তো মস্ত ধনী। ওদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের আলাদা আলাদা গাড়ি, বড় বৌদি একটা নিয়ে এহেন বড় বৌ-এর প্রতি মায়ের ভালোবাসার আধিক্য থাকা তো স্বাভাবিক। তাছাড়া বাবা, বরাবর একটু নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ভিতরে, নিরালা ঘরে থাকতে ভালোবাসেন। তবু সেখানে মায়ের আদর অ্যাপায়নের স্থান ছিল। মাকে তো মাঝে মাঝে অধিকার আদায়ে, বিশেষ করে সতীর মৃত্যুর আগে, একটু তৎপর হতে দেখা গেছে। কিন্তু সতীর মৃত্যুর পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, সম্পূর্ণভাবে। বড়বৌদির কন্যা এখন মায়ের সঙ্গী-সাথী।

বাবা থাকতেন একা। সীমা এ ঘরে আসার আগে পর্যন্ত লক্ষ্মীমাসিই বাবার দেখভাল করেছে। ঠিক সময়ে বাবার প্রয়োজনীয় জিনিস সাপ্লাই দিয়েছে, সীমা এ বাড়ির নতুন ঝি। সীমার আসার পরই লক্ষ্মীমাসির ছুটি। ছুটি মানে একেবারে মুক্তি নয়।

বৌদি আর মায়ের ফাইফরমাস খাটতেই লক্ষ্মীমাসির দিন কাবার। তাছাড়া দুবেলা রান্না ও পরিবেশন তো আছেই। লক্ষ্মীমাসির হিমসিম অবস্থা। এরপরেও বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আমার অবস্থান। আমার জন্মাবধি মায়ের কর্তব্য লক্ষ্মীমাসিই করে আসছে।

বাবার দেখাশোনার ভার, সীমার হাতে তুলে লক্ষ্মীমাসি বাবার প্রতি একবারে চোখ বন্ধ রেখেছে তা তো নয়। দিনে অন্তত একবার বাবার খোঁজ খবর নেয়। বাবার দেখাশোনার জন্য সীমাকে উপদেশ দেয়। এ বাড়ির ভিতরের খবর আলোতে এনে অতলান্ত জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দেয়। পড়ার মত অবসর সময়ে লক্ষ্মীমাসি সীমাকে বুঝায়,— শোন তোর বয়সী ওনার এক মেয়ে ছিল, নাম সতী। মেয়েটা হঠাৎ মারা গেছে। মানুষটার বুক ভর্তি দুঃখ রে। ভালো করে সেবাযত্ন করবি, গায়ে একটু তেল লাগিয়ে দিবি।

লক্ষ্মীমাসির উপদেশের জন্যই কিনা জানিনা, বাবার প্রতি সীমার সেবাযত্ন ছিল ত্রুটিহীন। তাছাড়া সীমাও বাবার প্রতি ছিল কৃতজ্ঞ। সীমা তো প্রথমে বাবার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল।

ভিখারি সীমাকে দেখে বাবার চক্ষু চড়ক গাছ। রীতিমতন ধমকে উঠেছিলেন—লজ্জা করে না ভিক্ষা করতে।

— পেটের জন্যে লজ্জা বিসর্জন দিতে হয়েছে বাবা।

সীমার মুখে শুদ্ধ বাংলা শুনে, বললেন— কি নাম তোমার? থাকা হয় কোথায়?

প্রতি উত্তরে, সীমা উজাড় করে দিল তার হৃদয় বেদনা। নাম সীমা, তার আপনজন বলতে কেউ নেই। বিধবা মা, বিয়ে দিয়েছিল, সেও মারা গেছে। কাজ তো করতে চায়, কিন্তু সুস্থভাবে কাজ করার জায়গা কোথায়।

সীমা কিছুক্ষণ ঝিমধরে বসেই রইল। তারপর— এ বাড়িতে সীমার কাজে যোগদান।

এই সীমাকে নিয়েই বাবার সঙ্গে মায়ের বিরোধ।

বাবার তত্ত্বতল্লাসির দায়িত্ব সীমার হাতে চলে যাওয়ায় মা ক্ষুব্ধ। সীমাকে বেশিক্ষণ বাবার কাছে দেখলে, মা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। হাঁকডাক চেঁচামেচি শুরু করতেন,— এতক্ষণ ধরে কি করছিস ঐ ঘরে, সরাসরি সীমার কাছে প্রথম প্রথম কৈফিয়ৎ চাইতেন। ধমক মেরে বলতেন, অন্য কাজ কর্ম তোর নেই! বিশুর ঘরে এককাপ চা দিয়ে আসতে পারিস নে?

সীমা আমার কাছে চা নিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ল বিছানার উপর। বড় বিষণ্ণ ওর মুখ। এই বিষণ্ণতার কারণ তো, আমার জানা, মায়ের তিক্ত কণ্ঠস্বর রীতিমতন কানে এসে পৌঁছেছে।

শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা দেবার ছলে বললাম— মা তোমাকে অকারণে বকাবকি করছে, তাই না সীমা?

প্রতি উত্তর না দিয়ে সীমা বই-এর পাতা উল্টাতে শুরু করল।

জিজ্ঞাসা করলাম— কতদূর লেখাপড়া করেছে!

— দশম শ্রেণী পর্যন্ত।

— পরীক্ষা দাও নি?

— কি করে দেবো। গরিব মানুষ। মা পাত্র পেয়েই বিয়ে দিয়েছিল। পোড়া কপালী মেয়ে আমি, পরের গালমন্দ যে আমার ভাগ্যলিখন।

— বর কেমন মানুষ ছিল?

— খুব ভাল। ছুতোর দোকানে কাজ করতো।

— তোমার স্বামীর মৃত্যুর পর দোকানদার তোমাকে কিছু সাহায্য করেন নি?

— আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন।

— সে কাজটা ছাড়লে কেন!

— দোকানদার— শুধু আমার কাজেই সন্তুষ্ট ছিলেন না.... থাক এসব কথা। আমার মত মেয়েদের এসব লাঞ্ছনা, অপমান তো পাওনা ..... কথা না বাড়িয়ে বলল—উঠি, আপনার বাবার স্নানের সময় হল।

স্নানের আগে সীমা, বাবার গায়ে, হাতে পায়ে একটু তেল মালিশ করে দিত। সীমার গলা ছিল খুব মিষ্টি। বাবাকে সে কখনও কখনও গান গেয়ে শোনাতো, কোন কোন দিন বাবার নির্দেশ মত বইয়ের নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করেও শোনাতো।

সীমা একদিন বাবাকে ভজন গেয়ে শোনাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অফিস থেকে ঘরে ফিরলাম। প্রবেশ পথেই বৌদির সঙ্গে দেখা। বৌদি চোখের ইশারায় ব্যঙ্গ ঝরানো কণ্ঠে— ঠাকুরপো, শুনছ ভজন! এ ঘরে শীঘ্র আর একটা বিয়ে মজলিশ বসবে গো।

চমকে ওঠার মত কথা। আমি বললাম—আমি তো বিয়ে করবো না বলেছি।

খিল খিল করে হেসে উঠল বৌদি। হাসতে হাসতে বলল—

— তুমি বিয়ে করতে না চাইলে কি হবে। এ ঘরে কি আর কেউ নেই বিয়ে করার?

বৌদির অশ্লীল কথার মধ্যে প্রবেশ না করেই নিজের ঘরে প্রবেশ করলাম।

সীমার কণ্ঠে মিষ্টি ভজন কানে ভাসছে। ভারি মিষ্টি সীমার গলা। সীমা রীতিমতন গুণী। ঠিকভাবে গাইড পেলে ভাল গায়িকা হতে পারতো।

সীমার সাহচর্যে বাবা সতীর দুঃখ ভুলতে পেরেছেন। বাবাকে এখন বেশ সতেজ দেখায়।

কাপড় ছাড়তেই সীমা এসে বলল— বাবা ডাকছেন।

আমি বললাম— সীমা তোমার গলাতো ভার মিষ্টি।

— ধ্যাৎ—বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবার সামনে এসে দাঁড়াতেই বাবা বললেন— বিশু, তুই আমায় একটা কথা দিবি!

— কি কথা বাবা!

— আগে কথা দে, যা বলবো শুনবি। আমার কথাটা শুনলে, আমি ভীষণ ভীষণ ভাবে খুশি হবো রে .... আমি বড় বেশি দুঃখ পেয়েছি। আমাকে খুশি করার জন্যে, তুই কি আমার একটা কথা রাখতে পারিস নে?

— কথাটা না শুনে কথা দেবো কি করে!

— আগে তোকে যে কথা বারবার বলেছি, আমি সেই কথাটাই বলছি— আর একবার ভেবে দেখ।

— বিয়ের প্রস্তাব হলে, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল বাবা, তোমার কথা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবার দীর্ঘশ্বাস বড়ই দীর্ঘ এবং বেদনার্ত ছিল, ধীর কণ্ঠে বললেন— তুমি আসতে পারো।

এখন ভাবি— বাবার সেই প্রস্তাবটা মেনে নিলে কি এমন ক্ষতি হতো? বিয়ে তো মানুষের জীবনে প্রয়োজনও বটে। না-করাটা নিছক জেদ ছাড়া তো আর কিছু নয়।

বাবার হারিয়ে যাবার পর এসব কথা আমার মনে জাগছে। রীতিমতন পীড়া দিচ্ছে এখন। কখন কখন মা-বাবার সুখ শান্তির জন্য ছেলেমেয়েদের স্বার্থত্যাগ করা উচিত, প্রাচীন শাস্ত্রে যখন স্বার্থ ত্যাগের বহু ঘটনা আছে। রামচন্দ্র তাঁর পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছ্ব বনবাসে গিয়েছিলেন।

বাবার নিখোঁজ হবার আগেই আর এক দুর্ঘটনা ঘটল। অফিস থেকে ঘরে পা রাখতেই লক্ষ্মীমাসি এসে বলল— সর্বনাশ হয়ে গেছে বিশু।

— কি হয়েছে মাসি।

— তোমার মা সীমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

— তার মানে!

— এ ঘরে সীমাকে রাখা হবে না।

— কেন?

— সীমা যে তোমার বাবার সঙ্গে খুব মাখামাখি করছে। পায়ে তেল মালিশ করছে, তোমার বাবাকে গান শুনাচ্ছে.....

— তাতে কি হয়েছে?

— তোমার মায়ের গায়ে জ্বালা ধরছে।

— তার মানে সন্দেহ, আর অবিশ্বাস!

— ঐসব আমি বুঝি না বিশু, সীমা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। ওকে দূর দূর করে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিল গো। বড় দুঃখী মেয়ে। কোথাও একটু জায়গা হল না গো?

— সেই সময় বাবা ঘরে ছিলেন?

— না; উনি ফিরে আসতেই, আমি ওনাকে সব বলেছি।

— বাবা কি বললেন।

— কিছুই বলেন নি, চুপ করে আছেন।

আমার ভীষণ ভয় হচ্ছিল, বাবা কিছু অঘটন ঘটিয়ে না ফেলেন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যদি বাবা গৃহত্যাগ করতেন, তাহলে আমার এত দুঃখের কিছু ছিল না।

আশ্চর্য, পর পর সাতদিন কেটে গেল, বাবা টু-শব্দ করলেন না। সীমাকে নিয়ে কোন কথা কাউকে বললেন না।

লক্ষ্মীমাসি পূর্বের মতই, বাবার দেখভালের দায়িত্ব তুলে নিল। মা কিন্তু ভুলেও বাবার ঘরে আসতেন না। মায়ের এইরূপ বিসদৃশ আচরণে আমি স্তম্ভিত যে, মা তাঁর নিজের কর্তব্য পালন না করে, সীমার অপবাধ অনুসন্ধানে তাঁর কি কোন অধিকার আছে? বাবাকে সাহচর্য দেবার অধিকার কার? মা কি এমন ভাবনা কোনদিন ভেবেছেন?

এই ঘটনার দশদিন পর হঠাৎ বাবা নিখোঁজ। বৈকালে বেড়াতে গিয়ে উনি আর ঘরে ফেরেন নি। কয়েকমাস গত, আজও বাবার সংবাদ নেই। দাদা-বৌদি, মায়ের ভিতর এ নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

অফিস থেকে ঘরে ফিরতেই লক্ষ্মীমাসি চায়ের কাপ হাতে আমার সামনে এসে করুণ কণ্ঠে বলল— তোমার বাবার কোন সংবাদ পেলে?

— না-মাসি। চায়ের কাপটা নিজের হাতে নিতে নিতে বলে।

— তোমার অফিসের লোকজনদের তো এ নিয়ে বলতে পারো।

মাসিকে কি করে বুঝাই, আমি দাদার মত নিশ্চেষ্ট বসে নেই। অফিসের পিওনকে, বাবার তত্ত্বতল্লাসি করার জন্যে লাগিয়ে দিয়েছি। খরচ খরচা বাবদ টাকাও দিয়েছি, মোটা টাকার প্রলোভন তার সামনে— ঝুলিয়ে রেখেছি।

দাদা-বৌদি আর মায়ের ধারণা, আমার বাবা নিশ্চয় গোপনে কোথাও লুকিয়ে বসবাস করছেন।

আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। বাবা, অত্যন্ত নীতিবান, স্পষ্টভাষী, তাঁর মধ্যে কোন লুকোছাপার ব্যাপার নেই।

দীর্ঘদিন বাবার খবর না পেয়ে আমি তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত। —বাবা বেঁচে আছেন তো?

অফিসের অনিলবাবু বয়স্ক মানুষ। পিতৃতুল্য। ভীষণ স্নেহ করেন। জানতে চাইলেন— বিশু তোমার বাবার সংবাদ পেলে?

কান্না ঝরালাম কণ্ঠে— না দাদা।

— একটা মানুষ, এমনভাবে হারিয়ে যাবেন।

— আমার ভয় হচ্ছে।

ভরসা দিলেন অনিলবাবু—ভয়ের কিছু নেই, সেরকম কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে আসতো ঘরে। উনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন মনে হচ্ছে।

— অনিলদা, এমনও তো হতে পারে বাবা এ শহরে নেই।

— হতে পারে, টাকাকড়ি, সব কি তোমার বাবার কাছেই আছে?

— আছে।

— কোন্ ব্যাঙ্কের সঙ্গে তোমার বাবার কারবার চলতো?

— এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ....

এরপর অনিলবাবু ফিসফিস করে বললেন— তুমি এক কাজ করো।

— কি করবো দাদা?

— এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বা ক্যাশিয়ারের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নাওতো। ইদানিং তোমার বাবা টাকা তুলেছেন কিনা। কত টাকা তুলেছেন।

চমৎকার পরামর্শ। কথাটা মনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারকে ফোন করলাম। আমার বাবার নাম শুনেই ম্যানেজার জানতে চাইলেন—আপনি কে বলছেন?

— ওনার ছেলে।

— ছেলে হয়ে বাবার খবর রাখেন না?

— স্যার, বাবা কয়েকমাস নিখোঁজ।

— একটা মানুষ যখন তাঁর নিজের হাতের তৈরি সংসার পরিত্যাগ করে বেরিয়ে যান, তাঁর ব্যথাটা কোথায়, তা ফিল করবেন তো।

— ব্যথাটা ফিল করছি বলেই জানতে চাইছি— বাবা, টাকা তুলেছেন কিনা।

— আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আপনার বাবাকে না তাঁর টাকাকে বেশি ভালোবাসেন?

তিক্ত হয়ে উঠল আমার কণ্ঠস্বর— আমি বুঝতে চাই, তিনি বেঁচে আছেন কিনা?

গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—হ্যাঁ, উনি এলাইভ। ফোন নামিয়ে দিলেন।

ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে পরিচয়ের সূত্র ধরে জানতে পারলাম বাবা মোটা টাকা তুলেছেন। এরপর আর কোন কথা জানার দরকার ছিল না। তাঁর টাকা, তিনি যত খুশি তুলুন, খরচ করুন, তাতে আমাদের কি? আসলে উনি বেঁচে আছেন এই সংবাদটুকুই আমাদের কাছে আনন্দের।

ঘরে ফিরে বৈকালিক চায়ের টেবিলে, সাধারণত আমি ডাইনিং টেবিলে চা খাই না। ঘরে বসেই চা-নাস্তা সারি। দাদা-বৌদির মুখোমুখি হতে আমি নারাজ। আজ ইচ্ছাকৃতভাবেই চায়ের মজলিশে যোগ দিলাম। চা খেতে খেতে বললাম— সুখবর, বাবার খোঁজ মিলেছে।

বৌদি জানতে চাইল— কিভাবে সংবাদ সংগ্রহ করলে গো ঠাকুরপো?

— ব্যাঙ্ক থেকে।

বৌদি কোমর বেঁকিয়ে ছিল। সোজা হয়ে বসল। সরল কণ্ঠে বলল— তোমার দাদা তো ব্যাঙ্কে খোঁজ করেছিলেন, ওঁবা কিছু বলেন নি।

মা বললেন— রবি ব্যাঙ্কে খোঁজ করেছিল, কই আমাকে তো কিছু বলেনি?

— এটা আবার বলার মত খবর না..? অবজ্ঞার কণ্ঠস্বর।

— রবি কি জানতে চেয়েছিল?

— ওনার নামে তো অনেক টাকা, সেগুলো নয় ছয় করছে কিনা।

— তার নিজের টাকা, সে টাকায় সে যা খুশি তাই করতে পারে, তার জন্যে খোঁজ খবরের দরকার কি? মায়ের তিক্ত কণ্ঠস্বর.....

মায়ের কি বোধোদয় হচ্ছে? মায়ের গলা থেকে এই প্রথম বাবাকে নিয়ে একটা যন্ত্রণার জ্বালা প্রকাশ হতে দেখলাম।

— আশ্চর্য— মানুষটা বেঁচে আছে কিনা, তার খোঁজখবর না করে, তার টাকার খোঁজ করা হচ্ছে, খেদোক্তির মত শোনালো মায়ের গলা।

দাদা বললেন— বাবার সম্পত্তিতে ছেলেদের অধিকার, সে সম্পত্তি উনি দুহাতে ওড়াবেন, তা তো কেউ সইবে না?

বৌদির প্রশ্ন— ঠাকুরপো, তোমার বাবা আজ পর্যন্ত কত টাকা তুলেছেন?

— ব্যাঙ্ক অঙ্কটা বলে নি, তবে মোটা টাকা.....

এটা যে বৌদির কাছে একটা বজ্রঘাতী সংবাদ তা তো জানতাম না। সংবাদটা ক্ষিপ্ত করে তুলল বৌদিকে। বৌদি চিৎকার করে উঠল— আমি একদিন গোপনে বললাম, বাবা আমাদের পাঁচ লাখ টাকা দিন, বাঙ্গালোরে একটা ফ্ল্যাট কিনবো।

মায়ের কণ্ঠে বিস্ময়— বৌমা, তোমরা বাঙ্গালোরে ফ্ল্যাট কিনতে চেয়েছিলে? কেন?

— মা, আপনি দেখছি বাবার মত প্রশ্ন করছেন। মানুষ পছন্দমত জায়গাতে বাড়ি ক্রয় করে। কাশ্মীরে আমার বাবার একটা ফ্ল্যাট আছে। দশ লাখ টাকায় ক্রয় করেছেন। মানুষ তো আর খাঁচার পাখি নয়, যে এক জায়গায় বন্দি হয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেদিন আমাকে টাকা দিলেন না, আজ টাকা তুলে নষ্ট করে বেড়াচ্ছেন।

ফট করে বলে উঠলেন মা—নষ্ট করছেন কি করে বুঝলে বৌমা। মানুষটা আজ পাঁচ মাস ঘর ছাড়া, তাঁরও তো একটা খরচ আছে। টাকা তো তুলতেই হবে। আমি জানি উনি বাজে খরচ করার মত মানুষ নন।

বৌদি সমর্থন না পেয়ে উঠে যায়।

মা নীরব।

আর আমি নীরব শ্রোতা।

লক্ষ্মীমাসিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল— সে বলল, তাহলে উনি এই শহরেই আছেন, একটু খোঁজ খবর কর বাবা.........

পরের দিন অফিসে কাজ করছিলাম আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম বাবাকে নিয়ে। ছুটির আগে পিওনটা প্রায় দৌড়ে এসে বাবার সংবাদ দিল। উনি নাকি সমন্বয় পল্লীতে আছেন। একতলা বাড়ি। সপ্তাহখানেক হল উনি বাড়িটা ক্রয় করেছেন।

পরক্ষণে জানতে চাইল পিওনটা— স্যার আপনার কি কোন বোন আছে?

— বোন ছিল, সে তো মারা গেছে।

— এ বাড়িতে উনি ওনার এক কন্যার সঙ্গে এক ওভারশিয়ার ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন, বিয়ে আজই রাতে।

কথাটা মাকে বলতেই, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মা, বললেন— আমাকে এখুনি নিয়ে চল। উনি কোথায়, কি করছেন, আমি এ চোখে দেখতে চাই। মানুষ প্রতিশোধস্পৃহায় অনেক কিছুই করতে পারে।

এমন কথা, আমারও মনে জাগছে।

মাকে সঙ্গে করে খোঁজ করতে করতে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হলাম। ছিমছাম বিয়ে বাড়ি। সানাই বাজছে। লোকজনের ছুটাছুটি। ভাবলাম ভুল ঠিকানায় এসে পড়িনি তো?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— এটা কি সুরজিৎবাবুব বাড়ি?

— হ্যাঁ, ওনার ঘরে আজ বিয়ে। আপনারা?

আর কোন কথা না বলে মা দ্রুত ভিতরে এলেন। পিছনে আমি।

আলোকিত ছাদনাতলায় বাবা বসে, সামনে বর কনে কন্যা সম্প্রদান করছেন। কন্যা সীমা, ভীষণ সুন্দর লাগছে তাকে। সীমাকে বৌ করার ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল। সে ইচ্ছা আমি নির্মম হাতে ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। ভীষণ অনুতাপ জাগছে।

মহত্ত্ব প্রদর্শনের এমন সুযোগ কি জীবনে আসবে?

ইতিমধ্যে মা বাবার পাশে বসে বাবাকে কন্যা সম্প্রদানে সাহায্য করতে শুরু করেছেন।

সীমা

জিয়াদ আলী

এখন একটু একলা হলেই সীমার মধ্যে হুট করে ঢুকে পড়ে সজল। সজল যে কীভাবে কোন্ ফাঁকে এসে বসত বা নিয়ে বসে তা সীমা নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। অথচ এই যে সজলের চলে আসা, একেবারে সারা মন-প্রাণ-দেহের কোটর দখল করে নেওয়া তা নিয়ে সীমা নিজের সঙ্গে বিরুদ্ধতাও তৈরি করতে চায় না। বরং পাহাড়ি নির্জনতার মধ্যে অন্ধকারে একা একা থাকতে সজলের উপস্থিতি যেন সত্যিই তার কাম্য হয়ে ওঠে।

সীমা জানলাটা খুলে দেয়। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার শরীর ছুঁয়ে যায়। বাইরের নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইউক্যালিপটাসগুলো এই কয়েক মাসে কি খুব বড়ো হয়ে গ্যাছে! গাছের আবছা শরীরের মতো সজলের একহারা লম্বা গড়নটার কথা তার মনে পড়ে যায়। মেদহীন ছিপছিপে শরীরই এক সময় সীমার খুব পছন্দ ছিল। পুরুষেরা স্থূল হলে কেমন ভ্যাদভেদে চিত্রকল্প এসে পড়তো সীমার মধ্যে। সীমার তখন গা ঘিন ঘিন করতো।

কলেজ ছুটির পর ভিকটোরিয়ার জলের মধ্যে মাছেদের ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ দেখতে দেখতে সীমা এসব কথা শোনাতো সজলের প্রতিক্রিয়াটুকু জেনে নেবার জন্য। সজলের তাতে উল্লসিত হওয়ারই কথা। কিন্তু সজল ঠিক উলটো কথা বলে সীমাকে ক্ষেপিয়ে দিত। সজল বলতো রামায়ণের পুরুষেরা কিন্তু লিকলিকে নয়। আসলে তখন দুধ-ঘিতে এতো ভেজাল ছিল না। এখনকার মতো ভেজাল তেল খেলে ভীম কি আর গদা নিয়ে অতো লম্ফ-ঝম্ফ করতে পারতো? ভাগ্যিস তখনকার নারীরা তোমার মতো ছিল না। তাহলে তিনটে তো দূরের কথা, দশরথের এক রানী পাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠতো।

সীমা প্রশ্ন করতো— কেন, দশরথ কি খুব মোটা ছিলেন? সজল ঠাট্টা করে বলতো— না, দশরথের সঙ্গে তার কোনদিন দেখা হয়নি। তবে তাঁর খাওয়ার বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় তিনি যথেষ্ট মেদবহুল ছিলেন। আসলে ত্রেতা যুগে মানুষের পছন্দ ছিল মোষের ফ্যাট। তখন মুরগি খাওয়ার ঝোঁক ছিল না। তখন তো নিউট্রেলা তৈরি হয়নি। তাহলে বিধবারা বেঁচে যেত। সজল বলতো বাঙালীর দুর্ভাগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মেদহীন নির্ভর শরীর দেখেও তারা কিছু শিখলো না। বাট্রান্ড 'রাসেল এ দেশে জন্মালে নির্ঘাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন।

বেদ-পুরাণ আর ঠাকুর-দেবতা নিয়ে সজল বন্ধুদের সঙ্গে সব সময়েই ওরকম মস্করা করতো। আর খুব ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্যেও সজল এক অটল গাম্ভীর্যে স্থির থাকতো। সকলেই

যখন তার কথা নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়তো, সজল তখন দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একেবারে অন্য সুরে গলাটা খাদে নামিয়ে বলে উঠতো, না একালে জন্ম নেওয়াটা ভুল হয়ে গ্যাছে রে। আরও অন্তত শ' দুয়েক বছর পরে জন্মালে এই ক্লেদাক্ত পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহে বা উপগ্রহে ঘর বাঁধা যেত।

ওর বন্ধুরা বলতো, তার মানে?

সজল খুব থেমে থেমে শব্দগুলোকে যেন ওজন করতে করতে বলতো, মঙ্গল বা চাঁদে বসত করতে মানুষের আরও কয়েক শ' বছর লেগে যাবে রে। ওখানকার জমি-জমার টেনডার এতো তাড়াতাড়ি খবরের কাগজে বিজ্ঞপিত করা যাবে না।

অযোধ্যা পাহাড়ের হিমেল বাতাসে ছ্যাকা খাওয়ার মতো সীমা নিজের মধ্যে ফিরে আসে। আলনা থেকে একটা উলের চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়। চেয়ারে এসে বসে। স্কুলের খাতাগুলো নিয়ে কলমের ঢাকনা খোলে। কিন্তু খাতার অক্ষরের বদলে আবার সজলের মুখটা তার চোখের আঠায় লেপটে যায়। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে অমন ঠাট্টা করা সজল কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ না করেই গেরুয়াধারী হয়ে গেল।

শেষবারে সজলের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সময় সীমা কেঁদে ফেলেছিল। সজলের তখন একমুখ-দাড়ি-গোঁফ। কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব। সজল তাকে বলেছিল— আমি চলে গেলে তোমার খুব কষ্ট হবে?

সীমা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল—কোথায় যাবে তুমি? সামনে পরীক্ষা। এভাবে নিজের ক্যারিয়ারটা নষ্ট করতে চাইছো কেন?

সজল অনেকক্ষণ চুপ করে ভিকটোরিয়ার দিঘির জলে মাছেদের খেলা দ্যাখে। তারপর ক্যাথিড্রাল চার্চের গম্বুজটার দিকে আরো বেশ কিছুটা সময় তাকিয়ে থাকে। সজল যেন চার্চের ঘন্টা-ধ্বনির দিকে সুনিবিড় একাগ্রতায় কান পেতে আছে। সীমার কথা কি তখন সজলের মর্মে পৌঁছায় না? সীমা একবার সজলকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিল হুগলির মোহনা-মুখ দেখতে। নীদর ধারে বসে সীমার মনে হয়েছিল নদী যদি সমুদ্রে গিয়ে না মেলে তাহলে কি নদী নাব্যতা হারায়? বন্ধ্যা হয়ে যায়? মানুষের জীবনও কি তাই? এই যে সেকাল থেকে একাল বা আগামীকাল, মনুষ্য কিংবা প্রাণীজগতের প্রাণপ্রবাহের নিরন্তরতা, এও কি সেই সামুদ্রিক সঙ্গম চাঞ্চল্যের মতো!

নদীতে জলতরঙ্গ শুনতে শুনতে সজলও কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ও ডান হাতের নখ দিয়ে মাটিতে খুঁটতে থাকে। তারপর হঠাৎ-ই সীমার হাত ধরে টানে। বলে ওঠে— চলো, ওই দূরের গ্রামের দিকটা ঘুরে আসি।

সীমা ও সজল হাঁটতে হাঁটতে একটা মসজিদের কাছে পৌঁছে যায়। তখন বৈকালীন আযানের আওয়াজ ভেসে আসছে। সজল কথা থামিয়ে দেয়। কান পেতে থাকে। প্রত্যেকটা শব্দ যেন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ভেসে যেতে থাকে লোনা বাতাসে। শব্দগুলোর অর্থ বোঝা

যায় না। কিন্তু পাখির ভাষা না বুঝেও তার সুরের সম্মোহনে মানুষ যেমন করে ডুবে যায়, সজল যেন সে-রকমই নিজের ভিতরে নিজেই ডুবে যেতে থাকে।

ঠিক এ-রকমটাই সজলকে সুরের সম্মোহনে ডুবে যেতে দেখেছিল সীমা আর এক দুপুরে। কোনো এক রাজনৈতিক নেতার হঠাৎ মৃত্যুতে ক্লাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা চলে গিয়েছিল সোজা দক্ষিণেশ্বরের নদীর ধারে। নদীতে তখন ভাঁটার টান। অনেক দূর পর্যন্ত চর দেখা যায়। চরের নরম পলিমাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা জলের কাছে পৌঁছে যায়। সীমার হাঁটু ডুবে যায় জলে। বৈশাখের ঘাম-ঝরা দুপুরে জলের শীতল ছোঁয়ায় কেমন মাদকতা তৈরি হয়। সীমার তখন ইচ্ছা করে আরও অনেকক্ষণ এভাবে জলের মধ্যে হাঁটু-ডোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। সীমা সেই আকুলতায় সজলের দিকে তাকায়। সজলও তখন এক হাঁটু জলের মধ্যে। তার চোখেও জলের মতো তিরতিরে ভাব। কিন্তু পাড় থেকে ভেসে আসা কাঁসর ঘন্টা শোনার জন্য সে যেন আকুল হয়ে কান পেতে থাকে। সীমার কোনা কথাতেই তখন সজলের খেয়াল নেই। সীমার অভিমান হয়। সে সপসপে কাদার মধ্য দিয়ে দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করে। সজল তখনো জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই থাকে। সীমা পাড়ের কাছাকাছি এসে পেছন ফিরে তাকায়। খুব ভয় পায় সজলকে নিয়ে। যেন এক্ষুনি জোয়ার এসে হুড়মুড়িয়ে জলে ঢেকে দেবে সজলের উরু, বুক, গলা ও মাথার চুল পর্যন্ত। সীমা প্রাণপণে চিৎকার করে— সজল, চলে এসো, এক্ষুণি জোয়ার আসবে। সজল—

সজলের হুঁশ ফেরে। সজলও ছুটতে থাকে পাড়ের দিকে। ভিকটোরিয়া স্মৃতিসৌধের বিশাল বাড়িখানাকে পেছনদিক করে বসাটাই সজলের বরাবরের অভ্যাস ছিল। সেদিনও তারা সেভাবেই বসে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছিল। ক্যারিয়ার শব্দ শুনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার মতো সজল 'ফু' বলে মুখ দিয়ে বিচিত্র রকমের একটা শব্দ বের করে। তারপর বলে, ধরো অমি ফার্স্টক্লাস পেলাম। সরকারি কলেজে একটা চাকরিও জুটে গেল। একটা বউ, দু'একখানা বাচ্চা-কাচ্চা, একটা ফ্ল্যাট। ব্যাস! এইটুকুই মানুষের জীবন! আমার এ-রকমটা হওয়াতে পৃথিবীর কী যায় আসে? না হওয়াতেই বা কা'র কী এসে যায়? আমি কি পৃথিবীর এই শোক-দুঃখ ও জীর্ণদশাকে এভাবে একচুল বদলে দিতে পারবো? তাহলে আমার বেঁচে থাকা কীসের জন্য? শুধু স্ত্রী আর সন্তানের সঙ্গ প্রত্যাশায়? এত বিশাল পৃথিবীর গর্ভে দাঁড়িয়ে আমার করণীয় কি এইটুকুই?

সজলের কথা শুনতে শুনতে সীমার মধ্যেও এক অন্য রকমের দার্শনিকতা জন্ম নিতে থাকে। সীমা বুঝতে পারে সজল এখন আর তার কাছের মানুষ নয়। অনেক দূরে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যেমন এক তদগত ভাবের উদ্রেক হয়, সজলের কথায় তার কিছুটা রেশ ছড়িয়ে যায়। সীমা কোনো কথা না বলে সজলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পরীক্ষার আগের দিনই সীমা একটা দু'লাইনের চিঠি পায়। তাতে সজল মাত্র দুটো বাক্য লিখেছিল। কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে খুঁজতে যেও না।

তবুও পরীক্ষার পর সীমা তাকে খুঁজে বেড়ায় নানা ঠিকানায়। কোনো বন্ধুই তার কোনো হদিস দিতে পারে না। অনেকেই পরামর্শ দেয় সীমাকে নতুন করে জীবনটা আবার শুরু করার জন্য। সীমা বোঝে-এ সমাজ নারীকে গার্হস্থ্য না করাতে পারলে কারোরই স্বস্তি নেই। নারীর স্বাতন্ত্র্যে আস্থা নেই সামাজিক মানুষের। সীমা হাঁপিয়ে ওঠে। তার এ জীবন নিয়ে সে কী করতে পারে? সজলের কথাগুলো তাকে ভাবিয়ে তোলে। কখনো কখনো মনে হয় সজল তো সবকিছু পেরিয়ে যেতে পারতো। এড়িয়ে গিয়ে কি সত্যিই কোনো মহৎ কাজ করা যায়? সীমার মনের মধ্যে আবার ধন্দ উঁকি মারে। সজল কি সত্যিই এড়িয়ে গেছে? না আরও বড়ো পরিধিতে সমর্পণ করেছে নিজেকে? সীমা নিজে কি বৃহত্তর কর্মযজ্ঞের সঙ্গী হয়ে উঠতে পারতো না? তাকে সঙ্গে নিলে সজলের ব্রত উদযাপনের কী বিঘ্ন ঘটতো? মহত্তম হিতসাধনের জন্য কি ব্রহ্মচারী হওয়াটা প্রাথমিক শর্ত হতে পারে? পৃথিবী জুড়ে বহু মানুষের উত্থান ঘটেছে যারা ইতিহাসের মুখ বদলে দিতে চেয়েছেন মানুষের হিতসাধনকেই উপজীব্য করে? তাঁরা সকলেই কি ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন? তা তো নয়। কৌমার্য অক্ষুণ্ন না রাখলে কি মানবিক কর্মযজ্ঞের পুরোহিত হয়ে ওঠা যায় না?

এসব জিজ্ঞাসা নিয়েই সজলকে নিয়ে সীমার প্রগাঢ় অভিমান পুষ্ট হতে থাকে। কখনো কখনো বাবা-মা ও আত্মীয়দের চাপের কাছে সীমা, কিছুটা অসহায়তাও বোধ করে।

ঠিক এমনি অবস্থার মধ্যে সীমা পেয়ে যায় পাহাড়ি অঞ্চলের এই অনাথ সেবাশ্রমের স্কুলের চাকরিটা। সীমা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এক অনির্বচনীয় মুক্তির আনন্দে সে বিভোর হয়ে ওঠে। সীমার উপলব্ধির জগৎটা একটু একটু করে বদলে যায়। সে ভাবে যে মানুষ নিজের হাতের পরম শুশ্রূষার বীজ থেকে ফসল ফলায়, সেও তো সামাজিক মানুষের অন্যতম দায় পালনের গৌরব দাবি করতে পারে। তার সে-কাজ আয়তনিক বিচারে যতোই ছোট স্তরের হোক, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের মহা-সম্মিলনেই তো মানুষের বেঁচে থাকা, বিবর্তিত হওয়া আরও প্রাগ্রসর কোনো সামাজিক উত্তরণের স্বপ্নে।

সীমার কাছে সেই সেবাশ্রমের কাজ তাই ক্রমশই প্রিয় হয়ে ওঠে। চাকরি নয়, সীমা সে-কাজকে সামাজিক দায় বলেই ভালবেসে ফেলে। অনাথ শিশুদের আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে সীমা একাত্ম হয়ে যায়।

তবুও কখনো কখনো খুব একলা হয়ে গেলে দমকা ঝড়ের মতো সজল ঢুকে পড়ে তার মনের অন্দর মহলে। সীমা সচেতন-ভাবে তাকে বাধাও দিতে চায় না। সূর্য ঢলে পড়লে যেমন ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, মধ্যরাতের নির্জনতায় সজলের সেই একহারা লম্বাটে গড়ন আরও দীর্ঘকায় মনে হয়। সীমার মধ্যে তখন অসীমের আকুতি জন্ম নিতে থাকে। সীমার মধ্যে আরও এক বিশ্বাস ক্রমশই গাঢ় হয়ে ওঠে। সেবাশ্রমের অজস্র চিঠির মধ্যে ঠিক একদিন সজলের মুক্তোর মতো টলেটলে অক্ষরে নাম-ঠিকানা লেখা একটা সবুজ খাম সে পেয়ে যাবেই।

ছন্দ পতন

জেবুননেসা তবরেজ

শীতের শেষ। ফাগুনের আমেজ এসে পড়েছে দিনটার উপর। দুটো বাড়ির মাঝখানে সরু একফালি গলির ভেতরে ঢুকে অপ্রত্যাশিতভাবে কেমন করে যেন একটুখানি বাতাস এসে পড়ে জানালার উপর। ভাড়াটে ঘরের নড়বড়ে জানালাটা তাতে যেন আহত হয়। অনধিকার দাক্ষিণ্যের অপমানে ব্যথা ভরে কঁকিয়ে ওঠে। কিন্তু দখিন সমীরণ তাতে থমকে দাঁড়ায় না। চপল কিশোরীর মত ছুঁয়ে পালিয়ে আসে,— পালিয়ে আসে আরমার এলোমেলো চুলে, শাড়ির আঁচলে, মুখে, হাতে, পায়ে— সমগ্র সত্তায়। দেখ, আমি এসেছি। চমকে ওঠে আরমা। ফাগুন এসেছে। অবসাদগ্রস্ত চোখ এবার নিজের অজান্তেই ক্যালেণ্ডারের উপর এসে পড়ে। সত্যি মাসটা ফাগুনই বটে।— আজ পৌষের শেষ। আরমার চোখ এবার ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে কুঞ্চিত হয়ে বুজে গেল। পাশ ফিরে শুলো। উঃ, ঘুম কি তার দুচোখ থেকে হারিছে গেছে? আর যে পারছে না সে। কপালের শিরাটা দপদপ্ করছে। প্রায়ই করে আজকাল। বালিশে মুখ গুঁজে শুলো খানিকক্ষণ। তারপর উঠল। ফাগুন এসেছে। ফলের ও ফসলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল ফাগুন। সবুজ স্নিগ্ধ মনে রাঙা চাওয়ার কুঁড়ি ধরানো মন ভোলানো দুখ বাড়ানো রাত জাগানো ফাগুন। আরমা উঠল। চোখে পানি দিয়ে এসে টেবিলে বসল। অসহ্য যন্ত্রণা বুকটাতে। ওকে প্রকাশ না করে উপায় নেই, রক্ত ঝরিয়ে ওকে ভাষায় রূপ না দিয়ে মুক্তি নেই আরমার— স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। অথচ.......। অথচ এইতো ক'টা দিন আগে— মনে হয় যেন আজ কাল পরশু— সাহিল বলেছিল— কি লেখাটেখা ছেড়ে কি সব হচ্ছে বলতো? তুমি যে আর দশজনের মত গিন্নি হয়ে গেলে।

অনেকবারের মত ব্যর্থ কৈফিয়ত দিয়েছে আরমা— লিখবো গো এবার লিখবো।

সাহিল ব্যথাময় দৃষ্টি মেলে বলেছিল— আচ্ছা কি সব স্বপ্ন ছিল বলতো? কতে লিখবে তুমি..... কত বড় হবে.....কত স্বপ্ন দেখেছিলাম দুজনে। বিয়ের পর কি যে হল তোমার.... আগে কত সুন্দর গল্প লিখতে।

হাতের রুমালে ফুল তুলতে তুলতে আরমা মুখ তোলে। বলে- বলবো?

— কি?

কেন লিখি না?

— বলো।

— এত সুখ এত তৃপ্তি এত অলস মধুর শান্তিতে লেখা হয় না।

— কি? প্রশ্ন করতে গিয়ে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করে আঘাত পেয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দে সাহিলের ঠোঁট দুটো একান্ত করা হাসিতে বিভাসিত হয়ে যায়। বলে–– তাই নাকি? তবে

তো বিয়ে করা উচিত হয়নি আমাদের। আমি তোমার জীবনে না এলে তো অনেক বড় হতে পারতে।

— ওগো না—। —বাধা দেয় আরমা— আমি বড় হতে চাই না। নাম করতে চাই না, তোমাকে চাই। শুধু তোমাকে।

ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। মন ভরে গিয়েছিল আরমার। তার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সাথী প্রেমিক আর স্বামীর প্রীতি প্রেম আর স্নেহতৃপ্ত মুগ্ধ গরবিনী হৃদয়ে আজ সুখের শান্তির কিছু না-ভাবা কিছু না-চাওয়া অদ্ভুত আলস্য। সাহিলের মনও ভরে গিয়েছিল। তারও শৈশব, কৈশোর যৌবনের মানসীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল— তা হয় না রুমা। তোমার স্বপ্ন সার্থক কবতে না পারলে আমার সুখ নেই, শান্তি নেই। লিখতে তোমাকে হবেই।

— শুধু ঐ এক কথা। — আরমা ওকথা ভাবতেও চায় না। বলে— লেখা হয় না তো। — তুমি এত কাছে। এত প্রেম প্রীতি, তোমার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না— দুঃখ না হলে কি সৃষ্টি হয় গো?

— দুঃখ চাও? — মরে গেলে—

রাগ করে পালিয়েছিল আরমা— আর হাসতে হাসতে সাহিল ওর পেছনে গিয়েছিল—। যত বড়ই হোক আরমা, তবু সাহিলের কাছে এখনও সে অবুঝ স্বভাবী ছেলে মানুষ। এখনও সেই ছোট্ট খেলার সাথীর মত সে চঞ্চল অভিমানী আর সরল। কিন্তু না— আরমাকে যে বড় হতে হবে। সাহিল ওকে ব্যর্থ করতে পারবে না। তাই রাতে আবার বলে— লক্ষ্মীটি, লেখনা। লিখলে আমি কত খুশি হই।

— ছাই হও। —আরমা ওর বুকের আশ্রয়ে স্থান করে নিয়ে বলে— আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ছি।

— অন্যের সঙ্গে বিয়ে হলে লিখতে, — না?

— ঘুমাবে না— না? — আরমা রাগ করে পাশ ফেরে। সাহিল একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ওর চুলে হাত বুলাতে থাকে ঠিক আজকের দখিন হাওয়ার মত সে পরশ মন জুড়ানো, মন ভরানো আর মন হারানো।

আরমার বুকের দীর্ঘশ্বাসটা আর বাধা মানে না। কে জানত এত আঘাত, এত যন্ত্রণা, এত বিশ্বাসঘাতকতা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। চোখে পানি নেই, শুধু জ্বালা। অথচ তা সত্য কি? বিশ্বাস করতে পারে না কিছুতেই, বিশ্বাস করা যায় না। তবু বিশ্বাস করতে হয়। নিজের চোখ কানকে কি কেউ অবিশ্বাস করতে পারে? আর সেই পরিবর্তন।— কি ব্যবহার হয়েছে সাহিলের। কি কথা!

— দাঁড়াও! এখনও তো অফিসের বেলা হয়নি। এত শীগগির কোথায় যাবে?

— কাজ আছে?—

— কি কাজ।

— অমিতের সঙ্গে একটু দেখা করতে যেতে হবে।

— কে অমিত? — তোমার বন্ধু? — এত বন্ধু নিয়ে কবে থেকে উতলা হলে?

আশ্চর্য। সাহিল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল— তোমার জন্য সব বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে ঘরে বসে থাকতে হবে নাকি? অদ্ভুত তোমার মন।

আরমার মনই অদ্ভুত। আরমা আহত দৃষ্টি নামিয়েছিল শুধু, কিছুই বলতে পারেনি। কি আর বলবে। সত্য— সব সত্য। কোন ভুল নেই। ওর প্রতিদিনের ব্যবহার থেকে আরমা বুঝতে পারছে বৈকি। এরকম কথা ব্যবহার তার একদিনকার প্রিয়তম সাহিলের নয়। এই তো সেদিন পর্যন্ত— দু'মিনিট আগেও অফিস যেতে কষ্ট পেত সাহিল। যাবার আগে ওদের সেই নিভৃত বিদায় দেওয়া আর নেওয়া। এই সেদিনও তো তাই করছে আরমা—। সাহিল, পথের বাঁকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাত— কি করুণ মনে হত তাকে।

উপরের বারান্দার জোর করা হাসি এঁকে দাঁড়াত আরমা।

ঐ আটটা ঘন্টার নিসঙ্গতা কাটাতে ওদের কত যুগ মনে হত। নির্দিষ্ট সময়ে অফিস থেকে এসে জামা-কাপড়সুদ্ধ চেয়ারে বসে যেন অনেক দিনের বিরহের পর মিলিত হয়েছে দুজনে এমনি কথার কুজনে, মধু আলাপনে কাপড় বদলাবার কথাও মনে হত না তার,— আরমাকেই স্মরণ করিয়ে দিতে হ'তো.....। এই তো সেদিন মনে হয়— যেন কাল।

প্রথম ক'দিন আরমা যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল।— খেত না, শুত না। লুকিয়ে চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে গেল তাও। কোথায় যাবে— কি করবে— কোন আঘাতে সাহিলকে আহত করবে ভেবে পায়নি কিছুই। অভিমান! কি দুরন্ত অভিমান। মুখ ফুটে কিছু বলার অপমান সে সইতে পারবে না। মুখ ফুটে যা বলতে পারেনি— তাই বলার জন্য তার মন শেষ কাঁদন কাঁদল খাতার পাতায়। ভেজা কাকের মত অসহায় ঝড়ো মন তার পেল উষ্ণ আশ্রয়— যেখানে প্রাণ খুলে কাঁদা যায়, হাসা যায়, বকা যায়, সব দেওয়া নেওয়া যায়।

— চিঠি আছে।— বাচ্চা চাকরটা টেবিলে একখান কার্ড রেখে যায়। চোখ বুলিয়ে চমকে উঠে আরমা। তার সাম্প্রাতিক কালের লেখা 'পিয়াসী রাত' পুরস্কার পেয়েছে। ছোট গল্পের প্রথম পুরস্কার সম্পাদকের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ লিপিটার প্রতিটি ছত্র তার বিস্মিত চোখে খুশির বিদ্যুৎ অথচ বর্ষণ না এনে শুকনো মরুভূমির জ্বালা সঞ্চয় করতে লাগল। — কেন এ মর্যাদা। কি হবে তা দিয়ে? কি বা লাভ তাতে আরমার? কোন কাজ না পাওয়ায় লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল আগের মত। ভাবেনি এতটা। সাহিল একদিন বলেছিল— তুমি লিখলে কত খুশি হই। —চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল আরমা। .....সেই সাহিলই বটে। অফিস যাবার আগে সেদিন হঠাৎ জিগ্যেস করেছিল— আজ কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি?

— কেন বলতো? — গেলে তো ফোনে জানাব। ......সেইটে অভ্যাস আরমার। কোথাও বেড়াতে গেলেই ফোন করে।

— না জিগ্যেস করছি। — শরীর খারাপ বলছিলে—, কোথাও যেও না।

— তুমি আজ চারটায় ফিরবে না?

— একটু দেরী হবে।

— কেন?

এক বন্ধুর ওখানে চায়ের নেমন্তন্ন রয়েছে।

আরমা আর কিছু বলেনি। সত্যি শরীর খারাপ লাগছিল....অথচ বিকালে কি খেয়ালে যেন বেড়াতে যাবার ইচ্ছায় ফোন তুলে ধরে।

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মোটা ভারিক্কী গলা— মিঃ আলি তো নেই। এইমাত্র তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে ইডেনে বেড়াতে গেলেন। আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

উত্তর না দিয়ে আরমা ফোনটা রেখে দিল। বান্ধবীর সঙ্গে ইডেনে! আজ তো চায়ের নেমন্তন্ন। সে তো অফিসের সহকর্মী বন্ধুর বাড়ি। বান্ধবী তো নয়। কই বান্ধবীর কথা তো কোনদিন বলেনি সাহিল। এত বন্ধু সহকর্মীর পর। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় নিজের অজান্তেই ইডেন উদ্যানে এসে পড়ে আরমা। সজাগ হয়ে ওঠে। দৃষ্টি কেমন আপনা থেকেই তীক্ষ্ণ হয় যায় হঠাৎ। নিজেরই বিরক্তি লাগে। ছিঃ, মনটা তার এত নীচ হচ্ছে কেন। হযত পরিচিতা কোন মেয়ে। ভদ্রতাবোধে বেড়াতে যাওয়া কি এমন অস্বাভাবিক। এসব কি ভাবছে আরমা। ছিঃ! নিজেকে শাসন করতে গিয়ে চমকাতে হলো হঠাৎ।— সন্ধ্যার আলো-আঁধারে নির্জন এক কুঞ্জবিথীকায় বসে একটা মেয়ের সঙ্গে কি বিশ্রীভাবে হাসছে সাহিল, ফুলঝুরির মত কি কথা নাচছে ওর মুখে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল আরমা। ঘাসের ডগা ছিড়ে দাঁতে কাটছে, আর সাহিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। —ওকি দৃষ্টি? ওকি হাসি! ওকি কথার ভঙ্গী? সন্ধ্যার নির্জনতায় বান্ধবীর সঙ্গে ইডেনের কুঞ্জ বিথীকায় নিজেকে কোথায় নামিয়ে এনেছে তার সুন্দরতম প্রিয় সাহিল।— পায়ের নিচে মাটি দুলছে। ঘৃণায় বিষাক্ত বাষ্পে এক্ষুণি যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে আরমার। সে পড়ে যাবে— মরে যাবে। দ্রুত সে ওখান থেকে তীরের মত বেরিয়ে এল মুক্ত পথে। টলতে টলতে বাড়ি ফিরল।

বেশ রাত করে এল সাহিল। কথায় কথায় একসময় শুধাল— বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি?

এই প্রথম মিথ্যে কথা বলল আরমা। অনেক কষ্টে সহজ সুরের চেষ্টায়— না।

— কি হয়েছে? শরীর খারাপ খুব?

— মাথা ধরেছে। তুমি কোথায় ছিলে?

— অমিতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই চারটে থেকে বসিয়ে রেখেছে। কিছুতেই ছাড়ল না। খাইয়ে-দাইয়ে তবে ছাড়ল। খেয়ে এসেছি।

একটা কান বালিশে আর একটা কানে হাত চাপা দিলে কি আর কিছুটা শুনতে পাওয়া যায় না? আরমা তাই কিছু বলল না। বলতে পারে না। কি বলবে— এত মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণার উত্তরে কি বলবে আরমা। প্রেম অনুযোগের প্রতিদান চায় না। কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে না।

তারপর থেকে ক্রমশ সাহিলের চলনে-বলনে ব্যবহারে নিঃসন্দেহ হল আরমা। আজকাল প্রায়ই সাহিল অমিত নামের সহকর্মীর সঙ্গে তার বাসায় যায়। রাত করে বাড়ি, আসে, এবং খেয়েই আসে।

অসময়ে দরজার কড়া নড়ছে। অনেক কষ্টে টেবিল থেকে মাথা তুলল আরমা। কে আবার এল এখন জ্বালাতে। পারবে না সে কারও সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু কড়া নড়ার বিরাম নেই। দরজা খুলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায় আরমা— সাহিল। হাতে তার নব প্রকাশিত অঙ্কুর।

— রমা! সাহিল এগিয়ে আসে। স্নিগ্ধ তৃপ্ত সুরে বলে তোমার গল্প প্রাইজ পেয়েছে রুমা। অফিসে থাকতে পারলাম না। বন্ধুদের কি কাড়াকাড়ি—।

একটু থেমে বলে— এসো। কাছে সরে এসো। অনেক দুঃখ পেয়েছ তাই না?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আরমা।

— দেখ, ইডেন গার্ডেনের রূপে যে কথা তুমি লিখেছ সে এমন মারাত্মক কিছুই না। এমনি সহজভাবে।

— আমি তো তোমাকে মারাত্মক কিছুই বলিনি। তোমার পক্ষে তা সহজ বটে।— আরমা কথা বলল।

— আমার পক্ষে। সাহিল অবাক হয়ে যায়— বিশ্বাস করো সে শুধু তোমাকে একটু আঘাত দিয়ে। সেদিন তোমার ফোন নিয়োগী ধরে-ছিল। তাকে এ কথা বলতে বলেছিলাম। আর ও মেয়েটা অফিসেরই মেয়ে। একটু হ্যাংলা। তাই কোনদিন যা করিনি তাই করেছিলাম। তোমার জন্যই বেড়াতে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করো। আশ্চর্য! আরমা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। সেই হাসি সেই ঢলে-পড়া ভঙ্গী, কথার ফুলঝুরি নিজের চোখে যা দেখেছে, আরমা আজ তার গল্প পুরস্কার পেয়েছে বলে তাকে ও অস্বীকার করতে চাইছে, সাহিলের বলতে বাধছে না তোমার জন্য। কি আশ্চর্য! কি মিথ্যাবাদী নীচ শঠ জঘন্য হয়ে গেছে সাহিল। ছিঃ ছিঃ। ঘৃণায় আরমার দেহ মন যেন কুঁকড়ে গেল।— রুমা! সাহিল টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে— বিশ্বাস করছ না?

আহত সাপের মত হঠাৎ যেন ফণা তুলল আরমা সতেজ দৃপ্ত দৃষ্টি তুলে স্পষ্টভাবে তাকাল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আরও স্পষ্ট উচ্চারণে বলে চরিত্রহীন যারা তারা স্বভাবতই মিথ্যাবাদী!

— আরমা! যেন আর্তনাদ করে উঠল সাহিল। আরমা উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে কলমটা তুলে নিল। সাহিল জমাট পাথরের মত অনড় অচল স্তব্ধ..... ।......সচল মুখর আরমার কলম। দখিন হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাতায় পাতায় ডানা মেলেছে। ফাগুন এসেছে। মন ভোলানো কাঁদানো ফাগুন।

তোমাকে ই-মেল করছি ব'লে ভেবো না এটা তোমার উদ্দেশে আমি লিখছি। এটা সম্পূর্ণ আমার আম্মীর জন্য স্মৃতি নিবেদন। যেহেতু আমি কলেজের ল্যাবে বসে ফ্রি অফ্ কস্ট একান্ত অভ্যেসে চর্চা করছি। তাই আমার বয়ানটা একটু দীর্ঘ হবে। আশা করি তুমি বিরক্ত হবে না। বিশেষতঃ তোমার প্রতি আমার রিডিং তো খুব সুখকর নয়, তাই তোমার মনে এই ই-মেল সূর্যালোক না ছড়িয়ে কালো মেঘের সঞ্চার করতেই পারে। কি করবো বলো! আমি যে অনন্যোপায়। বাড়ি ছেড়ে এতদূরের সিলিকন সিটিতে পড়তে এসে আমি বুঝতে পারছি আমার জীবনে আম্মী কতখানি। আমি তো এখন জলের মাছ ডাঙায়। সব কিছু নিজেকে করতে হচ্ছে। আমার সমস্ত কাপড় চোপড়, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, গামছা তোয়ালে মোজা গেঞ্জি এমনকি আন্ডারওয়ার পর্যন্ত সব কিছু আম্মী কেচে রাখতো। আদর আবদার ক'রে কত কি জোর ক'রে ক'রে খাওয়াতো। পরাতো। রাতের পড়া শেষ ক'রে যখন বিছানায় শুতে যেতাম তখন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতো। আবার আমার ঘরের পুবের জানালায় সূর্য উঁকি দেবার আগেই ঘুম থেকে ডেকে ডেকে তুলতো। আমার চোখমুখ ধোয়ার আগেই ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিত ব্রেকফাস্ট। আমার ঘরদোর, চেয়ার টেবিল, বইপত্র আলপিন থেকে আয়না, পোর্টেট থেকে আলনা, সবকিছু ঝেড়ে পুঁছে ঝকঝকে তকতকে ক'রে গুছিয়ে রাখতো নিজ হাতে। ইসকুলে বেরুবার সময় রুমালটাও এগিয়ে দিত ভাঁজ করে। আমার অবাঞ্ছিত বন্ধুদেরকে শাসন তর্জন ক'রে দূরে সরিয়ে রাখতো। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লে উদ্বিগ্ন হ'ত। হায়! আমি এখানে এখন সম্পূর্ণ একা। অসহায়। আমার কথা এখানে কেউ ভাবে না। সেদিন একটু জ্বর এসেছিল। কপালটা ধরেছিল। বন্ধুরা আমাকে দুটো ট্যাবলেট এনে দিয়েছিল ঠিকই! কিন্তু আমার কপালের দুপাশটা একটু টিপে দেবার জন্য কেউ ছিল না। এই পাণ্ডববর্জিত বিদেশে আমি যেদিকে তাকাই-শুধু আম্মীর কথাই মনে পড়ে। এখন বুঝতে পারি আম্মী আমার জীবনে কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল! দিনরাত শুধু আম্মীর কথাই মনে পড়ে। শুধু তার কথা মনের প্রেক্ষাপটে অনুভব করতেই যেন আমার এতদূরে পড়তে আসা সার্থক হয়েছে। সত্যিই আমার আম্মী জনম দুখিনী। তোমার কাছে তাকে সুখ পেতে তো কখনোই দেখিনি। কিন্তু আমি যদি পরীক্ষায় পাশ ক'রে কোনদিন ইঞ্জিনিয়ার হ'তে পারি তবে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যে কোন কোম্পানিতে চাকরি খুঁজে নেবো। সেখানে ছোট্ট সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে আমি আম্মীকে নিয়ে যাবো। জেনো, আমি তার জীবনের সমস্ত দুঃখকে একদিন ঘুচিয়ে দেবই।

বাপী, মাঝে মাঝে তোমার কথাও যে আমার মনে পড়ে না, তা নয়। তুমি তো

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। ঘরে বাইরে, ট্রেনে বাসে, হাটেবাজারে, অফিসে, আদালতে, পথে ঘাটে, ইস্কুলে, খাবার টেবিলে, চলন্ত স্কুটারের পিছনে আমাদেরকে বসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সবসময় তুমি আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাতে। উঠতে বসতে দিনরাত কানের কাছে শুধু একটাই ক্যাসেট বাজিয়ে যেতে-সাধনা করো, স্বপ্ন দিয়ে জীবনকে গড়তে হবে। আমাদেরকে ঘিরে আসলে তুমিই স্বপ্ন দেখতে। তোমার জীবনের যত অপূর্ণতাকে পূরণ করবার জন্য আমাদেরকে তুমি হাতিয়ার হিসেবে গড়তে চেয়েছিলে। তোমার লক্ষ্য পূরণে তুমি দাদাকে ভারতের বাইরে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অন্য মহাদেশে পাঠিয়ে দিলে। দাদা ছিল তোমার প্রাণের প্রাণ, কলিজার টুকরো, তোমার নয়নের মণি। তাকে যখন তুমি অতদূরের বরফে ঢাকা দেশে পাঠাতে পেরেছো তখন তোমার অপছন্দের কনিষ্ঠ পুত্রকে যে ভারতের অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! আমি তো ছিলাম তোমার চোখের বালি। তোমার স্বপ্নপূরণের নিছক হাতিয়ার মাত্র। আমার সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি কিংবা ব্যর্থতা ছিল তোমার কাছে অসহ্য। মনে আছে আমি একবার ইসকুলের পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছিলাম ব'লে তুমি আমাকে অপমান করেছিলে! আর, সেই আমরা একবার বাসে ক'রে ট্যুরে গিয়েগিয়াল! ডিমনা লেকের ধারে পাহাড়ি পরিবেশে ফুরফুরে হাওয়া প্রেস্টিজ ভুলে গিয়ে তুমি মনের আনন্দে মাথায় গামছা বেঁধে সাঁওতালী গান গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছিলে। আমি পাহাড়ের ছায়া মাখা লেকের জল ছুঁতে গিয়ে পা স্লিপ্ ক'রে জলে প'ড়ে গেছিলাম! আমার জামাকাপড় সব ভিজে গেছিল। পায়ের আঙুলে চোট লেগেছিল। আমার সেই বিব্রত অবস্থায় তুমি কিন্তু আমাকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সামনেই আমাকে তিরস্কার করেছিলে! একবারও ভেবে দেখোনি-আমার বন্ধুবান্ধব, অন্যান্য সঙ্গী ও অভিভাবকদের সম্মুখে আমার অসহায়তা, দুর্দশা ও লজ্জার কথা!

বাপী, তুমি ছিলে আস্ত এক ডিকটেটর। আমার কিঞ্চিৎমাত্র স্বাধীনতাও তুমি কখনো বরদাস্ত করতে না। আমার সবকিছুতেই তুমি ডিরেকশন দিতে। দিনরাত পিঞ্চ করতে। আমার ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচি কিংবা পছন্দ-অপছন্দের কোন মর্যাদা ছিল না তোমার কাছে। আমার একান্ত ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খার ব্যাপারেও তুমি নাক গলাতে দ্বিধা করোনি। যাকগে ওসব প্রসঙ্গ। আম্মী আমাকে শাসন করতো ঠিকই, কিন্তু তার অন্তরে ছিল স্নেহের সমুদ্র। কোমলতা। পুত্রের প্রতি অনাবিল আবেগ। অনুপম ভালবাসা। তুমিও শাসন করতে। কট্টর সে শাসন। সেখানে ছিলনা কোন ভালবাসর স্নিগ্ধ ব্যাকরণ। শুধু ছিল-আমাকে সাফল্যের যন্ত্র বানাবার জন্য তোমার গভীর নির্মম বাসনার প্রকাশ।

মাধ্যমিক পাশ করে আমি বললাম-আর্টস পড়বো।

তুমি বললে-না, সায়েন্স।

টুয়েলভ পাশ ক'রে আমি বললাম-ফিজিক্স অনার্স পড়ি!

তুমি বললেন-না, ইঞ্জিনিয়ারিং।

আমি বললাম-এখানেই পড়ি তবে!

তুমি বললে-না, পশ্চিমভারতে চলে যাও!

এবং কী আশ্চর্য-পদে পদে তোমার ইচ্ছাটাই জিতে গেল। অথচ জীবন আমার। স্বপ্ন আমার। ভবিষ্যৎ আমার। মেন্টাল এ্যাপ্‌টিটিউড্‌ আমার! বাপী, শুধু টাকার জোরে তুমি প্রতিটি খেলায় জিতে গেলে। তাই, তোমাকে আমার বড় অসহ্য লাগে।

তবু দ্যাখো, প্রয়োজনে আমি তোমার কাছে কেমন অসহায়। তোমার কাছেই আমাকে টাকার জন্য·হাত বাড়াতে হচ্ছে। সম্ভব হ'লে আরো হাজার দশেক টাকা পাঠিয়ে দিও। তুমি যে বাড়িতে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছিলে সেটা দিয়ে আমি একটা কম্পিউটার কিনে নিয়েছি। তাই হাত আপাতত শূণ্য। আর, তুমি নিশ্চয় জানো, এখানে জীবন যাত্রা খুবই এক্সপেনসিভ। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সবসময় হিসেব ক'রে চলা যায় না। এখানে অনেকই ঘোরাফেরা করার জন্য, টিউশনি পড়ার জন্য, সখ মেটানোর জন্য মোটর বাইক কিনে নিয়েছে। আমি তোমাকে কিন্তু ঐরকম দুচাকা কিনে দেবার জন্য বায়না ধরছি না। অনেকেই মদ খায়। নানান ছুতোয় পয়সা ওড়ায়। আমি কিন্তু এখানো ওসবে নিজেকে রপ্ত করিনি। শুধু নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই তোমার কাছে বাড়তি টাকাটা নিতে বাধ্য হচ্ছি। তবে ভয় নেই, তোমার দেওয়া সব টাকার হিসেব আমি ডাইরিতে লিখে রাখছি। পড়া শেষে চাকরি পেলেই ভবিষ্যতে আমি তোমার সমস্ত ঋণ সুদ সমেত পাই পয়সা শোধ করে দোব। সেই সময়টুকু নিশ্চয় তুমি আমাকে দেবে! আর তো ক'টা বছর মাত্র। এই ক'বছর কিন্তু তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। নইলে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে বরফের দেশে জ'মে ফ্রিজ হয়ে যাবে। তোমার এই কনিষ্ঠ পুত্র সিলিকন সিটিতে দিশেহারা হয়ে পড়বে। বাড়িতে আম্মীর চোখে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই বাঁচটা আপাতত তোমার পক্ষে খুবই জরুরী।

হ্যাঁ, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। এই বয়সে অনেকেই হার্ট এ্যাটাকের ধাক্কায় ছিটকে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। তাই বলছি, তুমি কিন্তু একদম টেনশন নেবে না। প্রতিদিন প্রাত ভ্রমণ চালিয়ে যাবে। যোগ ব্যায়ম যেমন করতে তেমনই নিয়মিত অভ্যেসটা রাখবে। রাত্রে শোবার আগে হাতের চেটোয় মধু নিয়ে চেঁটে খেতে ভুলবে না যেন। মাঝে মাঝে বাসকপাতা তালমিছরি দিয়ে ফুটিয়ে গাঢ় রস ক'রে খাবে। শ্বাসকষ্টটা অনেক উপশম হবে। একদম রাত জাগবেনা বলে দিচ্ছি। মিষ্টি কম খাবে। খাবার তালিকা থেকে ফ্যাট জাতীয় খাবার একদম মাইনাস ক'রে দেবে। হ্যাঁ, চারামাছ কিনবে, মোটা মাছ একদম নয়। যাকগে, এসব কথার তো কোন মূল নেই তোমার কাছে। তুমি একগুঁয়ে মানুষ। যা ভাল বুঝবে, করবে। শরীরের আইন ভাঙলেই সে তোমার উপরে তার প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। মাঝের থেকে তোমাক সাবধান করতে আমার বয়েই গেছে!

এতই যখন লিখছি স্ক্রিনের উপরে, তখন আরো দু'চারটি টুকিটাকি প্রসঙ্গে আঙুল চালাই।

আমার সেই মিনি বেড়ালটা কেমন আছে! তাকে যেন মাছের কাঁটা মিশিয়ে একমুঠো ক'রে ভাত খেতে দিও প্রতিদিন। আর সেই উঠোনের কোনে প্রেম-বেড়ার ভেতরে আমার লাগানো সেই রজনীগন্ধা ও বকুল ফুলের চারাগুলো? ওরা সব বেঁচে আছে তো! আমাকে ওদের মনে আছে কিনা, কি জানি! ওদের গোড়ায় যেন মাঝে মাঝে একটু জল দিও। আম্মী তো নিশ্চয় জল দেয়। তুমিও দিও কিন্তু। ওদের ডালে ফুল ফুটলে ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়ে দিও। অবশ্যই! আমাদের আমের বাগানে মুকুল এসেছে কি? শীত ফুরিয়ে বসন্ত প্রায় চলে এলো যে! আম্মীকে ব'লো-তার প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের শীতে এবারে কোন ট্রাবল হয়নি। পৃথিবীতে আম্মী ছাড়া আমার কথা আর তো কেউ ভাবে না! তাকে আমার জন্য চিন্তা করতে বারণ ক'রো। ব'লো-আমি খু-উ-ব ভাল আছি। পড়াশোনাও বেশ ভালই হচ্ছে। আর ক'মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে আমি তার কাছে বেড়াতে যাবো। তখন একমাসের ছুটি কাটিয়ে তাকে ছেড়ে আবার ফিরে আসবো তোমার পাঠানো এই দূর নির্বাসনে। ইতি—

দুর্নীতি

সেলিনা হোসেন

নিয়ামত রসুল যতদিন একা ছিলো ততদিন তার জীবনযাপনের ভাবনা ছিলো এক ধরনের। বিয়ের পরে দু'মাস না যেতেই ওর মনে হচ্ছে ও অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছে। বউয়ের সঙ্গে জড়িত জীবন যেহেতু ওর একার নয়, সেহেতু ও এখন এক ধরনের অস্বস্তির মধ্যে দিনযাপন করছে। বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই বউ বলেছে, তোমার চাকরিতে উপরিপাওনা আছে বলেই এখানে বিয়েতে রাজি হয়েছি, নইলে রাজি হতাম না। আমার জন্য কত প্রস্তাব ছিলো আমি রাজি হইনি।

নিয়ামত রসুল একথা শুনে অস্বস্তিতে আফরোজার দিকে তাকায়। ওর গলা শুকিয়ে যায়। বুকের কাছে কি যেন একটা এসে আটকে থাকে। আফরোজা ভুরু কুঁচকে বলে, কি হলো? অমন করেছো কেন? আমার কথা শুনে তুমি ভয় পেয়েছো মনে হচ্ছে। খুব কি খারাপ কিছু বলেছি?

— ইয়ে, মানে, তুমি আমাকে ঘুষ নিতে বলছো?

— ঘুষ কেন হবে? ওটা একটা উপরিপাওনা। তোমার যোগ্যতার সম্মানী। পরিশ্রমের জন্য বাড়তি আয়।

নিয়ামত রসুল গলা নিচু করে কঠিন স্বরে বলে, এটা দুর্নীতি।

— দুর্নীতি? হো-হো করে হাসে আফরোজা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছে। বাবা পুলিশ অফিসার। আয়ের চেযেও বাড়তি আযের প্রাচুর্য ছিলো বলে আয়েসেই জীবন কেটেছে। নিয়ামত রসুল বউয়ের হাসি শুনে বিব্রত মুখে চুপ করে থাকে। এটা যে হাসিব বিষয় হতে পারে তা ও কল্পনা করতে পারে না। একবাব ভাবে চেঁচিয়ে উঠে বলবে, এত হাসছো কেন? তোমার লজ্জা করে না হাসতে? কিন্তু বলা হয না। ভয় করে, নিজের ভেতরে কুঁকড়ে যায়। পরক্ষণে নিজেকেই বলে, ভয় কাকে? কিন্তু বুঝতে পারে না অদৃশ্য সুতোর টানটা কোথায়। এই না বুঝতে পারাই ওর এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। আসলে ও বুঝতে পারছে ভয়টা ধ্বস নামার। স্কুল শিক্ষক বাবা চাকরিব শুরুতেই বলে দিয়েছিলো, বাবা সৎ উপার্জনে খাওয়াবি। হারামের টাকা আমাদের জন্য না। ওটা আমরা ছুঁতে চাই না। এখন স্ত্রী অন্য জীবনের কথা বলছে। যে জীবনে ঢুকলে বাবা-মায়ের কাছ থেকে শেখা নিজেরও বিশ্বাস ধ্বসে পড়বে। নিয়ামত রসুল স্ত্রীর তীব্র দৃষ্টির সামনে বিষণ্ন হতে থাকে। ওই দৃষ্টি ওর ভেতরে ঢুকলে ও চোর হয়ে যায়, বেরিয়ে এলে পুলিশ হয়। আফরোজা খেঁকিয়ে উঠে বলে, কি হলো তোমার?

— খেলছি।

— খেলছো? কার সঙ্গে?

— নিজের সঙ্গে।

— কিভাবে?

— বুঝবে না।

— বললে, আমিও খেলতাম।

— ওই খেলার সাধ্য তোমার নেই।

— খেলাটার নামটা বলো না?

— চোর-পুলিশ?

— চোর-পুলিশ? হো-হো করে হেসে ওঠে আফরোজা।

— চোর পুলিশ হতে পারে না, কিন্তু পুলিশ চোর হয়, তখন কিভাবে খেলবে? আফরোজা রেগে গিয়ে বলে, তুমি আমাকে অপমান করছো।

— আশ্চর্য, তুমি অপমান বোঝ?

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে ও। মনে হয় সমস্ত বিষণ্নতা কেটে গিয়ে ও নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। খেলায় ওর জিৎ হয়েছে। আফরোজা দুপদাপ পা ফেলে অন্য ঘরে চলে যায়। নিয়ামত রসুল হাসতে হাসতে ভাবে, এভাবেই কি এ জীবনের রঙ দেখা শুরু হলো! ও দাঁতে ঠোঁট কাটে। হাসি এখন সারা ঘরে। দেয়াল থেকে, আসবাবপত্র থেকে হাসির ধ্বনি আসছে। নিয়ামত রসুল বাইরের পৃথিবী দেখবে বলে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায। জানালার শিকগুলো ভীষণ ঠাণ্ডা।

পরদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে ভয় করে নিয়ামত রসুলের। অফিসে লাঞ্চ করার সময় থেকেই বিষয়টি ওকে আক্রান্ত করে। এক লোকমা ভাত গেলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় সেটা বুকের ভেতরে আটকে গেছে এবং পরক্ষণে মনে হয় ওর শ্বশুর ওর ভেতরে ঢুকেছে। পুলিশ ভাবলেও তার মুখটা ভেসে ওঠে, চোর ভাবলেও তার মুখটা ভেসে ওঠে। ও ভাত খেতে পারে না। ওই এক লোকমা ভাত বুকের ভেতরে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। প্লেটে পড়ে থাকে করলা ভাজি, কৈ মাছ আর লাউ ডালের চচ্চড়ি। কোনোটাই আফরোজার রান্না নয়, কাজের মেয়ের।

শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরতেই হয়। আফরোজার মেকি হাসি ওকে আরো ম্রিয়মাণ করে দেয়। ও সহজ হতে পারে না। মনে হয় আফরোজা জণ্ডিসের রোগী, চোখের গভীর কোটরের ভেতর থেকে তাকিয়ে থাকে। ঘামতে থাকে নিয়ামত রসুল। ওর ঘাম দেখে রেগে যায় আফরোজা। চেঁচিয়ে বলে, কেমন সে বিদঘুটে গন্ধ তোমার ঘামে। কাছে এসে দাঁড়াতেও ঘেন্না হয়।

— ইয়ে, দাঁড়াও, গোসল করে আসি।

ও জুতোটা খুলে ঘরের একপ্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে বাথরুমে ঢোকে। দরজায় পিঠে ঠেকিয়ে বড় করে শ্বাস টেনে বলে, এটা পালানোর একটা দারুণ জায়গা।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটিয়ে ও সাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়ায় মনে হয় দূর থেকে কেউ ওকে শান্ত হতে বলছে, বলছে স্থির হতে। কিন্তু হয় না। ভেতরটা যেমন ছিলো তেমনই থাকে।

দরজায় শব্দ করে আফরোজা।

— আর কতক্ষণ? বের হও না?

শব্দ করে না নিয়ামত রসুল। ঘাপটি মেরে থাকে। বাথরুমের ছোটঘরে শুধু জল পড়ার শব্দ। বাইরে আফরোজার কণ্ঠস্বর।

— শুনছো? কি হলো? আর কতক্ষণ?

— আসছি।

নিয়ামত রসুল সাওয়ারের ট্যাপ বন্ধ করে। গা মোছে। লুঙি পরে এবং খানিকটা ভেজা শরীর নিয়ে বেরিয়ে আসে। ভাবে, শরীরটা জলে আর ঘামে মাখামাখি হলে আর কটু গন্ধ বের হবে না। বুকের ভেতরে স্বস্তি নিয়ে বের হতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, কি অদ্ভুতভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজছে ও। কেমন স্বাভাবিক নিয়মে পন্থা এসে যাচ্ছে চিন্তায়, এর জন্য কোনো আগাম ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না। নিজেকেই বললো, এমনটি হওয়ার কথা ছিলো না, তবু হলো। আশ্চর্য, বুকের ওপর আঙুল বুলিয়ে দাগ টানলো। কিছু একটা খুঁজতে চাইলো নিজের ভেতর। দোষটা কি ওর না দুলাভাইয়ের? দুলাভাইতো তার মামাতো বোনের জন্য ওকে পছন্দ করতেই পারে। আসলে দায়িত্বটাতো ওর নিজেরই ছিলো। ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছে। এখন আর কাউকে দোষারোপ করা যাবে না। আফরোজাকে দেখে আপত্তি করেনি ও। ভেবেছিলো বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। স্টুপিড, নিজেকে গাল দিয়ে দরজা খোলে। আফরোজা নেই। হয়তো বেডরুমে। ও ভেজা তোয়ালে হাতে নিয়ে বারান্দায় আসে। দড়ির ওপর তোয়ালেটা মেলে দিয়ে তোয়ালের এক প্রান্তে মুখ গোঁজে। সুগন্ধি আসছে তোয়ালে থেকে? হয়তো তোয়ালেটা আফরোজা ব্যবহার করেছিলো। শুনতে পায় অদৃশ্য কণ্ঠ। নিয়ামত রসুল জীবন সম্পর্কিত ভাবনায় বেশ হিসেবি লোক। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়— এটা ও ভালোভাবে যাচাই করে দেখার বাসনা রাখে। ছোটবেলা থেকেই ও এমন স্বভাব পেয়েছে। কার কাছে থেকে? মা না বাবা? নিয়ামত রসুল তা ভাবতে পারে না। কখনো মনে হয় দু'জনের কাছ থেকেই, কখনো মনে হয় ও নিজের ভেতর থেকে এই প্রেরণা গড়ে তুলেছে। এটাকে স্বশিক্ষাও বলা যেতে পারে।

নিয়ামত রসুল বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান। বড় বোনের চোদ্দ বছরের ছোট। বাবা-মায়ের মাঝে বেশ কয়েকটি বাচ্চা হয়েছিলো, বাঁচেনি। ও বড় হওয়ার আগেই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। প্রায় পিতৃতুল্য দুলাভাইয়ের প্রস্তাবটিতো ওর কাছে আদেশের মতোই ছিলো প্রায়।

বোগাস, এসব ভাবার কোনো মানেই হয় না। ও খুব একা একা বড় হয়েছে এটাই এখন মূল কথা। কথাটা হলো ওর একাকিত্ব। একা একা আপন মনে বড় হওয়া এজন্যই কি আফরোজার সঙ্গ মাঝে মাঝে ভালো লাগে না?

— কি হলো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? চা খাবে না? আজ তোমার জন্য একগাদা নাস্তা বানিয়েছি।

— একগাদা?

— তাতো করবোই। শোন, আমি কিন্তু অল্প টাকায় সংসার চালাতে পারবো না। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়।

আফরোজার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও সোজা বেডরুমে যায়। জামা গায়ে দেয়। চুল আঁচড়ায়। ডাইনিং টেবিলে এসে দাঁড়িয়ে বলে, দু'জনের জন্য এত খাবার! আমি তো শুধু চা খাবো।

— তো, এত কিছু কার জন্য বানিয়েছি?

আফরোজার কণ্ঠে ক্রোধ।

— নিয়ে খাও। আমি দিতে পারবো না।

আফরোজা চেয়ারের ওপর পা উঠিয়ে হাঁটুতে মুখ গোঁজে। নিয়ামত রসুল পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলে, আমার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু আমি পছন্দ করি না।

আফরোজা ফোঁস করে উঠে চায়ের পটটা এক ধাক্কায় টেবিল থেকে ফেলে দেয়। সেটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে মেঝেতে গড়ায় চায়ের লিকার। নিয়ামত রসুলের বুকের ভেতরটা কেমন জানি করে। ও চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় আসে। কপালে ঘাম জমে। এ ধরনের আচরণের সঙ্গে ও অভ্যস্ত নয়। ও বুঝতে পারে একটু পরে ওর শরীর থেকে কটুগন্ধ বের হবে। ও চা খেতে পারে না। চায়ের কাপটা বারান্দার কোণায় রেখে দিয়ে ও বাইরে চলে আসে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে। বেশ স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। নিয়ামত রসুল প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এখন আর ও ঘামছে না। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বলে আফরোজা দেখতে পায়নি। আফরোজা কি ওকে খুঁজছে? ও কি ওকে খোঁজার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে? নিয়ামত রসুল ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকাতে পারে না। দেখতে পায় শরীফ আসছে। ও পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। অনেকদিনের পরিচয়। ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। শরীফ এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখলে ও চমকে ওঠে। মনে হয় যেন, আফরোজা ওর ঘাড় খামচে ধরে বলছে, পালাচ্ছো কোথায়?

শরীফ অবাক হয়ে বলে, কি রে কি হয়েছে? তোকে ঠিক এ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসরের মতো দেখাচ্ছে। চুপ করে আছিস যে? কি হয়েছে। কিছু একটা তো ভাবছিস। ভাবনাটা কি?

— ভাবনা?

নিয়ামত রসুল শরীফের মুখের দিকে তাকায়। দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে। শরীফের চোখের মণিটা মনে হয় সবুজ। ভুরু জোড়া কালো নয়।

— কি দেখছিস।

— তুই কি আজ নিজেকে দেখেছিস শরীফ?

— না, দেখা হয়নি।

— দেখলে বুঝতি তুই আর আগের শরীফ নেই।

— বোগাস। পুরনো কথা বলছিস। এসব বনে বিদ্যা ফলানো যাবে না। কি হয়েছে বল?

— তুই জিজ্ঞেস কর আমি কি আজ নিজেকে দেখেছি?

— আমার বোঝা হয়ে গেছে, দেখেছিস এবং বুঝতে পেরেছিস্ যে তুই আর আগের নিয়ামত নেই।

— এখন কি করবো?

— কি আর করবি? বাড়ি যা আর বউয়ের পা ধরে মাপ চেয়ে নে।

— কেন? মাপ চাইবো কেন?

— ভুলটা তো তোরই।

কথাটা তো তোরই।

কথাটা বলে শরীফ ওর পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলে যায়। নিয়ামত রসুল রাস্তার পাশের রেনট্রি গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশ্চর্য, ও ভেবেছিলো আফরোজার কথাটা ওকে কি বলা যায়, নাকি বলা উচিত হবে? সেই বিষয়টি শরীফ জানে। কেমন করে? কেমন করে ওর চারপাশের মানুষের এমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে? ওর নেই কেন? নিয়ামত দু'হাত বুকের ওপর রেখে উত্তেজনা দমন করে চায়। পারে না। ওর হাঁটু কাঁপে। ও প্রাণপণে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজেকে সিঁটিয়ে রাখে। দেখতে পায় আফরোজা আসছে। আফরোজা একদম ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। নিয়ামত রসুল দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে পারে না, সেটা আফরোজার চোখের ওপরই রাখতে হয়। আফরোজা গড়গড় করে কথা বলতে থাকে, কি ব্যাপার এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? আমি তোমাকে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। শেষে না পেয়ে ভাবলাম তুমি বোধহয় বাইরে গেছো। কখন বেরুলে বাড়ি থেকে? দেখলাম চা'ও খাওনি কাপটা বারান্দায় পড়ে আছে শরীর খারাপ লাগছে।

— হ্যাঁ।

— কই বলনি তো আমাকে? কি হয়েছে?

— ঘামছি।

— ঘামছো? ঘামলে আবার শরীর খারাপ লাগে নাকি? জানতাম না তো? কখনো শুনিওনি।

— তুমি তো কটু গন্ধ পাও।

— দূর এটা একটা কথা হলো, চলো বাড়ি চলো। তোমাকে আমি দামি পারফিউম দেবো। কোনো গন্ধ থাকবে না। পারফিউম দারুণ জিনিস। ব্যবহার করা শিখতে হয়। আমি তোমাকে এসব শেখাতে চাই। কত যত্ন করে তোমার জন্য খাবার বানিয়েছি, কিছুই খেলে না।

— আমার খিদে নেই।

— সেজন্য হাঁটতে বেরিয়েছো, তা বলবে তো? ঠিক আছে, চলো বাড়ি চলো।

— আমি কিছুক্ষণ হাঁটতে চাই।

— চলো, আমিও তোমার সঙ্গে হাঁটবো। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো।

— না, আমি একা হাঁটতে চাই।

— একা হাঁটতে চাও? আমার সঙ্গ তোমার খারাপ লাগছে?

নিয়ামত রসুল হাঁটতে শুরু করে। মনে হয় এতক্ষণ গাছের গুঁড়ির যে সাপোর্টটা ওর দরকার ছিলো এখন আর সেটা দরকার নেই। ও নিজেকে মুক্ত করতে চায়। আফরোজা দু'কদম ওর সঙ্গে হেঁটে বলে, আচ্ছা, ঠিক আছে আমি বাড়ি ফিরছি। এই পলিউশনের মধ্যে আমার হাঁটতে ভালো লাগছে না। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আব শোন, আমি কিন্তু আর বেশিদিন এই বাড়িতে থাকবো না। একটা ভালো এলাকায় বড় বাড়ি তুমি ভাড়া করবে। এমন ছোট জায়গা, ছোট বাড়িতে থাকলে মন ক্ষুদ্র হয়ে থাকবে। সামনে বাচ্চাকাচ্চা হবে। ওদের আমি বড় পরিবেশে আরাম-আয়েসে বড় করতে চাই।

এসব শুনতে শুনতে নিয়ামত রসুল পায়ের গতি বাড়িয়ে দেয়। পেছনে তাকায় না। জানতে চায় না আফরোজা ফিরে যাচ্ছে, নাকি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে? ও পলিউশন ভরা বাতাস টেনে অনুভব করে ওর ভেতরটা বেশ ফ্রেশ লাগছে। কোথাও কোনো দুর্নীতির বোধ নেই।

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পরেও দেখতে পায় আগের দিনের মতো টেবিলে একগাদা খাবার। ও সেদিকে এক পলক তাকিয়ে বেডরুমে ঢোকে। আফরোজা ঘরেই ছিলো। ওকে দেখে ড্রেসিং টেবিলের ওপর হতে নতুন কেনা পারফিউমটা তুলে নিয়ে বলে, তোমার জন্য কিনেছি। সকালে দিলু-মিলু এলো। ওরা কেনাকাটা করতে গুলশান যাবে, তাই আমাকে নিতে এসেছিলো। আমি গেলাম। মিলুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে পারফিউমটা কিনেছি। চার হাজার টাকা নিয়েছে। আর একটু ভালো কেনার ইচ্ছে ছিলো। টাকার জন্য পারলাম না। দেখো তো তোমার পছন্দ হয়েছে কি না?

— আমি এসব চিনি না।

— দেখোই না, দেখতে দেখতে চিনবে।

নিয়ামত রসুল আফরোজার চকচকে মুখের দিকে তাকায়। আশ্চর্য, কোনো কিছু ওকে আহত করে না। ও ক্রমাগত জালটা ফেলেই যাচ্ছে, তারপর একসময় ওকে টেনে তুলবে। ওর কৌশল নিয়ামত রসুলকে মুগ্ধ করে।

— কি হলো, তাকিয়ে আছ যে?

ইয়ে, মানে একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করছে।

— কি?

— তোমার পূর্বপুরুষের কেউ কি জাল ফেলে মাছ ধরতো?

— মানে? আঁতকে ওঠে আফরোজা।

— মানে খুব সোজা। তেমন কেউ কি ছিলো যে নিপুণ জেলে, যার জালে ভরে উঠতো অজস্র রূপালি মাছ।

— এসব কি বলছো তুমি?

— হ্যাঁ, এটাও একটা দারুণ দক্ষতার কাজ, সবাই পারে না। কিভাবে জাল ফেলতে হবে বোঝে না। তুমি ভীষণ ভালো বোঝো আফরোজা।

— তুমি আমাকে অপমান করছো। বিয়ের পর থেকেই দেখছি আমার জন্য তোমার কোনো ভালোবাসা নেই। নিশ্চয়ই তোমার প্রেম ছিলো, তুমি সে প্রেমে ব্যর্থ হয়েছো বলেই আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছো।

— প্রেম? হো-হো করে হাসে নিয়ামত রসুল।

— হাসবে না, হাসবে না বলছি। বলতে বলতে আফরোজা পারফিউমের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলে, এরপর তোমার কাছে একটা দামি শাড়ি চাইলে বলবে, আমার পূর্বপুরুষের কেউ তাঁতি ছিলো কি না।

— না, সেটা বলবো না।

— বলবে না?

— হ্যাঁ, বলবো না। কারণ তাঁতিরা শাড়ি বানায়, কিন্তু পরে না। ওদের কৌশলের দরকার হয় না।

বলতে বলতে নিয়ামত রসুল বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। দরজা বন্ধ করার আগে শুনতে পায় আফরোজা কাঁদছে। ঘাম-জলের মাখামাখির মতো ও কি বেঁচে থাকার অন্য কোনো মাখামাখি বের করবে? না কি এভাবেই—। আফরোজা কৌশল জানে, ও ঝগড়া করে না। অনবরত নিজের ইচ্ছেগুলোর কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু কতদিন বলবে? পরবর্তী কি দাঁড়াবে? ও সাওয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবনা এগোয় না।

বাথরুম থেকে বের হলে দেখতে পায় আফরোজা চোখের জল মুছে ফেলেছে। টেবিলে বসে পাপড় ভাজা খাচ্ছে। ওকে দেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, চা খাবে?

— আসছি।

নিয়ামত রসুল চুল আঁচড়ে, জামা গায়ে দিয়ে টেবিলে আসে। একটা টুকরো পাঁপড় তুলে নেয়। আফরোজা নিজের প্লেটে কাবাব নিয়েছে। ও হয়তো একটি একটি করে সব খাবে। নিয়ামত রসুল পাঁপড় খেয়ে চায়ের কাপটা টেনে নেয়। আফরোজা মুখ নিচু করে বলে, বিয়ের ছয় মাস হয়ে গেলো, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা দাঁড়ালো না।

— কারণ, শুরুতেই তুমি সম্পর্কের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকিয়েছো। বলো না উপরি পাওনার জন্য তুমি আমাকে পছন্দ করেছো? আমাকে নয়।

— তোমাকে নিয়েই ওটা আমার বাস্তব কথা। যা তুমি করতে পারো, তা করবে না কেন?

— সেটা ভালো না মন্দ তা বিচার করতে হবে না?

— আমি তো বিচার করেছি। সেটা অবশ্যই ভালো। ভালোভাবে বাঁচতে হলে টাকার দরকার। আমি তোমাকে নিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে চাই।

— জানতে চাওনি আমার আয় আছে কি না?

— ভালো জীবনের জন্য সবার আয় থাকে।

— তুমি যেটাকে ভালো বলছো, সেটাকে আমি ভালো বলতে পারছি না। সেটা দুর্নীতি।

নিয়ামত রসুল টেবিলের ওপর ঠক্ করে কাপটা রেখে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। আফরোজা কিছু বলে না। কাবাব শেষ করে গাজরের হালুয়া প্লেটে নিয়েছে। নিয়ামত রসুল ড্রইংরুমে বসে সকালে পড়া কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে। শুনতে পায় আফরোজা কাজের মেয়েটার সঙ্গে চিৎকার করছে। নিয়ামত রসুলের মনে হয় ও এখন নিজের ভেতরের ক্রোধ এবং যাবতীয় শব্দ ছুঁড়ে ফেলছে। ছুঁড়ে ফেলা ওর কৌশল। ওভাবে প্রতিপক্ষকে দমন করা যায় না। নিয়ামত রসুল নিজের মনে হাসে। হাসতে হাসতে ছাদের দিকে তাকায়। আশ্চর্য, দুটো টিকটিকি ওখানে সঙ্গমরত। নিয়ামত রসুল দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। আবার তাকায়। একই দৃশ্য আর নেই। ওদের জায়গা বদল হয়েছে, নিজেদের অবস্থান বদল হয়েছে। ওরা আগের জায়গা থেকে পূব দিকে সরে গেছে। ওরা অন্য ভঙ্গিতে যৌনসুখ উপভোগ করছে। দৃশ্যটি দেখতে ওর ভালো লাগছে এবং ও কাগজের আড়ালে মুখ রেখে দৃশ্যটি দেখে পুলকিত হতে থাকে। হঠাৎ ওর মনে হয় আজ রাতে কি মাদি টিকটিকিটির পেটে ডিম হবে। তারপর বাচ্চা। না, ও দু'হাতে কাগজটা খামচে ধরে। মাথাটা হেলিয়ে দেয় সোফার পিঠে। বিড়বিড় করে বলে, না কোনো বাচ্চা নয়।

রাতে আফরোজা ঠাণ্ডা স্বরে বলে, এতদিন তুমি আমাকে পিল খেতে বলেছ, আমি খেয়েছি। এখন আর খাবো না। আমি বাচ্চা চাই।

— না।

— কেন?

— আমার মনে হচ্ছে, তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে দুর্নীতি আছে।

— মানে? কি বলতে চাও?

— কারণ আমাদের সম্পর্ক শুধুই ভালোবাসাহীন প্রয়োজন। এই সম্পর্কের ভেতরে একটি শিশুকে আনার কোনো মানেই হয় না।

নিয়ামত রসুল আফরোজার উত্তরের অপেক্ষা করে। কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। ও পাশ ফিরে শোয়। অন্ধকারে আফরোজার মুখ দেখা যায় না। দেখতে পেলে ও কিছু একটা ভেবে নিতে পারতো। এখন সে সুযোগ নেই। ও দু'চোখ বোজার আগে ভাবে, এভাবে কতদূর যেতে পারবো আমরা? কে নতি স্বীকার করবে? আফরোজা না আমি? পরমুহূর্তে আপন মনে হেসে নিজেকে বলে, আমি তো নয়ই।

কেয়ামতের পদধ্বনি

হেদায়েতুল্লাহ

গুম গুম শব্দে কান পাতা দায়। কান যদিও বা পাতা যায়; ঘরের ভিত— বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে জাফর মিস্তিরির। জাফর মিস্তিরির দাদা পাঁচু মোড়ল বলতো— বুঝলি জাফর! কেয়ামতের আগে খাড়া দজ্জাল এরকম দুমদাম পা ফেলে এসে— দুনিয়া তছনছ করবে। জাফর দাওয়ায় বসে মাটিতে কান পাতে। তাহলে কী কেয়ামতের দেরী নেই? তার বড় ছেলে আবদুল মোটর বাইকে স্টার্ট দিচ্ছিল। তাকে দেখে জাফর জিজ্ঞেস করে— হ্যাঁরে খোকা! সেদিন কী এসে গেল?

ছেলে বিরক্ত হয়। কীসের কী দিন? বুড়োটা রাতদিন শুধু বকর বকর করে। সবটা মাথামুন্ডু বোঝা যায় না।

— ওই যে— দুমদুম্ শব্দ? পায়ের তলায় মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠচে?

— ওঃ। ওতো পাইলিং হচ্ছে। এখানে সব বড় বড় বিল্ডিং হবে। হাউজিং হবে। কমপ্লেক্স হবে। কোলকাতা শহরটা এদিকে লম্বায় বেড়ে আসবে।

— তাই নাকি? ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না তার। সে সন্দেহের চোখে ছেলের দিকে তাকায়। আজকাল সে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। তার যেন মনে হয় কারা তার চারপাশে ষড়যন্ত্র করছে। তাকে যেন এই ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করছে। সত্তরেব কাছাকাছি বয়েস জাফর অনেক কিছু দেখেছে। অথচ মনে হয় এই তো সেদিন। এই তো সে জীবনটা শুরু কবেছিল; আর এর মধ্যেই সে জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে? এ যেন এক খোদার খেলা! কী আশ্চর্য! সময়টা কেন হাতের ফাঁকতালে বেরিয়ে গেছে। তাকে আর ফেরানো যাবে না। সে আর ফেরেনা।

জাফর একটা বিড়ি ধরায়। আজকাল বিড়িতে টান দিলে কাশি আসে। খুক খুক করে সে। পাড়ার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বদরুলের ওষুধ খাচ্ছে সে। বদরুল ডাক্তাব গম্ভীর গলায় বলে— জাফর চাচা! এসব হচ্ছে বাতাসের দোষ এসব কাশি সারে না। বাতাসের কত বিষ ঘুরে বেড়াচ্ছে জানো? জাফর মাথা নাড়ে। সে এ সময়ের অনেক কিছু জানে না। বুঝতে পারে না। যেন এই জামানার সঙ্গে তার ফারাক ঘটে গেছে অনেকখানি। বৌ-ঝিয়েরা এখন সেজেগুজে সিনেমায় যায়। বাজার ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। অথচ তার বৌ সাকিনা বিবি একহাত ঘোমটা টেনে বাপের বাড়ি মজলিশপুর ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চাইতো না।

মেঘে মেঘে তার বেলা অনেক হয়েছে। অথচ মনে হয়, এইতো সেদিন! গভীর রাতে নাগের বাজার থেকে একদল লোক এলো। তারা এই পাড়ায় এসে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। চারিদিকে তখন দাউ দাউ আগুন। তারা সবাই এই পাড়ার পেছনে বাদা জঙ্গলে গিয়ে

লুকোয়। জাফরের মা রাঙ্গা বিবি ছিল প্যারালিসিসের রুগী। জাফর তাকে কাঁধে তুলতেই, সে জড়ানো গলায় বলে— বাপ! তুই পেলিয়ে যা। আমার জন্য ভাবিসনিকো।

খোদা যদি কপালে মরণ রাখে তো মরবো!

— না, মা, তা হয় না। ডুকরে কেঁদে ওঠে জাফর।

না— খোকা— তুই পালা! এমনি তো রোগে ভুগচি! মরণ হয় হবে।

চারদিকে তখন আগুন আর বাঁচাও! বাঁচাও! আর্তনাদ।

আগুনের হলকা যেন গায়ের উপর এসে পড়ছে। জাফর তার তিন বোনকে নিয়ে চলে গিয়েছিল— কেউটে সাপ ভর্তি বাদায়। জাফর নিজের মনে মুচকি হাসে। সত্যি! খোদার কী লীলাখেলা! সাপের ভয়ে মানুষ যেখানে দিনের বেলায় যায় না; সেই বাদাবনে মানুষের ভয়ে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তাহলে মানুষই কী খাড়া দজ্জাল?

ওরা ঘর-বাড়ি সব লুট করে। পাড়ার মধ্যে কাউকে না পেলে হিংস্র হয়ে ওঠে। শেষে জাফরের মাকে পেলে— পিঠমোড়া করে বেঁধে আগুনে ছুঁড়ে দেয়। তখন সবাই ঠিক করেছিল, এদেশ ছাড়তে হবে। কেউ কেউ বলেও গেল। কিন্তু তখনকার বিরোধী পার্টির নেতা গোবর্ধনবাবু এক শান্তি মিটিং করেছিলেন। তাঁর দলের ছেলেরা রাতের বেলা এই পাড়া ঘিরে পাহারা দিত। একসময় সব আগুন নিভে গেল। জাফরের বাপজান বললো— না। না। এ ভিটে মাটি ছেড়ে কোথায় যাবো?

সেখানে চলবেই বা কী করে? এই তো বেশ আছি।

এই বাদার পাশে ছিল। এখানে মাছ ধরে সংসারতো ভালই চলে যাবে! বিদেশ-বিঁভুয়ে গিয়ে মান-এজ্জোত খোয়াবো নাকি?

আববাজি— গা ধুয়ে বেলা হয়ে গেল। বড়ছেলের বৌ মনিরা বেগম এসে তাড়া দেয়। দুই ছেলের কাছে মাসকাবারি থাকে সে। এখন সে বড়ো ছেলের দিকে। তাই বড় বৌ এসে তাড়া দিচ্ছে। সে তার ছেলে রিন্টুকে স্কুল থেকে আনতে যাবে। তার আবার মর্নিং স্কুল তো! সত্যিই বেলা হয়েছে। তার বাড়ির উঠোন ঝলমল করছে। উঠোনের পেয়ারা গাছে একটা পাখি ডাকছে। লাউগাছটা টালির চালকে সবুজ চাদরে মুড়ে দিয়েছে। তাতে মাঝে মাঝে নকশার মতো ফুল। তার ওপর রঙিন প্রজাপতি। দশ কাঠার এই ভিটে বাড়িটুকু পড়ে আছে। পিচার বাগানের মঠে আরো কিছু জমি ছিল। দুই মেয়ে— ফতেমা আর শাকিলাকে-বিয়ে দিতে হাতছাড়া করতে হলো। এখন আর সেখানে আর বাগান নেই। ছোট বড় নানান ডিজাইনের বাড়ি উঠছে। ভি. আই. পি. রোডের গায়ে এখনও শহরের চেহারা পুরোপুরি নেয়নি। এই সেদিন পর্যন্ত এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল। এখন অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। তবে তার আদল এখনও ঠিক গড়ে ওঠেনি।

আবার গুম গুম শব্দ। আবার থমকে যায়। জাফর। তার বাড়ির পাশে ছিল ধান খেত আর আগাছার জঙ্গল। কোথাকার কোন কোম্পানি এসে খোঁড়াখুড়ি শুরু করেছে। তারা সব

আকাশ ছোঁয়া বড় বড় মেশিন বসিয়েছে। এখানে নাকি বড় বড় বাড়ি হবে। আসলে এসব কথা জাফর বিশ্বাস করতে চায় না। সে জিজ্ঞেস করে— হ্যাঁরে। বড় বৌ! কীসের শব্দ রে?

— কেন? জানো না— তুমি? ওখানে মাড়োয়ারিরা হাউজিং করবে। কত লোক আসবে!

না। না। মিছে কথা! ওসব বড় বড় মেশিনগুলো— আসলে খাড়া দজ্জাল! এ দুনিয়াটাকে ধ্বংস করতে চায়। ওদের দয়া নেই। মায়া নেই। সবকিছু— গাছপালা, পাখ-পাখালি, স্মৃতি সত্ত্বা— যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। আসলে এই গুম গুম শব্দ হচ্ছে কেয়ামতের পদধ্বনি। কেয়ামত আসছে। এই দুনিয়াটা খাড়া দজ্জালের পায়ের নীচে ভেঙে গুড়িয়ে যাবে। সে ঠিকই টের পাচ্ছে।

বিলের ঘাটে গোসল করতে এসে সে অবাক হয়ে যায়। ঝিলের পানিতে অজস্র পরীর ডানা ভাসছে। পরীর ডানা? না। না। পরীর ডানা কোথায়? ওসব তো বড়ো প্লাসটিকের বোতল ভাসছে। আহা? ঝিলের ঘাটে পরী? সে তো অনেকদিন আগের কথা! যেন মনে হয় এই তো সেদিন— এই তো যেন গতকাল কিংবা বা পরসুর ঘটনা! তখনও ভি. আই. পি. রোড তৈরি হয় নি।

সন্ধ্যেবেলা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তারপর আকাশ পরিষ্কার। আকাশের মাথায় মাথায় গোল চাঁদ! কার হাতের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে যায় তার! তাকে তার বাপ ডাকছে।

— খোকা ওঠ! জোছনা রাতে ঝিলের পানিতে মাছের গাঁদি লেগেচে।

ধড়ফড় করে উঠে বলে জাফর। জোয়ান বয়স তার। দুজনে জাল আর থলে নিয়ে চলে যায় ঝিলে। মোকসেদ আলি অনেক দোয়া দরুদ জানে। সে বিড় বিড় করে কী পড়ে তারপর বলে—

— খোকা জাল ফেল?

জাল ভর্তি মাছ। দেখতে দেখতে দু'খানা থলে ভরে যায়। এমন সময় বকুল ফুলের সুবাস— কামিনা ফুলের সুবাস!

— বাপ! কীসে বাস কচ্চে?

— ও কিচু লয়! চুপচাপ মাছ ধর!

এমন সময়, জোছনার ভেতর দিয়ে ঝুম ঝুম নূপুর বাজিয়ে একদল পরী নেমে এলো। মোকসেদ দোয়া দরুদ পড়ে বলে— চল খোকা! বাড়ি চল! তেনারা নেমেচে!

জাফরের তখন ডাকাবুকো বয়েস। সে বলে— দাঁড়াও বাপজান! একটু নাচ দেকে লেই।

— না খোকা— খবরদার! তেনারা নাচ দেখাতে দেখাতে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন অজানা দেশে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে কেউ ফিরতি পারে না।

মোকসেদ আলি একরকম জোর জবরদস্তি করে জাফরকে বাড়ি নিয়ে এলো। তারপর

শেষ রাত্তির থেকে জাফরের ধুম জ্বর। সেই সঙ্গে ভুল বকতে লাগলো। আর ছুটে ছুটে ঝিলের দিকে যেতে চায়। জাফরের মা রাঙ্গাবিবি ডুকরে কেঁদে ওঠে। হায়! হায়! হায় রে! তার জোয়ান ছেলেটার এ কী হলো! শেষে জেন হাসিল করা সিদ্দিক মৌলভি এসে তিনদিন ধরে ঝড়ান কাড়ান করে। বাড়ি বন্ধ করে। রাঙ্গা বিবিকে অভয় দেয়। বেটি তোর কোন চিন্তা নেই। ওপরে আল্লা আছে। নীচে আমি! ওরাম কত জেন নারীকে নাকে নাকাল দিয়ে ঘোল খেইরোচি! আর এ ঝিলের পরী তো কোন ছার? সত্যি সত্যি তিনদিনের মধ্যে তার মাথা পরীরা সব নেমে যায়।

— হ্যাঁরে জাফর। কী ভাবছিস তুই? — জীবনলালের কথায় তার ঘোর কেটে যায়।

তারা দুজনে দমদমের অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিতে কাজ করতো হঠাৎ একদিন মালিক কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিল। সে তো অনেক অনেক দিন আগের কথা। বিশ-বাইশ বছর তো হবে। ওরা কারখানার গেটে ধারনা মেরে গেল। কিন্তু কারখানা আর খোলেনি। হতাশ হয়ে যে যার মতো পথ দেখালো। জাফর একটা ছোট পেরেক তৈরীর কারখানায় কাজ নিয়েছিল। আর জীবনলাল রিক্সা। জীবনলাল এখন টিবিতে ভুগছে একদলা লাল কফ ছুঁড়ে দিয়ে বলে— হ্যাঁ রে জাফর! আমার কথার উত্তর দিলি নে?

— কী আর উত্তর দোব বল তুই— জীবন? চারিদিকে তো শুধু কেয়ামতের পায়ের শব্দ।

— তুই কী যে বলিস— তার মাথা মুন্ডু বুঝি? তারপর গলা খাটো করে বলে— হ্যাঁরে! শুনছি—; আমাদের কোমপানি নাকি বিক্রি হয়ে যাবে?

— বিক্রি হয়ে যাবে? অবাক গলায় বলে জাফর— কবেই বিক্রি হয়ে গেছে।

— তা আমরা কোন টাকা পয়সা পাবো না— জাফর?

— এখনও তুই কারখানার স্বপ্ন দেখিস— জীবন? বলিহারি তুই? কিছু টাকা পেলে বুকের চিকিৎসাটা করাতে পারি।

এমন সময় হুটার বাজিয়ে পাশের ভি. আই. পি. রোড দিয়ে কোন মন্ত্রী বোধহয় চলে গেল। গোবর্ধনবাবু? হবেও বা। বার কয়েক এম. এল. এ. হয়ে এখন তিনি মন্ত্রী। পাড়ার মোড়ে কোন অনুষ্ঠান থাকলে, তিনি আসেন তাঁর দলের মিটিং থাকলেও তিনি আসেন। তবে আগের মতো আর প্রাণ নেই তাঁদের কোন কাজে। সবটাই যেন নিয়ম আর নিছক দায়সারা। তাঁর দলের ছেলেরা এখন প্রোমোটারি করে। কেউ কেউ বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লায়ের ব্যবসা। গোবর্ধনবাবু এখন জাফরদের চেনেন না। জাফররাও এখনকার গোবর্ধনবাবুকে চেনে না। জাফর শুনেছে, গোবর্ধনবাবুর মধ্যস্থতায় অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বিক্রি হয়েছে।

দুপুরে খেতে বসে অবাক হয় জাফর। এই আগুন বাজারে বাটি ভরা মাছের মাথা তার জন্যে? তার বড় ছেলে এখন রোজগারি মন্দ করে না এদিক সেদিক মস্তানির পর এখন সে তপোবন হাউজিং কমপ্লেক্সে মাটি সাপ্লাই দেয়। নীচু জমি ভরাট করে চারতলা

বিল্ডিং হবে। তার জন্যে চাই গাড়ি গাড়ি মাটি। তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে রাজারহাটে ওদিকে থেকে মাটি কেটে লরি ভর্তি করে সাপ্লাই দেয়। তবু ইদানীং যেন তার খাতির বেড়েছে। তার সন্দেহ হয়। এ কোন ষড়যন্ত্রের আভাস নয় তো?

তার ছোট ছেলে খালেক সাট্টার খাতা লেখে। কিন্তু তার কারবারে এখন মন্দা। পুলিশের ধর-পাকড় চলছে। সে এখন বাস-স্ট্যান্ডে চায়ের দোকান দিয়েছে। তবে তার 'ছ' ছেলের কোন বনিবনা ছিল না। কিন্তু ইদানীং তাদের ভাব-ভালোবাসা বেড়েছে। তারা দু'জনে বসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে। তাকে দেখলে তারা চুপ করে যায়। তার দিকে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকায়। জাফর পরিষ্কার বুঝতে পারে, ছেলেদের চোখের রঙ ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। কোন কিছুই তার নজরে এড়ায় না। তবে সে শান্তি চায়। খামোকা ছেলেদের ব্যাপারে সে নাক গলায় না।

কিন্তু সেদিন সকালবেলায় সে টের পায়। দাওয়ায় বসে সে চা-বিস্কুট খাচ্ছিল। এমন সময় তার দুই ছেলে কয়েকজন লোক নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। তারা টেপ দিয়ে ভিটেবাড়ি মাপামাপি করে। একজন লম্বা টাই পরা লোককে তার দুই ছেলে খুব খাতির করছে। তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আবদুল আর খালেক হেসে হেসে কথা বলছে। পরে জেনেছে, তিনি হচ্ছেন লাখোটিয়ার ম্যানেজার ব্যানার্জিবাবু। জাফর বিষন্ন গলায় জিজ্ঞেস করে— এরা কারা

— আবদুল? — খালেক?

— ওঃ! তুমি তো জানো না। এরা লাখোটিয়ার লোক।

— লাখোটিয়ার লোক? তা এখানে কেন?

— এই ভিটে-বাড়ি বিক্রি করে দোব। অনেক টাকা পাবো। খালেক বলে। সব কিছু ক্ষয়তে ক্ষয়তে এই ভিটেটুকুতে এসে ঠেকেছে। এটাও বিক্রি?

— না; খোকা তা হয় না। ভিটে বাড়ি কখনও বিক্রি হয়?

ওসব তুমি বুঝবে না। এই দশকাটা জমি বিক্রি করে আমরা অনেক টাকা পাবো। এভাবে কী ধুঁকে ধুঁকে বাঁচা যায়? টাকা না হলি এযুগে বাঁচা যায় না। দরকার হলি, আমরা সেই লাউহাটির দিকি চলে যাবো। যা এখানে পাবো, তাতে ওখানে জায়গাজমি কিনেও, আমরা ব্যবসা বানিজ্য করতি পারবো। — আবদুল হাসি হাসি মুখে বলে। জাফর আলি চুপ করে যায়।

রাত্রি হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে জাফর। সেই গুম গুম শব্দ আর নেই। বুকুল ফুলের সুবাস। হাসনুহেনা ফুলের সুবাস। জোছনায় যেন তার ঘর ভরে উঠেছে। এমন সময় জোছনার ভেতর দিয়ে কে যেন নেমে এলো? পরী? না। না। তার বৌ হাসিনা বিবি। সে তো বছর পাঁচেক হলো মারা গেছে। তবে? না। না। এই তো আমি এসেছি। একা একা আমার আর ভালো লাগছে না। হাসিনা বিবি বলে।

— কিন্তু আমি যাবো কি করে? আমার এখন তো সময় হয় নি?

— তাই?

— হ্যাঁ রে বৌ তাই।

— তাহলে আমি চলে যাই?

— নারে বৌ - আর দুদন্ড দাঁড়িয়ে যা— একটু কথা বলি।

হঠাৎ, কাদের ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে তার মাথার কাছে আব্দুল আর খালেক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে কয়েকটা কাগজ।

— বাপ! এটাকে সই করে দাও! কলম এগিয়ে দেয় আবদুল।

— কীসের কাগজ এটা— খোকা?

— ভিটে বাড়ি বিক্রি হবে— তার বায়না পত্তর।

— না- খোকা এ ভিটে-বাড়ি বিক্রি হবে না। অন্তত আমি বেঁচে থাকতে?

— কেন বাপজান? নরম গলায় বলে খালেক।

এখানে আমার বাপ তার বাপ - তার বাপের স্মৃতি। তোর মায়ের স্মৃতি - আমার মায়ের স্মৃতি—।

— ওসব নিয়ে কী হবে বাপ?

— তবুও! আমি আগে মরি। তারপর বিক্রি করিস।

— না! বাপ! তা হয় না। এরকম সুযোগ বার বার আসে না। লাখোটিয়ারা হটে গেলে, আর ভালো পার্টি পাওয়া যাবে না ওরা অন্তত ত্রিশ পয়ত্রিশ লাখ টাকা দেবে। — আবদুল আর খালেকের চোখগুলো ধারালো ছুরির মতো চকচক করে।

— না। না। বাঁচার জন্য এসব স্মৃতি উপড়ে ফেলা যায় না খোকারা? তাহলে কী তুমি দেবে না? গর্জন করে ওঠে খালেক।

— খোকা — তোরা ভেবে দেখ?

— না। না। এতে ভাবনার কী আছে— বাপজান? তুমি কি চাওনা তোমার ছেলেরা ভালো ভাবে সুখে শান্তিতে থাক?

— সে তো আমি সবসময় চাই। আল্লার কাছে সবসময় তোদের জন্য দোয়া চাই।

— শুধু দোয়া চাইলেই হবে? কিছু করে তো দেখাবে?

— কিন্তু খোকারা— এতো নিজেদের অস্তিত্বটাই বিক্রি করে দেওয়া?

— দেখ বাপ! এসব বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট নিয়ে দুনিয়া চলে না।

— দুনিয়া চলে টাকায়। টাকা যার— দুনিয়া তার!

জাফর আর তর্ক করে না। দুই ছেলে তার দু হাত এসে ধরে।

— বাপজান! আমাদের মুখের দিকে একটু তাকাও!

— ঠিক আচে! আমাকে একটু ভাবতে দে— তোরা!

কালকে সকালেই লাগবে এটা। ওরা রেডি হয়ে আসবে।

— ঠিক আচে! কাগজ আর কলমটা রেখে দে! আমি ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখি।

তার দুই ছেলে চলে যায়। তার আর ঘুম আসে না। সে একটা বিড়ি ধরায়।

রাত আরো গভীর হয়েছে। কাঁপা কাঁপা হাতে কলম তুলে নেয় জাফর আলি। কী হবে মায়া বাড়িয়ে? একসময় সব কিছু ত্যাগ করে তো চলে যেতে হয়। তার ছেলেরা সুখে থাকুক। শান্তিতে থাকুক। কাগজটা সই করে সে একটা আধলা ইঁট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখে। আর একটা দমের কষ্ট যেন শুরু হয় তার। ঘরের ভেতর তার নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। সে বাইরে বেরিয়ে আসে। মুক্ত বাতাসে কয়েকবার শ্বাস টেনে সে যেন একটু আরাম পায়। মাথার ওপর ফুটফুটে জোছনা। সেই আলোয় দেখে পাঁচিলের গায়ে সারি বাপ-দাদারা দাঁড়িয়ে। কী জাফর! আমাদের ভিটে-বাড়ি বিক্রি করে দিলি? নিজের ছেলেদের জন্য তুই এত স্বার্থপরের মতো কাজ করলি?

— না! না! তোমরা আর দোষ দিওনা! আমার ছেলেরা কী দুধে-ভাতে থাকবে না? তারাও কী তোমাদের বংশধর না?

আতর-লোবন-আর মাসি ঘাসপাতার গন্ধের সঙ্গে তার বাপ-দাদারা সব উধাও হয়ে যায়। তার ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। পাঁচিলের দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়ে। শেষবারের মতো সে ভিটে-বাড়ির দিকে তাকায়। কী হবে স্মৃতির টান বাড়িয়ে? সে তো সই করে দিয়েছে। এ ভিটে তো তার নয়। সেই মাড়োয়ারি লাখোটিয়ার। তারা এই লাউগাছ পেয়ারা গাছ সব উপড়ে ফেলবে। তার তিন ইঞ্চির দেয়াল আর টালির চাল সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। তা দিক। এসব তো এখন আর তার নয়। হঠাৎ রাত্রি ভেঙে আবার গুম গুম শব্দ। শব্দটা যেন আরো গাঢ় হয়ে এদিকে আসছে। খাড়া দজ্জাল এগিয়ে আসছে। সেই কেয়ামতের পায়ের শব্দ থেকে আরো দূরে সরে যেতে চায় সে। তাই রাত্রি ভেঙে হাঁটতে শুরু করে। ক্রমশ সে বকুল আর হাসনুহেনার গন্ধ পায়। আর জোছনা ভেঙে নূপুরের শব্দ।

টিভি

আবুল বাশার

দুঃখ কর অবধান
দুঃখ কর অবধান।
আমানী খাবার গর্ত
দ্যাখো বিদ্যমান।। (কবি-কঙ্কণ)।

আলাভোলা গাঁওয়ালী যুবক মাইনুলের পাগলি বউ আতসা খুব শখীন মেয়ে। ওর শখ হয়েছিল বারুই সদ্দারের উঠোনে টিভি দেখতে যাবে। সকাল থেকেই মন বহলাচ্ছে, যাব যাব যাব। বাসিমুখে উঠোন সাফ করছিল কুসুমবেলার প্রত্যুষে আর ঝাঁটা চালাতে চালাতে মন-ভাসানী গাওনা করছি, যাব রে যাব রে। কোমর দুলিয়ে সেই গাওনার সুরছন্দ ফুটিয়ে তুলছিল মনে মনে। লোকে বুঝতে পারেনি। মাইনুল বউয়ের মৃদুমন্দ গলার সুর কোমর-দুলুনি আর ঝাঁটার ঝাপতাল লক্ষ করেনি। টিভির জন্য বিবি যে কাতরাচ্ছে পোড়া চোখে তলব নেবার মতন মিহি চোখ চাষালোক কোথায় পাবে, তাছাড়া আলাভোলা ছোকরা যে ভারি উদাস।

সেই হয়েছে মরণ! মুখ ফুটে না বললে একটা অভিলাষ যদি বোঝে! দুপুরবেলা লাঙল ঠেলে বাড়ি ফিরেছে মরদ, বিবি ভিজেপান্তার গাঢ় আমানী সামনে ডাবর-সানকি ভর্তি করে এগিয়ে ধরে বললে— ঠাণ্ডা হও।

তৃষ্ণার্ত বলদের মতন সানকি চুষে সাফ। মনে হল ধরিত্রী শীতল হয়েছে। তখন আতসা মনের লুকনো ইচ্ছে পেশ করার জন্য স্বামীর গায়ে গা লাগিয়ে মৃদু ধাক্কা দেয়। এটা আতসার ঢঙ। স্বামী বোঝে, গায়ে কথা কয় যুবতী। বলে—ক'। অর্থাৎ কহ শুনি কী আব্দার। তেতেপুড়ে এসেছি, এখন রোখ খারাপ। তবু যখন গায়ে টোনা মারা হচ্ছে, শুনতেই হয়। বেচারি পাগলি তো। নইলে গুমোর হবে, ঠোঁট ফোলাবে, নেহাতই জালি স্বভাব।

বললে— আমি যাব। লিয়ে যাবা বুলো, সদ্দার বাড়ি?

— কেনে?

— টিবি এয়াছে। লোগে দল বেঁধ্যা ছুটছে হয় সাঁঝ। তামাসা নেগে যেয়েছে। দেখাবা মোকে?

— হয়।

— দেখাবা বুলো?

— হয় হয়। দেখবি বৈকি!

— আজ যাবা? সনঝেয়? সাথে লিবা বুলো?

— লিব।

ভারি আমোদে রসালো হয়ে ওঠে আতসার মুখের ডৌল, খুশিতে প্রসারিত হয়। আতসা বিকালে বাসতেল দিয়ে চুল বাঁধে। পায়ে আলতা আঁকে। কপালে টিপ বসায়। বিয়ের তোলা শাড়িখানা পিঁন্দে ফেলে। সামান্য চড়াতোলা চটিটাও, রাঙা চটি, পায়ে গলিয়ে নেয়। জামার তলে বুক-বাঁধুনী আংটা টান করে বাঁধে। মুখে হিমানি ছোঁয়ায়। পায়ে চাপামল মৃদু বাজনা দেয় পা-বাজি করার সময় পথে। ধুলো ঠেঙিয়ে আধক্রোশী রাস্তা ওরা পাড়ি দেয়। সেই মলের বাজনা এসে থামে রমিপুরের সদ্দারবাড়ির ভিতর-উঠোনে। তখন আকাশে প্রকাশ্য গোল চাঁদ ফিটকিরির মতন ফর্সা। সারা উঠোন থৈ থৈ করছে। চাষাগায়ের পরিশ্রান্ত মেটোগন্ধের সঙ্গে আতসার বাসতেল মিশে গিয়ে তাবত পালাঙ্গা (উঠোন) ম ম করে। গন্ধটা টিভির, না মানুষের জনগণ ঠিক করতে পারে না।

বারুই সদ্দার বড়লোক। খাটো সম্প্রদায় হলে কী হয়, টাকা সম্পত্তির গরমে তেনার নাক উঁচা। বারোমাস পাঁচবেলা ধুতিতে কোঁচা মেরে নাম্বারটেন সিগারেট টেনে ধুঁয়ো উড়িয়ে মজলিসে গিয়ে চেয়ারে বসে। দেশ-দেহাজের বিচার আচ্চা করে, চাষালোকের জরিমানা করায়। চোখের ভুরু রোমশ আর ঝুলো, চোখের দৃষ্টি তীব্র, কানের ডগায় লোম। দেখতে বেশ ভয়ংকর। বাজ-ডাকা গলার মিড়কী খর।

টিভি এসেছে জামাই যৌতুক দেবার জন্য। আগামী মাসে ছোট মেয়ের বিয়ে হবে। জনগণ ফকুটে তামাসা দেখার জন্য হেথায় জড়ো হচ্ছে সন্ধ্যা নাগাদ প্রতিদিন। টিভি জিনিসটা যে একটা বাক্স, তা কারো ধারণা ছিল না এবং সেটা যে ছোট বায়োস্কোপ তাই বা কে জানত। আতসা দু-চারদিন গঞ্জে গিয়ে টকি দেখেছে স্বামীর সঙ্গে। টিভি জিনিসটা কতকখানা সেই বাঁচার বাক্সবন্দী আসবাব। পয়সা থাকলে মানুষ কী না পারে। বাক্সর মধ্যে দুনিয়াজাহান আটক করতে দু'দণ্ড সময়। সুন্দর সুন্দর নারী-পুরুষ বাক্সর মধ্যে হাত-পা নেড়ে গান করছে, নাচছে। মেয়েটা কি খেমটা নাচ করছে? ঐ তো সদ্দারবাবুর হারেম-ঘর। আহা! ঐ তো জমি-জিরাত দেখা যায়, ধান ফলেছে মাঠে, চাষারা খাটছে।

চেয়ারে বসে বারুইসদ্দার সিগারেট টানছে আর বুক-ফোলাচ্ছে। মুখে একপ্রস্থ নাভি-উদ্গত হাসি লেগেই আছে, চোখের দৃষ্টি হাবাগোবা চাষার মুখ ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিক। দ্যাখ্ শালারা, কেমন একখানা বাক্স কিনেছি! দ্যাখ্ দুনিয়ায় কত কি হয়!

টিভিতে তখন শস্যক্ষেত্র হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গঞ্জের মাড়োয়ারিরা টিভিতে দেশের পাট ফলেছে কেমন, সেই শোভা দেখার জন্য টিভি কিনেছে। ঘরে বসে চাষ-আবাদ দেখা যায়।

আমাদের থাকলে আমরাও দেখতাম। আড়াই বিঘে জমির আড়াইখানা খতিয়ান। তা হোক। সেই শোভা দেখারও কি কম আহ্লাদ। কথাটা বললে স্বামী কী ভাববে, ভাববে পাগলি বউ। আর ইদিকে বড়নোকের পাগলামিডা কিনা সত্য, গরিবের সত্যতাই মিছা পাগলামি।

বাক্সের বেহেশ্‌ত দেখছে মানুষ। দোজখ দেখছে। কলকাতার রাস্তায় ভিখিরি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ বাক্সের মধ্যে খোদার আসমান শুদ্দো বন্দী হয়ে গিয়েছে।.....

সহসা বারুই সদ্দার চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে খচ করে বাক্সর কব্জা বন্ধ করে দিলে। মাইনুল দেখল কাঁচটা কেমন জল-পিছলানো রোদের মতন ঝিলমিল করতে করতে অন্ধকার আকাশের মতন নিভে গাঢ় নিথর হয়ে গেল। ঘরের পাবলিক চাপাগুঞ্জন করে উঠল। দু' সেকেন্ড পর সদ্দারের আঙুলের ইশারায় ঘরে বিদ্যুৎ এল। মনে হল, এটা যেন এক জাদু-বাড়ি। সদ্দার বলল— যা দোস্ত মহম্মদ ঘর যা। খেলা খতম।

সবুর মিঞা বলল— কেবল তো খেলা নেগে এস্যাছেল বাবু। বন্দ করলেন ক্যানে?

— চুরি চামারির ভয় দিবাকর।

— ক্যানে গো?

সদ্দার বলল— গতকাল টিভিতে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়েছে। পরশু আগুন লেগেছিল। দমকল এসে নেভালে। তরশু এক জমিদার বাড়িতে গোলবাড়ি ফাঁক করে দিয়েছে। চোরেরা। তাছাড়া মেয়েমানুষ পকেট মারছে দেখলাম। টিভি জিনিসটা বড্ড ভাল, সবকিছু আগাম আগাম সাবধান করে দেয়। তোদের কার মনে কী আছে, ভগবান জানে। এই দিগরে হাত লপকা মেয়ে-মানুষ গণ্ডা গণ্ডা। দু'দিন আগে সাবিত্রীর হেয়ার-নেট চুরি গেছে। আমি গন্ধ পাচ্ছি হাত-লপকা মেয়েগুলোর। আজ আর টিভি হবে না। তোরা চলে যা।

— কথাডা আপনার ঠিক হল না মোড়ল। টিভি দেখে দেশ শাসন করবেন না। টিভি একটা রঙের জিনিস। রঙের জিনিস বিশ্বাস করতে নাই।

কালো মাথাগুলোর মধ্যে কে যেন তরুণ গলায় মুরুব্বিপনা করে।

বারুই বলে— কে বললে নাই? রঙ লাগালেও চুরি জিনিসটা চুরিই। রঙ লেগেছে [illegible] কি প্রধানমন্ত্রী টিভিতে মুখ দেখিয়ে পর হয়ে গেল? তিনি তিনিই। এই যে আতসা মেখেছে বলেই কি আর আতসা নাই? ওর যা স্বভাব ও তাই করবে। চুরি না করলেও চামারি করবে ওর বর। দুজনা কেমন জোড়-বেঁধে এসেছে দ্যাখ্‌ না? তোদের কে [illegible] কে নয় কী করে বুঝব? রাগ করিস না মাইন, তোকে ঠাট্টা করলাম। কাল ফের [illegible] খে আসবি, তোকে আমেরিকার মেম দেখাব।

কথায় কথায় গুঞ্জন থেমে গেল। কালো মাথাগুলো উঠোনে ছড়িয়ে পড়ল। পরে বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ফিটকিরির চাঁদ তখনও আকাশে টইটই করছে। সেদিকে চেয়ে দেখে আতসার মন হু হু করে উঠল। গরিব বুলে এত সন্দ! এত খাটো করলে সদ্দারবাবু? আমার বর চোরচোট্টা?

ভাবতে ভাবতে আতসা বাড়ি এল। বেচারি আজ ছোট এক টুকরো ময়ুর ছাঁচ হেয়ার ক্লিপ ছাড়া কিছুই চুরি করেনি। যেমন ক'রে কলজেয় ধাক্কা দিয়ে সদ্দারবাবু তার বরকে চোট্টা বলেছে, সে কি সেইরকম ছুচকিগিরি করে কখনও? তা কখনই করে না আতসা।

খালি এক টুকরো ক্লিপ। ময়ূর ছাঁচ বলে মনে টানল, নইলে অমন জিনিসে আতসা 'পেসাব' (প্রস্রাব) করে। ছিঃ! ছিঃ! কী ঘেন্নার কথা!

এরপর আশ্চর্য দুটি ঘটনা ঘটে গেল সতীপুর গাঁয়ে। মুসলমান মাতব্বররা সদ্দারবাড়ি মেয়েলোকে টিভি দেখতে গিয়েছিল ব'লে ধর্মের জরিমানা করল প্রত্যেককে। তার নাম কাফরো। পাঁচ সিকে কাফরো দিতে হল আতসাকে টিভির দৌলতে। সেই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মাইনুল দেখল আতসার চুলে টিনের ময়ূর, তখন স্বামী বউকে বেধড়ক সিমলে পেটা করল পিঠে আর কবজির গাঁটে। মার খেয়ে আতসা ঝাঁঝ দুপুরে ফাল্গুনের ঠাণ্ডা মাটির মেঝেয় শুয়ে খালি গায়ে গড়াতে লাগল। বুকের পিঠের আঁচল আলগা করে সে হতে চাইল টিভির সিনেমা। উদ্ধত বুকে মাটির প্রলেপ লেগে আলুথালু বুনো চুলে তাকে দেখাচ্ছিল ক্রুদ্ধ করুণ কোন বিদেশিনীর ছায়াচিত্র। স্বামী আর সদ্দারবাড়ি মেম দেখতে যায়নি।

টিভি দেখতে যাওয়ার আগে বহলেছে, টিভি দেখে এসে বহলাচ্ছে, পরের সখের জিনিস চুরি করে নিলাজ মেয়ে এখন কুহর করছে। কাফারা দিয়েও সখ মরে না। এখন মেম হয়ে ডুকরোচ্ছে আপন খেয়ালে। টুকরো টুকরো চুরির স্বভাব কত যে মান ইজ্জতের সওয়াল, পাগলিটাকে বোঝানো গেল না। মেয়ের মায়ের ঐ ধারা চুরি চামারির দোষ ছিল। আসলে যে চোরের বংশ। চুরির সঙ্গে চোট্টামির যে সম্বন্ধ কত গহীন মা-মেয়ে তার প্রমাণ। চর্মকারপল্লীর গা-লাগা পাঠান ঘরের মেয়ে আতসা। সেইজন্য চুরির খায়েশে এত হুতোশ। ছোট ছোট চুরি করে কাকের মতন। কার গলার পুঁতি। কার মাথার টিনের টায়রা। কার ঘরের গন্ধ সাবান। কার নখ পালিশের ভাঙা শিশি। এইসব তুচ্ছ মামুলি অথচ নক্কার-করা চুরি। ঘরের মাটির খোপ-করা তাকে সাজিয়ে রাখে। মাটিতে দেয়াল পোঁতা আয়নার কাঁচটা মনোহর সদ্দারের বাড়ি থেকে হাতসাফাই করেছে। টিভিতে কি এমন চোরের সন্ধান আছে?

চড়া দুপুরে লাঙল ঠেলে এসে মাথার টিকরি গরম হয়েছে মাইনুলের। ঘরে আমানী নাই। বউ গিলে খেয়ে নেশা করেছে আর বজ্জাতি করছে মেঝেয় শুয়ে। আমানীটুকুনও রাখেনি বদ-মেয়ে। চোর। চুরি করে খেয়ে নিয়ে হাড়িখোর শ্যামলা কুকুরটার দোষ দিচ্ছে।

— কাঁজিখোর মাগী?

কাঁজি হল পান্তা মদ। এখানকার পাঠানরা কাঁজি পাঠান। রক্তে নেশা। সেই জন্যেই আমানী সাবড়ে বসে আছে। আসল পাঠানরা তো চুরি করে না। এরা যে কাঁজিখোর চর্মকারপল্লীর প্রতিবাসী, তাড়ির গন্ধে গা ম ম করে। সেই গন্ধ ঢাকবার জন্য বাসতেল মাখে। অন্যের ঘরে সিঁদ মারে। ছিঃ ছিঃ! এই মেয়েকে সিধে করার দোয়া দরুদ কোরানের পাতাতেও লেখেনি খোদা। ভাবতে ভাবতে মাইনুলের রাগ লঙ্কার হনুমানের জ্বলন্ত লেজের মতন ক্ষেপে গেল।

ঘরে ঢুকে মাটির খোপ তাক থেকে সব চোট্টামি করা প্রসাধনী উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আতসার উদ্ধত বুক মাটির প্রলেপে শীতল ছিল, সেই করুণ বক্ষস্থ মায়া-পূর্ণিমা

ম্লান হয়ে গেল স্বামীর প্রহারে। সেই দুপুরে বউকে ধর্ষণ করল মাইনুল। কারণ মাইনুলরা কাজী, কাঁজিখোর নয়। বিচার আচ্ছা টনটনে। সামান্য সদ্দার টিভির গরমে কাজীর সন্তানকে তিক করে।

তারপর গৃহ অভ্যন্তরে খড় চাল মাটিমাখা দেয়াল দেয়া ক্ষুদ্র গেরস্তির দাম্পত্য আদিম যৌন ঘৃণায় ফুঁসতে থাকল পরস্পর। দুজন দুজনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্ষুব্ধরোষে কাঁদতে লাগল। ওরা দুজনই যে সত্যিই ক্ষুধার্ত ছিল, বউটাও আমানী পায়নি, সে বার্তা স্বামীরও অজানা। কুকুরে সত্যিই খেয়ে ছিল খিদে নিবারক ভেতো মদ। ঘোলা ভাত জলের ছলনা।

সেই সময় পৃথিবীতে এক হাজার তীব্র কোকিল সমসুরে গীত করছিল কাছেরই বনে আবডালে। চমৎকার মাদক ফুলের গন্ধ ছিল বাতাসে। আদিম পৃথিবীর অসহায় প্রকৃতি-শাসিত আকাশ ছিল আকাশে। সেই আকাশ থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে নেমেছিল উড়ন্ত গোধুলির ছায়াপথ দিয়ে সতীপুর। আকাশে তারকার আলো ছিল পুরনো আকাশের মতন ধূসর। বারুইসদ্দারের টিভিতে তখন বোম্বাইয়ের তারকা ঝলমল করছে। উড়নি উড়িয়ে গান গাইছে 'আঁচল মে ক্যা জী.... বাদল মে ক্যাজী'....

অথচ পাগলি বউ লাঞ্ছিত হয়েও লজ্জা করেনি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লেংচে লেংচে পাশের বাড়ি থেকে চাল ধার করে এনে স্বামীকে রেঁদে খাইয়েছে। বলদকে ফেন ভুঁসি করেছে। দুহাতে পিষে একটা ডাঁশ মেরেছে। গোয়ালে মশা তাড়াবার ধুঁয়ো করেছে নাড়া জ্বেলে। আড়াই বিঘে জমির জমিদারির জন্য এত হেনস্তা, গা গতরে যাতনা। জ্বালা পোড়া। বলদের ডাঁশ মারা। আমানী পাহারা দেওয়া। উঠোনে ছড়িয়ে পড়া চুরি করা মালগুলি বেহায়ার মতন খুঁটে তোলা। স্বামীকে দেহ দিতে দিতে আতসা আব্দার করে— টিবি কিনতে পার না কাজীর পো, কত মুরোদ জুবানে রাখো, ধ্বকে রাখো না, যেতি সেই সাধ্যি থাকে, হরদিন পাঁচ সিকের জুরমানা দিই। কাফরা দিয়া কাফের হতে সাধ লয় মুনে, সদ্দারের মুখে নুড়ো দিতে ইচ্ছা যায়।

ইচ্ছা তো অনেক কিছুই যায়। বলদ জোড়া বেচে ফেলে বউয়ের জন্য একখানা সদ্দারের রঙিলা বাক্স কিনতেও সাধ জাগে, আর ঐ আড়াই বিঘা জমিনও সেই বাক্সর দামে বেচে ফেলে সারা দিনরাত বাক্সর সামনে বসে থেকে মরে যেতেও সাধ যায়। মানুষের সাধস্বপ্নের রকমই অদ্ভুত। মরে যেতে বাসনা জাগে।

মাইনুলের সব সাধ আর স্বপ্নের উপাদান আড়াই বিঘা জমিন ও একজোড়া বলদ আর একটি পাগলি বউ। যার নাকে নাকছাবির বদলে ফুটোতে বাবলার কাটা। কারো নাকছাবি তো চুরি করা যায় না। বউ বলেছে— বাবলা কাটায় নজ্জা করে।

কিন্তু নজ্জার মাথা খেয়েই সদ্দার বাড়ি যেতে হল আতসাকে। চৈতালি খন্দ ঝাড় পোছ করতে কুলোয় চালুনিতে গম সরষের ঝাড় পোছ। দিনমান কাম। চোখ মুখ চুল গা

গতরে গম সরষের গন্ধ। সন্ধ্যা অব্দি ঝকর ঝকর চালুনিতে ছন্দিত শব্দের বাহু আর হাতপাতার তাল মেলানো। বিনিময়ে পাঁচসেরি ছোট ধামায় গম পাওয়া যায়। নাকছাবির সঙ্গে পেট আতসাকে টেনে নিয়ে গেল। আড়াই বিঘার জমিনে নাকছাবির স্বপ্ন বেকুফ চাষা বোনে না কখনও, আলভোলা হলেও না।

মাইনুল আপত্তি করলেও আতসা শোনেনি। ভেবেছে হাত-রূপকার আবার সন্মান। সন্ধ্যার আগে যারা কামে এসেছিল সকলে সদ্দারের পুখুরে গোছল (চান) করে নিচ্ছিল। একখানা বাড়তি শাড়ি সঙ্গে এনেছিল। আতসা শাড়ি নেয়নি, তাই তার চান করা হল না। ধামার ভর্তি গম আঁচলে বেঁধে কোমরে নেয় সকলে, সাত আটজন মেয়ে। তার আগে সদ্দার ওর বৈঠকে ডেকে কোমর আর আঁচলের গেলো এবং সম্ভাব্য গোপন স্থান শরীরে, সন্দেহ হলে খুলে দেখতে চায়। লজ্জা করলে চলবে না। সাঁওতাল মেয়েগুলোরও দেখে নেয়, কোনকিছু চুরি কবল কিনা। কতক মেয়ে আচমকা টানে বুকের কাপড় নামিয়ে ফেলে সদ্দারকে দেখিয়ে দেয়, একফোঁটা লজ্জা করে না।

অমন ঝটকা মেরে বুক দেখানোর স্বভাব আতসার নেই। আগে জানলে আতসা একামে আসত না। ভারি নচ্ছার লোক। বৈঠকে দাঁড়িয়ে গা গতর পরীক্ষা দিতে হল আতসাকে। সদ্দার কোমরে হাত দিয়ে ডাক্তারের মতন হাত চালাচালি করল। তারপর বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে নারীর খালি বুকে নির্লজ্জের মতন চেয়ে দেখে হ্যা হ্যা করে হেসে ফেলে বলল— আঁচল খোল আতসা, বুকের কাপড় ওঠা। বুক দেখিয়ে ফাঁকি দিতে পারবি নে। বলেই সদ্দার নিজে হাতে আতসার আঁচলের গ্রন্থি মোচন করে দেখল শুধু শুধু গিঁট মারা ছিল, কিছুই নেই। মেয়ে মানুষের এমন রহস্য কেন সদ্দারের মাথায় এল না। আতসা খিল খিল করে হাসতে লাগল। বলল— তোমার চোখকে ফাঁকি দিতে না পেরে খালি খালিই গিঁট মেরোছি গো কত্তা। হাহাহাহা!

আজ খানিক আগাম আগাম ছুটি করেছিল সদ্দার। এই কাজে অন্য মেয়েরা এক সপ্তাহ ধরে রোজই আসছে। আজই প্রথম এসেছে আতসা। স্বামীর উপর বড়ই অভিমান হচ্ছিল তার নিমদ্দা লোক, বাবলার কাঁটার যাতনা বোঝে না। ভাবতে ভাবতে আতসার চোখ ছল ছল করে উঠল। বিদায়বেলা আতসার কানের কাছে মুখ নিচু করে নামিয়ে চাপা সুরে সদ্দার প্রস্তাব করল— মন করে পাগলি বউ তোরে ঐ বাক্সে পুরে রাখি। তুই আমাকে আঁচলে বেঁধে নে আতসা। তোর আতসে পুড়ে মরছি, আমি একটা পতঙ্গ রে কাঁজি-বউ, তুইফের আমানীর মতন ঠাণ্ডা। ঐ বাক্সের মধ্যে থাকবি, কত যত্ন করব। আয় না! আয়!

ভয়ানক চমকে উঠল আতসা। বুকের মধ্যে কে যেন সহসা আর্তনাদ করে উঠল। পালা বউ পালা, ছুটে পালিয়ে যা। তোর বাবলা কাঁটাই ভাল। তোর পাগলা বর যে কাঁদবে রে!

রাস্তার ধুলো উড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্য মেয়েদের মুখে চেয়ে দেখছিল আতসা,

এদের চোখেমুখে কোন অপমান নেই, কষ্ট নেই। এরা কেমন নিপাট সুখী। বুক দেখানোর পাপ অব্দি নেই।

দুপুরবেলা চড়া রোদের মধ্যে আমানীর ভয়ানক তেষ্টা পায় মাইনুলের। একি কাজী বউয়ের হাতে তৈরি কাঁজির নেশা! মাইনুল বাবলার ছায়ায় বলদ জোড়াকে লাঙল ঘাড়েই বিশ্রাম নিতে দেয়। একটা বিষণ্ণ ঘুঘু ডাকছে ঝিলমিলানো কাঁপন্ত রোদের ওপারে কোন বাবলার ডালে। সেদিকে চাইলে মন কেমন ধারা ধূ ধূ করে। বউ এখনও কেন আসে না, সে কথাও চিন্তা হয়। আমানী আনবে বউ। বুকে খিদে আর খাঁ খাঁ করা রোদের ভিতর দিয়ে বয়ে আসবে একখানা ঠাণ্ডা কুম। তাকে মাইনুল নাকছাবি দেয় না, টিভিও দেয় না। তার নাকে থাকে বাবলার কাঁটার রক্তাক্ত দুঃখ। তবু সে আমানী বয়ে আনে। মার খেয়েও কোথাও পালিয়ে যায় না।

মাইনুল নিমের ছায়ায় শুয়েছে। পাশেই কাশঝাড় ঘেরা কুমের জল আমানীর মতন সাদা। টিভি কাচে প্রথম আলো পড়ার মতন সাদা। টিবির সঙ্গে আমানীর আশ্চর্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করে মাইনুল। টিভির কব্জা বন্ধ করে দেওয়া সদ্দারের অপমান ও ঝিলমিল করে নিভে যাওয়া মুহূর্ত সে ভুলতে পারে না। শুয়ে শুয়ে হঠাৎ এক তাজ্জব তরল আলো ঝলকায় চোখের তারায়। কুমের জলে পিছলে আসছে। বেলা পড়ে আসছে। প্রকৃতিতে টিভি শুরু হয়ে গেছে। কখনও এমন করে ভাবেনি মাইনুল। বউ আসছে না কেন? বউ আসলে কখন থেকে আমানীর সানকি মাথায় দাঁড়িয়ে স্বামীর রোদে জল-ঝলস দেখছিল। মনে হচ্ছে সেই ঝলসটার সঙ্গে কী যেন খেলা করছে পাগলটা। স্বামীর সহসা চোখ পড়ে তার উপর। কেমন সুস্বাদু করে হাসে মাইনুল। চোখের ইশারায় কাছে ডাকে। আতসা স্বামীর পাশে গা-লাগা হয়ে নিবিড় করে বসে যায়, সানকি রাখে পাশে। আলাভোলা ছেলেটি তখন বউকে নিমের জড়ে শুইয়ে দিয়ে ক্যামেরাম্যান সাজে। কুমের অন্যপারে আসে। মনে হয় এই মাঠের মধ্যে আশ্চর্য একটা টিভি সেন্টার খুলে যাচ্ছে। সহসা সে পাগলের মতন চিৎকার করে ওঠে। 'বউ তুই টিভিরে বউ! ঐ দ্যাখ টিভির জোছনা, আলো, সব রঙ খেলছে রে!'

আতসা খিল খিল করে হেসে ওঠে। তখন সে নায়িকার মতন সুন্দর হয়। মনে হয় সে কোন রঙিন শুখা গম কাটা শস্যক্ষেত্রে শুয়ে আছে। একটা চটা চৌকনো আলো, কুমের আমানী আলো থেকে উঠে যাচ্ছে টিভির কাচের মতন সাদা, আতসার মুখে গিয়ে লাগছে। দেখতে দেখতে মাইনুলের মরে যেতে ইচ্ছে করে। সে মনে মনে বলে, আমি মরে যাই গো! তারপর বউয়ের কাছে আসে। পাশে শুয়ে যায়। কুমের আমানী আলো ওদের দুটি শরীরে খেলে বেড়ায়।

আতসা সহসা কেমন ব্যাকুল হয়ে স্বামীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, বুকে গভীর করে আঁকড়ে ধরে। বলে—হায় খুদা! সদ্দার যেনে এই আমাধের শুয়ে থাকা, আনন্দে মরে যাওয়া ছবিখানা ওর রঙিন বাক্সে আটক করতে না পারে খোদা গো!

স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কাঁদতে থাকে আতসা। তাদের সব অপমান প্রকৃতির কাছে জমা করতে থাকে তারা।

মাইনুলের মুখ দিয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ে—শালা টিভি! তুমার ইজ্জত কুথায় রাখি হে!

তারপর মাইনুলের চোখও ঈষৎ চিক্ চিক্ করে ভিজে ওঠে।

ভদ্রলোকের টিভিতে এই দৃশ্যের এখন আকাল চলছে। এ দৃশ্য নেই। সেকথা কইতেও নেই। তাই ওরা শুয়ে রইল চুপচাপ। ঘুঘু তখনও কাঁদছে একটানা।

পোকা

আবদুস শুকুর খান

সেগুন কাঠের ফ্রেমে আটকানো ঘন নীল বেলজিয়াম কাঁচের দরজা ঠেলে হোটেলের ভিতর ঢুকে মহিম দেখল, হলঘরে দু-চারজন কাস্টমার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে রয়েছে। চৌরঙ্গীর মত ব্যস্ততম এলাকায় বার-কাম রেস্টুরেন্ট। 'সানরাইজ', পঞ্চাশ বছরেরও বেশি ঐতিহ্য নিয়ে জৌলুসহীন অহংকারে চলেছে, বেশ রমরমিয়ে। চাইনিজ ও ইংলিশ ফুডের জন্য এই অঞ্চলে হোটেলটি বিখ্যাত। কম দামে, নিরিবিলি পরিবেশ, ঝুট ঝামেলাহীন বলে, পরিজন-পরিবার নিয়ে খাবার সুখ্যাতি আছে। ঠিক বেলা এগারটায় খোলে, বন্ধ হয রাত বারোটায়।

সাজানো গোছানো হল ঘর। গেটের পাশেই ক্যাশ-কাউন্টার, হলের শেষ প্রান্তে বার কাউন্টার। স্যেইলফে সাজানো দেশী-বিদেশী মদের বোতল। জনা-ত্রিশ ওয়েটার পরিচর্যায় ব্যস্ত। বারের পেছনে অফিস ঘর। কিচেন, অফিসের পেছনে। হলে সেগুন কাঠের টেবিল, সাদা কাপড়ে ঢাকা। প্রতি টেবিলে চারটে করে গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ার। মার্বেল পাথরের মেঝে। দেয়ালে শিল্পীর শৈল্পিক নিদর্শন, কোথাও যামিনী রায়, কোথাও প্রকাশ কর্মকার, কিংবা মকবুল ফিদা হুসেন। মাথার ওপর ঝাড়বাতি। লাল-নীল আলো একসঙ্গে জ্বললে মনে হয়— কোনও স্বর্গরাজ্যে এক আলোকময় উদ্যান। যৌবন-উচ্ছ্বাসে রূপম গরিমায় উৎফুল্ল। রাত যত বাড়ে— দেহ বল্লরীর সঙ্গে আলোগুলো উদ্দাম হয়। মাতাল, নেশাচ্ছন্ন মানুষগুলোর হৃদয় তোলপাড় করে, গুঞ্জন তোলে। নাচে-গানে যৌবনের প্রতিটি অনুভূতিকে অনুভবে, স্পন্দনে উপভোগ করে।

মহিম হলঘরে ঢুকে ক্যাশ কাউন্টারের সামনে বসা লোকটাকে আজও দেখল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর জুড়ে মৃদু ঝাঁকুনি। গত কয়েকদিন ধরে লোকটাকে এক কাপ চা কিংবা একটা কোল্ডড্রিংস নিয়ে বসে থাকতে দেখেছে। যেন গভীর কিছু চিন্তায় আচ্ছন্ন। মহিম ওসব পাত্তা দেয় না, এমন মানুষ পৃথিবীতে অনেক আছে। দুঃখ-পোড়া মানুষগুলোই মাতাল হতে আসে।

লোকটাকে ভালভাবে দেখল মহিম, সেই লোকটা না অন্য কেউ ঠিক বুঝতে পারল না। মনযোগ দিয়ে দেখার পর, স্থির হল— সে লোকটাকে পারচেইজ অফিসার মি. মৃন্ময় দাশের ঘরে দেখেছে। আজ লোকটাকে দেখেই কৌতূহলে তার দিকে চাইল আর আশ্চর্য, লোকটা বিদ্যুৎবেগে তার কাছে এসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আপনি মহিম সরকার?'

— হ্যাঁ, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো?

— আমি সঞ্জীব বোস, ইস্টকস্ট কোম্পানি থেকে এসেছি।

— কী দরকার?

— একবার দাশের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

— উনি ছুটিতে আছেন, দিন পনের পরে আসুন।

— উনি কবে আসবেন?

— তা তো বলতে পারব না। তবে দেরী হবে।

— খুবই সমস্যায় পড়া গেল,

— কেন? কী হয়েছে।

— আমাদের প্রায় তিন লক্ষ টাকার বিল বাকি পড়েছে, আজ ন-মাস হল কোনও পেমেন্ট পাচ্ছি না।

— আটকেছে কেন?

— জানি না, ওনার বাড়িতে ফোন করেছিলাম, উনি আপনার কথা বললেন।

— আমার কথা বলেছেন, আশ্চর্য।

— হ্যাঁ, আপনি নাকি এখন পারচেইজ দেখছেন, এবং আমাদের বিল আটকেছেন।

— আমি!

মহিম বিস্মিত। লোকটার চিবিয়ে কথা বলার মধ্যে রাগ রাগ ভাব। তার বাচন ভঙ্গী, চোখের ভাষা, একটা অশুভ সংকেত দেয়, মহিম নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে, মিথ্যে বলে যে কী লাভ পায়, ওই জানে।

মহিমকে বিড় বিড় করতে দেখে লোকটি বলে, কিছু বলছেন স্যার।

— না, আপনাকে নয়।

— আমার বিল....

— দু-চার দিন পরে আসুন দেখি কী অবস্থায় আছে, কতদূর কী করা যায়।

— দেখবেন স্যার, বিলটা পাশ করিয়ে দিন স্যার, আপনার পাওনা আপনি ঠিক পেয়ে যাবেন।

— মানে।

— না, আমার ঠিক অঙ্কটা জানা নেই। মৃন্ময়বাবুর সঙ্গে আমাদের সেল্‌সম্যানের কী কী কথা হয়েছে, তা জেনে আপনাকে ফোনে জানাব।

— তার দরকার নেই।

— অমন বলবেন না স্যার, কখন কার যে কাকে কী দরকার লাগে তা কি কেউ বলতে পারে? এই আমার দরকার বলে আমি ছুটে এসেছি, কাল আপনার দরকার হলে আপনি আমার কাছে যাবেন, এমন 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিশি না হলে কোনও ব্যবসা করা যায়? তাহলে আজ চলি স্যার, একদিন দেখা করে যাব।

— তাই আসবেন।

লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, ওঃ হ্যাঁ, আপনাদের নামে কয়েকটা গিফ্‌ট আছে, যাবার সময় নিয়ে যাবেন। কিংবা কোথায় দাঁড়াবেন বলুন, আমার লোক এসে দিয়ে যাবে।

— গিফ্‌ট, কিসের?

— আসলে ওটা মি. দাশের জন্য রাখা ছিল। উনি এখন আসছেন না, কে কোথায় নিয়ে চলে যাবে, তার চেয়ে আপনি নিয়ে যান।

— কী কী আছে।

— কয়েক ডজন কাঁচের গ্লাস। আইস বক্স ব্যাগ, ব্যাগেরা, আর তিনটে রয়েল স্টাগের বোতল। তা, আপনি কটায় আসবেন?

— আমি, সময় হবে না।

— টাইম দিলে আপনার জন্য ওয়েট করতে পারি।

— আমার সময় হবে না; আপনি বরং এখানেই পাঠিয়ে দেন। 'সানরাইজের নামে'।

— কিন্তু মৃন্ময়বাবু এর আগে তো ওখান থেকে সব নিয়ে যেতেন।

— আমি মৃন্ময়বাবু নই, আমি মহিম সরকার। ওঁর আর আমার মধ্যে কিছু আলাদা তো হবেই।

— বুঝেছি, স্যার বুঝেছি।

— ঠিক আছে, যান। পরে একদিন আসুন, বিলগুলো দেখে রাখব।

— ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ।

লোকটা চলে যেতে মহিমের বুকের ভেতর শীতল হয়ে আসে। সঙ্গে অস্বস্তি।

সে বুঝতে পারে না, আজকাল কেন এমন হচ্ছে তার। হোটেলে পা রাখলে কিছু চক্রান্তের গন্ধ নাকে আসে। ভেতরের গ্রন্থিগুলো কেমন দুর্বল হতে শুরু করে। চাপা ভয় তাকে গ্রাস করে। বুকের গভীরে কার যেন মৃদু স্বর, 'সাবধান, মহিম, খুব সাবধান। একটা জটিল আবর্ত তার সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। ভাবনার অশুভ সংকেত ঠিক যেন মিস্ সেফালির পল্লবিত দেহলতার মত কাঁপতে থাকে।

লোকটা চলে যাবার পরও মনে হয় লোকটি যায়নি। যেন বা একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব রেখে গেছে কোথাও। বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহিম। তারপর নিচুমুখে নিজের রুমের দিকে এগোয়। অফিস রুমের দরজায় হাত রেখে সে পেছন ফিরে দেখে, কয়েকশো হিংস্র পোকা যেন তার পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা তার হাতের বাজুতে। আতঙ্কগ্রস্থ মহিম ঘরে ঢুকে ফুল স্পিডে পাখা চালায়। বেয়ারা জল দিয়ে গেলে সে ঢক ঢক করে জল খায়। ঠাণ্ডা হতে চেয়েও ঠাণ্ডা হল না। আচ্ছন্ন চোখে দেখল, সেই হিংস্র, ডানা ওয়ালা পোকা উড়ে আসছে তার দিকে।

মহিমের পাশের রুমে টাইপিস্ট সুষমা বসে। উজ্জ্বল, কর্মদীপ্ত মহিমের প্রতি তার আলাদা

টান আছে। ভালোবাসে। মাঝখানে কাঁচের জানালা দিয়ে তাকে দেখা যায়। রোগা হলেও চেহারা ঝরঝরে, আকর্ষণীয়। মহিমও তাকে ভালোবাসে।

মহিমকে কুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে, আড়চোখে জিজ্ঞাসা করে, শরীর খারাপ নাকি?

— না।

— তাহলে, অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? রাস্তায় কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি? নাকি সুবর্ণার সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তাই মন খারাপ।

সুবর্ণা মহিমের প্রাক্তন প্রেমিকা। বেকার মহিমকে ল্যাং মেরে অন্যকে বিয়ে করেছে। সেই খোঁচা দিয়ে মাঝে মাঝে মহিমকে রাগায় সুষমা।

মহিম তার রসিকতায় কান না দিয়ে বলল, বাসের যা অবস্থা, জান কয়লা হয়ে যায়।

— তা যা বলেছ। ওঃ, তোমাকে ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়েছেন; একবার দেখা করে এসো, আর শোনো আজ তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিও। তোমাকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যাব। কিছু কেনাকাটা করে মেট্রোতে সিনেমায় যাব— 'দেবদাস'।

— আজ হবে না, অনেক কাজ বাকি। সেল্‌স ট্যাক্স না করলে কাল ঝাড় খেতে হবে।

— যতটা পার করো, বাকি কাল এসে করবে।

— দেখি, মা কেমন আছেন?

— তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন।

— যাব একদিন।

— একদিন না, আজই—

— আচ্ছা, কাজ কর। দেখা যাবে।

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে মহিম দেখল মি. চৌহান কারো সঙ্গে ফোনে হম্বি-তম্বী করছেন। তার গলার গমগম শব্দ সারা ঘরময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যেন একাই একশো জনের শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করছেন। ম্যানেজারেব এই রাসভারি স্বভাবের জন্য সবাই ওকে ভয় করে।

মহিম জানে, এখানকার স্টাফ ওকে ভয় পায় অন্য কারণে। মি. চৌহান কিংবা মি. দাশ একই সুতোয় বাঁধা, একই পাড়া থেকে এসেছে। একে অন্যের পরিপূরক। ওরা নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে মালিক পক্ষের কাছে প্রতিটি স্টাফ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে, নালিশ জানায়, যাতে মালিক পক্ষ অন্যান্য স্টাফের সম্পর্কে খারাপ ভাবনা ভাবে। একমাত্র ওদের কথা ছাড়া অন্যান্যদের কথার কোনও মূল্য না থাকে। খুবই পরিচ্ছন্ন চালাকির সঙ্গে কাজ না করেও বাহবা কুড়ানো। মহিমের এসব দেখতে দেখতে গা-সওয়া হয়ে গেছে। মহিম ওদের কাছে খুবই ঈর্ষার পাত্র।

মহিমকে দেখে মি. চৌহান তাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। সামনের চেয়ারে বসল সে।

মি. চৌহান ফোনে কারও সঙ্গে প্রায় পনের মিনিট কথা বলার পর ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার ফোন বাজল, রিসিভার তুলে, হ্যালো বলে ভারি গলার স্বর নামিয়ে নিচু স্বরে কথা বলতে থাকল। কান খাড়া করে শুনতে থাকল, সবই ব্যবসা সংক্রান্ত কথা। মাঝেমধ্যে লেনদেনের গন্ধ।

চৌহানের কথা শুনতে শুনতে বিকট একটা গন্ধ তাকে বিবশ করে তুলল সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য পোকার আক্রমণ, তীক্ষ্ণ কামড়। যন্ত্রণা দগ্ধ মানুষের মতন মহিম আর্তনাদ করতে গিয়ে নিজেকে সামলাল এবং অবাক হয়ে দেখল লাল-নীল পোকা তরতর করে উঠে আসছে হাতে। হাত থেকে বুকে। বুক থেকে পকেটের গহ্বরে। মহিম ঘোট পাকায়, সে নিজের চোখে দেখে মি. চৌহান কীভাবে পোকায় পরিণত হচ্ছে। যেমন প্রজাপতি প্রজাপতি থেকে শুয়োপোকার রূপ পায়। আতঙ্ক বিহ্বল মহিম 'থ' হয়ে বসে থাকে।

কথা শেষ করে চৌহান জড়সড় মহিমের দিকে ঘুরে মিহি কণ্ঠে বলল, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা প্রাইভেট আলোচনা আছে মি. সরকার।

— বলুন।

— সরাসরি বলব?

— মানে?

— দেখুন আপনি এখানে এসেছেন কিছুদিন হল, সব কিছু বুঝে ওঠার সুযোগ হয়তো হয়নি, তবুও সামান্য হলেও এখানের মানুষ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছেন।

— কিছু তো পেরেছি।

আপনি মালিকের খাস লোক। কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না, অথচ কথাগুলো না বললে নয়—

— নিজের ভেবে বলতে পারেন।

— নিজের ভাবি বলেই আপনার ভালোর জন্য আপনার সঙ্গে আলোচনা করা।

— হ্যাঁ, বলুন।

— বুঝতেই পারছেন, আমি নামে ম্যানেজার, কত মাইনে পাই, তা স্যালারির খাতা দেখে বুঝতে পারেন। অসহায় না হলে কেউ হোটেল লাইনে কাজ করতে আসে না। মা-বাবা, ভাই বোনের বিরাট সংসার, দায়িত্ব বিশাল....

— যা বলার স্পষ্ট করে বলুন।

— আপনি আর যাই করুন কারো পেটে লাথি মারবেন না।

— কি যা-তা বলছেন, আমি কারো কখনো ক্ষতি করিনি।

— সে-ভাবে করেননি, কিন্তু রোজগারে বাদ সাদছেন।

— মাইনে কম বলে চুরি করবেন?

— এটাকে চুরি বলছেন কেন? বুদ্ধি খাটিয়ে পয়সা কামানো। এই যে মানুষগুলো

বারে মদ খেতে আসছে, ফূর্তি করছে, মেয়েছেলের পেছনে টাকা ঢালছে, আপনি কী ভাবেন ওরা রোজগারের পয়সা ওড়াচ্ছে! মোটেই না। সব দু'নম্বরি, পয়সা রাখার জায়গা নেই। তাই খরচ করছে। তার থেকে দু-একটাকা এ-ধার ওধার করে নিলে এমন কিছু ক্ষতি নেই।

— শুনেছি; সবাই চুরি করে।

— শুনেছেন, চোখে দেখেননি, তাই নিয়ে অত জলঘোলা করার কি আছে?'

'আমি কিছুই করিনি, শুধু শুধু আমাকে দোষারোপ করছেন।

— দোষারোপ নয়, বাস্তব পরিস্থিতিটুকু জানুন। এই আপনার চোখের সামনে ঘটনা ঘটল। আপনার গোঁয়ার্তুমির জন্য একটা 'কেশ' খেলাম আমরা। যে অফিসার নুনের কেশ দিয়ে গেল, তার চাহিদা মত ঘুষ দিলে 'কেশ' হত না। এবার উকিল, কোর্ট, ছোটাছুটি নানান হ্যাপা পোহাও। দেখা যাবে, যা চেয়েছিল, তার চেয়ে দশগুণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আজকাল কোথাও ঘুস ছাড়া কিছু হয় না। স্কুল, কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে গেলেও পয়সা লাগে।

— এটা একধরনের অসুখ মি. চৌহান। গভীর অসুখ। প্রতি মানুষের রক্তে ছোঁয়াচে জীবাণুর মতো ছড়িয়ে গেছে। একজন একজনকে ঠকিয়ে নেবার প্রবণতা।

— সবই তো বোঝেন, তবে.....

— জানি না, কেন এসব সহ্য করতে পারি না।

— আপনার সত্যে আপনি থাকুন, তবে এটুকু বলি, যতটুকু জেনেছেন, এর বেশি জানার চেষ্টা করবেন না, করলে পরে পস্তাবেন।

— ভয় দেখাচ্ছেন?

— ভয় নয়, ভাল চাই বলে সাবধান করে দিচ্ছি। গরীবের ছেলে, শিক্ষিত, সাত বছর বেকার থাকার পর মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছেন। উপরে ওঠার লক্ষ রাখুন। দুটো পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করুন। তা না করে গোয়েন্দাগিরি করে কোনও ফল পাবেন না, এখানে কেউ আপনার মূল্য বুঝবে না। কেউ না, আমিও আমার আমিত্ব বিসর্জন দিয়েছি। আজ যাদের কথায় নাচছেন, তারাই আপনাকে শ্রীখণ্ডী করে পয়সা রোজগার করছে। ওরাই একদিন আপনাকে এমন নিচে নামাবে, বুঝতে পারবেন না। আপনার আগে আপনার জায়গায় দু-চার জন এসেছিল তারা কেউ দু-তিন মাসের বেশি টিকতে পারেনি। কিচেন সুপার ডি-সুজাকে আপনি চেনেন না, শালা এক নম্বরের হারামি, দু-চারটা খুন ওর কাছে জলভাত। ওর ভয়ে সারা হোটেল তটস্থ। আপনাকে এর বেশি বলার দরকার নেই। এখন ভাবুন আপনি নিজে কী করবেন।

মহিম চৌহানের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। অকস্মাৎ তার মনে হল, পায়ের পাতা থেকে কয়েকটা পোকা হিল হিল করে উঠে আসছে। কামড় দিচ্ছে। যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। মনে আত্মায়।

মাতালের মতো উঠে দাঁড়াল সে। তাকে উঠতে দেখে, চৌহান হাসিমুখে বলল— উঠলেন যে, বসুন কফি বলছি।

— না, খাব না।

— জানি কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে। আমারও বলতে ভালো লাগেনি। তবুও পরিস্থিতি মানুষকে বলায়, বদলে দেয়। পৃথিবীতে কেউ খারাপ হয়ে জন্মায়নি, মানুষ ও পরিস্থিতি তাদের বদলে দেয়।

মি. চৌহানের কথায় রাগ করল না মহিম। এখানে কাজ নিয়ে আসার পর মি. চৌহান অনেকবার তাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। একবার এক ঘটনার কথা মনে পড়ল তার.....

...... বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিল। নতুন বলে, অন্যান্য বারম্যানেরা তাকে পাত্তাই দিচ্ছিল না। কোনও খাতাপত্র হাত দিতেও দিচ্ছিল না। সবাই যেন প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। মহিম সবার সঙ্গে আপনভাবে মেলামেশার চেষ্টা করে, সেদিন দু'জন কাস্টমার এসে বসল সামনের টেবিলে, বসেই চিৎকার, এ্যাই কে আছিস, দুটো বিয়ার দে। ধারে কাছে কেউ ছিল না। একটু দূরে একজন ওয়েটার দাঁড়িয়েছিল, মহিম তাকে ডেকে বিয়ার দিতে বলে অন্য কাজে ডুবে গেল। দু-এক মিনিটের ব্যবধান, হঠাৎ কাস্টমার টেবিল থেকে উঠে এসে চিৎকার জুড়ে দিল— এ্যাই শুয়ার কা বাচ্চা, বিয়ার দিচ্ছিস না কেন বে?

মাথা গরম হল মহিমের, সে প্রতিবাদ করে বলল, কী যা-তা বলছেন, ভদ্রভাবে কথা বলুন, ওই তো আপনার বিয়ার নিয়ে যাচ্ছে।

— কী শালা ভদ্রতা শেখাচ্ছে তুই কেন দিলি না?

— আপনাকে সার্ভ করার জন্য ওয়েটার আছে।

— আবার তর্ক? বলেই সজোরে চড় মারল মহিমের গালে। ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল সে, সামলে নিল। লোকটি আবার লাথি মারতে উদ্ধত হল। চিৎকার চেঁচামেচিতে অনেকেই জড় হয়েছিল। ওয়েটার, ক্যাশিয়ার কিচেন স্টাফ, কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছিল না। লোকটি সমানে হম্বি-তম্বী করছে— মার শালাকে, মেরে দু-টুকরো করেদে... ইত্যাদি।

তাকে অপমানিত হতে দেখে কেউ কিছু বলছে না, এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে, ভেবে কূলকিনারা পেল না, মনে হল, তাকে অপমানিত হতে দেখে ওরা যেন আনন্দ পাচ্ছে। সেই বিপন্ন মুহূর্তে মি. চৌহান ছুটে এসে লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল— এ কী করছেন শ্যামলবাবু, কার গায় হাত তুলছেন?

— ও শালা আমাদের ইনসাল্ট করেছে, একটু চিনিয়ে দিলাম।

— আপনাকে চিনবে কি করে, উনিতো এই তো ক'দিন হল এসেছেন বেকার, চাকরি নেই, তারপর উদীয়মান লেখক। ওর লেখা গল্প, কবিতা খবরের কাগজে ছাপা হয়। তাছাড়া মালিকের খুবই পরিচিত।

— লেখার ইয়েমারি, শালা, আমাকে ইনসাল্ট।

চৌহান মহিমকে টেনে অফিসে নিয়ে আসে। মহিমকে কাঁদতে দেখে চৌহান বলে, ও শালা নিউমার্কেটের মস্তান। তাছাড়া মাতালদের নিয়ে কাজ করতে হলে, এমন একটু-আধটু অপমান হজম করতে হবে। এসব নিয়ে ভাবলে চলবে না।

পরের দিন ওই ভদ্রলোক এসে মহিমের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, গতকালের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করবেন। আসলে মুড ভালো ছিল না, তাই.....

তারপর থেকে ভদ্রলোককে কোনদিন হোটেলে আসতে দেখেনি মহিম। এতদিন পর সেই ঘটনার পিছনে কোনও চক্রান্তের গন্ধ পেল সে। তবে কী, এসবই মৃন্ময় দাস, চক্রবর্তী, কিংবা চৌহানদের কোনও খেলা। সাপুড়ে যেমন বিষাক্ত সাপ ধরে তার বিষ দাঁত ভেঙে, নির্বিষ করে; তেমনি, কেউ যেন তাকে নির্বিষ করতে এমন খেলা খেলছে, ভেতরে ভেতরে খেলাতে চাইছে।.......

মি. চৌহানের ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল মহিম। নিজের চেয়ারের দিকে কেন্নোর মত হামাগুড়ি দিতে দিতে ভাবল, 'এখানে টিকে থাকতে গেলে তাকে নির্বিষ হয়েই থাকতে হবে। তা-না হলে তার পায়ের তলার পলকা মাটি যে-কোনও দিন, যে-কোনও মুহূর্তে সরে যাবে।

'সানরাইজ' হোটেলে কাজ নেবার পর, হোটেল পারচেইজ ম্যানেজার মি. মৃন্ময় দাশ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তার এতদিনের আধিপত্য শেষ হতে চলেছে। মালিক কে এল কাপুর মহিমকে খুবই সুনজরে দেখে, বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। মহিম আসার পর থেকে হোটেল যেন নতুনভাবে সাজতে শুরু করেছে। কীভাবে হোটেলকে আকর্ষণীয় করা যায, কীভাবে ব্যবসা বাড়ান যায়। আশে-পাশের হোটেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কীভাবে জেতা যায়, খদ্দের ধরা যায় তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সবই মহিমের সঙ্গে নিভৃতে বসে সারেন। এ-দৃশ্য কেউ সহ্য করতে পারছে না। পারচেইজ ম্যানেজার মৃন্ময় দাশ তো নই।

সদা-বিনয়ী, হাসি-খুশি ছোট খাটো মানুষ মৃন্ময় দাশকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। লোকটা ভেতরে ভেতরে এত জটিল। হোটেলের অনেকের কাছে তার কীর্তির আর কুটিল মানসিকতার গল্প শুনতে শুনতে মানুষটার সম্বন্ধে অজান্তেই বিতৃষ্ণা জন্মেছে। লোকটা যে কত জনের চাকরি খেয়েছে। টাকার বিনিময়ে কত ওয়েটারকে চাকরি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নিজের স্বার্থ ছাড়া এক পাও চলে না। যেখানে পয়সার গন্ধ সেখানে তার কাজের বাহার। কথা বলেন, খুব গম্ভীর হয়ে, মনে হয় যেন কোনও ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির বশ। এমন ভাব দেখান, যেন তিনিই মালিক। তার কথাই শেষ কথা।

যারা হোটেলে মাল সাপ্লাই দেয় তারা মালিককে কোনদিন দেখেননি। মালিক যখন থাকেন না, সেই সময় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। কয়েক মাসের ব্যবধানে মহিম বুঝতে

পারল, মৃন্ময় দাশের সঙ্গে সাপ্লায়ারদের একটা কমিশনের ব্যবস্থা আছে। মাসের শেষে খাম তুলে দিতে দেখেছে সে। এই জানার আগ্রহ তার প্রতি ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার অজান্তে মালিকের কান ভারি করে, কাজ পারে না, অলস বোকা ইত্যাদি।

কে. এল কাপুর বিচক্ষণ লোক। নিজের হাতে হোটেল গড়েছেন। তিনি একদিন মহিমকে সাবধান করে বললেন, আপনার সম্পর্কে অনেক মন্তব্য শুনছি, সবটাই বিশ্বাস করি না, তবুও বলব এদের সঙ্গে মানিয়ে চলবেন।

— কে কী বলল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, শুধু আপনি এসব বিশ্বাস না করলেই হল, আপনি বিশ্বাস করলে আমি সহ্য করতে পারব না।

— আমরা মানুষ চিনি। এরা খচ্চরের জাত, কাউকে টিকতে দেয় না, তাই সাবধানে থাকতে বলি।

— ধন্যবাদ স্যার।

কাপুরের কথায় মহিম বেঁচে ওঠার অক্সিজেন পায়। একদিন ঘটনাক্রমে মৃন্ময় দাশ খুবই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। এবং পারচেইজের সমস্ত দায়িত্ব মহিমের উপর এসে পড়ে। কাজ করতে নেমে মহিম কুল কিনারা পায় না। পুরানো সাপ্লায়ারেরা কেউ মহিমের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে না, মাল চাইলেও দিতে চায় না। অনেক টাকা বাকি, চেক না দিলে মাল দেবে না এমন ওজুহাত দেখান সবাই। হোটেল চালু রাখতে মহিম বাধ্য হয়ে কে. এল. কাপুরকে না জানিয়ে নতুন সাপ্লায়ার জোগাড় করল। পেয়েও গেল।

ইস্ট-কস্ট কোম্পানি; এরা বিয়ার, ওয়াইন, হুইস্কি, ইত্যাদি সাপ্লাই দেয়।

ওই কোম্পানির এজেন্ট সুদীপ চক্রবর্তী। মহিম সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলল—

— আপনাদের ট্রামস্ অ্যান্ড কন্ডিসান কী?

— পেমেন্ট দু-মাসের মধ্যে চাই।

— রেট চার্ট আছে?

— এই ..ন স্কীম পেপার, এবং রেট চার্ট।

— একশো কেশ বিয়ার তুললে, বারো কেশ মাল ফ্রি এবং পাকা মালের সঙ্গে দু-কোয়াট করে ফ্রি পাবেন।

— তাই নাকি?

— অবশ্য আপনি চাইলে ওগুলোর দাম হিসাবে অন্যভাবে নিতে পারেন।

— মানে।

— মানে, মাসের শেষে যত কেশ মাল আসবে তা হিসাব করে ফ্রি-মালের পয়সা আপনাকে দিয়ে দেব, কেউ জানবে না।

— মহিম চুপ করে থাকে। মহিমকে চুপ থাকতে দেখে, চক্রবর্তী আবার বলেন, কেন আমি তো শুনেছি এখানে মৃন্ময় দাশ এভাবে অন্যান্য কোম্পানির কাছ থেকে পয়সা নেন।

— কে কী নিয়েছে আমি জানি না, আপনি ফ্রি মাল সমেত পাঠাবেন। আগামীকালই একশো কেশ বিয়ার পাঠিয়ে দেবেন; আর পাকা মাল কয়েক দিন পরে ওর্ডার দেব।

— আচ্ছা স্যার। ধন্যবাদ।

চক্রবর্তী চলে গেলে, মহিম পুরানো পারচেজ পেমেন্ট ও ডিউ বিল খুঁজে দেখে, না, পঞ্চাশ বছরেও এক বোতল মাল ফ্রি আসেনি। সবই দাশবাবু আত্মসাৎ করেছেন। এবং মালের সঙ্গে ফ্রী গীফ্‌ট আসত সবই।

মালিক কে. এল. কাপুর, একা মানুষ, মি. দাশকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করেন, মি. দাশ তার সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রমাণ ছাড়াই মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছেন এবং অন্যান্যদের ওপর লাঠি ঘোরাচ্ছেন, আশ্চর্য। এত বছর ব্যবসা করে কাপুর তো নয়ই এমন কী মি. চৌহানও বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেননি।

মহিম মনে মনে ঠিক করল, মি. কাপুর লন্ডন থেকে ফিরে এলেই তাকে সমস্ত জানিয়ে দেবে।

মেট্রো সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে সুষমা আবেগে মহিমের হাত ধরে পারুর কণ্ঠস্বরে বলে— আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না মহিম।

মহিম সুষমার কথায় উত্তর দেয় না। হাত ছুঁয়ে হাঁটতে থাকে। মেট্রো রেলের চত্বরে এসে বলে, তুমি মাকে দেখতে যাবে তো?

— চল, দেখেই যাই। তার আগে চল ময়দান মার্কেটে রসিদের হোটেলে কিছু খাই। পর্দা ঢাকা কেবিনের মধ্যে বসে মহিম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মহিমকে এভাবে বিমর্ষ হতে দেখে সুষমা বলে, তোমার কী হয়েছে বলতো? কদিন ধরে দেখছি তুমি খুব অন্যমনস্ক হয়ে আছ।

— না কিছু নয়।

— কিছু তো হয়েছে, আজ হোটেলে দেখলাম, দাশবাবু, ডিসুজা, চোহান তোমার সম্পর্কে কী সব আলোচনা করছে, আমি যেতে ওরা সতর্ক হয়ে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে থাকে, তোমাকে নিয়ে ওরা এত কী আলোচনা করে বলত?

— আমি কী করে জানব?

— দাশ জয়েন করার পর থেকে দেখছি মি. কাপুরও যেন খুব বিরক্ত!

— জানি না।

— না, কিছু হয়েছে, আমার কাছে লুকিও না বল। বলব না বলব করে সমস্ত কিছু খুলে বলল মহিম। সব শুনে সুষমা মহিমের উপর রাগ করল, দ্যাখো তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। সে যা করছে করতে দাও না, তাতে তোমার-আমার কী, আমাদের সামনে উজ্জ্বল দিন, সে দিনের কথাও তো ভাবতে হবে।

— তা হলে অন্যায়কে মেনে নিতে হবে।

— অন্যায়, কিসের অন্যায়, কেউ তো আর মালিকের চুরি করছে না, কোনও কোম্পানি যদি তার ব্রান্ড সেল করার জন্য কিছু দেয়, তাতে তোমার কী। আর মালিককে বললে, মালিক কি তোমার মায়নে বাড়াবে? এক পয়সাও বাড়াবে না। মালিক, মালিক-ই সে তোমাকে নিঙড়ে ব্যবহার করবে, কখনো ভালোবন্ধু হবে না।

— কিন্তু

— কোন কিন্তু নয় মহিম, ওসব কিন্তু মাথা থেকে মুছে ফেল, কাপুরের কানে তোল না, বরং মি. দাশের সঙ্গে একটা রফা করে চল, তাতে তোমার লাভ।

— এসব কী বলছ? আমি অন্যায় মেনে নেব না। কাপুর ফিরলে সমস্ত জানিয়ে দেব।

— তবে থাক তুমি তোমার আদর্শ নিয়ে, আমি চললাম। তুমি যা করছ আমার চাকরিটা যাবে। বলে রাগে উঠে দাঁড়াল সুষমা। এক ঝটকায় কেবিনের পর্দা সরিয়ে রাস্তায় নেমে গেল।

মহিম তার চলার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। বুঝতে পারল না, তার কোথায় ভুল হচ্ছে। সুষমাও তাকে মাথা নত করতে বলছে, আশ্চর্য। জীবনে এই প্রথম একটা পরাজয়ের স্পর্শ পেল সে। বুকটা ভারি হয়ে এল। সামনের মোগলাইয়ের প্লেটের ওপর কয়েকটা মাছি উড়ে এসে বসেছে। মহিম তাকে তাড়াতে পারল না।

আজকাল অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটে মহিমের। হোটেলে পা দিলেই এক ধরণের অস্বস্তি। কিছু অঘটনের সংকেত। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মনে হয় কেউ যেন তার পাশাপাশি হাঁটছে। ভয় করে। মি. দাশের হায়নার চোখ তাকে যেন ছিঁড়ে খায়। ডিসুজার চিবিয়ে কথা বলা। চৌহানের উদাসীনতা তাকে ভাবায়। সারা হোটেলে সে যেন গ্রহব্যূৎ মানুষ, এমন কী ওয়েটাররাও তাঁকে অসম্মান করে। জল চাইলে জল দেয় না। চা চাইলে, দেরী করে।

মহিম বড় একা। ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে যাবে। জীবনের অনিশ্চয়তা তাকে ভাবায়। সুষমার কথাই ঠিক মনে হয় তার, মালিক কখনো বাবা হয় না। যতদিন শক্তি সামর্থ আছে, তোমার কদর। শক্তি হারালে বাতিল ঘোড়া।

সেদিন অফিসে পা-দিতে না দিতেই মি. কাপুরের কাছ থেকে তলব এল। মহিমকে ঘরে ঢুকতে দেখে কাপুর বেশ ঝাঁঝাল গলায় বললেন, মি. সরকার, এভাবে যখন তখন অন্য কারও ফোন এলে আমার কাজের অসুবিধে হয়। এখন থেকে অন্য কাউকে ফোন দেবেন না। এই নিন আপনার ফোন।

— আমার ফোন, এসময়ে কে করল।

মহিম রিসিভার তুলে, বলল, 'হ্যালো'

ও প্রান্তে কিছু বলার আগেই মহিম 'রং নাম্বার' বলে ফোন নামিয়ে বেশ উষ্মার সঙ্গে ঘর ছেড়ে আসছিল। কাপুর মহিমকে ডেকে বলল, বসুন কথা আছে।

মহিম বসতে, কাপুর বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলল, আপনার আজকাল কোনও কাজে মন নেই। স্যালারির খাতায় এত ভুল, পি-এপ মিলছে না। ডেইলি রেজিস্টারে টোটাল বাকি। কাজ করতে হলে মন দিয়ে করুন না হয় ছেড়ে দিন।

এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না মহিম। সে কিছু না দেখেই বলল— একা ছিলাম। চাপের মধ্যে কাজ করেছি ভুল হতে পারে, রেখে দিন পরে দেখব।

— আপনাকে আর দেখতে হবে না, অনেক দেখেছেন, পাশে বসে থাকা মি. দাশের দিকে খাতা বাড়িয়ে বলল, 'এগুলো দেখে যত ফার্স্ট পারেন, ওর মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

মি. দাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, ছেড়ে দিন স্যার, এবার থেকে আমি-ই দেখব। মর্মাহত মহিম। অপমানিত হয়ে ঘর থেকে বেরুনোর সময় দেখল, দরজার বাইরে কিচেন সুপার ডি-সুজা দাঁড়িয়ে। মহিমকে দেখে খিক খিক করে হাসছে। মহিমের কাছে এসে চাপা স্বরে বলল, কী কেমন হল, বেশি গোয়েন্দাগিরি করলে, দেব শালা গঙ্গায় ভাসিয়ে। শালা চামচে।

হেরে গেল মহিম। হেরে গেল নিজের কাছে, আদর্শের কাছে। বিবেকের কাছে। হারল কাপুর সাহেবের কাছে। এইতো কদিন আগে পর্যন্ত তার কাজের প্রশংসা করেছে, ফ্রি-মাল, গিফট পেয়ে বলেছেন, এত বছর ব্যবসা করে আমার বাপ কোনদিন ফ্রিতে এক পিস মাল পায়নি, আর আপনি এক মাসে আশি হাজার টাকার মাল ফ্রিতে দিয়েছেন, যাক গে, এই ফ্রি-মাল সম্পর্কে অন্য কোন স্টাফদের বলবেন না।

সেই কাপুর সাহেব তার সম্পর্কে এমন আচরণ করল কেন ভেবে পেল না। একটা কান্না দলা পাকিয়ে বুকের পাঁজরে ধাক্কা দেয়। কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না সে। পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্কে এক অনীহা তাকে বিমর্ষ করে। সুষমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করছে তার। তার শুকনো মুখে আশঙ্কা দেখে অনুমান করতে পারে কী ঘটতে যাচ্ছে।

টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের চেয়ারে বসে। সাদা কাগজে নিজের পদত্যাগ পত্র লিখে, খামে ভরে। যাবার সময় কাপুরের টেবিলে রেখে যাবে। অনেক দিন সুষমা রাগ করে কথা বলেনি। আজ আর তার ওপর কোনও রাগ নেই। সে নিঃশব্দে সুষমার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। সুষমা মুখ তুলে তাকায় না। নিঃশব্দে টাইপ করতে থাকে। মহিম তার হাত আলতো ছুঁয়ে বলে, আজ এক সঙ্গে বেরুব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

— কেন?

— তোমাকে আমার মা দেখতে চেয়েছেন?

— কিন্তু

— কোন কিন্তু নয়, তৈরি থেকো।

আবার নিজের টেবিলে এসে বসে। হাতের বাকি কাজ শেষ করে। নিজের পাগলামোর জন্য নিজে কষ্ট পায়। নিজেকে প্রবোধ দেয়, জীবন যেভাবে যেতে চায় তাকে সেইভাবে চলতে দেওয়া উচিত। মনের বিরুদ্ধে কাজ করে কষ্ট কেন পেতে যাব। এত বড় ভূখণ্ডে বেঁচে থাকার মতো আশ্রয় জুটবে না, তাই আবার হয় নাকি? ঠিক জুটে যাবে।

কাজ করতে করতে অদ্ভুত আঁধার নামে। নিরাসক্ত জীবনের অমোঘ অন্ধকার। ভালোবাসার অন্ধকার, বিশ্বাসের অন্ধকার, মা-ভাই-বোন, অসুস্থ বাবার মুখ মনে পড়ে। সে মাছি তাড়ানোর মতন করতে দু'হাতে সরায়। ভাঙা মেঘের সারি দ্রুত এগিয়ে আসে। মহিম হাঁপায়। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবে, যে যার বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকাই শ্রেয়।

কাজ শেষ করতে করতে পাঁচটা বেজে যায়। কাপুর সাহেব চলে গেছেন। হাতের চিঠিটা তুলে কাপুরের টেবিলে রেখে আসে। টেবিল শেষবারের মতো গুছিয়ে রাখে। নিঃশব্দে বসে কিছুক্ষণ। মহিম বোঝে একটা মায়া তাকে শিকড়ে-বাকড়ে বেঁধে রেখেছে। জোর করে পালাতে পারে না সে।

নিজের ব্যাগ নিতে গিয়ে মহিম দেখল, তার ব্যাগের নীচে নীল রঙের খাম। হাত লেগে খামটা পড়ে গেল। মহিম দ্রুত খামটা তুলে নেয়। উলটে-পালটে দেখে। কিসের খাম, কে দিল? সে দ্রুত খামটা ছিড়ে ফেলে আর অবাক হয়ে দেখে ভিতরের মহার্ঘ বস্তু, টাকা, অনেক টাকা।

আনকোরা টাকার গন্ধ তার নাকে আসে। টাকাগুলো খাম থেকে বের করে টেবিলে ছড়িয়ে দেয়, গুণে দেখে, একশো টাকার পঞ্চাশটি, মানে পাঁচ হাজার টাকা!

তার দু'মাসের মাইনে। সে টাকাগুলো নিয়ে গন্ধ শোঁকে। আহা কী দারুণ গন্ধ। এই টাকাই জীবন। টাকাই যৌবন, আত্মমর্যাদা। টাকার জন্য মানুষের আত্মসম্মান কাঁচের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। শুধু করতল ভরে যায় লাল টাটকা রক্তে। রামকৃষ্ণ বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা, দুটোর তাৎপর্যই আলাদা। মাটি না থাকলে যেমন ছিন্নমূল, টাকা না হলেও মানুষ মনুষ্যত্বহীন জন্তুর মতো।

দরজায় খুট শব্দ। মহিম সতর্ক হতে টাকাগুলো লুকানোর চেষ্টা করে। পারে না কয়েকটা নীচে পড়ে যায়। একটা তুলতে গিয়ে আরও দুটো। এভাবে বাতাসে একটা একটা করে সমস্ত টাকা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। মহিম পাখির মত উড়ে যাওয়া টাকাগুলো ধরতে যায়। এক সময় ক্লান্ত হয়ে বসে থাকে। বসে বসে টাকাগুলোর ঘুরে বেড়ানো দেখে, দেখতে দেখতে তার মস্তিষ্ক জুড়ে ভাবনার চন্দন। এত টাকা কে দিল! মি. কাপুর কি তার দু'মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করেছেন? না-কি ইস্ট-কস্ট কোম্পানির চক্রবর্তী বিলের জন্য এসেছিল, তিনি ফেলে গেছেন। নাকি তার কমিশন বাবদ টাকা দিয়ে গেছেন।

মহিমের বুকের যন্ত্রণার রীড এক সঙ্গে বেজে ওঠে। সে মেঝেতে উবু হয়ে বসে দেখে, টাকাগুলো কী দারুণ লাল নীল পোকারমত ডানা মেলে উড়ছে। সে বিড়বিড় করে।

— টাকা তুমি কার?

— যার হাতে তার।

— তোমার রং কী?

— কোন রং নেই, যে যে রং-এ দেখে, সেই রং।

সুষমার অভিমান, বাবার হাঁপানি, আইবুড়ো দিদির উদাসীন চোখ, মায়ের প্রতীক্ষা স্থির চিত্রের মত তার সামনে ভাসতে থাকে। মুদিখানার হারান কাকার নিস্পৃহ চোখ, কাবুলিওয়ালার হাঁক তাকে বিমর্ষ করে, এক সঙ্গে সবাই পোকা হয়ে উড়ে আসছে তার দিকে। সবাই এক সঙ্গে অদ্ভুত কণ্ঠে বলে, তোমার আদর্শ আমাদের পঙ্গু জীবন— করে দেবে, মর তুই মর। একজন ঐশ্বরিত স্বরে বলল, টাকাগুলো তুলে রাখ।

— পারব না, কেন পারবে না, যাদের জন্য এত করলে, তারা তোমাকে কী দিয়েছে! মালিক কী তোমার যোগ্য সম্মান দিয়েছে, দেয়নি, উল্টে অপমান করেছে।

— বাইরে কাদের কণ্ঠ।

দরজা খুলে সুষমা বলল, কী হল দেরী করছ কেন? চল।

মহিম সাড়া করল না, ভাঙা মানুষের মত দাঁড়াল ঘাড় কাত করে। জ্বল জ্বল করে দেখল সুষমাকে ভূতের মত মনে হল তার।

সুষমা তাকে ঝাঁকুনি দিল, কী হল কথা বলছ না কেন?

মহিম উদ্ভট কণ্ঠে জবাব দিল, পোকা।

সুষমা নিচু হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা টাকা দেখে বলল, এত টাকা ছড়ানো কেন? কোথায় ছিল? কে দিল?

— জানি না, এইখানে ছিল, বলল কিন্তু নিজেও শুনতে পেল না!

— যেই দিক তুলে রাখ, বলে সুষমা টাকাগুলো কুড়াতে থাকে। ভালই হল আজই মাকে বলে বিয়ের দিন পাকা করে ফেলব।

সুষমা মেঝেতে উবু হয়ে বসে। মহিম তাকে দেখে চমকে ওঠে, যেন এক বিরাটকায় পোকা মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে সাঁতরাচ্ছে। কী বীভৎস হয়ে উঠল তার চেহারা।

চোখ, মুখ, দাঁত। মহিম পোকাটাকে মারার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পা-পা করে এগিয়ে যায়। এক সময় ধরে।

সুষমা অবাক হয়ে মহিমকে দেখে। তার ঘোর লাগা চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে এক সময় সুষমা চিৎকার করে ওঠে, মহিম কী করছো ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

মহিম আশ্চর্য নম্র গলায় বলে, পোকা, পোকাটাকে না মারলে, তোমাকে আমাকে আমাদের সমাজ, মান-মনুষ্যত্ব সব কুরে কুরে খেয়ে নেবে।

ভয়ে আতঙ্কে সুষমা চিৎকার করে— 'মহিম তুমি কী পাগল হয়ে গেলে।'

— পাগল, বিকট চিৎকারে হেসে ওঠে মহিম। মহিমের চিৎকার। সুষমার আতঙ্ক মিশ্রিত কান্নায় অফিসের সমস্ত দরজা খুলে যায়। একেকটা পা এসে জড় হয় ঘরের সামনে। একটা কণ্ঠ থেকে অনেক কণ্ঠ। সব কণ্ঠ ভেদ করে, ডি-সুজার কণ্ঠ ছাপিয়ে যায়। — শালা, অফিসের মধ্যে নোংরামি মেয়ে নিয়ে ফুর্তি মার শালাকে।

সুষমা বাধা দিতে পারে না, সে দেখে ডি-সুজার হাত দুটো সাঁড়াশির মতো চেপে বসছে মহিমের গলায় সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ এগিয়ে আসছে না। নিস্পৃহ মহিম শূন্য চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

ফতোয়া

নজরুল ইসলাম

পাটিকাবাড়ির অচিনতলার ইদ্গা ময়দানে আজ বিরাট মজলিস। আশেপাশের সাত গ্রামের মানুষ ডাকা হয়েছে। সব শুনে ফতোয়া দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে পাটদিযাড়ের বুযর্গ আলেম আবসার আলী দেওবন্দীকে।

আলেম আরবী কথা, অর্থ বিদ্বান। কিন্তু এ অঞ্চলে যারা ইসলামী শাস্ত্র নিয়ে মাদ্রাসায় পড়ে একমাত্র তাদেরই আলেম বলে। তাই সিনিয়র মাদ্রাসার মাধ্যমিক সমতুল পরীক্ষার নাম আলেম। আবসার আলী অবশ্য শুধু আলেম পাশ করা আলেম নন। তিনি আলেম পাশ করার পর, ফাজেল, কামেল এবং এম এ সমতুল এম এম পাশ করার পরও দেওবন্দে গিয়ে ইসলামী শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার হওয়ার জন্য মুফ্‌তি পরীক্ষা পাশ করেছেন। অক্সফোর্ড থেকে পাস করে যেমন অক্সোন, কেম্‌ব্রিজ থেকে পাশ করে ক্যান্টাব, তেমনি দেওবন্দ থেকে পাশ করে দেওবন্দী। দেওবন্দী এসে সকলের সামনে, যেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন সেখানে, যে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়া হয় তার পাশে বিছানো গালিচার ওপর বসে আছেন। তাঁর চারপাশ আলো করে আছেন সাত গ্রামের সাত মোড়ল— পাটিকাবাড়ির লুৎফর রহমান, হাসানপুরের জয়নুদ্দিন সেখ, বসন্তপুরের নাদেরবক্স মণ্ডল, আমিনাবাদের পরেশ সেখ, কালুপুরের অধার সেখ, জোড়গাছার শমী মণ্ডল এবং আজিমগোলার হাবুল হায়ৎ বিশ্বাস। তারপর অন্যান্য লোক। যাদের ডাকা হয়েছিল, তারা তো এসেছেই ; যাদের ডাকা হয়নি, তারাও এসে জড়ো হয়েছে। কোন মেয়েকেই এই মজলিশে ডাকা হয়নি। তবু অনেক কজন মেয়ে বিল্লালের বাড়ির ওদিকটায় জড়ো হয়ে জমায়েতের এক পাশে বসে আছে।

আজ যে ব্যাপার নিয়ে মজলিশ ডাকা হয়েছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এ অঞ্চলে এরকম ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। খবরের কাগজ কি রেডিও-টিভিতেও এরকম ঘটনার কথা কেউ আগে কোনদিন জানতে পারেনি।

হাসানপুরের হারুন অর রশিদ পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল না। টেনেটুনে মাধ্যমিক পর্যন্ত গেলেও, মাধ্যমিকে বার তিনেক ফেল করে, যারা পরীক্ষার খাতা দেখে তাদের অযোগ্যতার প্রতিবাদস্বরূপ সে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা হাবিবুরের মতই তার শরীর ছিল ছিপছিপে লম্বাটে। তত দিনে সে ছ ফুটের মত লম্বা হয়েছিল। শরীরের কাঠামোও ছিল মজবুত। সেবার ভুবনপুরে সেনাবাহিনী লোক নিয়োগ করতে এল। হারুন লাইন দিল। হাজার লোকের মাঝে থেকে তারা হারুনকে বেছে নিল। হাসানপুর গ্রামে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সেনাবাহিনীর কথা তারা শুনেছে। কিন্তু তাদের ঘরের ছেলে

সে বাহিনীতে যোগ দেবে। দেশের হয়ে যুদ্ধ করবে। এমন কথা কেউ কোনদিন ভাবেইনি। হারুন সেটা করে দিয়েছে। তার ওপর সে মাসে মাসে নগদ টাকায় বেতন পাবে। রাতারাতি সে ভাল পাত্র হয়ে গেল। অনেক জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। পাটিকাবাড়ির জারমান সেখের কন্যা জরিনাকে তার পছন্দ ছিল। তারা একই সঙ্গে লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে যেত। ছাতার নীচে জরিনার গালের লাল আভা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। সে আভা এসে সোজা হারুনের বুকের বাঁদিকটাতে ঢুকে পড়ত। ষোল-সতের বছরের জরিনা তখন ক্লাশ এইটে পড়ত। হারুনের বাবার প্রস্তাব জরিনার বাবা মেনে নিল। খুব ধুমধাম করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। অষ্টমঙ্গলা সেরেই হারুনকে ট্রেনিং-এ জয়েন করতে হল। ট্রেনিং-এর পর কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এল। তারপরে কাশ্মীরে পোস্টিং হয়ে গেল।

মাসের পর মাস কেটে যায়। হারুনের দেখা নাই। মাঝে মাঝে শুধু দুয়েকটা চিঠি আসে। তাতে তার মনের আগুন আরও দ্বিগুণ হয়। কিছুদিন পর তাও আসা বন্ধ হল। তার চিঠিরও কোন উত্তর এল না। তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে একদিন বাবাকে নিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে গেল। সেখানে খোঁজখবর নিয়ে যা জানল, তাতে জরিনার পাথর হয়ে যাবার অবস্থা। অফিসার জানাল, হারুন ছুটি চাচ্ছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য ছুটি দেওয়া হয়নি। ফলে মাস তিনেক হল, হারুন অস্ত্র সমেত কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। হারুনের বাড়ির লোকেরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা এখানে ওখানে ছোটাছুটি করছিল। কাশ্মীরেও গিয়েছিল কিন্তু কোনও ফল হয়নি। একদিন বাড়িতে চিঠি এল, হারুন 'ডেজার্টার'।

জরিনা দু চোখে শুধু অন্ধকার দেখল। যে কোনদিন নেশা ধরেনি, তার কথা আলাদা। কিন্তু যে একবার নেশার স্বাদ পেয়েছে, তার পক্ষে নেশা না করে থাকা হাতে আগুন ধরে রাখার মত শক্ত। তার বয়স এখন আঠার। শরীরে, মনে ভরপুর কামনা। শরীর-মন দুইই পুরুষ সঙ্গ চায়। অথচ তার স্বামী পলাতক। কোথায় আছে, আদৌ আছে কি নেই, সে জানেনা। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তার খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করে না। বাবার বাড়ির লোকেরা একটা বোঝার মত, একটা অলক্ষুণে অভিশাপ মনে করে। তাদের কারও ব্যবহার আর যথেষ্ট আন্তরিক মনে হয় না। বিরক্ত হয়ে জরিনা আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করল। মাধ্যমিক পাশ করে আজিগেলা হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হল।

পাড়ার রকিব সেখ, তার করুণ জীবন দেখে, না হারুনের মতই তার গালের লাল আভা দেখে, তার প্রতি দুর্বল হয়ে গেল, বলা মুশকিল। সে একদিন জরিনার সঙ্গে পড়া তার বোন সাহেদার মাধ্যম জরিনাকে প্রস্তাব পাঠাল। প্রথমে জরিনা একদম ঝেড়ে ফেলেছিল, 'তাই আবার হয় নাকি? আমি বিবাহিত। বিবাহিত মেয়ের স্বামী বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে হয় নাকি?"

"তোর স্বামী বেঁচে থাকলে এতদিন আসত না?"

'মারা গিয়েছে, তাতো ওরা বলেনি। বলেছে 'ডেজার্টার'। ডেজার্টার মানে তো পলাতক।"

"ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ গা, বেঁচে থাকলে এতদিনও আসত না?"

জরিনারও তাই মনে হয়। বেঁচে থাকলে, প্রকাশ্যে না হলেও লুকিয়ে চুরিয়ে আসত। কি হল লোকটার। আস্ত একটা লোক গায়েব হয়ে গেল। বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করল, "কি করে খোঁজ করা যায়, বল্ দেখি?"

"খোঁজ করার কি আছে?"

"তা হলে কি করব?"

"তোর কেউ খোঁজ নিচ্ছে? তুই বিয়ে করে নে।"

"নারে। আমি তা পারব না।"

"তা হলে, কি করবি? সারা জীবন এরকম একদম একা থাকবি?"

জরিনা চমকে উঠল। সে যে খুব কঠিন কাজ। নিজের সঙ্গে নিজে সবসময় যুদ্ধ করা। এই চার বছরেই সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। সে আর পাচ্ছে না। সে সত্যি এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়।

বান্ধবী বলে চলল, "এখন তো তাও তোর আব্বা বেঁচে আছেন। তিনি মারা গেলে কার কাছে থাকবি? পাঁচ কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে না?"

জরিনা ভাবি ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। ভীত হয়ে বান্ধবীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। মোল্লা ডেকে, কলেমা পড়িয়ে 'ইজাব-কবুল' করে দ্বিতীয়বার তার বিয়ে হয়ে গেল।

রকিব বাড়ির কাচেই মুদিরখানার একটা ছোট্ট দোকান চালাত। তাতে যা লাভ হত, তাতে কোনরকমে চলে যেত। তা হলেও জরিনার শূন্য জীবনে তার উপস্থিতি আর ভালবাসা দিয়ে ভরে দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর কি সম্পর্ক, তা জরিনা রকিবের সঙ্গে তার বিয়ে হবার পরই বুঝতে পেরেছিল। রকিব সকালে-বিকালে তার সঙ্গে খুনসুঁটি করত। দোকানের কাজের মাঝে একটু ফাঁক পেলেও এসে জরিনাকে উত্যক্ত করত। জরিনা মুখে তিরস্কার করলেও মনে মনে খুশিই হত। সব মিলিয়ে সে খুশি ছিল। আরও খুশি হয়েছিল সেদিন, যেদিন বুঝেছিল, সে মা হতে যাচ্ছে। কিন্তু কদিন না যেতেই তা বিভীষিকা হয়ে উঠল।

কাগজে বড় বড় করে খবর বের হল, হারুন পাকিস্তানের জেলে বেঁচে ছিল। দু দেশের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার তাকে, আরও কয়েকজনের সাথে, ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। দুদিন পরেই হারুন পাটিকাবাড়ি এসে হাজির হল। জরিনার মাথায় ইতিমধ্যেই আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এবার বজ্রপাত নেমে এল। হারুন তাকে স্ত্রীরূপে দাবী করল। রকিবও হাল ছেড়ে দিতে রাজী হল না। সে জরিনার সন্তানের বাবা হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক প্রশ্ন সব লোকের মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

প্রথমত হারুন এবং রকিবের মধ্যে কার সঙ্গে জরিনার থাকা উচিত? যদি রকিবের সঙ্গে থাকে, তা হলে হারুনের সঙ্গে বিয়ের কি হবে? যদি হারুনের কাছে ফিরে যায়, তবে রকিবের সঙ্গে বিয়ের কি হবে? জরিনার গর্ভে রকিবের সন্তানের কি হবে? সে কার কাছে থাকবে?

হারুন পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে 'হিরো' হয়ে এসেছিল। সে কোনমতেই 'জিরো' হতে চায় না। সে বলল, 'আমার কোন দোষ নেই। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরে রেখেছিল। কাজেই জরিনা আমার কাছে আসবে।''

''বাচ্চাটার কি হবে?'

''যার বাচ্চা, তার কাছে থাকবে।''

লোকের মুখে সে কথা শুনে জরিনা বলেছিল, ''ঠিকই তো। আমার বাচ্চা আমার কাছে থাকবে।''

সঙ্গে সঙ্গে রকিব যোগ করেছিল, ''আমার বাচ্চা আমার কাছে থাকবে। আমার বাচ্চার মাও আমার কাছে থাকবে।''

হারুন 'হিরোর' মত ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হল না। সে মেয়েকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জরিনার বাবার ওপর চাপ দিতে লাগল। কয়েকবার এ নিয়ে মজলিশ বসেছে। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই, সবার সঙ্গে পরামর্শ করে, হারুনের বাবা আজ সাত গ্রামের মানুষ ডেকেছে। এরকম মানুষ ডাকা এখানে অনেক বছর পর বড় কোন সমস্যা হলে পরেই ডাকা হয়। সে সভায় বিচার ইসলামী আইন অনুসারেই হয়, কিন্তু ভারতের পুরানো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।

সবাই এসে গিয়েছিল। এবার কাজ শুরু করতে হয়। দেওবন্দী মোড়লদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। নাদেরবক্স বললেন, ''তা হলে হাবিবুরকে জিজ্ঞেস করা হোক, কেন সে আমাদের ডেকেছে।'' এইটাই এই অঞ্চলের নিয়ম। যে কোন বিচার সভায়, যে মানুষ ডাকে, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারা যে রায় হবে তা মেনে নেবে কি না? জয়নুদ্দিনের বাড়ি হারুনের বাবার সঙ্গে একই গ্রামে হওয়ায়, তাঁরই ওপর জিজ্ঞেস করার ভাব পড়ল।

জয়নুদ্দিন বলল, ''কই গো হাবিবুর? তুমি আমাদের কেন ডাক্ল্যা, বলো।''

হাবিবুর উঠে দাঁড়িয়ে সব কথা বিবৃত করল। তাঁরপর হাত জোড় করে বলল, ''আপনারা ইয়ার একটা ফায়শালা করে দ্যান।''

''ফায়শালা যদি তোমার বিরুদ্ধে যায় তুমি মাইনে লিবা তো?''

হাবিবুর ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল, ''হ্যাঁ।''

এবার দেওবন্দী পাটিকাবাড়ির লুৎফরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। লুৎফর প্রথমে রকিবের

বাবা রমজানের দিকে তাকিয়ে বলল, "মজলিসের যা রায় হবে, তা তোমরা মেনে নিবে তো?"

এত লোকের উপস্থিতিতে তাদের কথা মেনে নেবে না বলা বোধ হয় সম্ভব নয়। সে ঘাড় নেড়ে বলল, "নিশ্চয়।"

লুৎফর এবার জরিনার বাবা জারমানকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা?"

জারমানও হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল।

বিচারের কাজ শুরু হল। পরেশ সেখ প্রস্তাব দিলেন, "হাবিবুরের কথা তো শোনা হল। তা হলে, অন্য পক্ষেরও বক্তব্য শোনা হোক।"

দেওবন্দীর ইঙ্গিত মত লুৎফর আবার জারমানের দিকে চেয়ে বললেন, "জার্মানভাই আপনাদের কি বলার আছে, বলুন।"

জারমান বলল, "আমার কিছু বলার আর কি থাকবে? আমার কিছু বলার নাই।"

লুৎফর এবার রমজানের দিকে তাকাল, 'তোর কি বলার আছে, বল্।"

রমজান ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি বোলবি, বল্।"

রকিব বিধ্বস্তের মত উঠে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "জরিনার স্বামী অনেক বছর নিরুদ্দেশ ছিল। তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও তার কোনরকম খোঁজ নিতনা। এরকম অবস্থায় তার সম্পূর্ণ স্বমতে আমি শাস্ত্র অনুসারে ধর্মের নিয়ম মেনে বিয়ে করেছি। জরিনা আমার সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় জরিনা যাতে আমার সঙ্গেই থাকতে পারে, আপনারা সেটা দেখুন।"

'দেওবন্দী বললেন, 'যদি আর কারও কিছু বলার থাকে, বলতে পারেন।"

আবুল হায়াৎ আরও একটু জোরে বললেন, "আপনাদের আর কারোর যদি কিছু বলার থাকে, যাতে এই ফয়শালার সুবিধা হবে, তা হলে বলুন।"

বলার জন্য কেউ এগিয়ে এল না।

দেওবন্দী বললেন, "রায় কি দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে যদি কেউ কোন মত দিতে চান, বলুন।"

শমী মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মত বলুন।"

এবার লোক মতামত দিতে লাগল। কেউ বলল, জরিনার রকিবের সঙ্গেই থাকা উচিত। কেউ বলল, হারুনের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। তবে বাচ্চাটা রকিবকে দেওয়া উচিত। কেউ বলল না, বাচ্চা মায়ের কাছেই থাকা উচিত।

উপস্থিত লোকেরা কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারল না।

তখন দেওবন্দী মোড়লদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

অনেক শলা পরামর্শ করে রায় দিলেন।

অধার সেখ দেওবন্দীর হয়ে সে রায় ঘোষণা করলেন :

হারুন আর জরিনার বিয়ে হয়েছিল ইসলামী শরিয়ত অনুসারে। ইসলামী ফিকাহ্ অনুসারে, স্বামী একমাত্র তালাক দিতে পারে। স্ত্রীর তালাক দেওয়ার কোন অধিকার স্বীকৃত নয়। হারুন তালাক দেয়নি। আদালতের কোন রায় অনুসারেও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাজেই তাদের বিয়ে এখনও অটুটও আছে। আবার ইসলামী আইন অনুসারে একজন পুরুষকে এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হলেও নারীকে এক স্বামী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়নি। কাজেই রকিবের সঙ্গে জরিনার বিয়ে জায়েজ নয়। কাজেই জরিনাকে হারুনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

হারুনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রকিব মূহ্যমান হয়ে মুখ নীচু করল।

ঘোষণা শেষ করে অধার শেখ বসতেই লোকেদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, "পেটের বাচ্চার কি হবে?"

দেওবন্দী বললেন, "বাচ্চার বাবা হিসেবে, নাজায়েজ বাচ্চা রকিব পাবে।"

তার কথা শেষ না হতেই বিল্লালের বাড়ির দিক থেকে একটি মহিলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মৌলভী সাহেব!"

সবাই ওদিক ফিরে তাকাল। কেউ উচ্চারণ করল, "জরিনা।"

জরিনা বলল, "মৌলভী সাহেব! আপনি তো আমাকে কি করতে হবে, সে রায় দিয়ে দিলেন। দেওয়ার আগে, আমি কি চাই, আমার কোন বক্তব্য আছে কি না, একবার জিজ্ঞেসও করলেন না।"

তার কথায় দেওবন্দী সমেত সভার সকলে চমকে উঠল। জরিনা লুৎফর গ্রামের মেয়ে। মজলিশও তারই গ্রামে। কাজেই তাঁর খারাপ লাগল সব থেকে বেশি। তিনি কর্কশ কণ্ঠস্বরে বললেন, "তোকে এখানে, বেশরমের মত, বেপর্দা হয়ে, পুরুষ মানুষের মজলিশে, আসতে কে বলেছে? না লায়েক মেয়েছেলে কোথাকার!"

জরিনা তিরস্কারকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'লুৎফরচাচা! বেপর্দা বলছেন কেন? ইসলামে পুরুষ ও নারীর যে আলাদা ধরনের বাধ্যতামূলক পোষাকের কথা বলা হয়েছে, তা ন্যায্য কি না, সে তর্কে না গিয়েও বলছি, ইসলাম ধর্মে যে পোশাক পরতে বলা হয়েছে, আমার পোশাকে তার কোন ব্যতয় হয়নি। মেয়েদের মুখ আর পায়ের পাতা ছাড়া অন্য সব জায়গা আবৃত করতে বলা হয়েছে। মুখ আবৃত করে রাখতে কোথাও বলা হয়নি। আর পুরুষের মজলিশে আসার কথা বলছেন? মেয়েরা হজরত মহম্মদের সঙ্গে মজলিশে বসত, জামাতে নামাজ পড়ত। তা হলে তা আপনাদের কাছে আপত্তিজনক হচ্ছে কেন? আমরা মেয়েরা এবার এই ঈদ্গায়ে ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে আসব। দেখি, আপনারা কি করে বন্ধ করেন?"

তার কথা শুনে সারা মজলিশ চুপ করে গেল। নাদেরবক্স দেওবন্দীর দিকে তাকিয়ে জিগ্গেস করলেন, 'মৌলভী সাহেব! মেয়েটি কি ঠিক বলছে?"

দেওবন্দী বলল, "ঠিকই বলছে।"

জয়নুদ্দিন বললেন, "কিরকম ঠিক?"

ইসলামে মেয়েদের মুখ ও পায়ের পাতা ছাড়া শরীরের অন্য জায়গা আবৃত রাখতে বলা হয়েছে। মুখ আবৃত করতে বলা হয়নি। কাজেই সে যে পোশাক পরে আছে, তা ইসলামী মতেও ঠিকই আছে। আর মেয়েরা পুরুষদের জমায়েতে আসতে পারবে না, এরকম কথা হাদিস-কোরানে কোথাও নেই। আমাদের নবী করিম সাল্লুল্লাহে আলায়হেওয়াস্‌সাল্লাম যখন মদিনায় প্রথম মসজিদ স্থাপন করেন তখন মেয়েরাও তাঁর সঙ্গে জামাতে নামাজ পড়ত।"

নাদেরবক্স জানতে চাইল, "তা হলে পরে তাদেরকে বাদ দেওয়া হল কেন?"

"বাদ দেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি না। তবে দেখি, আর মেয়েরা জামাতে আসে না।"

জরিনা বলে চলছিল, "১৯৩৯ সালে এ দেশে 'ডিসুলিশন অফ মুসলিম ম্যারেজেস অ্যাক্ট' বলে একটা আইন পাশ হয়েছে। সেই আইন অনুসারে, আটটি কারণে, স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইতে পারে। প্রথম কারণ, চার বছর স্বামীর কোন খোঁজ না পাওয়া। দ্বিতীয় কারণ, যে কোন কারণেই হোক, দু বছর স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভারপোষণ না করা। তৃতীয় কারণ, স্বামীর সাত বছর জেল হওয়া। হারুন নিখোঁজ হওয়ার পর আজ কতদিন হয়েছে? হারুন বা তার আত্মীয়-স্বজন, যাঁরা আজ আপনাদের ডেকে এনেছে, তাঁরা আমার ভরণপোষণের জন্য কি ব্যবস্থা করেছিল? যদি না করে, তবে আজ এ সব করার জন্য তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত কি না?"

দেওবন্দী কিছু বলতে পারল না।

নাদেরবক্স আবার জানতে চাইল, "মেয়েটি যে রকম বলছে, সেরকম আইন সত্যি কি আছে?"

দেওবন্দী অসহায়ের মত ঘাড় নেড়ে জানালেন, "আছে?"

'তা হলে তো মেয়েটার কথা না শোনা অন্যায় হয়েছে।"

হারুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে একদম আটকে রেখেছিল। আমার কি করার ছিল?"

জরিনা সরাসরি উত্তর দিল, "সেনাবাহিনী লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিল, পলাতক। আমার কি ছিল? ফিরে এসেও আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল। তা না করে জোর করে আমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল। আমার দ্বিতীয় স্বামীর এবং আমার বাবার ওপর চাপ দেওয়া হল। আমি কি ভেড়ার বাচ্চা না কি? তাদের যার কাছে খুশি আমাকে পাঠিয়ে দেবে?'

জরিনার বাবা জারমান উঠে দাঁড়াল। বলল, "জুরি তুই একটু ভদ্রভাবে কথা বল্‌।"

জরিনা বলে চলল। 'মৌলভী সাহেব! আপনি ফতোয়া দিয়েছেন, আমাকে হারুনের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু আমি এখনই বলে দিচ্ছি, আমি যাব না। আপনারা যা হয়, এখনই বিচার করে যান। তবে আমি আবারও বলছি, মেয়ের সম্মতি ছাড়া মুসলমানদের বিয়ে হয় না। যার বিয়ে করার জন্য সম্মতি নিতে হয়, তার বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্যও সম্মতি থাকা চাই।"

জয়নুদ্দিন দেওবন্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, "কি বলছে, শুনেছেন?"

দেওবন্দী বললেন, "ঠিকই বলছে। নবী করিম সাল্লুলাহেআলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন বিয়েতে যদি মেয়ের ক্ষতি হচ্ছে, সে বিয়ে ভেঙে দাও।"

"যদি অত সব বলছেন, তা হলে আমরা ও রকম ফতোয়া দিলাম কেন?"

দেওবন্দী মুখ বন্ধ করে থাকল।

জয়নুদ্দিন উঠে জানতে চাইল, "তা হলে কি, মা তুই রকিবের সঙ্গেই থাকবি?"

"না।"

"তা হলে?"

"আমি একাই থাকব।"

"কিন্তু তোর নাজায়েজ বাচ্চার কি হবে?"

"বাচ্চা তার মায়ের কাছে থাকবে। আর জয়নুদ্দিন চাচা, যে কোন বাচ্চাই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। যে বাচ্চা এখনই জন্মাইয়নি, সে দোষ করতে পাবে না। সে নাজায়েজ হতে যাবে কেন? আমাদের কোন কাজ নাজায়েজ, অর্থাৎ অবৈধ হতে পারে। তারে জন্য বাচ্চা দায়ী নয়। বাচ্চা নিষ্পাপ।"

গোটা মজলিশ চুপ করে থাকল। কি করা উচিত ভাবতে লাগল।

জলপাইপাতার মুকুট

আনসার উল হক

সমস্ত গা দরদর করে ঘামছে। কদিন যা ভ্যাপসা গরম! ঘরের বাইরে পা দিলেই ঘামে ভিজে একসা। বাড়ি থেকে রেলস্টেশন ঢিল-ছোঁড়া দূরত্ব। তবুও সময় বের করা যায় না, নাকে মুখে দুটো গুঁজে ছুটতে হয় ট্রেন ধরতে। নিত্য-প্রথামত। সরকারি চাকরি তো! তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মটা আবার একটু বাঁকা। বিশাল এক পাহাড়ি বিছের মত ট্রেনটা এঁকে বেঁকে শহরের পথে পা বাড়ায়।

মাঝারি বয়সের গোলগাল এক ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে শেষ কামরার কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। ছোট্ট এক লাফ দিয়ে কোনরকমে হ্যাণ্ডেল পাকড়ে ওপরে উঠে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন। গেটে দাঁড়িয়ে থাকা সুধাময় বাবু বললেন : দেখুন, আপনার তো বয়স হয়েছে। এভাবে 'রিস্ক' নেবেন না। একটা ট্রেন না হয় পরেই এলেন। ভেতর থেকে বুম্বা বলল, আসুন আসুন, ভেতরে চলে আসুন। শরীর ঠাণ্ডা হবে। স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। তিনি তখন ঘামছেন, কাঁপছেন।

আজ সুকুমার এসেছে সবার আগে। রোজকার যাত্রী। জানালার ধারের সিটে বসে বিশ্রাম করছে। সকাল বিকেল তার হাড়-ভাঙা পরিশ্রম। সে ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বলল—

বসুন কাকু। একটু বিশ্রাম করুন।

বিশ্রামের তাঁর খুবই দরকার ছিল। তাই কোনরকম মন্তব্য না করে 'ধন্যবাদ' বলে ধপ করে বসে পড়লেন সিটে। বললেন : বেঁচে থাকো, বাবা। তুমি যে কী উপকার করলে!

— না কাকু, এইটুকু সহযোগিতা যদি না করতে পারি, তবে মানুষ বলে পরিচয় দেব কি করে।

— না না, তা নয়। চাকরির খাতিরে আমি তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি। মানুষের মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। বিবেক, মনুষ্যত্ব আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে।

— ঠিক বলেছেন কাকু। তবে এটা আংশিক সত্য। বর্তমানে অন্ততঃ কিছু মানুষ পাবেন, যাদের মধ্যে মূল্যবোধ, বিবেক, মনুষ্যত্ব এখনও বেঁচে আছে। তাই তো জগৎ সংসার চলছে। তবে সেইসব মানুষের সংখ্যা নেহাত কম।

সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন গৌতমবাবু। মিশতে পারেন সবার সঙ্গে, গুছিয়ে কথা বলতে পারেন। মানুষের আপদ বিপদে পাশে দাঁড়ান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনি থাকেন কোথায়?

— এই বারুইপুরেই। অমৃত-কলোনীতে।

— ওই রাস্তায় সকালে তো আমরা দল বেঁধে বেড়াতে বের হই। অমৃত-কলোনীর ভেতর দিয়ে, কলেজ পেরিয়ে যুগল পুকুর, ধোপাগাছি পর্যন্ত যাই। কখন কখন অর্জুনতলা পর্যন্তও। তা, কলোনীর মধ্যে আপনার বাড়ি কোনটা?

— একেবারে মুখেই। তিনতলা বাড়ি, একটা নেমপ্লেট লাগানো আছে 'হোয়াইট হাউস'।

— ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। যাই বলুন দাদা, সত্যিই আপনার রুচি আছে। নামের সঙ্গে ম্যাচিং করে রঙ করেছেন। ছিমছাম বাড়িটা, খুব মনলোভা। আপনি কি চাকরি করেন, না ব্যবসা?

— আয়কার বিভাগে আছি।

কে যেন পাশ থেকে একটা নিবস মন্তব্য ছুঁড়ে দিল · ইনকাম ট্যাক্সে আছেন, তাই তে বড় বাড়ি। কেউ কোন অতিরিক্ত মন্তব্য করলেন না, কথা বাড়ালেন না। গৌতমবাবুই বললেন— কি নাম আপনার দাদা?

— শোহরাব হোসেন।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুকুমার কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে বলল : কাকু, আপনাকে আমি দেখেছি।

— কোথায়?

— আমি রোজ সকালে প্র্যাকটিসে যাই। ফুটবল। আপনাকে থলে হাতে কাছারীবাজাবে দেখেছি। তবে আপনাদের বাড়ি এটা জানতাম না। বিশ্বাসই হত না।

— শোহরাব সাহেব চিন্তায় পড়লেন। অবিশ্বাসের কারণ তিনি মনে মনে খুঁজতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা যখন বৃথা হল, তিনি দু-একটা ঢোক গিললেন। বোকা বোকা চোখে জিজ্ঞেস করলেন— আচ্ছা সুকুমারবাবু, এই অবিশ্বাসেব কাবণটা কী জানতে পাবি?

— আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন, সুকুমার বলবেন। আপনাব ছেলের মত আমি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, কলকাতার ইভ্‌নিং কলেজে।

— ইভ্‌নিং কলেজ কেন? দিনের বেলা কী কর?

— গেল বছর ফুটবল আকাদেমিতে একটা ভালো সুযোগ পেয়েছি। মায়ের ইচ্ছা, বাবার মত আমিও একজন বড় খেলোয়াড় হই। দিনেরবেলা অনুশীলন আর রাত্রে কলেজ করি।

সুকুমারের সুকুমার-মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন শোহরাব সাহেব। সুকুমারও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাঁর আনমনা হওয়ার কারণ খুঁজতে লাগল। কোত্থেকে যে অনেকটা সময় কেটে গেল, তা কেউই বুঝতে পারল না। আসলে সুকুমারের শরীরটা ইস্পাতের মত পেটাই, বয়স উনিশের আসপাশে। ছ'ফুট ছুঁইছুঁই লম্বা। রঙ চাপা, লাজুক মুখ। যে দেখে, সেই-ই ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। তাই অল্প সময়ের মধ্যে সুকুমার অজান্তে শোহরাব সাহেবের মনের এককোণে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।

— আচ্ছা সুকুমার, তুমি কই কারণটা তো বললে না। ওই বাড়িটা যে আমার, সেটা তোমার মনে না হওয়ার কারণটা কি?

— সত্যি বলতে কি কাকু। এত বড় ঝাঁ-চকচক সুন্দর একটা বাড়ি। রুচিসম্মত নাম 'আন্তরিক', সামনে লাগোয়া ফুলের বাগান। আর ভেতরে ঢোকার ফালি রাস্তাটা এত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন যে, এটা মুসলিম বাড়ি বলে আমার কোনদিন মনেই হয়নি।

— তাই নাকি?

আর একটা কারণও আছে। প্রায়দিনই সকালে বাড়ির ভেতরে থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে। মনে হয় কেউ রেওয়াজ করে।

— আমার মেয়ে, এগার ক্লাশে পড়ে। গান শেখে মাস্টারমশাইয়ের কাছে।

— জানেন কাকু, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাবায়, মনকে নাড়া দেয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে আপনাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি। চুপিচুপি শুনি।

— চুপি চুপি কেন, সুকুমার?

— পাছে কেউ কিছু বলে। বেফাঁস মন্তব্য করে। আজেবাজে মন্তব্য আমি আবার সহ্য করতে পারি না। বলতে বলতে সুকুমার খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল : মূল শহর থেকে এতটা দূরে, মুসলিম বাড়িতে গানের চর্চা হয়। আমার খুব ভাল লাগল, ধারণাও পাল্টে গেল।

কথায় কথায় গাড়ি প্রায় শহরেই ঢুকে পড়েছে। এবার শোহরাব সাহেবের নামার পালা। নামার আগে বলে গেলেন : সুকুমার, সময় পেলে একদিন বাড়িতে এস। গল্প করা যাবে।

কিছুদিন পর। সকালেব রোদ নিকোন-উঠোনে পড়ে ঝিকমিক করছে। এ যেন পদ্মপাতায় হীরের কুচি। আজ তার বিছানা ছাড়তে একটু দেরি হয়ে গেছে। তবুও সে অন্যান্য দিনের মত ওয়াকিং, ব্যায়াম, অনুশীলন সব সেরে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল শোহরাব সাহেবের কথা। আজ রবিবার, ছুটির দিন। দেখা হয়তো হয়ে যাবে। আবার ভাবছে প্র্যাকটিসের ড্রেস। ড্রেস বলতে গাঢ় নীল রঙের একটা ট্র্যাক-স্যুট, দু-পায়ের বাইরের দিকে লম্বা সাদা স্ট্রাইপ। গায়ে হালকা বাদামি রঙের টি-শার্ট, লোয়ারের নিচে গোঁজা। পায়ে নীল-সাদা কেড্স। এই পোশাকে তাকে দারুণ মানায়। তাহলেও সুকুমার ভাবছে এই পোশাকে কি কারো বাড়িতে ঢোকা যায়! না, ঢোকা উচিত!

কলিংবেলের আওয়াজ শুনে সুতপা ভাবল তার মাস্টারমশাই এসেছে। এগার ক্লাস বলে কথা, চার-চারটে মাস্টার। আইহোল দিয়ে হঠাৎ এক আগন্তুককে দেখে সে চমকে উঠল। বাবাকে জিজ্ঞেস করেই সে দরজা খুলে দিল।

সুকুমার জিজ্ঞেস করল : এটা কি শোহরাব সাহেবের বাড়ি?

— হ্যাঁ।

— তিনি আছেন?

— হ্যাঁ।

এই হ্যাঁ হ্যাঁ বলতে বলতে সুতপাও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সুকুমারের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে 'বাবা-আ-আ' বলে হাঁক পাড়ল। বাবা এলেন।

— আরে, এযে সুকুমার। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভেতরে এস। কেমন আছ? পরিচয় পর্ব সেরে শোহরাব সাহেব বললেন : তোমরা দুজনে বসে গল্প কর, আমি আসছি। বাজার কাছেই।

সুকুমারের মৃদু আপত্তি সুতপাই এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সুতপাই প্রথমে মুখ খুলল : আচ্ছা সুকুমারদা, তুমি যে এত প্র্যাকটিস কর তোমার কষ্ট হয় না?

উত্তর পাওয়ার আগেই আবার প্রশ্ন : তোমার মূল লক্ষ্য কি?

সুকুমারকে এইভাবে কেউ, বিশেষ করে কোন মেয়ে কোনদিনই 'দাদা' বলে সম্বোধন করেনি। তাই 'দাদা' শুনে তার খুব ভালো লাগছিল। আর মনে মনে ভাবছিল মেয়েটা কি ভালো! নিজেকে সামলে নিয়ে, মনটা শক্ত করে বলল : একজন বড় খেলোয়াড় হতে চাই। বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে খেলতে চাই।

— ভারত! বিশ্বকাপ!! তুমি কি ক্ষেপেছ, সুকমারদা? কোনদিনই সম্ভব নয়।

— অবশ্যই সম্ভব হবে। তবে থাকতে হবে একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস আর অর্থ। দেখছ না, বিদেশের খেলোয়াড়দের পিছনে কত্ত পয়সা খরচ হয়। তার ছিটেফোঁটাও বরাদ্দ নেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের জন্য।

— একশ কোটির দেশ থেকে এগারটা খেলোয়াড় বের হচ্ছে না!

— সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সরকাব চেষ্টা করলে অবশ্যই হবে।

সুতপা বলল : সুকুমারদা, এইতো কদিন আগে শেষ হল শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ। সেরা বিশ্বকাপও বটে। আমার প্রিয় দেশ ব্রাজিল পেল সেই স্বপ্নের কাপ।

— আমিও মনে প্রাণে চেয়েছিলাম ব্রাজিল জিতুক। ব্রাজিল ছাড়া বিশ্বকাপ কেউ কোনদিন ভাবতেই পারে না। ব্রাজিল মানে ফুটবল, ব্রাজিল মানে বিশ্বকাপ। ব্রাজিল মানে শাম্বা, ব্রাজিল মানে উন্মাদনা।

এইভাবে আলাপ আলোচনায় বেশ কিছু সময় কাটল। তবে সুতপা, নিজেকে যেন ক্রমশ মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলছে। বিশ্বকাপ পর্যালোচনার ফাঁকে সে যেন তার স্বপ্নের মানুষের সুকুমার মুখটি দেখতে পাচ্ছে।

শোহরাব সাহেব বাজারের থলে হাতে ভেতরে ঢুকলেন। সুতপা একলাফে বাবার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রীতিমত উত্তেজিত। বলল : সুকুমারদা খুব ভালো ছেলে। বড় মাপের ফুটবল খেলোয়াড়। ওকে সাহায্য করলে ও অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে। দেশের হয়ে বিশ্বকাপও খেলতে পারে।

— ঠিক আছে মা, ওকে সাহায্য করার কথা দিলাম। প্রয়োজনে তুইও ওকে সাহায্য করিস।

— অবশ্যই।

— এতক্ষণ বিশ্বকাপের আলোচনা চলছিল বুঝি? তোরা দুজনেই তো দেখছি খেলোয়াড়ের মত টগবগ করে ফুটছিস।

সুকুমার ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল : কাকু, আমি তাহলে আসি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, মা আবাব চিন্তা করবে।

— সে কি! তোমার জন্য সামান্য নাস্তা আনলাম। না-খেয়ে যাবে! আমাদের অমঙ্গল হবে।

সুতপা ততক্ষণে নিজের গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা ক্যাসেট স্টিরিওতে লাগিয়ে দিয়েছে। 'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি....।' বোধ হয়, সুকুমারকে শোনানোর জন্য।

নাস্তা শেষ করে সুকুমার আস্তো আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। গেটের সামনে ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠা কালো-গোলাপ চারাটার দিকে চোখ পড়ল সুকুমারের। তার নিজের ভেতরে যেন এক হালকা আগুনের তাপ ছড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখে সুতপা দাঁড়িয়ে। ক্ষণিকের চোখাচোখিতে দু'জনেই মৃদু হাসল। এই নির্দোষ হাসির মধ্যে কোন রহস্য আছে, কিনা, তা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তবে মনে হল সুকুমার যেন বাঁচার নতুন এক শিকড়ের সন্ধান পেল।

সুতপা গলা বাড়িয়ে বলল : আবার এস সুকুমারদা। সুকুমার পিছন ফিরে তাকিয়ে সুতপার মুখমণ্ডলের উপর এক ঝলক আশার আলোক আর কয়েক টুকরো স্বপ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মৃদস্বরে বলল : অবশ্যই।

সুতপার মনের চারপাশ জুড়ে হঠাৎ যেন নীল বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠল। সে আলোর ঝিলিক পূর্ণিমার চাঁদকেও ফিকে করে দেয়, হার মানায়। সে আবেগে চেঁচিয়ে বলল : তোমাকে জিততেই হবে সুকুমারদা। দেশের জন্য যদি কোনদিন তুমি কোন সম্মান এনে দাও, সে ছোট হোক বা বড়ই হোক, আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেব আমার ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠ সম্মান, জলপাইপাতার মুকুট।

পাগল সাহেব

ইমদাদুল হক মিলন

বাগানের গাছপালায় বিকেল শেষ হয়ে আসছে দেখে এসডিও সাহেব একটু বিরক্ত হন। শ্রীনাথ হারামজাদা গেল কোথায়? বিকেল পড়ে গেল, এখনও আসছে না কেন? শ্মশানখেলায় গিয়ে একা একটি চিতায় উঠল নাকি!

কারও ওপর রেগে গেলে সাহেব একটু ঘন ঘন সিগ্রেট খান। আর চা। খালি কাপেও অনেক সময় চুমুক দিয়ে ফেলেন। অন্যমনস্কতা। এই যেমন এখন। আনমনে হেঁটে হেঁটে টেবিলটার সামনে যান সাহেব। বিকেলবেলা, শীতকাল গরমকাল নেই, সাহেবের একটু বাগানে বসার অভ্যেস বলে, বেতের গোলটেবিল আর একটা চেয়ার চিরকালের জন্য পাতা আছে বাগানে। বিকেলবেলা চাকর আবদুল কাদের চিনেমাটির কেটলি ভর্তি চা, একটা কাপ আর সিগ্রেট-ম্যাট রেখে যায়। একা বাগানে, গাছপালার ছায়ায় ফুলের গন্ধে আর মফঃস্বল শহরের পুরনো হাওয়ায় বসে চা খেতে, সিগ্রেট খেতে সাহেব খুব পছন্দ করেন। তাঁর পরনে তখন আশি সুতোর মিহি লুঙ্গি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি।

এই দেখে প্রথম প্রথম স্ত্রী খুব আপত্তি করতেন। তুমি এই শহরের এসডিও। বড় সাহেব। সবাই তোমাকে চেনে, শ্রদ্ধাভক্তি করে। বিকেলবেলা তুমি যে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে বাগানে বস, বাড়ির পাশ দিয়ে সারা শহরের লোকজনের চলাচল, তারা দেখে কী ভাবে বল তো!

শুনে সাহেব তাঁর মোটা কাঁচের চশমা নাকের ওপর একটুখানি ঠেলে দেন। তারপর ডানদিকের ভ্রূতে ছোট বড় তিনটে গিঁট ফেলে বললেন, কী ভাবে?

স্ত্রী বুঝতে পারেন, সাহেব রেগে গেছেন। রেগে গেলে তাঁর ডানদিকের ভ্রূতে ছোট বড় তিনটে গিঁট পড়ে। গলার স্বর অচেনা হয়ে যায়।

স্ত্রী আর কথা বলেন না। সাহেব বললেন, যতক্ষণ কাছারিতে থাকি, আমি ততক্ষণ এসডিও। বাইরে আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি। লোকের ভাবাভাবিতে আমার কিছু এসে যায় না। এসডিও হয়েছি বলে, নিজের বাড়িতেও কি আমার প্রিয় অভ্যেসগুলো পালন করতে পারব না! তাছাড়া লুঙ্গি পরে, বিকেলবেলা একা একা বাগানে বসে চা সিগ্রেট খাওয়ার সুখ আমি ছাড়া কে বোঝে।

প্রথম প্রথম স্ত্রী দু'একদিন তাঁর সঙ্গে বাগানে গিয়ে বসেছেন। কিন্তু বসেই টের পেয়েছেন সাহেব তাঁর উপস্থিতি পছন্দ করেন না, কিন্তু সাহেব মুখে কিছুই বলেননি। মেয়েমানুষেরা চিরকালই মেয়েমানুষ বলে এসব ব্যাপার বুঝতে পারে। সাহেবের স্ত্রীও বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর আর কখনও যাননি। বিকেলবেলা দোতলার রেলিঙে দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে স্বামীকে

দেখেন। একাকী বাগানে বসে আছে কিংবা পায়চারি করছে, চা সিগ্রেট খাচ্ছে। এতকালের চেনা লোকটাকে তখন যে কী অচেনা মনে হয়! এই লোকটাই তাঁর সন্তানের পিতা। বিকেলবেলা রেলিঙে দাঁড়িয়ে প্রায়ই তাঁর এই কথাটা মনে হয়।

এই শহরে আসার কিছুদিন পরে, স্কুল থেকে ফিরে মেয়ে রাণী একদিন বলল, মা জানো বাবা কী করেছেন?

কী? পেশকার সাহেব তাঁর মেয়েকে নাটকে পার্ট করতে দেবেন না বলে বাবা নাকি তাঁকে খুব বকেছেন। এই নিয়ে স্কুলের মেয়েরা, আপারা খুব হাসাহাসি করেছে আজ। দু'একজনকে বলতে শুনলাম, এসডিও সাহেবের মাথায় ছিট আছে।

রাতেরবেলা কথাটা বলতেই এসডিও সাহেব রেগে গেলেন। ডানদিকের ভ্রূতে তিনটে গিঁট ফেলে বললেন, মেয়েটার পার্ট করার খুব ইচ্ছে, বুঝেছ। স্কুলে কয়েকবার করেছেও। একবার নাকি বেগম রোকেয়ার চরিত্রে চমৎকার পার্ট করেছিল। তাছাড়া নীলকণ্ঠবাবুরা এবার যে নাটকটা করছে, নায়িকার পার্ট ওই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।

স্ত্রী গম্ভীর গলায় বললেন, হোক না হোক তাতে তোমার কী?

এ কথায় সাহেব ভীষণ অবাক হয়ে যান কী বলছ, আমি তো নীলকণ্ঠবাবুদের উপদেষ্টা। ওদের নাটকটি যাতে ভালভাবে হয়, তা আমি দেখব না! তাছাড়া মেয়েটার যদি উৎসাহ না থাকত তাহলে অন্য কথা। ওর ইচ্ছে তো ষোলোআনা। নীলকণ্ঠবাবু বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়েছে। বলেছে, বাবাকে বলবেন। কিন্তু পেশকার সাহেবকে বলায়, তিনি পারলে নীলকণ্ঠবাবুকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করেন। তখন বাধ্য হয়েই আমি—

এসডিও সাহেব একটু থামেন। তারপর কথা নেই বার্তা নেই হো হো করে হেসে ওঠেন। বুঝলে, পেশকার সাহেবকে কী রকম ম্যানেজ করলাম। লোকটাব ঘুষটুষ খাওয়ার অভ্যেস। আমি এখানে আসার পরপরই কিছু কাগজপত্র হাতে এসেছে। প্রমণাদি। সেগুলো হাতে নিয়ে ধীর গলায় বললাম, পেশকার সাহেব, চাকরিটা করার ইচ্ছে থাকলে আজ থেকে মেয়েকে রিহার্সালে পাঠিয়ে দেবেন।

তারপর আবার সেই হাসি। প্রাণখোলা। দেখে স্ত্রী সেই মুহূর্তে আরেকবার ভেবেছেন, সত্যি কি এই লোকটা তাঁর সন্তানের পিতা!

সেই নাটকের টাকা-পয়সা জোগাড় করে দিয়েছিলেন এসডিও সাহেব। কোর্ট থেকেই টাকা উঠেছিল বেশি। যাকে যাকে জামিন দিয়েছেন, তাদের উকিলদের বলেছেন, জামিন দিলাম। কিন্তু একটা কথা আছে আমার। নীলকণ্ঠবাবুদের নাটকে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেবেন।

সেই নাটক স্ত্রী-কন্যা নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন এসডিও সাহেব। মফঃস্বল শহরের নাটক ইত্যাদি শুরু হয় রাত আটটার পর। চলে রাত একটা দু'টো অব্দি। এই ব্যাপারটা স্ত্রীর খুব অপছন্দ। তিনি যেতে চাননি। বলেছিলেন, রাণীকে নিয়ে তুমি যাও।

শুনে সাহেবের ডান ভ্রূতে সেই তিনটে ছোটবড় গিঁট। দেখে স্ত্রী আর আপত্তি করেননি।

কিন্তু এই লোকের সঙ্গে কে যায় নাটকফাটক দেখতে। মফঃস্বল শহরের ওই নাটক, ছেলেপানদের পার্ট, তাই দেখে কী খুশি সাহেব! তিন চারটে সিন রিপিট করিয়েছেন। নাটক চলছে, একটা সিন শেষ হয়েছে, সামনের সারি থেকে অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন সাহেব, আহা এই সিনটা বড় চমৎকার হয়েছে। রিপিট করো। আবার শুরু হল পুরনো সিন। এইভাবে তিন চারবার। দেখে পাবলিক তো বিরক্ত হয়েছেই, স্ত্রী কন্যাও কম হয়নি। কিন্তু কারও কিছু বলার নেই।

এই তো গেল এক উৎপাত। সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটা ছিল, হাতে একটা বেত নিয়ে বসেছিলেন সাহেব। মঞ্চের সামনে, মেঝেতে বাচ্চাকাচ্চারা বসেছিল। অকারণে তারা তো চেঁচামেচি করবেই। আর তাতেই সাহেবের মাথা গরম। প্রায়ই বেত হাতে দাঁড়িয়ে পড়েন। দুচার ঘা লাগিয়ে দেন। তখন তাঁকে দেখাচ্ছিল পাঠশালার পণ্ডিত মশায়দের মতো। ওই শ্রেণীর লোকেদের স্ত্রীর খুব অপছন্দ।

তারপরও মাসে মাসে নাটক হয় শহরে। সাহেব হলেন বড় উদ্যোক্তা। প্রায়ই রিহার্সাল দেখতে যান। চাঁদাফাদা তুলে দেন। আর নাটকের দিন তো তিনিই সব। কিন্তু স্ত্রী আর যান না। কোনও না কোনও অছিলায় বাড়ি থাকেন। কষ্টটা যায় রাণীর ওপর দিয়ে।

কিন্তু সবচেয়ে বাজে কাজটা সাহেব করলেন কিছুদিন আগে। শহরের কলেজে পড়া মুসলমান একটা ছেলের সঙ্গে কবিরাজ বেণীমাধববাবুর বড় মেয়ের প্রেম। শহরের সবাই জানে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের প্রেম ; ব্যাপারটা কেউ ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু দু'জনেই ডেসপারেট। বিয়ে করবেই।

এসব শুনে কবিরাজ মশাই দু'তিনবার মেয়েকে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। বারবারই ছেলেটা তার দলবল নিয়ে স্টেশানে গিয়ে উপস্থিত হয়। উপায় না দেখে কবিরাজ মশায় কেস করেন।

এদিকে ছেলের বাপও খুব রেগে গেছে ছেলের ওপর। সে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে, কাছারিতে গেছে।

এসডিও সাহেব ঘটনাটা আগেই শুনেছিলেন। ছেলেটা নাটকফাটক করে। তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছে, ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না স্যার।

এসডিও সাহেব একদিন সকালে কাছারিতে গিয়েই কবিরাজ মশায় আর ছেলের বাপ দুজনকেই পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে এনেছেন। এনে সোজা হাজতে ভরেছেন। তারপর নিজে টাউন হলে কাজী ডাকিয়ে, শহরের আর দু'চারজনকে নিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। মিষ্টি কেনার টাকা আর কাজীর খরচ ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, নিশ্চিন্তে সব করো। দুজনকেই আমি হাজতে আটকে রেখেছি। বিয়ে শেষ হলেই ছাড়া পেয়ে যাবে।

আমি বলে দিয়ে এসেছি।

সেই বিকেলে কী যে হৈ চৈ শহরে। ছেলে ছোকরারা সাহেবের খুব ভক্ত হয়ে গেল।

শোনা যায়, ছেলের বাপ আর কবিরাজ মশায়কেও নাকি সেই বিয়ের মিষ্টি খাইয়ে ছেড়েছেন সাহেব। কিন্তু এসবের ফলে এসডিও সাহেবের বাসায় ছোট্ট একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্ত্রী তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন কথা বলেন না।

তিন চারদিন দেখে সাহেব একদিন নিজেই স্ত্রীকে বললেন, তুমি অযথা রাগ করে আছ। আমি কোনও অধর্ম করিনি, কোনও পাপ করিনি। সত্যিকারের প্রেমই তো বড় ধর্ম। ওরা দু'জন দু'জনকে ছাড়া বাঁচবে না। হোক হিন্দু মুসলমান। আমি দু'জনকে মিলিয়ে দিয়েছি।

সেই সাহেব এখন এই শেষ বিকেলে অস্থিরভাবে বাগানে পায়চারি করছেন। পরনে আশি সুতোর মিহি লুঙ্গি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। হাতে সিগ্রেট জ্বলছে। আর ঘুরে ঘুরে চায়ের টেবিলের সামনে গিয়ে শ্রীনাথ রিকশাঅলার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আজ পূর্ণিমা। শ্রীনাথকে সকালবেলা বলে রেখেছেন, সন্ধেবেলা তার রিকশা চড়ে শহরের বাইরে যাবেন পূর্ণিমা দেখতে। বহুকাল খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা দেখা হয়নি তাঁর!

কিন্তু শ্রীনাথ হারামজাদা আসছে না কেন? সন্ধে হয়ে এল।

সাহেব আবার একটা সিগ্রেট ধরান। কেটলি থেকে ঠাণ্ডা চা ঢালেন কাপে। তারপর পায়চারি করতে করতে কাপে চুমুক দেন।

তখন কোয়ার্টারের পেছনে মরা ব্রহ্মপুত্র তার ওপারে শস্যের যে উদার মাঠ, সেই জায়গাটা ভেঙেচুরে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠে আসে। উঠেই লক্ষকোটি জ্যোৎস্নার রেখা পাঠিয়ে দেয় শহরের ওপর। মরা ব্রহ্মপুত্রের পুরনো হাওয়াটা সেই মুহূর্তে একটুখানি জোরদার হয়। জ্যোৎস্নার রেখা বয়ে আনে এসডিও সাহেবের বাগানে। চা খেতে খেতে সে দৃশ্যই দেখেন সাহেব, দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায় তাঁর। এই রকম একটা দৃশ্যই আজ শহরের বাইরে, খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল। সকালবেলা শ্রীনাথকে বলে রেখেছিলেন।

কিন্তু শ্রীনাথ হারামজাদাটা এখনও আসছে না। সাহেব ঘন ঘন সিগ্রেটে টান দেন। প্রচণ্ড রেগে গেলে যা হয় তাঁর।

তখন নিঃশব্দে শ্রীনাথের রিকশা এসে দাঁড়িয়েছে বাগানের ওপারে। গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে বুড়ো শ্রীনাথকে দেখতে পান সাহেব। খালি গা, কোমরের তলায় কোরা ধুতিটা লুঙ্গির মতো করে পরা। আর শ্রীনাথের কোমরে যে ময়লা গামছাটা দিনমান বাঁধা থাকে, সেটা এখন তার হাতে। শ্রীনাথ কি খুব ক্লান্ত! বহুদূর থেকে রিকশা চালিয়ে এসেছে!

গাছপালার আড়াল থেকে সাহেব দেখেন শ্রীনাথের বুকের হাড় শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে খেলা করছে। দাড়িগোঁফঅলা কালো মুখটা দিয়ে হা করে ব্রহ্মপুত্রের পুরনো হাওয়া খাচ্ছে শ্রীনাথ। জলের মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায়ও শ্রীনাথের চোখ দেখা যায় না। দু খাবলা অন্ধকার জমে আছে দুচোখে। হাওয়ায় বুড়ো শ্রীনাথের পাতলা চুল ফুরফুর করে ওড়ে। দেখে সাহেব তাঁর যাবতীয় রাগের কথা ভুলে যান। পূর্ণিমা দেখতে যাবেন শ্রীনাথকে বলে রেখেছিলেন, ভুলে যান। মনে মনে এই মুহূর্তে সাহেব কেবল একটা কথাই বলেন, তুই আমার ভাই।

তারপর আশি সুতোর মিহি লুঙ্গি পরা, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, সাহেব গিয়ে দাঁড়ান শ্রীনাথের রিকশার সামনে। লুঙ্গি গেঞ্জি পরে তিনি কখনও গেটের বাইরে যান না, এ কথা তাঁর মনে থাকে না।

সাহেবকে দেখেই সিট থেকে লাফিয়ে নেমেছে শ্রীনাথ। দেরি হয়ে গেছে সাব। ক্ষমা কইরেন। ম্যালা দূরে গেছিলাম।

সাহেবের ঠিক সেই মুহূর্তে পূর্ণিমা দেখতে যাবেন মনে পড়ে। কথা না বলে তিনি রিকশায় উঠে বসেন।

গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরা সাহেবকে রিকশায় উঠতে দেখে শ্রীনাথ খুব অবাক। আগেই খানিকটা হয়েছিল। দেরি করেছে, সাহেব তাকে একটুও বকল না যে! আবার এখন যে খালি গায়েই রিকশায় ওঠে! তবুও শ্রীনাথের কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না। সিটে বসে জিজ্ঞেস করে, টাউনের বাইরে যামু সাব?

সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যা।

তখন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে শহর। রাস্তার আলোগুলো জ্যোৎস্নায় মার খেয়ে পিটপিট করে জ্বলছে। দেখে ভীষণ বিরক্ত হন সাহেব। মনে মনে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকজনের ওপর বেজায় চটে যান তিনি। এই রকম জ্যোৎস্নায় ইলেকট্রিসিটির দরকার কী! কালই অর্ডার দিতে হবে পূর্ণিমা রাতে যেন শহরের রাস্তাঘাটে ইলেকট্রিসিটি না থাকে। অযথা অপচয়।

কিন্তু ততক্ষণে সারা শহরে খবর হয়ে গেছে, এসডিও সাহেব গেঞ্জি গায়ে রিকশা করে বেরিয়েছেন, রাস্তার দু'পাশ থেকে, বাড়িঘর থেকে, মুদি মনিহারি, পান-বিড়ি-সিগ্রেট-চায়ের দোকান, ডিসপেনসারি, লাইব্রেরি থেকে লোকজন সব অবাক হয়ে এসডিও সাহেবকে দেখছে। কেউ কেউ সালাম দিচ্ছে। সাহেব এসরের কিছুই দেখছেন না। সালাম নিচ্ছেন না। কেবল মোটা কাঁচের ভেতর থেকে চাঁদ দেখছেন, জ্যোৎস্না দেখছেন।

ব্যাপারটা খেয়লা করেছিল শ্রীনাথ। সাহেবকে দেখে পাবলিক মজা পাচ্ছে। গেঞ্জি গায়ে, লুঙ্গি পরা এসডিও সাহেব রিকশা চেপে শহরে বেরিয়েছেন এমন মজার দৃশ্য যেন জগতে আর নেই। কথাটা ভেবে শ্রীনাথ খুব বিরক্ত হয়। সওয়ারি হলো গিয়ে দেবতা। দেবতাকে দেখে লোকে হাসাহাসি করবে শ্রীনাথ তা সয় কেমন করে। সারা দিনের ক্লান্ত শরীর। জোর বল নেই গায়ে। রিকশা চালাতে পা টনটনায়, অবশ হয়ে আসে। তবুও প্রাণপণে হাওয়ার বেগে রিকশা চালায় শ্রীনাথ। পাপিষ্ঠদের চোখ থেকে যত দ্রুত নিকেশ হওয়া যায়।

মুন্সেফ কোর্ট ছাড়িয়ে একটা সিনেমা হল। সবে ইভিনিং শো শুরু হয়েছে। রিকশা হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, কথা নেই বার্তা নেই হৈ চৈ করে যাবতীয় লোকজন হল ছেড়ে রাস্তায়।

শ্রীনাথ বুঝতে পারে, সিনেমার দৃশ্যের চেয়েও মজার দৃশ্য রাস্তায়, সেই দৃশ্য দেখতে লোকজন সব বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু সাহেব কি এসবের কিছু খেয়াল করেন? করেন না। করে শ্রীনাথ। আর রাগে জ্বলে যায়। সওয়ারি হল দেবতা দেবতার অপমান শ্রীনাথ সইতে পারে না। বুড়ো শরীরের যাবতীয় শক্তি দুপায়ে এনে রিকশা চালায়। মুহূর্তে পেরিয়ে যায় জায়গাটা।

শহরের শেষ প্রান্তে পাকা বড় রাস্তাটা যেখানে শেষ, সেখানে হাসপাতাল। রিকশা সেখানে আসতেই সাহেব আকাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে হাসপাতাল বিল্ডিংটা দেখেন। সাদা বিল্ডিঙে জ্যোৎস্না পড়ে কী যে একটা দৃশ্য! রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরী মনে হয়। ভেতরে কি সোনার কাঠি রুপোর কাঠি শিয়রে রাজকন্য ঘুমিয়ে আছে! সাহেব ছেলেমানুষের মতো এই কথাটা ভাবেন। তারপরই চমকে ওঠেন। চিনতে পারেন, এটা হাসপাতাল। মনটা খারাপ হয়ে যায়। আহা, শরীরে অসুখ নিয়ে মানুষেরা শুয়ে আছে ওখানে! কষ্ট যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আছে। রোগকাতর মানুষর উদ্দেশে যিশুখৃষ্টের মতো অস্পষ্ট স্বরে সাহেব তারপর বললেন, ঈশ্বর উহাদের পরিত্রাণ করুন।

শ্রীনাথ বলল, এইবার কুন দিকে যামু সাব? পাকা রাস্তা তো এহেনে ঐ শেষ!

জ্যোৎস্নায় সাহেব দেখেন বুড়ো শ্রীনাথ ক্লান্তিতে ভেঙে চুরে যাচ্ছে।

দু'টো কথা সম্পূর্ণ করতে চারবার শ্বাস টেনেছে।

সাহেব বললেন, শহরের বাইরে যাওয়ার পথ নেইবে শ্রীনাথ?

আছে সাব। কাঁচা ঝাঁকানি লাগব আপনের।

লাগুক। তুই যা।

রিকশা থেকে মেনে আস্তেধীরে রিকশাটা হাতে টেনে নেয় শ্রীনাথ।

কাঁচা রাস্তায় নামায়। তারপর আবার রিকশায় ওঠে।

সাহেব দেখেন। শহরের বাইরে উদার শস্যের মাঠ প্রান্ত অব্দি। তাতে নিজের যাবতীয় জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে চাঁদ। আর চিরকালের পুরনো হাওয়াটা তো আছেই। এখন জ্যোৎস্নায় শস্যের মাঠে দুরন্ত শিশুর মতো লুটোপুটি খাচ্ছে।

সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আহা!

শ্রীনাথ সে সময় খুকখুক করে খানিক কাশে। সাহেব শোনেন শ্রীনাথের গলায সারা জীবনের ক্লান্তি। তারপর হঠাৎই চমকে ওঠেন তিনি। আহা, ভাই আমার ভাই। আমাকে এই এতদূর টেনে এনেছো। আমি মূঢ়, তোমার কষ্ট বুঝিনি।।

তারপরই চেঁচিয়ে ওঠেন সাহেব। শ্রীনাথ তুই পেছনের সিটে যা।

শুনে শ্রীনাথ হাসে, কেন সাব?

তুই তো আমাকে অনেক দূর নিয়ে এলি, এবার আমি তোকে খানিক দূর নিই।

শ্রীনাথ মূর্খ। প্যাঁচানো কথা বোঝে না। বলল, কী কন সাব?

তুই আরাম করে পেছনে বস। আমি রিকশা চালাই।

শুনে আঁতকে ওঠে শ্রীনাথ। হায় হায় কন কী সাব! আমার কুন দোষ অইছে! আস্তে চালাইছি। আপনে বহেন। দেহেন এহন কেমুন জোরে চালাই।

সাহেব হাসেন। না না ওসব কিছু না। তুই পেছনে বোস।

শ্রীনাথ কিছু বুঝতে পারে না। সিট থেকে নেমে কাঁচুমাচু হয়ে সাহেবের সামনে দাঁড়ায়। সাব আমার অপরাধ অইছে? আপনে রাগ করেছেন?

আরে না পাগল। তুই বোস। আমি চালাই। তুই তো অনেকক্ষণ চালালি। তাছাড়া নিজে তো সারাজীবন মানুষ টেনে গেলি, আজ কেউ তোকে টানুক।

এবার-কথাটা বোঝে শ্রীনাথ। বুঝে হা হা করে ওঠে। এইডা অয় না সাব। ভগবান মানুষরে এমুন কইরাই পয়দা করেচে। কে ঐ চিরদিন টাইন্না যায়, আর কে ঐ যায় বইয়া। আপনে বহেন।

এ কথায় সাহেব একটু রেগে যান। গলা ভারি করে বললেন, শ্রীনাথ যা বলছি কর।

তারপর লুঙ্গিটা হাঁটুর ওপর তুলে পরেন। চশমাটা খুলে দেন শ্রীনাথের হাতে। এটা চোখে পরে বোস। আর তোর গামছাটা দে আমাকে।

শ্রীনাথ কিছুই বুঝতে পারে না। বোকার মতো চশমটা পরে। আর গামছাটা খুলে দেয় সাহেবের হাতেই। তারপর জবুথুব হয়ে পেছনের সিটে উঠে বসে। সাহেবের পুরু কাঁচের চশমা তার চোখে। সেই চোখে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবকিছু অন্যরকম দেখে শ্রীনাথ।

শ্রীনাথের গামছাটা শ্রীনাথের মতো করে কোমরে বাঁধেন সাহেব। তারপর রিকশা চালাতে শুরু করেন। প্রথম কয়েকটি প্যাডেল মারতে তাঁর একটু অসুবিধা হয়। হ্যাণ্ডেল এদিক ওদিক ঘুরে যায়। তাই দেখে শ্রীনাথ হাসে। নামেন, পারবেন না সাব। যার কাম তারে করতে দেন। আমি রিকশায় বইয়া থাকুম আর আপনে রিকশা চালাইবেন, ভগবান সইব না।

সাহেব ততক্ষণে কায়দাটা শিখে ফেলেছেন। এখন আস্তে ধীরে চালিয়ে যাচ্ছেন। চোখে তাঁর চশমা নেই। চশমা ছাড়া পৃথিবীটা তিনি খুব অন্যরকম দেখেন। দু'পাশে শস্যেব মাঠ। তাতে নীল জ্যোৎস্না উপুড় হয়ে পড়েছে। আবহমান হাওয়াটা আছেই। শস্যচারা জ্যোৎস্নার উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। এসবের মাঝমধ্যিখান দিয়ে সাদা পথ। কোথায় কোন দূরে যে চলে গেছে। সেই পথে রিকশা চালান এসডিও সাহেব। পেছনের সিটে চশমা চোখে শ্রীনাথ। পৃথিবীটা সে এখন খুব অন্যরকম দেখছে।

সাহেব বললেন, শ্রীনাথ আজ তোব ভগবানের সঙ্গে দেখা করব।

চশমা পরা চোখে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রীনাথ। কথা বলে না। শস্যের মাঠে, আবহমান হাওয়ায় আর জ্যোৎস্নায় ভগবান যে কোথায় লুকিয়ে আছেন, দু'জন মানুষের কেউ তা জানে না।

সুপ্তমুদ্রা

মুর্শিদ এ. এম.

একটা আলোর রেখা কোথাও আছে। সেই বিশ্বাস নিয়ে সেই প্রশ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে রাশিন। কবে থেকে এই রেখার খোঁজতল্লাশ তা বুঝি মনেই নেই তার। তার মতো মানুষের। মানুষ হিসেবে সে কোনো অন্য প্রজাতির মধ্যে না পড়লেও সবকিছুতে তৃপ্ত, কথায় কথায় আপ্লুত, বেঁচে থাকার মজা নিয়েই যারা বেঁচে থাকে— তাদের মতো। অথচ কী আশ্চর্য সে কখনো এমনও ভাবেনি এই জগৎসংসার ছাপিয়ে মহিমান্বিত কোনোকিছুর মতো আলাদা হবে তার অস্তিত্ব। আলাদা হবে তার ভাবনাচিন্তা বা পরীক্ষানিরীক্ষার ভুবন। হয়তো এমন একটা কিছু রাশি মানতে চাইত যা তার ভাবনার জগতে নতুন অথচ তাতে সায় থাকবে অন্য সবায়ের। এটা কোনো চাপিয়ে দেয়ার মনোভাব থেকে আসে না। বরং সেই সহযোগিতা তার কাম্য থাকত যাতে সে অন্যজনের পাতে ঠাঁই পাবার যোগ্য হয়।

এটাকে যা-ই বলা হোক, কবে থেকে এটার উৎপত্তি তার সনতারিখ আজ আর বলা সম্ভব নয়। হয়তো এটার উৎপত্তিই ধরো, তো ধরা যাক সেই শৈশব সময়টাকে যখন রাশিন মাত্র দশ/এগারো। আর রাশিনের চারপাশে যখন ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষের এক বিচিত্র রূপ। যে মানুষকে সে সেই বয়েসে অবয়বহীন নিষ্ঠুর দেখেছে। আজকে যখন অনেক কিছু বোঝা ও জানার শেষ পর্যায়, যদি এই আটচল্লিশ বছরকে অনেকটাই প্রাজ্ঞতায় ঠাসা ধরা যায়, তো তখন দেখছে মানুষ অমন ঠ্যাঙাড়ে, কুৎসিত, অবিন্যস্ত চোখ কান ইন্দ্রিয়ের কালো কালো কোনো অপার্থিব বস্তু নয়। যারা সমাজে ঘুরে বেড়ায়, তারই মতো তাদেরও বউ বাচ্চা অফিস থাকে। জন্ম মৃত্যু, পেচ্ছাব, পায়খানা, সর্দি, কাশি, হাঁপানি, স্পন্ডেলাইটিস থাকে। বিচিত্ররূপটা সেই মানুষদের হাতে জ্বলন্ত মশালের মতো বিধবংসী অগ্নি আর এক হাতে পেট্রোলের মতো দাহ্য তরল, কোমরে গোঁজা ভোজালি বা রিভলবার। ওই বয়েসে দাদিমার কাছে শোনা রূপকথার দৈত্যদের সঙ্গে কিছুটা বুঝি বা মিল। কিন্তু সেই দৈত্যদের লড়াই ছিল রাজপুত্রদের বিরুদ্ধে। রাজপুত্তুরদের সুন্দর রাজ্যপাট আর সুন্দরী রাজকন্যেদের হাসিল করার জন্য। সেই বিষম প্রমাণ যুদ্ধ বা ধবংস কেমন করে মানুষে মানুষে একই সমকক্ষতায় কিংবা নিরুপায়তায় ব্যবহৃত হল— তা ভেবে কূল-কিনারা পায়নি।

হয়তো সেই মানুষদের অন্য কোনো অপার্থিব বস্তু হিসেবে মনে দাগ কেটে থাকার দরুণ মনে হয়েছিল আববা বা মা, কেউ একজন তার কাছে থেকে তাকে অন্তত দুশ্চিন্তামুক্ত ঘুম এনে দেবে— তাহলে সে ফিরে পাবে মনুষ্যত্বের সৌন্দর্যময় কোনো ব্যাখ্যা। কিন্তু রাশিনের চারপাশে বন্ধ হয়ে গেছিল সেই পথ। বন্ধ হয়ে গেছিল আলো আসার সমস্ত আয়োজন। অথচ রাশিনকে বড় হতে হবে, মানুষ হতে হবে, লেখাপড়া শিখে এগিয়ে যেতে

হবে। এই বিবেকবাণী বা নির্দেশাবলি সেই সময়ে সেই আবহের পক্ষে মারাত্মক কেননা সে এক গন্ডগ্রাম যেখানে নববই শতাংশ মানুষ নির্ভর করে থাকেন রাশিনের অভিভাবকদের জমিজমার খেতবাগানের ফসল মাছ সব্জি কলা কচু চুরির ওপর। সেটা চুরি না অধিকারবোধ তা-ও স্পষ্ট ছিল না সে গাঁয়ের মানুষদের।

তবু রাশিন শিক্ষা পেয়েছে, দীক্ষা পেয়েছে, বড় হয়েছে হয়তো অনেকটাই ঝুঁকে গেছে মরণের দিকেও। মরণের চারপাশ দেখাও হয়েছে ঢের। অথচ হায়, আলোর সেই ক্ষীণ রেখা! তবে কি আলোয় নিশানে ছুটে বেড়ালে অধরা থাকে সেই ঔজ্জ্বল্য! আঁধারই কি তবে শেষ আশ্রয় ওই রেখাটির ফিরে আসা! চর্চা করেছে যতবার, তত সরে যেতে হয়েছে নিবিড় কোণে। সেই ঘুপচিতে কোনো আত্মীয় নেই, পরিজন নেই, পড়শি-প্রতিবেশী নেই। অদৃশ্য এক নিরেট দেয়াল কবে যে দাঁড়াল মাথা তুলে। তার আর তাব চারপাশের বেঁচে থাকার মাঝে।

সজীবতার এই নিশ্ছিদ্র ফাঁক বুঝি টের পেয়ে থাকবে জীবেশ। জীবেশ, রাশিনের আঠারো বছরের ছেলে। সে জোগান দেয় নানা গল্পের, নানা কলহ আর পৃথিবীর যে গতি রয়েছে তার সঙ্গে সাযুজ্য সমান নানান ওঠাপড়া। ষোলো বছরেই সে ধরেছে বাবার হাত। যে হাতে তীব্র তেজ আর একরাশ সহানুভূতি। মায়ের কাছে বহু শুনেছে সে বাবার কাহিনী। যেন বাবাকে মায়ের মতো দয়াময়ীরা বহুকাল চেনে। যেন অবলীলায় বলে দিতে পারে রাশিনের জন্মানোর আগেও রাশিনের জীবনে কী কী ঘটেছিল সেই বৃত্তান্ত। মা আসলে চিনেছিল। রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা মানুষ কেমন কেমন ভাবে সঞ্চয় করে যাবতীয় ক্ষোভ, যাবতীয় আঁধার জড়ো করে। সামনা-সামনি এহেন দাম্পত্যে প্রায়শই জটিল রোগের মতো কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে— দেখেছে জীবেশ। আড়ালে সেই নারী পুত্রের কাছে ভেঙে পড়ে। অনুশোচনা যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে আর এক প্রজন্মের নয়া পৌরুষের কাছে। এই আবডাল কিছুতেই ভেঙে কখনো ঢোকেনি রাশিনের পৌরুষ। ঢুকতে গেলে যে সাহস লাগে সে সাহসের উলটো পিঠে লেখা থাকে সন্দেহ নামক ক্লিশে বস্তুটি। কিংবা নিজেকে অন্যের চোখে মহান দেখার সুপ্ত কাঙ্ক্ষা। এমন আপজন কে কবে দেখেছে, যে একজনের মহানতার ছায়ায় বেঁচে থাকবে! অথবা মহানতা ব্যাপারটাই তো ভুলের পর্বত। সেটা ঢাকতে পেরেছে জীবেশ। কখনো সে বাবাকে মনে করেনি মহানতা নিয়ে মাথা ব্যথা আছে। বাবা তার কাছে বন্ধুর মতো কোনো এক অবিশ্রান্ত ঝরণার জল। অকাতরে নেবে যাচ্ছে নেবেই যাচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে মাটি-পাথরে। যেটুকু রেখে যাচ্ছে— তা বোধহয় রিনরিন শব্দে জলের আভাস। জলীয় মিষ্টি নরম আভাস।

তবে কোথায় এক টুকরো নদীও আছে, এ কথা জানতে বেগ পেতে হয়নি তার। বাবা কি সেই নদীর অপেক্ষায়?

জীবেশ প্রায়ই প্রশ্ন করত, তুমি না থাকলে, মানে তোমরা দু'জন না থাকলে কি আমি হতাম?

মা বলত, দূর পাগল, আমরা না থাকলে কী করে তুই হতিস?

বাবা বলত, আমি না থাকলেও তুই আসতিস। তোর মতো করে তুই বেড়ে উঠতিস, যেমন অসংখ্য জীবকূল বেড়ে আসছে।

— তাহলে কি আমি, এই জীবেশই হতাম।

— হ্যাঁ, তুই তা-ই হতিস। জীবেশ। আর তোর কোনো মোহ থাকত না, যেমন এখনও না থাকার কথা বলি— সেই পিতৃপরিচয়ের মোহ। আপন পরিচয় তুই নিজে বানিয়ে নিতিস।

জীবেশ এসব মনে করতে করতে বইয়ে ঢুকে যেত। এক পাঠ থেকে অন্য পাঠে। এক বই থেকে অন্য বই হয়ে বাবার লেখা বইয়ের ভেতর। না এই রাশিন তার বাবা নয়, সে এক অন্য কেউ, যেমন আরও আরও লেখক সে পড়ে ফেলেছে। এই পাঠের মধ্যে কোনো আত্মীয়তায় না যাওয়ার খেলায় জীবেশ হতে পারত পাঠনির্ভর। তার পড়াশোনায় সে খুঁজে পেতে পারত আর এক জগতের ছাড়পত্র। আর একেবারে সেই জগতে কারও ঢোকার অনুমতি নেই। কোনো লেখকেরও নেই। লেখা হয়ে যাওয়ার পর কে আর খোঁজ নেয় লেখক লোকটা কীভাবে কেন কী জন্যে এই রচনা লিখে গেছে। জীবেশের কাছে ঠিক এই একা হওয়াটাই যেন মিলিয়ে দিত রাশিনের সঙ্গে। রাশিনের একাকীত্বের সঙ্গে।

বাবা ভীষণ একা তার মনে হত। বাবাকে কি সে জিগ্যেস করবে, বাবা, তোমার বন্ধুবান্ধব নেই কেন? তোমাকে কারও সঙ্গে গপ্পো করতে দেখি না কেন? কোনো কুটুমবাড়িতে যেতে চাও না কেন?

জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না। একবার বাবাও নাকি তার বাবাকে জিগ্যেস করেছিল, তোমার কি একটাও বন্ধু থাকতে নেই?

দাদু বলেছিলেন, 'সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেউ কারও নয়।' আমারও বন্ধু ছিল। বন্ধুদের নিয়ে রিডিং লাইব্রেরিও করেছিলাম। প্রায় শ'দুয়েকের মতো বই ছিল। কিন্তু একদিন কোথায় কী হয়ে গেল। শেষে দেখা গেল যাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারছি— সে মানিটর বলো আর ফিজিক্যালি, সে-ই একমাত্র টিকে থাকছে। যখন সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেল, ব্যস— অল দ্য ডেজ হ্যাভ গন। তোমার বন্ধুবান্ধব আছে, মিতালি করছ— এটা তোমার রক্তে আছে— কিন্তু তুমি এখনই বিশ্বাস করতে পারবে না কীভাবে তোমার কোনো বন্ধুই থাকবে না। বন্ধুত্বের জন্যে কাঁদবে, কবিতা লিখবে, সভা ডাকবে, নেমতন্ন করবে, কিছুতেই কিছু হবে না। দাদু বলতেন। বাবা নিশ্চয়ই তখন দাদু আর তাঁর বন্ধুদের ফ্রেমে বাঁধানো ফটো বাক্স থেকে বের করে দেখে থাকবে।

বাবা একসময় এ পাড়ায় গড়ে তুলেছিল ক্লাব। নাটক নিয়ে মাতামাতি ছিল প্রায় কিংবদন্তীর

পর্যায়ে। নিজে নাটক লিখে— এই বাড়ির দোতলা তখনও হয়নি, রিহার্সাল হত। গাঁটের পয়সা খরচ করে নাটকের ছেলেমেয়েদের টিফিন। মহিলা আর্টিস্টের গাড়ি ভাড়া। এসব শুনেছে মায়ের কাছে। কিন্তু বাবা দরকার মনে করেনি সে-সবের ছবি তুলে রাখার। কিংবা ছবি হয়তো আছে কারও ক্যামেরায় তোলা— তার খোঁজ পাওয়া যাবে না কোনোদিনই। বাবা দরকার মনে করেনি কোনো ডায়েরি লেখার। ডায়েরি মানে তো নিজের কাহিনী সাতকাহন করে বলা, আর তা যাতে দশজনে পড়ে বাহবা দেয় সেজন্যই রচনা করা। বাবা এভাবে নিজের জন্যে কখনো লেখেনি। বাহবা পাবার জন্যেও নয়। বাবা শুধু বলে, এদের নিয়ে আর একবার ইচ্ছে করে একটা নাটক নামাতে। এদের বলতে এ পাড়ায় এখন যাদের মাথায় বেশির ভাগ চুলে কলপ আর যাদের দাড়ি বিশেষ এক আবরণের জন্যে বানানো। তারা জীবনের অন্য এক জগতের মানে খুঁজে নেয়ার জন্যে হন্যে হয়ে কঠোর ধর্মাচরণের ঘেরাটোপে বন্দি। তবু একবারও কি তারা মেলাতে চায় না দুই মেরুর জীবনকে। আদতে কি দুটো মেরুই? না কি তা শুধু তাদের মানসিক এক কল্পলোকের সাড়া। মানুষের জীবনে এমন বিষম মেরু কি সম্ভব? যে এক আচরণে অভ্যস্থ হলে অন্য আচরণ করা যাবে না?

তেমন এক চরিত্র বাবাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। কী চমৎকার ছিল তার কণ্ঠস্বর, কী দুর্দান্ত দাপট ছিল তার প্রতিটি অভিনয়। পাড়ার যুবকদের মুখে মুখে তখন সে হিরোর মতো উচ্চারণ পেত। সে হল শামিম।

শামিমের সঙ্গে আরও যারা সাধারণ যুবক রাশিনের সঙ্গে মিলে নানান গতি আনার চেষ্টা করছিল এই সমাজের মানুষের মনে একটা প্রবল নাড়াচাড়া টের পেয়েছিল রাশিন— তারা রাশিনের মতো নয় বলেই দলবদ্ধভাবে সরে গেছিল নিতান্তই সাধারণ স্তরে। কীভাবে সমাজের মাথা হব, কীভাবে আরও অর্থবান হব, কীভাবে দখল নিতে পারব পাড়ার মাতব্বরিতে— এই চিন্তা তাদের ছেঁকে ধরেছিল। অথচ রাশিন জানে এই সম্মান অন্যভাবেও পাওয়া যায়। শামিমের দলে তাই যারা আছে বা থাকাই সম্ভব— তাদের সঙ্গে কখন যেন দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল রাশিনের। দূরত্ব অথচ তা টের পেতে হয় অন্তরে। বাহ্যিক তারা কেউ কারও ছায়া মাড়ায় না এমন নয়। কিন্তু ক্রমশ অন্তর-দূরত্ব বেগবান।

জীবেশও কি আক্রান্ত হয়েছিল রাশিনের এই চিন্তার দূরত্বে? নয়তো সে কেন বুঝতে পারে, শামিম যেভাবে হাঁটেন, শামিম যেভাবে সকলকে আহ্বান করেন, শামিম যে যে পোশাক পরেন— তা কেবল অহং-এর প্রদর্শন মাত্র। পারিবারিক কোনো এক অনুষ্ঠানে যখন রাশিন একবার শামিমের পরামর্শ নেয়ার কথা আলোচনায় আনে, তখন কেন জীবেশের মনে হয়, বাবা এটা ঠিক করছে না! কেন সে বলে ওঠে, বাবা, এটা তোমার করা চলবে না। তুমি শামিমকাকুর কাছে যাবে না। কাজটা তো তাঁরও তিনি কেন আসছেন না তোমার কাছে? তাদের ঘরের আলোবাতাস স্তব্ধ করে দিয়ে যে ফ্ল্যাট তিনি বানাতে চলেছেন— তার কথাও কি অজানা থেকেছে জীবেশের?

রাশিন এখন ব্যস্ত তার আগামী রচনার ঘোরে। আশপাশে বান্ধব তার আলমারিতে ঠাসা বই ছাড়া অন্য কিছু না। আর লেখার শাদা পাতা, কলম। এখানে এক ছোট্ট পরিসরে, যেটা তার বাড়ি থেকে দূরে প্রায়ই রাশিনকে চলে আসতে হয়। লেখার তাগিদে তো বটেই, হয়তো একাকীত্বের মর্মান্তিক চাপ আরও টের পেতে। কেন না তার লেখার গৌরব তো এনে দেয় ওই একাকীত্বের পীড়নই। একটা সঙ্গী কেবল ছোট্ট হ্যান্ডসেট। শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কল নেয়ার জন্যে। ইচ্ছে করলে অপ্রয়োজনীয় বিরক্তিকর ডাককে উপেক্ষা করা চলে।

বাড়ি থেকে, যে নম্বরের সঙ্গে জীবেশ লিখে দিয়েছে 'ব.বা' সেটা এখন এই বেলা একটার দিকে ভেসে উঠল মোবাইলের পর্দায়। ওদিকে জীবেশ বলে ওঠে, বাবা, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায় শামিমকাকু।

শামিম! নিশ্চয়ই বাড়ির ফোনে কথা বলতে এসেছে সে। মানে বসার ঘরে এতদিন পর শামিম! কী মনে করে? ভাবতে ভাবতে জীবেশের স্বর বিষয়টিকে নির্দিষ্টতা দেয়— আসলে কাকু তোমার ওখান থেকে মেজোদাদুকে খবর দিতে বলছে, আছে ওখানে?

— আছে, ধরো দিচ্ছি ডেকে।

— নাও, শামিমকাকু কথা বলবে—

— হ্যাঁ বলো শামিম।

— বড়দা, আমি শামিম বলছি। অদ্ভুত গম্ভীব টানটান গলায় বলে শামিম। একটু ওনাকে ডেকে দিলে ব্যাপাবটা বলি।

— কী ব্যাপারে?

— তোমাকেই তাহলে বলছি। মেজো চাচা হজে যাবেন, ওনার ফর্ম জমা দেয়ার লাস্ট ডেট আজই। এখুনি আমরা রওনা দিচ্ছি তা ওনাকে নিয়েই যাব। আমরা অপেক্ষা করছি, ব্যস এটুকু বললেই হবে। উনি সব জানেন।

শুনতে শুনতে এক তন্ময়তা ঘিরে ধরেছিল রাশিনকে। যেন কিছুই শোনা হয়নি, সেভাবে বলে— আমি তাহলে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওঁকে।

— ঠিক আছে। রাখি?

— এক মিনিট শামিম। তারপর কথা গুছিয়ে নিতে একটু সময় যায় রাশিনের। তোমার কণ্ঠস্বর কিন্তু তেমনই ভরাট আছে শামিম। এতদিন পর খুব কাছ থেকে নিভৃতে তোমার গলা শুনলাম। অবিকল গৌরাঙ্গর গলা!

— তাই নাকি? হো হো হেসে ওঠে ফোনের ওপারে শামিম। ওসব পুরনো কথা।

— ভুলতে পারো, ভুলে গেছ সে সব?

— ভোলা যায় না। আবার স্মৃতি নিয়ে তো বেঁচে থাকা যায় না। দুনিয়াটা খুব জটিল হয়ে উঠছে দাদা। বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। মানুষ বদলাচ্ছে বলেই হয়তো।

— আমার কী মনে হয় জানো? তুমি আমি বদলাতে চাই না। কেবল সময়ের সঙ্গে

জুতে যাই। ভাবতে পারো সেই নাটকটা যদি এখনকার সময়ে করা যায়? এসো না, নাটকটা আবার করি। স্বপ্ন নিয়ে, স্বপ্নের নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে— করবে শামিম? ওদিকে থেকে আবার হাসি শোনে রাশিন। অট্টহাস্য নয়, অভিজ্ঞ, সুনির্দিষ্ট হাসি। তারপর শামিম বলে, রাখি বড়দা। একটু তাড়া আছে।

ফোন রাখার পর বাবার কথা ভেবে কেমন যেন আহ্লাদ জড়ো হয় জীবেশের ভেতর। শামিমকে কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসে। এ যেন দাদুর সঙ্গে রিকশায় পাশাপাশি বসে তাঁর চশমা বদলাতে যাওয়ার সেই সময়। যখন মোড়ে মোড়ে বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে অনেকেরই শুভেচ্ছা বিনিময়। এত মানুষ দাদুকে চেনেন! এত নমস্কার এত সালাম! কী জিততে জিততে চলেছে তার দাদু? বোধহয় সম্মানের চেয়ে বড় সততার বিনিময়, যা সারাটা জীবন সঞ্চিত ছিল তাঁর অফুরন্ত। এর জন্যেই কি তিনি অমন নিঃসহায়, একা হয়ে গিয়েছিলেন শেষ জীবনে! বাবার মতো!

— কাকু, একটু ওয়েট করে গেলে হত। বাবা এসে পড়বেন। যেতে যেতে বলে জীবেশ।

— নাঃ, আবার না হয় আসবখন।

— আচ্ছা কাকু, যাঁরা একা একা থাকেন, তাঁরা কি ভালো লোক?

— হঠাৎ এ কথা বলছ? অবশ্য তুমি তোমার বাবার মতোই তো বলবে। কেন বলছ এ কথা?

— বাবা একদম কারও সঙ্গে মেশে না। এটা তো খারাপ। থমকে দাঁড়িয়ে থাকে শামিম। কী বলা যায় এই পরিণত বালককে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অবয়ব-সীমান্ত হীন আকাশের তলায়। দু'জনে। কাঁধে হাত রাখে জীবেশের। আসলে কী জানো বাবা, কীভাবে যেন মানুষ-মানুষে আলাদা পথ হয়ে যায়। কারও একাকীত্ব চোখে পড়ার মতো কারও দেখা যায় না। যখন আয়নার সামনে তুমি দাঁড়াও একা হও না? তেমনি প্রার্থনায়, ঈশ্বরের সামনে, কবরে...... শেষ বিচারের দিনে....। তোমার বাবা সাধনায় থাকেন, অহরহ থাকেন— একা তো হবেনই....। আর আমরা? দুটো পথ যে কীভাবে মিলবে.....?

বাড়ি ফিরতে আবার সংসার ভিড় করে রাশিনকে ঘিরে। জীবেশের গোপন আনন্দও এতক্ষণ যা তার বাবাকে নিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ে রাশিনের ওপর। একটু বিশ্রামের সময় দিয়ে অনেক রাতে, যখন তারাদের চুপিচুপি কথা শোনার জন্য ছেলেকে কতবার জাগিয়ে তুলেছে রাশিন, সে-সময় জীবেশ বাবাকে বলে, বাবা, শামিমকাকু তোমাকে 'বড়দা' বলে?

— হ্যাঁ বলেই তো।

— উনি তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট?

— দেখে কী মনে হয়?

— এতদিন দেখে মনে হত বড়। রাশিন বুঝতে পারে এ বড়ত্ব-র মানে ভিন্ন। অনেক কিছুই মানুষকে বড় করে তোলে। জীবেশ সেরকম কোনো বড়-র সন্ধান পেয়ে গেছিল এতদিন।

— তাই নাকি? কখন শুনলে তুমি?

— ফোনে যখন কথা বলছিলে তোমরা। তারপর ওনার সঙ্গে কত কথা হল।

— কী কথা হল?

— বললেন, তোমার বাবা যদি একবার মসজিদে যেতেন। সেখানে কত মানুষ, তারা তোমার বাবাকে হিরে জহরতের মতো মাথায় করে বাখত।

বাশিন অবাক চোখে যেটুকু ছায়া ফুটে ওঠে ছেলের মুখে তাতে দেখতে চেষ্টা করে কোনো আঁকিবুকি রেখা, কাটাকুটি খেলা। খুব ধীরে ধীরে আবার জিগ্যেস করে, কাকু আর কী বললেন?

তোমার কী কী বই বেরিয়েছে জানতে চাইলেন, তোমাব লেখালিখির খবর। এইসব। আর— যখন কথা শেষ হয়, পাঁচটা আঙুলে কী যেন দেখালো।

এই রকম? একটা মুদ্রা মেলে ধরে জীবেশের সামনে। জীবেশ মাথা নাড়ে, হ্যাঁ। চমকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রাশিন। মনে আছে, মনে আছে শামিমের? নাকি শুধু মনেই নেই, মুদ্রাদোষেব মতো মিশে গেছে রক্তে!

ছেলেকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না গোছের সান্ত্বনা দিয়ে ঘুমোতে বলে একটা ট্যাবলেট খায় রাশিন। রোজই খেতে হয়। তারপর খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারে নিজের হাতের আঙুল নিয়ে ফিকে আবছার নীচে সেই মুদ্রাটি বানায় তারপর বিড় বিড় করতে থাকে— প্রতিবাদ, প্রতিবাদ কি শুধু অস্ত্রে থাকে? থাকে প্রেমে ভালোবাসায়..... নীরবতায়। থাকে রক্তের উষ্ণ স্রোতের অনু পরমাণুতে....। সে কথা কি তুমি জানো রাজ সেনাপতি... ?

শরীর ঠকঠকিয়ে কেঁপে যায় রাশিনের। ওই পাশের প্রতিবেশি ছাদটাই তো শামিমের মাথার ওপর আশ্রয় বিছিয়ে আছে। শামিম কি ছাদে দাঁড়িয়ে তারই মতো প্রার্থনা কবতে পারে না? তার বিনীত মুদ্রার সঙ্গে মুদ্রা মিলিয়ে বলে উঠতে পারে না গৌরাঙ্গ-ব সেই সংলাপ! যে মুদ্রা·সে দেখিয়েছিল জীবেশকে, অজান্তে, প্রাত্যহিক ব্যবহার্যতায়।

ছাদ ক্রমশ স্পষ্ট হয়। অট্টালিকার অবয়ব স্বচ্ছ হয় ধীরে ধীরে। তবু সে বৈভবকে চাপা দিয়ে কোথাও যেন অতিপ্রাকৃতিক এক অস্বচ্ছতার চাদর জড়িয়ে থাকে সমস্ত শিখরের ওপর। রাশিন হাতের মুদ্রার ওপর নির্ভর, নেমে আসে নীচে।

সৃষ্টি

শেখর আহমেদ

সুরমা সেনগুপ্ত। সুরমা। সুর্মা। কাগজে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে নিজে ভ'রে উঠি, নিজেই অতৃপ্ত হই। আঁকিয়ে নই আমি। হাতের লেখা আমার কোনোকালেই দৃষ্টিনন্দন নয়। পড়াশোনার তালে তালে যতটা হস্তলিপি ঘষা মাজায় মুক্তাক্ষরের অধিকারী হওয়া যায় ততদূর এগোনোর কপাল আমার হয়নি। হাইস্কুলের মাঝপথেই অকস্মাৎ বজ্রপাত। যবনিকাপতন চিরকালের মতো। বাপ তো নয়, সাপ। আমার ভাগ্যের কপালে সাঁৎ করে নিদান-ছোবল চড়িয়ে দিব্যি হাওয়া। তারপর আমার গর্ভধারিণী। 'আমায় অকূলে ভাসিয়ে তুমি কোথায় চলে গেলে গোও'— বলে সেই যে চ্যাঁচানি শুরু করলেন, তা থামল বছর ঘুরতেই— একেবারে তাঁর চরণচিহ্ন ধরে হাঁটা দেওয়ার পর। আর আমি শাখামৃগ পড়ে রইলুম চিৎপাত হয়ে। চন্দ্র সূর্য আকাশ বাতাসের দাক্ষিণ্যে। মহা উল্লাসেই থাকতে হল। বাবা মা যুক্তি করে আমার নামকরণ করেছিলেন মহোল্লাস। চার চারটে মরাপুত্র মাটিতে আছড়ানোর পর আমায় জ্যান্ত টেনে আনা। উল্লাসের ব্যাপার নয়?

ছেলেবেলায় হাতুড়ি আর ভোঁতা দা দিয়ে পাথর নিয়ে কারিকুরি করে যেতাম। ধ্যাবড়া শিবের বাহন কিংবা থ্যাবড়া মুখের আদল। বাবা মাকে ডেকে বলতেন, নাও, কলমপেষা ছাপোষা কেরানির ব্যাটা রামকিংকর হবে। রত্নগর্ভা তুমি। তোমাব আর ভাবনা কী? এখন থেকে ঠ্যাং ছড়িয়ে পানের বাটা সাজানো অভ্যেস করো। সুখ নয়, তোমার হবে সুখের ওপর শতরঞ্চি, তার ওপর চেয়ার-বেঞ্চি।

রামকিংকরের নাম সেই প্রথম শোনা। একটু উঁচু ক্লাসের দাদাদের জিজ্ঞেস করে জানলুম, তিনি এক কিংবদন্তী ভাস্কর। পাথর কুঁদে মূর্তি বানানোকে ভাস্কর্য বলে।

বাবা কোনো কথা সহজ করে বলতেন না। এম. এ. পাশ করেও ছোটখাটো সওদাগিরি অফিসে কেরানির জীবনে প্রাণপাত। জীবন সম্পর্কে হতাশা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। এই ব্যাপারটাই আমাকে জেদি করে তুলেছিল। আমাকে রামকিংকর হতে হবে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো হতে হবে। ভাস্কর্য নিয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত মাস্টারমশাইদের হাতে চড়-থাপড় খেতেই শুধু বাকি, তখন বাবাই তাঁদের নিষ্কৃতি দিয়ে গেলেন।

রাত একটা। শরতের হিম পড়ছে বাইরে। পুজো আসি আসি। এই ক্যাম্পাসে প্রচুর গাছ। যেন জঙ্গল ঘেরা। দোতলার বেশি বাড়ি করার হুকুম নেই। সবাই উচ্চশিক্ষিত। কেউ বড়ো চাকুরি, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ভাস্কর, কেউ কবি। শুধু আমি গণ্ডমূর্খ। আমি ম্যাসিওর। ম্যাসাজ করি। আমি অ-কুলীন এদের মাঝে। আমার সঙ্গে কাষ্ঠহাসির সম্পর্ক ওদের। তবু

ওরা কত নগণ্য, কত তুচ্ছ আমার কাছে। আমার যা সম্পদ, তার কানাকড়ি ওদের নেই। আমি রূপকার। সাত এর বি প্লটের জগন্নাথ চৌধুরী নামকরা আর্কিটেক্ট। দু-দুটো গাড়ি। বাড়ির গড়ন, চেয়ার টেবিল, সোফা সেট— সব কিছুতেই তাঁর সুচারু শিল্পী ভাবনা প্রকট। নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ওদের কাজ তো মরা বস্তু নিয়ে। কেটে-কুটে, জোড়াজুড়ি দিয়ে দাঁড় করানো। কই, আমার মতো জীবন্ত শরীর নিয়ে কারিকুরি করুক তো দেখি। গড়ে তুলুক— ইচ্ছেমতন।

পাশের বাড়িতে চড়া কস্তুরী ধূপ জ্বলছে। নেশা যে কত বিচিত্র হয়। সুহাস কুণ্ডুর নেশা ধূপ জ্বালানো। ইয়া মোটা মোটা কঞ্চির মতো কাঠি। বাঙ্গালোর থেকে ভি পি পি-তে আসে ওঁর জন্য। এক একটা স্টিক জ্বলে অন্তত চার ঘন্টা। গন্ধে ম ম করে বাতাস। ভালো লাগে। পুজো পুজো পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ে সারাদিন।

পুজোর কথা মনে আসতেই মনে পড়ে গুরুদেবের মুখ। মাত্র একটা দিন। দিন নয়, রাত। আলো আঁধারিতে কপিলমুনির আশ্রমের পশ্চিমে একটা গাছের নিচে দেখা কিছুক্ষণের সেই দুর্মর স্মৃতি। দু'বছর আগের কথা। ঘুরতে ঘুরতে হাজির গঙ্গাসাগরে। সংক্রান্তির তখনও দু'দিন বাকি। রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের কাছে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটছি। গাছের নিচে জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে গম্ভীর ডাক এল, বেটা, ইধার শুন।

এগিয়ে গেলাম। শ্মশ্রু-গুম্ফ মণ্ডিত এক সন্ন্যাসী। মাথাভরা কালো চুল, কিন্তু জটা নেই। রক্তাম্বরধারী। দেখলাম তাঁর সামনে ইটের উনুনে পিতলের ছোট হাঁড়ি চাপানো। কয়েক টুকরো শুকনো কাঠ। শুধু আগুন জ্বালানোর প্রতীক্ষা। উনি আদেশের সুরে বললেন, জারা ম্যাচিস দে।

তখন প্যান্টের নিচে, মোজার মধ্যে সিগারেট দেশলাই গুঁজে রাখার চল উঠেছে। আমারও ছিল। কিন্তু মাথায় বদ বুদ্ধি চাপল। সাধু সন্ন্যাসীকে কোনোদিনই পছন্দ করি না। বললাম, ম্যাচিস তো নেহী হ্যায়।

সাধু তীক্ষ্ণ চোখে চাইলেন আমার মুখে। দূর থেকে আসা আলোর আভায় জ্বলছে যেন চোখের মণি। হিসহিসিয়ে বললেন, নেহী তো তেরা স্টাকি মে কেয়া হ্যায়?

চমকে উঠলাম। অবশ হয়ে মোজায় হাত বাড়াচ্ছি, সাধু প্রবল অসন্তোষে প্রায় কুকুর তাড়ানোর মতো করে উঠলেন, যা যা ভাগ। কেয়া সোচা হ্যায় তু, তেরা ম্যাচিস বিনা আগ নেহী জ্বলেগা?

বলেই সজ্জিত কাষ্ঠের ওপরে সজোরে দুই তালু দিয়ে ঘর্ষণ করলেন। ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠল।

হঠযোগ না কি করে যেন আগুন জ্বালানো যায়, শুনেছিলাম। অভ্যাসের ব্যাপার, দৈব কিছু নয়। জানতাম। তবু নড়তে পারলাম না। মাটিতে যেন পা গেঁথে গেছে। সাধুজি বার

বার কুকুর খেদানোর ঢঙে আমায় চলে যেতে বলছেন। রাষ্ট্র ভাষায় উত্তম জাতীয় দু'একটা গালমন্দও কপালে জুটছে। আগুনের আভায় তাঁর মুখ যেন কঠিন নির্মম ঘাতকের মতো। কিন্তু আমি নড়তে পারছি না। আমার ভয় করছে না, চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। আমি বিবশ হয়ে গেছি।

আগুন নিভে এল। সাধুজি অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বললেন, নেহী যায়েগা? তো, হাত মুহ ধো লে। বলে জলের ঘটি দেখিয়ে দিলেন। আমি এগিয়ে গেলাম। মুখে হাতে জল দিয়ে জুতো খুলে বসলাম। সাধুজি দু'টো পাতায় ভাগ করলেন ভোগ— লে, খা লে।

অমৃত। জীবনে এত সুন্দর কিছু খাইনি। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ভেতরে ভেতরে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। হু হু করে বদলে যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে বসলাম তাঁর পায়ের কাছে। সাধুজির কণ্ঠে এখন অপার স্নেহ। মুখ শিশুর মতো সরল। বললাম, সাধুজি, ভগওয়ান ক্যায়া হ্যায়? দেখা হ্যায় আপনে?

উনি বলতে শুরু করলেন। পুরাণ থেকে শুরু করে বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহিব, ওল্ড টেস্টামেন্ট ....

আমি শুনছি। কিছু বুঝছি কিনা জানি না, কিন্তু শুনছি। যেমন করে সমঝদার শ্রোতা সুরবাহার শোনে। চেয়ে আছি ওর মুখের দিকে অপলক। যেমন করে নবজাত শিশু তার মায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

কথায় কথায় এও বেরিয়ে এল, বন্ধনের জীবনে উনি মাত্র তিনটে এম. এ. একটা পি এইচ ডি, আর একটি ডি লিট-এর মতো সামান্য বিদ্যাচর্চা করেছেন। একথা বলে একটু লজ্জিত হলেন। আমার সব কিছু জেনে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী হতে চাই জীবনে?

আমার অবশ-চেতনা কথা কইল। বললাম, আমি তাঁর চরণে আশ্রয় চাই।

সাধুজি হাসলেন,— বাবা বিশ্বনাথজি কা চরণোঁ মে স্থান লে বেটা। আমি কে? পড়ে আছি গাছতলায়। খাওয়া কবে জোটে, কবে জোটে না।

তাঁর আশ্রয়ে কোন আহার জোটে, সে অমৃতের সন্ধান তো আমি পেয়ে গেছি। আমাকে আর ভোলানো সহজ নয়। আমি নাছোড়বান্দা।

উনি বোঝালেন। দুনিয়ার পিয়াস না মেটা পর্যন্ত, দুনিয়াদারির বাইরে আর এক পিয়াস আপনি না জেগে ওঠা পর্যন্ত সে পথ তার জন্যে নয়। তাতে একূল ওকূল দু-কূল নষ্ট হয়। আমার ভাস্কর হওয়ার অতৃপ্ত স্বপ্নের কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। কী যেন ভাবলেন সামান্য সময় তদ্‌গতভাবে। তারপর বলে উঠলেন, কেয়া, মূর্তি বানায়গা? পাথরো কা? ছোড় দে। ইয়ে লে।

ঝোলার মধ্যে হাত গলিয়ে বের করে আনলেন এক জোড়া দস্তানা, —জিন্দা ইনসান কা শরীর বানায়গা তু। য্যায়সা তেরি মর্জি। পহন লে। যা, ঘর যা।

পশম পশম। ভেতরটা উষ্ণ। লোমশ প্রাণীর শরীরের মতো। হাতে গলাতেই সারা শরীরে শিহরণ। আনমনা হয়ে ফিরে গেলাম অস্থায়ী ধর্মশালায়। নিশি-জাগা ঘুম ঘোরে তিনি, চোখ মেলতেই তিনি। ঘুম ভেঙে অনেক বেলায় ছুটে গেলাম গাছতলায়। নেই চতুর্দিকে গিজ গিজ করছে অসংখ্য মানুষ। কাতারে কাতারে এসে জড়ো হচ্ছে। সাধুজি নেই। সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরলাম। স্নান নেই, আহার নেই। খুঁজে বেড়াচ্ছি রাতের অন্ধকারেও। নেই। দস্তানা দুটো বুকে জড়িয়ে রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলাম। সাগরের ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্রের বাতাস হা হা করে কাঁদছে।

আমি ম্যাসিওর। ফিজিওথেরাপিস্ট। কিংবা অন্য কিছু। শরীর আমার হাতে কথা বলে। দু বছরের মধ্যে আমার বাড়ি হয়েছে। ঋণ কিছু করতে হয়েছে বটে। শোধও করে দেব। গাড়িও কিনব একদিন। আমি কেন অন্যের তাচ্ছিল্যকে গুরুত্ব দেব? আমার মতো অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা ওদের আছে?

এত রাতে সাইরেন বাজিয়ে কোথায় পুলিশের গাড়ি ছুটে যায়। আমিও নড়ে উঠি। ছি-ছি, এ কী করছি? গুরুজি বলেছিলেন, অহঙ্কার গ্রাস করলে দস্তানার গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। গুরুজির কোনো ছবি নেই। এক মানসপটেই যতটুকু ধরে রাখতে পেরেছি। যখন খুব মন কেমন করে, দস্তানা দুটোকে বুকে জড়িয়ে তাঁর ধ্যান করি। তাঁকে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি তখন। উঠে গিয়ে দস্তানা দুটো বের করি। চেপে ধরি বুকে। তখন মিষ্টি সুরে টেলিফোন বাজে। জানি কার টেলিফোন। নিয়মিত রুটিন হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর থেকেই প্রতীক্ষা শুরু হয়। এক হাতে বুকে চেপে রাখা দস্তানা, অন্য হাতে রিসিভার,— হ্যালো?

— মহল! এখনও ঘুমোওনি?

কী সুন্দর সংক্ষেপ করে নিয়েছে আমার নামটা। কী মিষ্টি। যা বিতিকিচ্ছিরি নাম রেখেছিলেন বাবা।

— না সুরমা। তুমি কী করছ?

— আমি? আমি তোমায় ফোন করছি। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। অদ্ভুত সুরেলা ঝঙ্কার ওর হাসিতে। যতবার শুনি, ততবারই চমৎকৃত হই। আসলে স্বরটাই ওর অসাধারণ। যেদিন প্রথম টেলিফোনে ও আমাকে কল দিয়েছিল, সেদিনই মুগ্ধ হয়েছি। আজও ঘোর কাটেনি। এত মধুর কণ্ঠস্বর কারও আর আছে কিনা জানি না। হয়তো বা পাখিরাও লজ্জা পায়।

আর এত কদর্য রূপ কারও হয়, তাও জানতাম না। ঠিকানা মিলিয়ে যখন বাড়িতে হাজির হয়েছি, দারোয়ান ড্রয়িংরুমে বসিয়ে মালকিনকে ডাকতে গেছে, বসা ঘরের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত থেকেছি। কিন্তু শিউরে উঠেছি তাঁর আবির্ভাবে। থ্যাবড়া নাক, কুঁৎকুতে দুই চোখ, চ্যাটালো বুক, পুরুষের মতো গোলগাল কোমর, পুরু ঠোঁট। শুধু রংটুকু বাদ দিলে সবই কদাকার। কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে এ সব তো আর চাপা পড়ে না উৎকণ্ঠা ছেড়ে তখন চলে

আসার জন্য অস্থিরতায় ভুগছি। আমি পেশাদার শরীর-শিল্পী। রূপগুণের বিচার করা আমার উচিত নয়। কিন্তু এখানে যে এক কল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের তীব্র বিরোধ সইতে পারছি না। তাঁর প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সুন্দর করে দিতে হবে। কেউ নেই, শুধু অগাধ ঐশ্বর্য ছাড়া।

— অসম্ভব। বলে উঠে চলে আসছিলাম। উনি পথরোধ করে দাঁড়ালেন। কেঁদে ফেললেন। এত ঐশ্বর্যের টানেও কোনো যোগ্য পুরুষ তাঁর দিকে ফিরে তাকায় না। আমিও যদি মুখ ফিরিয়ে নিই—

হাসি পেল। এত থেকেও মানুষ কত কাঙাল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল পেশাদারি মন। এক ধরনের চ্যালেঞ্জও। বললাম, বেশ। পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে।

— দেব

— দু'মাস সময় লাগবে।

— রাজি।

— একটিই শর্ত। এই দু'মাস আপনি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারবেন না।

— তাই হবে।

শুরু হয়ে গেল আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। গুরুজির মুখ স্মরণ করে তাঁর দানে দু'হাত ঢেকে স্পর্শ করলাম সুরমা সেনগুপ্তর শরীর। প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে তুলি টিকোলো নাক। দু'চোখের কোণ টেনে আয়ত করে তুলি। একটু একটু করে জেগে ওঠে দ্বীপ।

করতালুর চাপে একটু একটু করে বসে যায় মাংসল উদর। কঠিন নিষ্পেষণে কোমর কৃশ হয় সিংহিনীর মতো। ধীরে অতি ধীরে। দু'হাতের অঞ্জলিতে একটু একটু জেগে ওঠে দুটি অনাবৃত বুক, শতদলের মতো। ও চেয়ে থাকে নিষ্পলক। ওর নিশ্বাস দ্রুততর হয়। শরীরে পুরুষ স্পর্শের শিহরণ ছড়ায়, বুঝতে পারি। ও মুগ্ধ হয়ে আমাকে দেখে। আমার দস্তনার যাদু। আমি ওকে দেখি না, দেখি আমার সৃষ্টিকে।

তারপর কবে যেন শুরু হল ওর ফোন করা। শুরু হল 'তুমি'। শুরু হল ওর ফোনের জন্য আমার প্রতীক্ষা। আর স্বপ্ন দেখা। আমি নতুন কোনো কাজ হাতে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কাজের সময়ে আমি শিল্পী। কিন্তু রাতজাগা শীতল এই প্রহরে কে আমি? আমি ধ্যানী। ধ্যান করি তিলোত্তমার, আমার নিজের হাতে গড়া তিল তিল করে।

— মহুলা, কথা বলছ না কেন?

কানে সুর—তরঙ্গ নয়, সু, আমার সুর্মা, আমার সৃষ্টি। এ নাম এখনও ওকে জানাইনি। কাল বলব, কাল। আমার সব কথাই যে কালকের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

— ঘুমোও সু, ঘুমিয়ে পড়ো।

— আমার যে ঘুম আসছে না। এখনই নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

— না, আর তো মাত্র কয়েক ঘন্টা। কালই তো শেষ টাচ।

— তবে, আমার সঙ্গে গল্প করো।

— না, অবুঝ হয়ো না। জান তো, আয়না দেখার পর আর আমি হাত দেব না। শেষটুকু ভেবে নিতে দাও। সব খুঁটিনাটি। ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়ো।

— আচ্ছা, তুমিও বেশি জাগবে না, কথা দাও। ঘুমিয়ে পড়বে, উঁ?

— হুঁ

ফোন ছেড়ে দেয় সুরমা। আমি কাঁপছি। আমি থরথর করে কাঁপছি। প্রতিমার চক্ষুদানের আগে পটুয়া যেমন অস্থির হয়, তেমন দশা আমার। বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল— সু, সুরমা, সুর্মা.....

।। ২।।

অনেকদিন পর এঘরে ঢুকে পুরোনো গন্ধটাকে খুঁজে পাচ্ছি। অনেকদিন পর এঘরে এলাম, বলা ভুল। মাঝে মধ্যেই এসেছি সামান্য সময়ের জন্য। কিন্তু এমন করে আসিনি, যেমন বাইরে থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম এই ঘরের টানে।

কাঞ্ছা আর দৌলতরাম ছাড়া সকলকে জবাব দেওয়া হয়েছিল। ওরা বাড়িটাকে ঝকঝকেই রেখেছে বলতে হবে। ঘরের দরজা জানলা তকতক করছে। আঙুল ঘষে এক বিন্দু ধুলোও আবিষ্কার করা যাবে না। ফুলদানিতে ফুল। খাটে ফিকে নীল পাতলা চাদর। সম্পদ বোম্বে থেকে ফিরবে সাতদিন পর। ডিভোর্সের কাগজপত্র তার পরে তৈরি করলেই চলবে। চলে আসার আগে ফোনে সে কথা জানিয়ে দিয়ে এসেছি। সত্যি বলতে কি সম্পদ একটুও আশ্চর্য হয়নি। একবারও বিস্ময় প্রকাশ করেনি। শুনে শুধু হালকা চালে বলেছে, ওয়েল। তাই হবে।

আমি জানি কেন ও বোম্বে গেছে। ওর নতুন পার্টনার মিস সহেলির টানে। সহেলি টু টাইম ডিভোর্সি। তাতে কী? এখন ওর সহেলিকে চাই। সহেলির রূপ আছে এবং বিজনেসও। বিজনেস। বিজনেস ছাড়া ও আর কিছু বোঝে না। বুঝতে আমার সময় লেগেছে অনেক। কত বোকা ছিলাম। ভাগ্যিস, আমার প্রপার্টিতে হাত বসানোর আগেই তা টের পেয়েছি। ব্যবসার প্রয়োজনে পার্টিতে আমার হাজিরা, পার্টির খাতিরে আমার আরও দু পেগ ড্রিংক বাড়ানো, নতুন কন্ট্রাক্টের জন্য মত্ত বিশিষ্ট অতিথিকে গায়ের ওপরে আশ্রয় দিয়ে আমারই সী-অফ্ করতে যাওয়া— এ সবই তো ওর কাছে স্বাভাবিক। এবং আরও বড়ো কন্ট্রাক্টের প্রয়োজনে আরও বড়ো শিল্পপতির অঙ্কশায়িনী হওয়া। আজ সিংহানিয়া, কাল বাজাজ, পরশু দিলওয়াস্তা। কেন নয়? ঠিকই তো, কেন নয়।

ধীরে ধীরে এ পর্যন্ত এগোতে হয়েছে আমাকে। ওর বাক্ চাতুর্য অসাধারণ। ওর অত্যাধুনিক যুক্তির কাছে বারবার আমাকে হার মানতে হয়েছে। মানুষ বিজনেস করে ক্যাপিটাল নিয়ে। ক্যাপিটাল শুধু টাকা নয়। যার যেটা মূলধন— টাকা, ট্যালেন্ট রূপ-যৌবন, কৌশল। শরীরও তো সম্পদ। তবে কেন তা কাজে লাগবে না?

অন্তর রি রি করেছে। কিন্তু ওর চাপাচাপি, ওর অমোঘ যুক্তি। অশান্তি এড়াতে এক পা এক পা করে এগোতে হয়েছে আমাকে নরকের দিকে। আমার এই রূপ, এ আমার অভিশাপ। নিজেকে অভিসম্পাত করেছি রাত্রিদিন। ও আমার রূপকে বিয়ে করছে। আমার সম্পত্তিকে। আমাকে নয়। বারবার বলেছে— সবগুলো বাড়ি আর কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করে ওর হাতে তুলে দিই। নরকের শেষপ্রান্ত এতো তাড়াতাড়ি দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না।

তবু নরকেরও বোধহয় নেশা আছে। ি্কৃতির নেশা। ক্রমশ গ্রাস করেছিল আমাকে। মনে হত ওর ওপরে প্রতিশোধ নিচ্ছি। কিন্তু কার ওপরে প্রতিশোধ? ও তখন সহেলির পিছনে ছুটছে। আমার জন্য শরীরী প্রয়োজনটুকুও নেই। আমার সম্পত্তি হস্তান্তর না করা নিয়ে অশান্তি চরমে। ওর হাতে মারও খেতে হয়েছে। কিন্তু বেঁকে দাঁড়িয়েছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করে দিচ্ছিল, আর বেশিদিন নয়।

নরকের পথেরও তারতম্য হয়। ঠেলতে ঠেলতে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, ওর হুঁশ ছিল না। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল সেদিন, যেদিন ও হনুমন্ত প্রসাদের বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে আনতে বলল। কু-রূপ কাকে বলে আমার অজানা নয়। আমি নিজে কুশ্রী ছিলাম। কিন্তু এ কদর্য। সাড়ে চার ফুট উচ্চতার মানুষটা আলকাতরার মতো কালো। বয়সে আমার বাবার সমান। মাথা ভরা টাক, কুঁৎকুতে চোখ, দু-ঠোঁটের কষে সাদা দাগ। একটা বড়োসড়ো থলথলে মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। হ্যা হ্যা করে যখন হাসে, থুতু ছিটকে লাগে গায়ে। আচার আচরণ কথাবার্তা— কারও সব কিছু এত কদর্য হতে পারে? এর নাকি ভারত জুড়ে সতেরোটা জুট মিল, সাতাশটা কটন মিল, তিনটে কয়লার খনি। জামার বোতামে, হাতের আঙটিতে, ঘড়ির ব্যান্ডে হীরে ঝলমল করে। একটা কুৎসিত বুড়ো গরিলা যেন সম্ভ্রান্ত সাজতে চায়। প্রথম আলাপেই বুড়ো, চোখ দিয়ে আমাকে গিলতে লাগল। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। দাঁতের গোড়ায় জিভের ডগায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লালার পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের ড্রয়িংরুমে নিজের সোফা থেকে উঠে ধপ করে আমার পাশে বসল। সম্পদ জানে, কখন বাঘকে শিকারের টোপ ধরতে দিতে হয়। পাকা শিকারি যে। টুক করে উঠে গেল ঘরের বাইরে। বুড়ো গরিলাটা মুহূর্তে তার থাবা বসাল আমার বুকে। দিন দুপুরে, স্পষ্ট আলোয়। দুর্গন্ধ। ওর গায়ে কোনো গন্ধ ছিল না। কিন্তু বুনো পশুর গায়ের উৎকট গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। এক ঝটকায় ওর থাবা ছাড়িয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

না, কোনো চ্যাঁচামেচি নয়। সম্পদকে ডেকে সাফ সাফ কড়া কথা শুনিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নয়। হনুমন্তপ্রসাদ পাক্কা বেওসাদার কি না। সম্পদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কন্ট্রাক্ট নিয়ে কথা বললেন। আমাকে আমল দিলেন না। যেন কিছুই হয়নি। ভাবলাম, যাক, বেঁচে গেলাম।

ও চলে যাওয়ার পর সম্পদও এ নিয়ে কিছু বলল না। পরদিন তাজবেঙ্গলে বিশাল পার্টি দিচ্ছে সম্পদ। এ সপ্তাহেই আমেরিকায় লেদার এক্সপোর্ট হবে তার। বিকালে আমার ওপরে আদেশ হল— হনুমন্তপ্রসাদের বাড়ি গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার।

অসম্ভব। সেই উৎকট গন্ধটা তাড়া করছে আমাকে। আমি জানি, ওখানে গেলে আগে প্রণামী দিয়ে তবে তাঁকে আনতে হবে। পরিষ্কার হয়ে গেল, সেদিন কেন অত শান্ত থেকেছিলেন তিনি। শিকার আপনি গিয়ে ধরা দেবে তাঁর গুহায়, তবেই না সে অপমানের বদলা! আমি দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। আর না।

সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠল সম্পদ, যেতেই হবে। পঞ্চাশ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট হাতছাড়া হয়ে যাবে।

যাক। পঞ্চাশ কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট নষ্ট হোক। আমার কী তাতে? সম্পদের মুনাফা হবে। আমি কী পাব? আমি কি কিছু পেয়েছি? সম্পদকে পেয়েছি আজও? পাব কোনোদিন? না সম্পদ মানুষ নয়, সম্পদ স্বামী নয়, সম্পদ ব্যবসাদার। আমি কেন তার পণ্য হব?

ক্ষেপে উঠল সম্পদ। ভেবেছিল আমি তার যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। বিশ্বাস করতে পারছে না, আমি রুখে দাঁড়াতে পারি, আমি নারী— ভেতরে ভেতরে কালনাগিনীর বিষ আমার সহজাত।

ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। প্রহারের সঙ্গে বর্ষিত হতে থাকল অশ্লীল গালিগালাজ।

সম্পদ রূপবান, সুপুরুষ। সে যেমন, আমিও তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম এশিয়া অ্যাসোসিয়েট্স্-এর এক্সটেন্ডেড বোর্ড মিটিংয়ে। বাবার একদা পার্টনার মিঃ গুপ্তা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন,— সম্পদ চৌধুরী। ভেরি রাইজিং ইয়ং চ্যাপ। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, কোনো প্রাচীন সম্ভ্রান্ত গ্রীক যেন আধুনিক পোষাক পরে আমার সামনে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে। এতদিন নিজের নতুন পাওয়া রূপের সাগরে ভাসছিলাম। এখন ডুবতে লাগলাম আর এক রূপসাগরে। সম্পদ। আমার স্বপ্নের পুরুষ।

সেই সম্পদকে আমার হিংস্র নেকড়ে মনে হচ্ছে। তার মুখের অশ্রাব্য গালাগালির চেয়েও অসুন্দর, নোংরা। আমার তখন আর একটুও ব্যথা লাগছে না। অবাক হয়ে ভাবছি, মানুষের বাইরের রূপটা কত পলকা। রূপজ মোহের আড়ালে বসে থাকা সত্তা যখন বেরিয়ে আসে নখ-দাঁত নিয়ে তখন সেই তো তার আসল ছবি। তাকে আর ভোলা যায় না।

ও চলে যাওয়ার পর ও বাড়ির পুরোনো চাকর রামেশ্বর এসে কেঁদে ফেলল, আপ চলে যাইয়ে মাঈজি। ইহাঁ আপ মর যায়েঙ্গে।

আমি তার বুকে ছোট্ট মেয়েটির মতো আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। মরুভূমির শুকনো প্রান্তরে কোথাও না কোথাও মরূদ্যান থাকে, যত ক্ষুদ্রই হোক। রামুচাচার ঘেমো অপরিচ্ছন্ন বুকে আমি খুঁজে পাচ্ছি বাবার স্নেহের শীতল সুবাস...

— মালকিন! দৌলতরাম এক গ্লাস সরবত এনে রেখেছে টেবিলে — দই আর অরেঞ্জ ড্রিংকস-এর তৈরি। আমার বড়ো প্রিয়। বাইরে থেকে কাজ সেরে ফিরলে এটা আমার দরকার হয়।

সোফার অনিল দুটো বড়ো সুটকেস দুহাতে বয়ে এনে ঘরে রেখে গেল। দৌলতরাম কিছু একটা আন্দাজ করতে চাইছে, বুঝতে পারছি। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, আজ হী ওয়াপস যাবেন মাঈজি?

— না রে, আমি এখন এখানেই থাকব। বললাম, যেমন করে প্রবাসী মা তার সন্তানকে আশ্বস্ত করে।

দৌলতরাম যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা। হাঁ হয়ে গেছে।

— কাঞ্ছা, হো কাঞ্ছা, মাঈজি ইধার হি রহেঙ্গে অব্‌সে। কাঞ্ছা, আরে হো কাঞ্ছা— আরে শুন ইয়ার—

চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল দৌলতরাম। যেমন করে ছোট্ট ছেলে বিরাট আনন্দের খবর তার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিতে যায়। আমাব চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। আমার উপস্থিতি এত খুশি করতে পারে কাউকে? এত নির্মল আনন্দ দিতে পারে? দু-দুবার অ্যাবরসন করাতে হয়েছে আমাকে। আমার অনাগত মাতৃত্ব একটু একটু করে ভিজে উঠছে।

আমি সরবতটায় চুমুক দিলাম। এক নিশ্বাসে পান করে গ্লাস নামিয়ে রাখলাম। আর কী ভালো লাগছে। আমি মুক্ত। আমার পায়ের বেড়ি কেটে বেরিয়ে এসেছি। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। এ যেন আমি নয়। এ আমিকে আমি চিনি না। নিজেকে বড়ো অচেনা লাগছে। আমি খুঁজে পেতে চাইছি সেই পুরোনো সুরমা সেনগুপ্তকে। সেই কুরূপ মেয়েটাকে।

আয়নার কাছে বারবার জলছবির মতো একটা সাধারণ মুখ ভাসছে। মহল। মহলকে আমার বড়ো প্রয়োজন। কতদিন ধরে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ফোন উইথড্রন। ফোন নম্বর ধরে খুঁজে বের করলাম ওর বাড়ি। এইচ ডি এফ সি দেনার দায়ে ক্রোক করে নিয়েছে। এত বড়ো পৃথিবীর ভিড়ে মহলকে আমি কোথায় খুঁজব? একবার ভেবেছিলাম, কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। পরে মনে হল, না, ও আসবে কেন? না পাই, তা সইব, কিন্তু অবহেলা কি সইতে পারব?

অবহেলা। অদৃশ্য চাবুক আমাকে দংশায়। সে রাতে ফোন ছাড়ার পর আমি ঘুমিয়েছি। কিংবা আধো ঘুম আধো স্বপ্নে বিচরণ করেছি। কাল সকালে মহল আসবে, নবজন্ম হবে

আমার। আমার সব কিছু তার দেওয়া। আমি তাকেই উজাড় করে দেব। আয়না দেখি না। কিন্তু দেখতে তো পাই, আমার কোমর কমতে কমতে সিংহিনীর মতো সরু হয়ে গেছে। আমার বুকে স্থলপদ্ম ফুটেছে। মহলই একমাত্র পুরুষ, যে আমার শরীর ছুঁয়েছে, আমাকে সম্পূর্ণ দেখেছে। কোনো পুরুষ কখনও মন দিয়ে আমাকে কামনা করবে— এ ভরসা আমার ছিল না। মহলের স্পর্শ, তা সে হোক না গ্লাভসের অন্তরাল থেকে— আমাকে শিহরিত করেছে।

মহলের স্পর্শ, তা সে হোক না গ্লাভসের অন্তরাল থেকে— আমাকে শিহরিত করেছে। আমার বুকে, আমার কোমরে, নিতম্বে, জঘনে, জঙ্ঘায়— ও আমার দেহ নদীতে তুফান তুলেছে। কিন্তু নিজে অশান্ত হয়নি। কী শান্ত সংযমে সে বেঁধে রাখতে পারত নিজেকে। নারী তো এই-ই চায়। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম, তলিয়ে যাচ্ছিলাম। শুধু রাত্রে টেলিফোনে ওর গলায় আবেশ ফুটে উঠত। যদিও ও নিজে থেকে একদিনও ফোন করেনি। সব-আবেগ ধরে রাখতে চাইত নিজের মধ্যে, আড়াল করত। তবু আমি বুঝতাম। আমি যে নারী, আমি যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছি ততদিনে।

ভোর ভোর এসে গেল ও। সেদিন ওর ছোঁয়ায় কোনো শক্তির প্রয়োগ ছিল না। আমার নিরাবরণ শরীরের ওপর থেকে নিচে, পরম মমতা বুলিয়ে দিল। কোথাও সামান্য চাপ একটুক্ষণ ধরে রাখা। কোথাও সামান্য টান। তারপর গ্লাভস্ খুলে ফেলল,— যাও, দেখো নিজেকে। ওর গলা কাঁপছিল। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বুক ওঠানামা করছে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে ওকে।

ওর সামনে আমার কোনো লজ্জা অবশিষ্ট ছিল না। ওই অবস্থায় ছুটে গেলাম দেওয়ালে ঝোলানো বেলজিয়াম গ্লাসের সামনে। এক টানে সরিয়ে দিলাম পর্দা। নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে চাই, নিজের খুঁটিনাটি সবটুকু।

স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। এ কে? এ কি আমি? এত রূপ, এই ফাগুন আগুন অঙ্গ, এ কি আমার? আমার পিছনে মহলের প্রতিবিম্ব। মহল আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কর্ণমূল ছুঁয়ে যাচ্ছে। মহল ফিসফিস করল,— সুরমা, সু, সুর্মা, আমি— আমি তোমাকে ভালোবাসি— আমি— ছিটকে সরে গেলাম আমি। আর এতদিন পর একরাশ লজ্জা গ্রাস করল আমাকে। তাড়াতাড়ি কাফ্তানটা পরে নিলাম। মহল অদ্ভুত বিস্ময়ে চেয়ে আছে। আমি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চেক-বই বের করলাম। খসখস করে লিখে ফেললাম।

— এই নাও, তোমার পেমেন্ট পঞ্চাশ হাজার।

মহল বোবা হয়ে গেছে।

— নাও। ভয় নেই, বাউন্স হবে না।

মহল বিড়বিড় করল,— আমি, আমি কি টাকার জন্য— না সু, তুমি আমার তিলোত্তমা, সৃষ্টি। সু, আমি তোমাকে—

হা হা করে হেসে উঠলাম আমি,— ভাবলে কী করে মহল? তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্যটা ভুলে গেছ? নাও, পাগলামি কোরো না।

আমার হাসি পাচ্ছে। আমিই বা কোন খেয়ালে ওকে কামনা করেছিলাম— ওই অশিক্ষিত গরিব একটা ভ্যাগাবন্ডকে?

ওর দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে, শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যেন মাটি হারিয়ে ফেলছে পায়ের তলায়। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে চেকটা গুঁজে দিলাম— আজ সন্ধ্যাতেই তোমার বাড়িতে একটা ভালো গিফট পৌঁছে যাবে। ভেবো না সস্তা কিছু। ওয়েল ডান মহল। য়্যু হ্যাভ—

ওর চোখ জ্বলে উঠল। আমার কথার মাঝখানেই ও চেকটাকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করল। তারপর কুচিকুচি। উড়িয়ে দিয়ে নিজের ছোট্ট ব্যাগটা তুলে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

আমি কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে ছুটে গেলাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে। সরালাম সে আয়নার পর্দা। সাজের জিনিসগুলো বের করলাম। ছুটে গেলাম আলমারির সামনে, কোন পোশাকটা পরব? কী যে করব বুঝে উঠতে পারছি না। তুচ্ছ এক ম্যাসিওরকে নিয়ে ভাবার অবকাশ আমার আছে?......

ফোন বাজে কেন? এ বাড়িতে এখন আমি থাকব, এ তো কারও জানার কথা নয়।

— হ্যালো?

— সুরমা? আমি প্রতীক। বাড়িতে ফোন করে মনে হল, তুমি এ বাড়িতেই—একবার দেখা করতে চাই—

— সরি প্রতীক!

নামিয়ে রাখলাম। প্রতীক সম্পদের আগে আমার পাণিপ্রাথী ছিল। ইন্ডাস্ট্রিয়্যালিস্ট। জানত, আমার সঙ্গে সম্পদের বনিবনা হচ্ছে না। ঠিক লক্ষ রেখেছে। না, কারও সঙ্গে দেখা করব না। নিজেকে গুটিয়ে রাখব খোলের মধ্যে শামুকের মতো।

কাঞ্চাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে দৌলতরাম। দুজনের মুখে খুশির ঝিলিক, নতুন রোদ্দুরের মতো ঝলমলে। কাঞ্ছা বলে, কী রান্না হবে মাঈজি?

— যা খুশি। যা তোদের মন চায়

খুব খুশি হল ওরা। দাঁড়িয়ে আছে দুজনেই। মনে হল কিছু বলতে চায়। বললাম, কিছু বলবি?

—মাঈজি, মাটির দিকে চোখ রেখে বলল দৌলতরাম, লখন আর শিউরাম বলছিল কী, ওদের নতুন বাড়ি ভালো লাগছে না। আপনি হুকুম করলে ওরা আবার এখানে—

হেসে ফেললাম,— আচ্ছা খবর দে।

— বহুত মেহেরবানি মাঈজি। পুরোনো সঙ্গীদের ফিরে পাওয়ার আনন্দে ওরা অধীর। তাড়াতাড়ি যেতে চায়। আমারও খুব ভালো লাগছে। হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার মতো।

— শোন। ওদের পিছনে ডাকলাম, ঘুরে তাকাল ওরা।

— আচ্ছা, সেই ম্যাসিওরবাবু আর কখনও আসেনি? খুব মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলাম।

— নেহী তো!

— ফোনও করেনি?

— নেহী।

— পথেঘাটে যদি কখনও দেখা হয়—

— একবারও তো নজরে এল না। কাঞ্ছা, তু দেখেছিস?

— না তো।

— আচ্ছা, তোরা যা।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। ফিরে পাওয়ার সুখ মুছে যাচ্ছে। আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। না, অসহ্য এ রূপ। আমি চাই না। এ অভিশাপ আমি দূর করে দিতে চাই। মহল, তুমি কোথায়? তোমাকে আমার বড়ো প্রয়োজন।

।। ৩।।

কুসুমবরণ সূর্য তখন নিজেকে মেলে ধরার আগে পৃথিবীকে দেখে দিচ্ছে চুপি চুপি। বাবুঘাটে নিত্য স্নানার্থীদের ভিড়। একটা বড়োসড়ো খড়ের নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে হুগলির দিকে। একদল শ্মশানযাত্রী শবদাহের শেষে এখানে স্নান সেরে ঘুমিয়েছিল বোধহয়। রাতে বাড়ি ফিরতে নেই। তারা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসছে। শরৎ শেষের স্নিগ্ধ শীত। নদীর বাতাস একটু প্রবল। ও পাড়েও ব্যস্ততা। দূর থেকে দেখা যায়।

নিত্যকার অভ্যাসমতো সুরমা সেনগুপ্ত এসেছে নদীর ধারে। ফর্সা হওয়ার আগেই। ঘি-রঙা শাড়ির ওপরে পাতলা তসরের চাদর জড়ানো। বাতাসে চুল উড়ছে। রেলিঙে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে নদীর বুকে। সত্যিই কি তাকিয়ে আছে? দৃষ্টিভরা নিঃসীম শূন্যতা। ডানা মেলে উড়ে গেছে কোন সুদূরে।

এই সাত সকালে এক অন্ধ ভিখারি তার বেহালায় ছড় টেনেছে। করুণ রাগিণী গুমরে গুমরে উঠছে। সুরমা চঞ্চল হল। পিছন ফিরে তাকাল। অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল ড্রাইভার অনিল। এ ইঙ্গিত তার পরিচিত। সে এগিয়ে যায় গাড়ির দিকে।

বামে ভিক্টোরিয়া, ডানদিকে পি জি হাসপাতালকে রেখে ছুটে চলেছে বিশাল ডাটসন গাড়ি। গদিতে ডুবে আছে সুরমা। দৃষ্টি তেমনই স্থির, উদাসীন। ড্রাইভার অনিল নির্দিষ্ট পোশাকে সুসজ্জিত। মাথায় টুপি। পোশাকের আড়ালে নিজের সত্তাকে সেও যেন হারিয়ে ফেলেছে। যন্ত্রমানুষের মতো চালকের আসনে বসে নিঃশব্দে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

এত সকালেও জ্যাম। রবীন্দ্রসদনের মুখে এক সার ট্রাক জট পাকিয়ে ফেলেছে। অনিল গাড়িটাকে বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড় করায়। স্টার্ট বন্ধ করে। সুরমার কপালে সামান্য ভাঁজ। ওই পর্যন্ত। কৌতূহলী হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে না। নির্বিকার অনিলও।

— বলবেন ম্যাডামা, স্টেটস্‌ম্যান, টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার—

সুরমা মুখ ঘোরায়। বাঁদিকের দরজার কাছে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা একটা মুখ। চোখে চোখ পড়তেই সট করে সরে যায়। চকিতে সোজা হয়ে উঠে বসে সুরমা। লোকটা দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের দিকে। বগলে একগাদা খবরের কাগজ।

সুরমা চিৎকার করে ওঠে,— অনিল ওকে ধরো— যেভাবেই হোক ধরো ওকে!

অনিল দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। ছুটতে থাকে ওর পিছনে। লোকটা আরও জোরে ছুটছে। অনিল কি পারবে? উৎকণ্ঠায় থমথম করছে সুরমা। চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে ওরা। দরজা খুলে সুরমা বেরিয়ে আসে।

হাসপাতালের মেন গেটের কাছে ওকে ধরে ফেলেছে অনিল। জাপটে ধরে আছে। লোকটা ছটফট করছে, কিন্তু ছাড়াতে পারছে না নিজেক। অনিল খুবই শক্তিমান। লোকটা চিৎকার করছে,— ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন।

ফুটপাথের ওপর চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল রাত জেগে ক্লান্ত রোগীর পরিজনরা। কিছু মুটে মজুর। ছুটে আসে ওরা। জটলা বেঁধে যায়। নানা জনে মন্তব্য করছে— এ ব্যাটা হকার নিশ্চয়ই ওর টাকা গেঁড়িয়েছে— এ শালা ড্রাইভার সাত সকালে মাল খেয়েছে মাইরি—

সুরমা পৌঁছে গেছে। লোকটা যেন আরও মরিয়া হয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

— সিন ক্রিয়েট কোরো না মহল। দু'মাস তুমি আমার জন্য প্রাণপাত করেছ। আজ পাঁচটা মিনিট তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। শুধু পাঁচটা মিনিট।

মহল শান্ত হয়ে যায়। সুরমা ইঙ্গিতে অনিলকে বলেন ওকে ছেড়ে দিতে। তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করে। হতভম্ব মানুষজনের সামনে দিয়ে মহল মাথা নিচু করে অনুসরণ করে সুরমাকে।

কোনো কথা নেই। কাগজের বান্ডিল সামনের গদিতে। মহল বসে আছে সুরমার পাশে। দু'জনের দৃষ্টিই শূন্যতাকে নির্ভর করে আছে। গাড়ি ছুটে চলেছে আবার বাবুঘাটের দিকে।

রেলিংয়ের সেই জায়গাতেই এসে দাঁড়ায় সুরমা। পাশে মহল। বেহালাবাদক ভিখারি বাজিয়ে চলেছে করুণ সুর। নদীর বুকে নবারুণ খেলা করছে।

— মহল, আমি তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছি। কোথায় ছিলে তুমি? তোমার বাড়িতেও গেছিলাম।

উত্তর দেয় না মহল। চেয়ে থাকে নদীর বুকে। কোনো ভাবান্তর নেই।

— আমি হেরে গেছি মহল। এ রূপ আমার অভিশাপ। আমার দুর্গ্রহ। আমি সব হারিয়েছি— আমার নারীত্ব, আমার অহংকার—

কণ্ঠ রুদ্ধ হয় সুরমার। মহল চুপ। আগের মতোই।

— এ পণ্য আমি চাই না মহল। তোমাকে আর একটা কন্ট্রাক্ট নিতে হবে। আমাকে আগের রূপে ফিরিয়ে দাও। যত টাকা লাগে, আমি দেব। কিন্তু এ কাজ তোমাকে করতে হবে।

মহলের ঠোঁটে দাড়ি-গোঁফের মাঝখানে এক চিলতে করুণ হাসির রেখা।

— মহল, মহল প্লিজ। আর কোনোদিন কোনো অনুরোধ করব না তোমায়।

মহল মাথা নাড়ে। সুরমা দেখতে পায়, একটা বড়োসড়ো দীর্ঘশ্বাস।

— আমি আর পারি না সু।

কত দূর থেকে কথা বলছে ও? কতদূর? অধীর হয়ে ওঠে সুরমা,— বিশ্বাস করি না। তোমার সেই ম্যাজিক গ্লাভস—

দূরে আঙুল দেখায় মহল নদীর বুকে— ওখানে— তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম এখানেই।

সুরমার ঠোঁট ফুলে ওঠে। দলা পাকানো কান্না ঠেলে ফুঁপিয়ে ওঠে,— মহল, মহল তুমি— আমি কি তোমার এতবড়ো অভিমানের যোগ্য মহল? তুমি জানতে না আমি শূন্যগর্ভা? জানতে না, যে আসল নয়, তারই অহংকার হয় বেশি?

মহলের মুখের হাসি বদলে যাচ্ছে। ঠোঁট কাঁপছে। কাঁপছে দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। কপালে জেগে উঠছে সদ্যজাত দ্বীপরেখার মতো ভাঁজ।

— মহল, ধরা গলায় ফিসফিস করে ওঠে সুরমা,— তবে গ্লাভসের বন্ধন ঘুচে যাক। তোমার দুহাতে, শুধু তোমার মতো করে গড়ে নেবে আমাকে মহল? সুরমা ওর হাত জড়িয়ে ধরে।

মহল মুখ ফেরায় সুরমার দিকে। কাঁপছে দু'জোড়া হাত। দু'জোড়া চোখে টলটলে নদীজল— কে কার প্রতিবিম্ব দেখে?

শেষ অধ্যায়

সৈয়দ রেজাউল করিম

কলিং বেল-এর আওয়াজ হতেই দুরন্ত হরিণীর মত ত্রস্ত পায়ে মোসলেমা ছুটে যায় সদর দরজায়। দাদা এসেছে বোধ হয়! দোর খুলে অবাক হয় মোসলেমা। দাদা নয়, পিওন। একটা চিঠি দিয়ে পিওন চলে যায়। ঠিকানাটা দেখে মোসলেমা চমকে ওঠে। বিচিত্র এক শিহরণ ধমনীর মধ্যে ছুটে যায। লজ্জায় ঘৃণার আরক্ত হয়ে ওঠে মোসলেমা। নির্দয় কশাই-এর মত খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে। মুস্তফা লিখেছে— 'চাঁপা (মোসলেমার ডাক নাম), তোমাকে ভুল বুঝে তালাক দিয়েছিলাম। সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে। তুমি যে রকম অভিমানি, আমাকে ক্ষমা করবে কিনা জানি না তবুও তোমাদের ওখানে একদিন যাচ্ছি। সাক্ষাতে সব বলব। আশাকরি তুমি আমার প্রতি সদয় হবে ইতি—মুস্তফা আলি।'

সূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপাত্মক হাসি ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে মোসলেমার। ক্ষমা! ক্ষমা করব তোমাকে? ছাই ছাপা আগুনের মতো ওর রাগটা গন্‌গন্‌ করে ওঠে। মুস্তফার সেদিনের সেই কথাগুলো এখনও মোসলেমার কানে বাজতে থাকে—'বাড়ি হতে বেরিয়ে যাও— তোমার মত বেশ্যাকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তোমাকে মুক্তি দিলাম। যাও—যেথা খুশি যাও—ইচ্ছে মত 'ভাতার' ধর গিয়ে। আমি তোমাকে তালাক দিলাম—তালাক দিলাম— তালাক।'

সমস্ত পৃথিবীটা সেদিন মোসলেমার চোখের সামনে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছিল। দিন দুনিয়া সব কিছুই আঁধার লাগছিল। শাশুড়ির চীৎকার তখন কানে আসছিল— 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ভাতারছাড়ি, কুল-মজানি, বেশ্যা মেয়ে, 'শেষবেলা' মোদের বাড়ি কুল মজাতে এলি। কর্তাকে বলেছিলুম বৌ তোমার ভাল হবে না। শুনলে না মোর কথা। মাগীর রূপ দেখে বৌ করে আনলে। আর সেই বৌ আজ বংশের মুখে কালি দিল।'

বাড়ির ছাদের ওপর বসে, আনমনে এইসব কথাগুলো ভাবছিল মোসলেমা। তারপর কখন যে বিকেলের সোনালি সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে গেছে যে চিন্তা করে নি। মায়ের ডাকে স্বপ্নের ঘোর কাটে মোসলেমার। ঢাকের মত বাজখাই গলায় চীৎকার শুরু করলেন- 'মোসলেমা, ও মোসলেমা। পোড়ারমুখি গেলি কই?'

হাসান ছাদে ছিল। সেই জবাব দিল—'বুবু এখানে।

মা বললেন— 'উঠে আসতে ক। কতবার বারণ করেছি, উপরে উঠবি না। শুনলে না কতা। শুনি মুচি সব। নাক কান নেই।' রাগে গজগজ করতে করতে মা গেলেন রান্নাশালে।

মোসলেমার মা মোসলেমাকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখেন। বিশেষ করে ঐ হিষ্টিরিয়া

রোগটা হওয়ার পর। ডাক্তারবাবু বার বার নিষেধ করে গেছেন- 'একটু লক্ষ্য রাখবেন মা। আগুন আর পুকুরে পড়লে সর্বনাশ। বাঁচাতে পারবেন না মেয়েকে।'

মা বলেছিলেন—'বাবা! এ রোগ কি সারার নয়? কতক্ষণ আর চোখে চোখে রাখব? কাজকাম সেরে সন্ধ্যা ছ'টার সময় বাড়ির ফিরে, মার কাছে সব কথা শুনে, এক মুহূর্ত দেরি না করে মুস্তাফা তখনই বেরিয়ে পড়ল শ্বশুর বাড়ির অভিমুখে। মাত্র ঘন্টা তিনেকের পথ। সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছে গেল সেখানে। দাওয়ায় উঠতে গিয়ে খটকা খেল মুস্তফা। শ্বশুর মশাই হুঁকা টানতে টানতে শুধালেন—'কি বাবাজী, ভাল আছ তো? মেয়েটা কেমন আছে?'

তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারে নি মুস্তফা। মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তবুও সন্দেহ নিরসন করতে জিজ্ঞাসা করল— 'আব্বা! আপনি না কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন? শরীরটা এখন ভাল আছে তো?'

হো হো করে হেসে উঠল মোবারক মীর্জা। 'তুমি কি পাগল হলে বাবা! আমার আবার শরীর খারাপ হল কখন?'

'তবে যে শুনলাম.... সেইজন্য আপনার মেয়ে এখানে এল।'

'মেয়ে!' আরও অবাক হলেন মীর্জা। 'মেয়ে কখন এল!'

সিরাজের কথা শুনে চোখ কপালে তুললেন মীর্জা। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালেন চারদিকে কিন্তু কোথায় মোসলেমা! কোথাও পাওয়া গেল না তাঁকে। পরদিন সকালে মোসলেমা ফিরে এসেছিল বাপের বাড়িতে। মেয়ের মুখে সব কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিল মীর্জা। টগবগ করে ফুটে উঠেছিল তার শীতল রক্ত। শা... কে জ্যান্ত কবর দেব। কিন্তু কোথায় পাবে সিরাজকে? সিরাজ তখন দেশ ছাড়া। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা মেয়েকে নিয়ে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিল মীর্জা। তাঁর চোখের সামনেই মেয়েকে তালাক দিল মুস্তাফা। কত গালাগালি শুনতে হল তাকে বুড়ো বয়সে। মেয়েকে অভয় দিয়ে বলেছিল— 'তোর কোন ভয় নেই। আমাদের যদি দু'টো ভাত জোটে, তোরও জুটবে।'

অদূরে বাসুলডাঙ্গা রেল স্টেশনের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দু'টো বাজার ইঙ্গিতে দু'বার শব্দ হ'ল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুমের কোলে নিমগ্ন। কেমন যেন তন্দ্রা তন্দ্রা আসছিল মোসলেমার। চোখ দুটো বুজিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তা তাঁর মনে নেই। 'কে?—কে ওখানে?' ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মোসলেমা।

'আমি মুস্তফা।'

'কেন? কেন চুপিচুপি চোরের মত এসেছ এখানে? কি চাই তোমার?' ঝংকার দিয়ে উঠল মোসলেমা।

'লুঠেরার মত একটা নারীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করেও কি তুমি আমাকে মুক্তি দিতে চাও না? কেন—কেন এসেছ এখানে?'

'এসেছি আমার ভুলের ক্ষমা চাইতে।'

রাগান্বিত মোসলেমা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল— 'আমি তো ত্রাণকর্তা নই যে তোমার ভুলের ক্ষমা করব।' তারপর একটু থেমে বলল— 'তুমি এখান থেকে যাও। না হলে মাকে ডাকব। আমার ঘুম পাচ্ছে। আঃ—'

মুস্তফা অবিচলিত ভাবে বলল, 'না মাকে আর ডাকতে হবে না। একটু পরেই আমি চলে যাব। শুধু কটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছি।'

'বল কি বলতে চাও?'

আবেগের সঙ্গে মুস্তফা বলল— 'চাঁপা, তুমি সেদিন রাত্রে আমাকে সব কথা বল নি কেন? কেন বল নি সেদিন তুমি ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য সিরাজের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ। তুমি যদি সেদিন বলতে তাহলে তোমার আমার জীবনে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটত না।'

'ভয়ে, ভয়ে সেদিন আমি সব চেপে যেতে চেয়েছিলাম। কি জানি, হয়তো সব শুনে আমাকে তিরস্কার করবে। কটু কথা বলবে। হয়তো বা তালাক দেবে। সেই ভয়েই তোমার কাছে কিছু বলতে রাজী হই নি। কিন্তু তুমি যদি উত্তপ্ত না হয়ে একটু সহ্য করতে, পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে আমি সব বলতাম। সব-সব।'

আক্ষেপের সুরে মুস্তফা বলল, 'কিন্তু আমি বহুবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তুমি সে কথা বলতে রাজী হও নি। যাক যা হবার হয়ে গেছে · এস আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আমরা শুদ্ধ হই।'

'কিন্তু আমি কি পাপ করলাম! যার জন্য আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে! যার জন্য আমাকে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে!' কাঁদতে কাঁদতে মোসলেমা বলল ; 'আমি আজীবন সৎ পথে থেকেছি—জ্ঞানত কোন পাপ করি নি। কিন্তু কি লাভ হয়েছে ত তে আমার? কি দাম দিয়েছ আমার সতীত্বের—আমার পতিভক্তির?'

'চুপ কর চাঁপা, চুপ কব। কেঁদো না। তোমার সতীত্বের, নারীত্বেব এতটুকু মর্যাদা আমি দিই নি। কেবল পুরুষত্বের অহংকারে তোমার প্রতি অবিচার করেছি। আমি কথা দিচ্ছি চাঁপা, জীবনে যে ভুল করেছি সে ভুল আর করব না। তোমাকে বিয়ে করে আবাব নতুন করে সংসার গড়ব। সেই বাসনা নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে মোসলেমা বলল ; 'তা কি হয়। যে কাঁচ একবার ভেঙে গেছে তাকে কি আর জোড়া দেওয়া যায়। আবার যদি তুমি বিয়ে করে আমাকে তোমার সংসারে নিয়ে যাও তাহলে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আমাকে সইতে হবে।'

মুস্তফা বাধা দিয়ে বলল ; 'না চাঁপা না, সে ভয় নেই। বাড়ির কর্তা আমি। আমি যা বলব তাই হবে। কেউ তোমাকে কটু কথা বলবে না।'

ম্লান হাসি হাসল মোসলেমা। সকরুণ ভাবে বলল, 'তোমার বাড়ির কেউ কিছু না বললেও বলবে গ্রামবাসী, আত্মীয় স্বজনেরা। তাদের মুখ তো আর চাপা দিতে পারবে না।

তাছাড়া আমার জন্য তোমার মান সম্মান ধুলোয় লুণ্ঠিত হোক আমি চাই না। তালাক দেওয়া বৌকে ঘরে তুললে সমাজ তোমাকে একঘরে করবে। নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। সেটা কি ভাল হবে?'

'কি করবে সমাজ আমাকে একঘরে করে? চীৎকার করে উঠল মুস্তফা। আমার টাকা আছে, জমি-জমা আছে। সমাজের সব বন্ধন আমি কাটিয়ে উঠতে পারব। ওরা কেউ কিছু করতে পারবে না। তারপর একটু থেমে কি ভেবে মুস্তাফা বলল, 'জান চাঁপা মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সমাজের এই সব কুপ্রথাকে লাথি মেরে ফেলে দিই। এরা ন্যায় অন্যায় কিছু বিচার করতে পারে না। তবুও নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। দোষ করলাম আমি, আর প্রায়শ্চিত্ত করবে তুমি। কি আশ্চর্য এই নিয়ম, কি আশ্চর্যের আমাদের আইন-আমাদের অনুশাসন।'

'না গো না, মোসলেমা বাধা দিয়ে বলল, 'ও কথা তুমি বলো না। যে সমাজে আমরা বাস করি তার নিয়মগুলো তো মানতে হবে। না হলে আমরা শূন্য পথের যাত্রীর মত দিশেহারা হয়ে পড়ব। তোমরা ইচ্ছে মত বউ ছাড়বে—আমরা ইচ্ছে মত স্বামী ধরব। এ ভাবে চললে তো এ সমাজ বেশীদিন টিকবে না। অকালে জাহান্নামে যাবে।'

'সে বরং ভাল ছিল।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুস্তফা বলল, 'তাহলে তোমাকে পেতে আমাকে অনেক পথ পরিক্রমা করতে হত না। সহজেই তোমাকে আবার কাছে পেতাম। সব ভুলভ্রান্তি দু'হাতে ঠেলে আবার নতুন করে সংসার গড়তাম। পুনরায় ভুল না হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতাম। আচ্ছা চাঁপা, সত্যি করে বলত—তুমি আমার সংসারে বৌ হয়ে যাবে না, যেতে কি তোমার মন চায় না?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বিষণ্ন কণ্ঠে মোসলেমা বলল, 'মন তো অনেক কিছুই চায়, অনেক কিছুই আশা করে। কিন্তু তার মধ্যে ক'টা পরিপূর্ণতা লাভ করে!' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বুক উজাড় করে বলল, 'সব কিছু ছেড়ে অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল ; একটা সুখী সংসার, ছেলেপুলের মা হওয়ার বাসনা। কিন্তু সব, সব ব্যর্থ হয়ে গেল। অকালে ঝরে গেল সব আশা ভরসা।' বলে হু হু করে কেঁদে ফেলল মোসলেমা।

'না চাঁপা না। সান্ত্বনা দিয়ে মুস্তফা বলল, 'আমি ভুল করেছি। ভুল করে ঠকেছি। কিন্তু একটা জিনিষ আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে আমাদের এই ঠকে যাওয়া ভালোবাস অক্ষয়, অমর হয়ে থাকবে। কোন অবিশ্বাস, সংশয়, ক্ষুদ্রতা তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। আমরা একটা সুন্দর সুখী সংসার গড়ব। অতৃপ্ত হৃদয়ের সব আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করব। তাই তো লজ্জা, শরম, বাধা-বিপত্তি, ঘৃণা, ভয় সবকিছু দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বলো চাঁপা তুমি আমাকে বিমুখ করবে না।'

মোসলেমা হাসল।

মুস্তাফা বলল, 'হাসছ যে। তুমি কি সত্যই আমাকে চাও না? সামান্য একটা ভুল করেছি বলে এত অভিমান তোমার?'

অভিজ্ঞের মত মোসলেমা বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ। প্রেম মানে শুধু চাওয়া আর পাওয়া নয়। প্রেম সব তুচ্ছতার উর্দ্ধে। সে এক অনুভবের জগৎ। সেই জগতের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। তুমি আছ, আমি আছি, অথচ দুজন দুজনকে একান্ত আপন করে পাচ্ছি না।'

মুস্তফা অধৈর্য্যভাবে বলল , 'যে প্রেম মানুষের মুক্তির স্বাদ এনে দেয় না, শুধু বৈরাগ্য আনে সে প্রেমের কি দরকার। কি লাভ আছে তাতে? একটু দম নিয়ে মুস্তফা বলতে থাকে, 'রেখে দাও তোমার মনগড়া বাক্যের জাল। আমি যা চাইছি—যা বলেছি তার স্পষ্ট জবাব দাও। তুমি আমাকে ভালোবাস না? আমার দুঃখে তোমার অন্তরে কি এতটুকু বেদনার ছাপ পড়ে না?'

মোসলেমা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার, আমার অন্তর যে কি বিরহের অসহ্য মর্মান্তিক জ্বালায় জ্বলছে তা তোমাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না। সব কিছু উজাড় করে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু সেই ভালোবাসা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়ে একদিন অগ্ন্যুৎপাত ঘটাল আমার জীবনে। সেই অগ্ন্যুৎপাতের কী জ্বালা, কী বীভৎসতা কী ভয়ঙ্কর তার রূপ তা তুমি বুঝবে না। তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি তোমাকে ভালোবাসি মুস্তফা। তোমাকে একান্ত করে পেতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা, সে আকাঙ্খা আজ বাস্তব সমস্যার মুখে পরাজিত। পরাজিত আমাদের ভালোবাসা, মায়া মমতা সব। তাই তো তোমাকে কাছে পেয়েও হাত বাড়াতে পারি না। সেবা করতে পারি না।' বলে হু হু করে কাঁদতে থাকে মোসলেমা।

মুস্তফা একসময়ে মোসলেমার খুব কাছে চলে যায়। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সান্ত্বনা দেয়। 'ছিঃ চাঁপা। কাঁদে না। তোমার চোখে কি কান্না মানায়? এতদিন ধরে, তিল তিল করে যে ভালোবাসার সৌধ আমরা গড়ে তুলেছি, সেই সৌধ সামান্য 'তালাক' কথাতেই ভেঙে পড়বে?' এই, মুখ তোল। একটু হাসো। আমাকে কথা দাও .....'

মোসলেমা সম্বিত ফিরে পায়। শাসন করার ভঙ্গিতে বলে, 'আমাকে বুকে টেনে নিয়ে এটা কি করছ তুমি ছেলেমানুষের মত। এটা অন্যায়। এটা পাপ। এটা শরিয়ত বিরুদ্ধ কাজ। তুমি আমাকে তালাক দিয়েছ। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ছেড়ে দাও আমাকে।'

'না ছাড়ব না।' দৃঢ়তার সঙ্গে মুস্তফা বলে, 'আগে কথা দাও।'

মোসলেমা বোঝাতে চেষ্টা করে, 'তুমি ভুল করছ। আমাদের ধর্ম এই অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দেয় না। আমাদের ধর্মের চেয়ে কি আমি বড়? আমি বেশি কাম্য? বেশি প্রয়োজনীয়?'

মুস্তফা বলল, 'হ্যাঁ ধর্মের চেয়ে তুমি আমার কাছে বড়। বৈরাগ্যের প্রার্থনা তো আমাদের ধর্মে সায় দেয় না, তাই তো আগে প্রয়োজন সংসারের। চল চাঁপা, এই অন্ধ সমাজের

সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। যেখানে থাকবে না সমাজের বন্ধন ধর্মের কড়া অনুশাসন, আইনের জাল। চল সেখানে পালিয়ে যাই আমরা। নির্জন স্থানে গড়ে তুলি একটা ছোট সংসার। আমাদের অতৃপ্ত হৃদয় পূর্ণ করি ভালোবাসায়।

মোসলেমা প্রতিবাদ করে, 'কিন্তু এটা যে পাপ। পাপের সাগরে তো আমি ডুবে মরতে চাই না।'

'এটা পাপ নয় চাঁপা, এটা পাপ নয়।' আবেগের সঙ্গে মুস্তফা বলল, 'এটা আমাদের জীবনে একটা আলো। আমরা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ। স্বামী স্ত্রী আমাদের পরিচয়। আমাদের ভালোবাসা তো পাপ নয়। পাপের সৃষ্টি করেছে এই অন্ধ সমাজ ব্যবস্থা।'

'কিন্তু তুমি আমাকে তালাক দিয়েছ। এর পরেও....'

মুস্তফা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল— 'শুধু একটা কথার কথাতেই এত আইন, এত অনুশাসন। এই সংসারে তো আমরা কত পাপ কাজ করি। কই তার শাস্তি তো এত বেশি নয়। আমি রাগে অন্ধ হয়ে তালাক দিয়েছি বলে কি তোমার আমার সব সম্পর্ক উঠে গেছে। আসল কথা বল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না?'

মোসলেমা মাথা নাড়ল। বলল; 'না মুস্তফা না। ওভাবে পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। তাতে কলঙ্ক চাপবে। শুধু তোমার আমার নয়। আমাদের তোমাদের সমগ্র পরিবারের ওপর। সত্যিই যদি আমি তোমার কাছে একান্ত কাম্য হই, তাহলে তুমি আর কটা দিন সবুর কর। আমাদের বিধান অনুযায়ী আমার বিয়ে হোক। তিনি তালাক দিলে তুমি বিয়ে কর।'

মুস্তফা হাসল। বলল, 'কি বলছ তুমি চাঁপা, কি বলছ এ সব। দু'দিন আগে আমার স্ত্রী ছিলে। তিনমাস দশদিন পরে আর একজনের স্ত্রী হবে। আবার তিনি ছেড়ে দিলে তুমি আমার স্ত্রী হবে। এ যে সোজা ভাষায় বেশ্যার নামান্তর।'

মোসলেমা বলল, 'কিন্তু কি করব বল? এছাড়া তো গত্যন্তর নেই। জানি এটাও একটা পাপ—এটাও অন্যায় কাজ। কিন্তু ন্যায় বলে তো চলে আসছে। এটা তো মানতেই হবে। এ ছাড়া গতি কি?'

'কিন্তু এতেও তো অনেক সমস্যা আছে।' মুস্তফা বলল, 'হয়তো যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, সে হয়তো তোমাকে সহজে ছাড়বে না। পশুর মত দৈহিক লালসা মিটিয়ে সমস্ত রস নিংড়ে খেয়ে তবে হয়তো তোমাকে বাসি ফুলের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর আমি অসহায় শৃগালের মত মাংসের লোভে কাকের দিকে তাকিয়ে থাকব। তুমি কখন কাছে আসবে। হয়তো জীবন যৌবনের শেষ লগ্নে তুমি এসে হাজির হবে। তোমার মুখপানে চেয়ে আমার ঘৃণা হবে। লজ্জা, সংকোচে তুনি হয়তো মুখ তুলে চাইতেই পারবে না।'

মোসলেমা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'তাইতো আমি বলছিলাম তুমি অন্য কাউকে বিয়ে কর। তুমি সুখী হও। তাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ বা দুঃখ থাকবে না। আসল কথা

আমরা তো দু'জন দু'জনকে চিনলাম। দু'জন দু'জনকে জানলাম। আমাদের অন্তরে কোন পাপ নেই।'

'তাইতো বলছি—চল আমরা পালিয়ে যাই।' মুস্তফা আগ্রহের সাথে বলল।

'না আমি যাব না। তুমি যাও। তোমার ফাঁদে আর পা দেব না।'

'তোমার ওপর কোনদিন জেদ করি নি, করবও না। আর সে অধিকারও আমার নেই।' ব্যথিত মনে মুস্তফা বলল। 'আমি চলেই যাচ্ছি। তবে একটা কথা শোন। যদি না তুমি আমার সঙ্গে যাও তাহলে আমি আর ঘরে ফিরব না। একেবারে উচ্ছন্নে যাব। তবুও যদি ভুলতে না পারি তাহলে আত্মহত্যা করব।'

মোসলেমা চীৎকার করে উঠল, 'যাও, যাও, আমাকে আর ভয় দেখাতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?'

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় মোসলেমার, চোখ মেলে তাকায়, চারদিকে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণায়। কানের কাছে বার বার প্রতিধ্বনি হচ্ছে—'তবুও যদি তোমাকে ভুলতে না পারি, তাহলে আত্মহত্যা করব.....।' বিছানার ওপরে উঠে বসল মোসলেমা। ক্লান্ত অশ্বের মত হাঁপাচ্ছে সে। সেই সঙ্গে ওঠা নামা করছে ওর বুকটা। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। অবাধ্য অসংযত মন ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাকে রোধ করার শক্তি মোসলেমার নেই। তাই দ্রুত পদে খাট থেকে নামল। হাতড়ে হাতড়ে দরজার খিল খুলে ছুটল। অস্ফুট কয়েকটা শব্দ শোনা গেল তাঁর কণ্ঠ থেকে, 'মুস্তফা তুমি দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাব। এ বিরহ যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বাঁচতে চাই। তোমাকে ছেড়ে, এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে আমি বিদায় নিতে চাই না। তুমি দাঁড়াও।' মোসলেমার চীৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর দাদা রাজ্জাকের। কেমন যেন সন্দেহ হল মনে। ঘরে দেখল মোসলেমা নেই। চীৎকার করে ডাকল কয়েকবার। কোন সাড়া নেই। উঠোন ছেড়ে বাইরে আসতেই লক্ষ্য পড়ল অদূরে ষাটমিনসার মাঠ ভেঙে কে ছুটে চলেছে। মোসলেমা ছাড়া আর কেউ নয়। চীৎকার করে ডাকল রাজ্জাক।

পূর্ণিমা চাঁদ তখন মিটিমিটি হাসছে। মরা সাপের মত লুটিয়ে থাকা আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে বাহ্যিক জ্ঞানহারা মোসলেমা ছুটে চলল কিসের টানে কে জানে, এটা কি তাঁর মনের বিকার? না হিস্টিরিয়া রোগের অভিব্যক্তি কে বলতে পারে?

বাসুলডাঙ্গা প্লাটফর্মে এসে হঠাৎ হোঁচট খেটে মাতালের মত গড়িয়ে পড়ল মোসলেমা রেল লাইনের ওপর। পাঁচটার ক্ষুধার্ত লোকাল ট্রেনটা গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলো। সাহস করে কেউ নামতেও পারল না। ট্রেনটা যখন থামল তখন সব শেষ।

শেষ অধ্যায়ের যবনিকা টেনে একরাশ অপ্রত্যাশিত খবর নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা ছুটে চলল ডায়মণ্ডহারবারের অভিমুখে।

ভ্রষ্টা

জাহান আরা সিদ্দিকী

মেয়েটিকে ওয়াহিদের নষ্ট মেয়েমানুষ বলেই মনে হয়েছিল। সিনেমা জগতে যে মেয়ে এক্সট্রার কাজ করে সে যে কখনও ভাল থাকতে পারে. এটা তার বিশ্বাস হত না।

ফিল্ম লাইনের মেয়েদের সম্পর্কে বরাবরই ওয়াহিদের একটা বাজে ধারণা ছিল। কখনও কোনোদিন যে ও সে জগতের মেয়েদের সংস্পর্শে আসবে ভাবতেও পারেনি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাদের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। সেবার সে ভার্সিটিতে এম. এ. পরীক্ষা দেবে। লেখাপড়ার চাইতে সে ছিল রাজনীতিতে বেশি সক্রিয়। রাজনীতির চক্রে পড়ে লেখাপড়ার দিকে খুব একটা মনোযোগ দিতে পারেনি। রাজনীতিতে এত বেশি জড়িয়ে পড়ল যে একসময় সে একজন ছোটখাট ছাত্রনেতা বনে গেল। সেসময় ছাত্রদের হলে কয়েকটা মারামারির ঘটনায় দু'তিনজন ছাত্র আহত হল। পুলিশ হলে হানা দিল। এ ঘটনায় ওয়াহিদ জড়িত না থাকলেও পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে দলের অন্যান্যদের সঙ্গে হল ছেড়ে পালাল। ঢাকার আশেপাশের ছাত্ররা গ্রামে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু ওয়াহিদ বেশ বিপদে পড়ে গেল। তার বাড়ি দিনাজপুর। কমপক্ষে দুদিনের পথ। সে কেবল ভাবছিল ঢাকাতে কোথায় লুকিয়ে থাকবে। এমন সময় সিনেমা জগতের মাশরুর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা।

মাশরুর ভাই বয়সে তার চেয়ে অনেক সিনিয়র হলেও প্রায়ই তারা একসঙ্গে আড্ডা দিত। ফিল্মে ডিরেক্টর হিসেবে অল্প বয়সেই মাশরুর ভাই বেশ নাম ধাম করেছিলেন। সব শুনে তিনি বললেন. তুমি এক কাজ করো, মুখে দাঁড়ি গোঁফ লাগিয়ে আমার অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজে লেগে যাও।

চমৎকার প্রস্তাব। ওয়াহিদ এক কথায় রাজি হয়ে গেল। নাম-ধাম বদলিয়ে গোঁফ-দাড়ি রেখে সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিনেমা জগতের বেশ কিছু লোকজনের কাছে সে পরিচিত হয়ে গেল। এমন সময় একদিন একটা মেয়েকে তার চোখে পড়ল। শুটিং-এর সময় নায়িকার সখীর ভূমিকায় আর চার পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে সে নাচছিল। ওর প্রতি দৃষ্টি পড়ার কারণটা সম্ভবত ওর রূপ। দলের অন্যান্য মেয়ে তো বটেই এমনকি নায়িকার চেয়েও তাকে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, শ্যামলা রঙ, বড় বড় পল্লবঘন কালো চোখ, চমৎকার মিষ্টি হাসি, সব মিলিয়ে ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন।

ওয়াহিদের পাশে মাশরুর বসেছিলেন। ততদিনে তার সঙ্গে ওয়াহিদের ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। দুজনেই মাঝে মধ্যে মেয়েদের নিয়ে টুকটাক রসিকতা করা শুরু করেছিল।

মাশরুর মেয়েটির প্রতি ওয়াহিদের মনোযোগ দেখে বললেন, কি ভাই, রেশমীকে তোমার মনে ধরেছে মনে হচ্ছে।

ঘুরে মাশরুর দিকে তাকিয়ে ওয়াহিদ বলল, ঐ সবুজ শাড়ি পরা মেয়েটির নাম রেশমী বুঝি?

— হ্যাঁ।

— কী করে বুঝলেন আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম?

— কারণ একে বাদ দিলে বাকি আর একটিও মেয়ের দিকে তাকানো যায় না।

— তাহলে ওসব মেয়েকে কেন নিলেন?

— ওদের চেহারা ফটোজিনিক। ছবিতে ওদেরকে সুন্দরই দেখাবে।

নায়িকাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওয়াহিদ বলল,

— আপনার নায়িকাকেও সামনাসামনি খুব একটা সুন্দর দেখাচ্ছে না অথচ ফিল্মে বেশ সুন্দর দেখায়।

— সেজন্যই তো ওরা ক্যামেরা-ম্যানদের সঙ্গে খাতির রাখে। নইলে ক্যামেরাম্যান তাদের চেহারা ছবিতে আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তুলবে না।

ওয়াহিদ হাসতে হাসতে বলল, এভাবে ব্লাকমেইল করেই বুঝি আপনারা এসব মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করেন?

উনিও হাসতে হাসতে বললেন, কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না। লাইম লাইটে আনার জন্য ওরা কি আমাদেরকে ক্ষণিকের আনন্দ বিতরণ করবে না?

— এসবই চলে এখানে, তাই না?

— শোনো, সিনেমা জগতে মেয়েদেরকে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে অনেক পুরুষকে খুশি করে উপরে উঠতে হয়। যাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু দরিদ্র বা সাধারণ ঘর থেকে যেসব মেয়েরা আসে তাদেরকে তো দৈহিকভাবে এক্সপ্লয়েট করাই হয়। আর ওরাও এসব জেনেশুনে এগিয়ে আসে।

— কেন?

— খ্যাতি, গ্লামার। খ্যাতির নেশায় কত মেয়ে যে স্বেচ্ছায় প্রোডিউসার আর ডাইরেক্টরকে প্রলোভিত করে, তুমি তা বিশ্বাস করতে পারবে না। দোষ তো কেবল ডাইরেক্টর আর প্রোডিউসারেরই হয়। কিন্তু মেয়েরা এমন সব প্রস্তাব নিয়ে আসে যা অকল্পনীয়। আমার নিজের জীবন থেকে বলি, রাতে বহুবার মেয়েদের ফোন পেয়েছি। তারা আমাকে কী বলেছে জানো? 'প্লিজ আমাকে আপনার ছবিতে একটা রোল দিন। আপনি আমার কাছে যা চাইবেন আমি তাতেই রাজি।' অনেক সময় আমিই কৌশলে ওদের ম্যানেজ করি। বলি, ফটো পাঠিয়ে দিন।

— বলেন কী। এভাবে মেয়েরা বলে?

মাশরুর সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল,— পুরুষরাও সেসব সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। সিনেমায় শুধু ডাইরেক্টর কেন, সব লেবেলেই এক অবস্থা। এ লাইনে নারীদেহের ব্যবসাটা খুব বেশি হয়। সত্যি বলতে কি একবার আমি নিজেই পিম্পের মতো আচরণ করেছিলাম। হয়েছিল কি জানো, যে প্রোডিউসার ফিল্মটা করবে সে আমাকে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে ছবির নায়িকাকে তার চাই। ফাইনান্স ছাড়া আমিই বা ফিল্ম বানাই কী করে? ভেবে দেখলাম, নায়িকাও ঐ মার্কা। অযথা আমিই বা হাই মরালিটি নিয়ে বসে থাকি কেন। শেষ পর্যন্ত নায়িকাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ফিল্মটা বানালাম।

— সিনেমা জগতের প্রভাবশালী লোকজন দেখছি এদের ভালই এক্সপ্লয়েট করছে। মাশরুর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল,— শোনো, মেয়েগুলো ফিল্মে তাদের চেহারা দেখানোর জন্য এতই ব্যাকুল হয়ে থাকে যে স্পট বেয়ারাটা পর্যন্ত সুযোগ নিতে চায়। একদিনের কথা বলি। হুট করে রুমে ঢুকে দেখি দুজন স্পট বেয়ারা একগাদা মেয়ের ফটো ঘাঁটছে আর ফোন নম্বর দেখে দেখে ফোনে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আমি যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছি সে তা টের পাইনি।

— এর কারণ কী?

— ওরা ফিল্ম লাইনের প্রভাবশালী লোক সেজে মেয়েগুলোকে সিনেমায় রোল দেয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতে বলছিল। এভাবে তারা হয়তো বেশ কিছু মেয়েকে উপভোগও করে।

— মেয়েগুলো যখন সস্তা পাবলিসিটির জন্য নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিচ্ছে তখন ওদের আর দোষ কী। কথোপকথনের মাঝপথে মাসরুর চেঁচিয়ে বলল, 'কাট।'

নায়িকা ও সখীদের নাচ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। মাশরুর ওদের কাছে ছুটে গিয়ে হাত মুখ ঘুরিয়ে কীসব নির্দেশ দিতে থাকলেন। রেশমী ইতিমধ্যে মেয়েগুলোর কাছ থেকে সরে এসে এক কোণায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। স্পট বয় এসে সবার হাতে ঠোঙ্গা ধরিয়ে দিয়ে গেল। মাশরুর কাজ শেষে আবার ওর পাশে এসে বসলেন। ওয়াহিদ মিষ্টির ঠোঙ্গা খুলে মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, এক্সট্রাদেরও বুঝি নায়িকা হওয়ার আকাঙক্ষা থাকে?

— অবশ্যই। আর সেজন্য ওরা অনেককে প্লিজ করতে সচেষ্ট হয়।

ওয়াহিদ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি মেলে রেশমীর দিকে তাকিয়ে বলল, এদের সঙ্গে পতিতাদের এমন কী তফাৎ, শুনি? পতিতারা অর্থের জন্য দেহদান করে বেড়াচ্ছে আর এরা খ্যাতি, গ্লামার এসবের জন্য—

— শুধু ওসবই নয়, সেই সঙ্গে প্রাপ্তিযোগও আছে।

ইতিমধ্যে চায়ের কাপ হাতে বয়টা পাশে এসে দাঁড়াল। ওয়াহিদ একহাতে চায়ের কাপটা নিয়ে ফের সেটের দিকে তাকাল। লাইট জ্বলে উঠেছে। মেয়েগুলো সমানে নেচে

যাচ্ছে। মেয়েদের অঙ্গভঙ্গির প্রতি চোখ রেখে ওয়াহিদ মন্তব্য করল, এদের পেশায় দেখছি ডবল লাভ। সিনেমা জগতের গ্লামারটা উপভোগ করা গেল আবার ক্যামোফ্লাজের অন্তরালে অর্থ উপার্জন করা হল।

— ওদের শেষ বয়সটা কিন্তু বেশ কষ্টের। যৌবন ফুরিয়ে গেলে কেউ ওদের দিকে ফিরে তাকায় না। এমনও অনেক এক্সট্রা রয়েছে যাদের বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষা করে খেতে হয়।

মাশরুরের কণ্ঠে সমবেদনার ছোঁয়া। ওয়াহিদ তাতে প্রভাবিত হল না। তার কথার উত্তরে যুক্তি দেখিয়ে বলল,— কিন্তু প্রথম বয়সে ওরা নিশ্চয় অনেক টাকা কামায়।

— ফিল্ম জগতের সব এক্সট্রারাই তো কমপ্রোমাইজ করে না। যারা করে সাধারণ পতিতাদের চাইতে তাদের কদর অনেক বেশি। ফিল্মে কাজ করে এ গ্লামারের নেশায় পয়সাওয়ালা অনেক পুরুষই এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনেক অর্থবান ব্যক্তি এদের পেছনে টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করে না।

ওয়াহিদ রেশমীর দিকে তাকাল। উজ্জ্বল আলোয় ওর মুখখানা অপূর্ব দেখাচ্ছে। এই মেয়েটি এরকম একটা বাজে পেশায় আছে সেটা বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটির চেহারায় এমন একটা নিষ্পাপভাব আছে যে ওকে এ লাইনের মেয়ে বলে মনে হয় না। একটু ইতস্তত করে সে বলল, আচ্ছা রেশমীও কি টাকার বিনিময়ে—

মাশরুর সশব্দে হেসে বলল, বুঝেছি তুমি মুখে স্বীকার করছ না বটে কিন্তু ওকে তোমার মনে ধরেছে। তা সঙ্কোচ না করে সরাসরি বলে ফেল, আজ রাতেই আমি ওকে তোমার রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

বিব্রত হয়ে ওয়াহিদ বলল, দেখুন, আমি ঠিক ওভাবে কোনো মেয়েকে নিয়ে ভাবতে পারি না।

— কেন, তুমি কি পুরুষ মানুষ নও?

আহা তাই বলে অচেনা একটা মেয়ের সঙ্গে এভাবে— দূর, তা কী করে হয়? একটা মেয়ের সঙ্গে প্রথম প্রথম কথাবার্তা হবে, ঘনিষ্ঠতা জমবে তারপর—

মাশরুর হাসতে হাসতে রসিকতা করে বলল,— তুমি দেখছি নীতিবান পুরুষ। হ্যাঁ, ব্যাপারটাতো আগে লক্ষ্য করিনি। এতদিন হয়ে গেল কোনো মেয়ের দিকে তোমাকে এগুতে দেখলাম না। এখানে বেশীদিন সংযম রক্ষা করতে পারবে না। আর কদিন যাক দেখবে—

মাশরুরের কথার মাঝখানে ওয়াহিদ বলে উঠল,— আমার তা মনে হয় না।

— এখনই তোমার নজর পড়েছে রেশমীর দিকে। ওর ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিচ্ছ।

— ঐ সুন্দরী মেয়েটি এ লাইনে কেন এল সে ব্যাপারে কি কৌতূহল জাগতে পারে না?

চায়ের কাপটা পাশের টুলে রেখে মাশরুর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছলেন। তারপর ওয়াহিদের দিকে ফিরে বললেন, রেশমী আমার ঘরেও কয়েক রাত কাটিয়েছে।

— আপনাকে পটিয়ে নায়িকা হতে চায় বুঝি?

উনি এক মুহূর্ত থেমে কী যেন চিন্তা করে বললেন,— আমি প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। ওর যখন নায়িকা হবার মত সব যোগ্যতা আছে, তখন ঐ ধান্দাতেই সে নিশ্চয় রাজি হয়েছে। নইলে এ মেয়ে আমার সঙ্গে বিছানায় আসতে রাজি হবে কেন? কিন্তু শুনলে অবাক হবে ও সে লাইনে কোন কথাবার্তাই বলল না। টাকার ব্যাপারে ওকে বরং বেশী উৎসাহী বলে মনে হল। এখানকার যে কজনের কাছে ও গেছে সবাই মোটামুটি মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়েই ওকে নিয়ে গেছে। নায়িকা হবার তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওর আছে বলে মনে হয় না। ও সে ম্যানুপুলেট করে এতদিনে নায়িকা না হোক অন্তত সহ-নায়িকার ভূমিকাতে উঠতে পারত।

মাশরুরের সঙ্গে কথাবার্তার পর থেকে ওয়াহিদ রেশমীকে কিছুটা উৎসুক দৃষ্টি নিয়েই দেখত। সুটিং এর ফাঁকে ওর সঙ্গে দু চারটে কথাবার্তাও হত। কখনও সে দেখত রাতে সিনেমার হোমরা চোমরাদের গাড়ি করে ও বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা ওকে বাড়িতে নামিয়ে দেয়ার নাম করে কোথায় নিয়ে যেত অনুমান করা কঠিন ছিল না। ওয়াহিদকে দেখতে পেলে রেশমী সুন্দর একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে সালাম দিত। সে দৃষ্টিতে তাকে প্রলোভিত করার কোনো ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করেনি। একদিন শুটিং সেরে রাতে ওকে নামিযে দেয়ার দায়িত্ব পড়ল ওয়াহিদের উপর। গাড়িতে একা রেশমীর পাশে বসে তার অস্বস্তিই হচ্ছিল। রেশমী কিন্তু সপ্রতিভভাবেই তার সঙ্গে কথা বলতে থাকল। বলল, জানেন, আপনাকে আমার সিনেমা জগতের মানুষ বলে মনে হয় না। ওয়াহিদ চমকে উঠল। ও কিভাবে তার আসল পরিচয়টা টের পেয়ে গেল? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,— একথা কেন মনে হল?

রেশমী রহস্যের হাসি হেসে উত্তর দিল,

— আপনি এদের মতো নন।

— তুমি কী বোঝাতে চাইছ?

— ও আপনি বুঝবেন না।

গাড়িটা ততক্ষণে পুরোনো ঢাকার একটা সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য রিক্সার মাঝে তাদের গাড়িটা বার বার থমকে যাচ্ছিল। ওয়াহিদ মনে মনে একটু বিরক্ত হল। কিন্তু রেশমীর দিকে তাকিয়ে সে বিরক্তি ভাবটা আর রইল না। রাস্তার বাতির আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। সুটিং-এর সময় ও যে উগ্র মেকআপ করেছিল, বাড়ি ফেরার আগে সেটা সে উঠিয়ে নিয়েছে। মেকআপহীন চেহারাটার মধ্যে স্নিগ্ধ একটা আভা চোখদুটোতে আশ্চর্য রকমের সরলতা। কে বলবে এই মেয়ে বিভিন্ন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে অর্থ উপার্জন

করে? ওকে দেখলে মধ্যবিত্ত ভদ্র কোনো পরিবারের মেয়ে বলে মনে হয়। বয়সও খুব বেশি হবে না। খুব বেশি হল উনিশ বিশ। এই বয়সে মেয়েটি এই লাইনে এসে নিজেকে অধঃপতনের পথে ঠেলে দিয়েছে। অথচ ওর নায়িকা হওয়ার উচ্চাকাঙক্ষাও নেই। স্রেফ অর্থের লোভে এপথে এসেছে।

আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি বরং এখানেই নেমে যাই। বাকি পথটা হেঁটে বা রিক্সায় চলে যাব।

গাড়িটা বেশ কিছুক্ষণ যানজটে আটকে থাকায় লজ্জিত মুখে বলে রেশমী। অজান্তেই ওয়াহিদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, না না কষ্টের কী আছে। তুমি মেয়েমানুষ একলা এত রাতে কীভাবে যাবে?

রেশমী যেন চমকে তার দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে বিস্ময়, কিছু বেদনাবোধ। ওয়াহিদের কণ্ঠের সহানুভূতির সুর ওকে যেন স্পর্শ করেছে। ওয়াহিদ সেটা অনুভব করে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য প্রশ্ন করল,— কে কে আছে তোমার বাড়িতে?

— বাবা, মা আর ছোট তিন ভাই-বোন।

— তোমার ভাইবোনরা কী করে?

— ছোট বোনটা ক্লাশ এইটে পড়ে, বাকিরাও স্কুলে।

— তুমি পড়াশুনা করছ না?

— আর হল কই। ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম।

এটুকু বলে রেশমী হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। গভীর চিন্তার রাজ্যে ও চলে গেছে। এই মুহূর্তে ওয়াহিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ও যেন সচেতন নয়।

— তোমার বাবা কি চাননি তুমি লেখাপড়া করো?

ভাবনার রাজ্য থেকে ফিরে এসে রেশমী বলল,— বাবার খুব শখ ছিল আমি বড় হয়ে স্কুলে কিংবা কলেজে পড়াব।

— তাহলে পড়া ছেড়ে দিলে কেন?

মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পেল ওয়াহিদ।

— আপনার জীবনে আপনি যা হতে চান সেটা কি হতে পারেন? জীবন কি আপনার হাতের মুঠোয়?

রেশমীর উত্তরে একটা ধাক্কা খেল ওয়াহিদ। একেবারে দার্শনিকের মতো কথা বলছে রেশমী। তাইতো, ওয়াহিদ কি কখনও কল্পনা করেছিল রাজনীতির লাইনে এসে সে লেখাপড়া অবহেলা করবে? কত শখ ছিল বড় হয়ে ডাক্তার হবে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমাবে কিন্তু কীভাবে যেন সে পথ থেকে সে সরে গেল। কিন্তু রেশমীর মতো মেয়ে এসব উপলব্ধি করল কীভাবে?

— রেশমী, এতবড় কথা কে শিখিয়েছে তোমাকে?

— শুনুন, আমি হয়তো আপনার মতো অত লেখাপড়া শিখতে পারিনি, কিন্তু যতটুকু দেখেছি সে অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি তো রয়েছে!

— সেটা কী?

— জীবনে ছোট্ট ছোট্ট কিছু ঘটনা আপনাকে কোথায় স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সে আপনি নিজেও জানেন না। আপনি অসহায় দৃষ্টি মেলে সব দেখতে থাকবেন, বুঝতে পারবেন কিন্তু কিছু করার কিছুই থাকবে না। ওয়াহিদ স্তম্ভিত হয়ে রেশমীর দিকে তাকিয়ে রইল। রেশমীর মুকে নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি। ও হঠাৎ জানালাব কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ড্রাইভারকে বলল, এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে।

ওয়াহিদ বলল, কোন বাড়িটা তোমাদের?

— আর খানিকটা গলির ভেতর ঢুকতে হবে। অত সরু গলিতে গাড়ি ঢুকবে না। আচ্ছা আসি।

বলতে বলতে ও গাড়ি থেকে নেমে গেল। ওয়াহিদ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ওর পিছু নিল। রেশমী ফিরে তাকিয়ে বলল, আপনি চলে যান। ওয়াহিদ বলল, আমি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব। বলা যায় না পাড়ার বখাটে ছেলেপিলে......

রেশমীর মুখে বিদ্রূপের হাসি।

— আমি অত ভাল মেয়ে নই সে আপনি জানেন। তাছাড়া পাড়ার ছেলেরা আমাকে চেনে, অযথা উত্যক্ত করবে না। বরং গাড়িটা ওখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে যানজট লাগবে।

— ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

সেদিন থেকে রেশমীকে ওয়াহিদ যেন একটু অন্যদৃষ্টিতে দেখতে লাগল, মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু রহস্য আছে যা নিদারুণভাবে তাকে আকৃষ্ট করে। পরদিন শুটিং-এর ফাঁকে রেশমী তার কাছে এসে বলল,

গতরাতে আপনি আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে এতা সজাগ ছিলেন দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার ব্যাপারে কেউ এতটা দুশ্চিন্তা করবে এ আমি ভাবতে পারিনি।

রেশমীর কথাগুলো ওয়াহিদকে দুর্বল করে ফেলল। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে সে টুকটাক কথা বলতে শুরু করল। এরই মধ্যে একদিন সংবাদ পেল যে তার দলের এক নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে ফেলেছে। সে রাতে সিনেমা জগতের একজনের বাড়িতে বড়সড় পার্টি ছিল। ফুলে ফুলে ছাওয়া লনের পাশের বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মৃদু আলো জ্বলছিল। পাশে ছোট্ট বিদেশি প্রজাতির বাঁশগাছগুলো বসন্তের বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বা চেয়ারে বসে গ্লাস হাতে গল্পে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারা দুজন হাল্কা পানীয় ও মদ পরিবেশন করতে করতে ছুটোছুটি করছিল। আকাশে

বড়-সড় উজ্জ্বল চাঁদ। লনের একপ্রান্তে মিউজিক বাজছিল। সব মিলিয়ে রোমান্টিক একটা পরিবেশ। ওয়াহিদ এমনিতেই কখনও অতিরিক্ত মদ পান করত না। কিন্তু সেদিন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পরই রেশমী এসে তার সামনে দাঁড়াল। আজ হাল্কা গোলাপী রঙের সাদা বুটিওয়ালা জামদানী শাড়ি পরেছে সে। গলায়, কানে হাতে সামান্য গয়না। দীর্ঘ চুল পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে। রেশমীর সৌন্দর্য তার মনের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ওকে ওয়াহিদ বিছানায় নেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। ওর দিকে ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে জড়ানো গলায় বলল, রেশমী আজ রাতে তুমি—

তার কথাটা শেষ হল না। তীব্র শ্লষেব সঙ্গে রেশমী বলে উঠল, শেষ পর্যন্ত আপনি, আপনিও সেই একই দলে-- ছিঃ। অথচ আমি আপনাকে অন্য রকম ভেবেছিলাম, মন থেকে শ্রদ্ধা করেছিলাম।

রেশমীব দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা। ওব মুখটা বাগে আবক্তিম হয়ে উঠেছে। লজ্জায়, সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেল ওযাহিদ। মদের ঘোব কেটে যেন বাস্তবে ফিরে এল। রেশমী ততক্ষণে তার সামনে থেকে সরে গেছে।

পরদিন সেটে রেশমীর চোখেব দিকে সে তাকাতে পারছিল না। গত রাতে মদের ঘোবে নিজের আচরণ স্মরণ করে লজ্জায মাথাটা নত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রেশমীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পরও ওর উপব রাগ হয়নি বরং ওব কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছিল। নানান ছলে সারাটা দিন বেশমীর কাছ থেকে ওয়াহিদ দূরে দূরে থাকল। একবার খেযাল করল রেশমী দূব থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে এমন ভান করল যেন ওকে তার চোখে পড়েনি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়ানো গেল না। রেশমী সন্ধ্যার দিকে তার সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। ওর দিকে একবাব দৃষ্টিপাত করে চোখ সরিয়ে নিল সে। রেশমী মৃদু কণ্ঠে বলল, সরি, গতরাতে আপনাকে ওভাবে কথাটা বলা আমার ঠিক হয়নি। আপনি তো অন্যায় কিছু করেননি। আমি ওধরনেরই মেয়ে। কিন্তু কেন জানি আপনাকে আমি ওরকম ভাবতে পারি না। ওয়াহিদ এতক্ষণে ওর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল,

— তুমি ঠিকই করেছিলে রেশমী। আমি অধঃপতনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তুমি শাসন করে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিলে। ঐ কঠোর আচরণটুকু আমার প্রাপ্য ছিল।

— কিন্তু অত বড় বড় কথা তো আমার মুখে সাজে না। আমি নিজেই যেখানে—

কথাটা শেষ না করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করল রেশমী। ওর চেহারায় বেদনাব ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

— কেন, রেশমী, কেন তুমি এপথে—

রেশমী গভীর দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল। সে চোখের দৃষ্টিতে কী দেখল সেই জানে। মৃদুকণ্ঠে বলল, আজও কি আপনি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন?

— গাড়িটা গলিতে আবার যানজট সৃষ্টি করবে না তো?

রেশমী হেসে বলল, আজ আমাকে গাড়ি ড্রপ দেবে না। বাসে করে ফিরতে হবে। আপনি যদি যেতে চান তাহলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

— কখন যাবে তুমি?

— আমার কাজ শেষ, এখনই ফিরব।

ওয়াহিদ তাকিয়ে দেখল রেশমী শুটিং-এর পোশাক আশাক ছেড়ে ইতিমধ্যে হলুদ রঙের একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিয়েছে। মুখে প্রসাধনের কোনো প্রলেপ নেই।

— চলো বেরিয়ে পড়ি।

— আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। ফেরার পথে কাঁচা বাজার হয়ে যেতে হবে।

— ঠিক আছে, আমার সময়ের অভাব নেই।

রেশমী তাকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচা বাজারে ঢুকল। আলু, মরিচ, তেল থেকে শুরু করে একগাদা সওদা দুহাতে ঝুলিয়ে বলল, চলুন।

ওয়াহিদ হাতটা ভারী ব্যাগের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ওটা আমাকে দাও।

— আমার অভ্যেসটা নষ্ট হয়ে যাবে। রোজ রোজ তো আপনি আর আমার বোঝা বইবেন না।

জোর করে ওর হাত থেকে খানিকটা বোঝা হাতে তুলে নিয়ে ওয়াহিদ বলল, রোজ তুমি বাজার করো নাকি?

— রোজ সময় পাই কোথায়? দু তিন দিনের বাজার একবারে করে ফেলি। চলুন বাসস্ট্যান্ডে যাই।

— আজ আমি তোমাকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যাব।

— অযথা টাকা খরচ করবেন। অবশ্য বাসে যেতে নিশ্চয় আপনার কষ্ট হবে। ঠিক আছে।

সেদিনের মতো ওরা সরু গলির মুখটাতে নেমে পড়ল। ততক্ষণে রাস্তার পাশের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু গলির মুখের ল্যাম্প পোস্টটির বাল্ব নষ্ট। ক্ষীণ আলোতে গলিটা ঠিকমতো চোখে পড়ছে না। মনে হল রেশমী অন্ধকার গলিতে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত। রেশমী সামনের দিকে চলতে চলতে বলল, আপনি আমার পিছন পিছন আসবেন। সাবধানে হাঁটবেন, বাঁদিকে একটা ড্রেন আছে।

ড্রেনটা ওয়াহিদ দেখতে পেল না তবে উৎকট একটা গন্ধ নাকে এসে প্রবেশ করল। আশপাশের জীর্ণ বাড়িঘর থেকে চিৎকার আর চেঁচামেচির শব্দ কানে এল। বেশ কিছুটা হাঁটার পর রেশমী ভগ্নপ্রায় একটা বড় দালানের সামনের গেটে এসে থামল। দালানের প্রজ্বলিত আলোয় এদিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক পুরানো আমলের দালান। লোহার

গেটে মরচে ধরে আছে। রেশমী তার দিকে ফিরে বলল, আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনাকে এখানে এভাবে আনাটা ঠিক হয়নি।

— তুমি যদি রোজ এ পথ ধরে হেঁটে আসতে পার তাহলে একদিন কি আমি আসতে পারব না?

— ভেতরে আসুন।

গেটের ভেতর ঢুকে দালানটা পেরিয়ে একেবারে পেছন দিকটাতে চলে এল রেশমী। একটা বিশাল জামগাছের আড়ালে জীর্ণ একতলা একটা ছোট্ট দালান। বাইরের অধিকাংশ জায়গায় সিমেন্টের আস্তর খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। ভয় হল কখন বাড়িটা ধ্বসে পড়বে। রেশমী এই বাড়িতে থাকে একথা ভাবতে কষ্ট হল তার। ততক্ষণে রেশমীর কড়া নাড়ার শব্দে একটি মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে। চেহারাটা রেশমীর মতো, কিন্তু রঙটা কালোর দিকে। রেশমী ওয়াহিদকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছোট বোন রুনা।

রেশমী আর ওয়াহিদের তার হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে রুনা ভেতরে চলে গেল। ঘরের এককোণায় নড়বড়ে একটা টেবিলে বসে দুটো কিশোর পড়ছিল। ওয়াহিদকে দেখে পড়া ছেড়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রেশমী তাকে বলল, বসুন।

ছোট্ট ঘরটার এককোণে পুরানো তিন চারটে বেতের চেয়ার রাখা ছিল। তারই একটাতে সে বসে পড়ল। রেশমী কিশোর বয়সী দুজনার দিকে দেখিয়ে বলল, আমার ভাই। তারপর কড়া সুরে ধমক দিয়ে বলল, কিরে তোরা পড়া ছেড়ে ওদিকে তাকিয়ে রয়েছিস কেন? পড়।

ঠিক এসময় ভেতর থেকে একজন পুরুষ মানুষের কাশির শব্দ পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে নারীকণ্ঠে কেউ একজন বলে উঠল, রেশমী ফিরেছিস?

— হ্যাঁ মা।

বলতে বলতে সে পুরনো পর্দাটা সরিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল। একটু পরই ফিরে এসে বলল, চলুন বাবা-মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

ওয়াহিদ ওর পেছন পেছন পাশের ঘরটাতে ঢুকল। মাঝারি আকারের ঘরের কোণে একটা চৌকিতে একজন মাঝবয়সী লোক লুঙ্গি পরে শুয়ে ছিলেন। ওয়াহিদ সালাম দিয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভাল মতো তার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। লুঙ্গির নীচ থেকে তার পায়ের অংশদুটো নেই। রেশমী পরিচয় করিয়ে দিল, বাবা।

ঘোমটা পরা রেশমীর মা বাজার সওদাগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রেশমী বলল, মা চা দাও এককাপ।

ওয়াহিদ বাধা দিয়ে বলল, আজ থাক, অন্য একদিন খাব।

ওর মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। রেশমী বলল, ঠিক আছে থাক।

ঘরের ভেতর এক পলক তাকিয়েই ওয়াহিদ বুঝল এই একঘরে রাতে সবাই মিলে শোয়। মাত্র দুটো রুমের মধ্যে এদের বসবাস। ঘরের সবকিছুর মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। রেশমীর বাবা ওয়াহিদকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মেয়েটা আপনাদের ওখানে চাকুরী করে বুঝি? ওকে একটু দেখে শুনে রাখবেন। জানেন কত স্বপ্ন ছিল ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে—

রেশমী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, এসব কথা এখন থাক।

— তোকে নিয়ে আমার স্বপ্নের কথাটা বলছিলাম।

তিক্ত হাসি হেসে রেশমী বলল, স্বপ্নটাতো আর কখনও পূরণ হবে না। কী দরকার অযথা সে স্বপ্নের কথা আলোচনা করে।

কিন্তু স্বপ্ন না দেখলে আমি বাঁচব কী নিয়ে? দেখিস তুই, আমার বিশ্বাস আছে তুই অনেক বড় নায়িকা হবি। পড়াশোনা হল না তো কী হয়েছে। ফিল্ম লাইনে তুই ভাল করবি।

— চলুন, ওঘরে যাই।

ওয়াহিদ রেশমীর সঙ্গে পাশের ঘরে এসে বসল। ওর ছোটভাই দুটো ফের পড়া বন্ধ করে আগের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। রেশমী বলল, আবার পড়া ফাঁকি দিচ্ছিস?

ওয়াহিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি অন্য একদিন আসব, আজ আসি।

রেশমী তাকে দরজার বাইরে জামগাছটা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, একলা ফিরতে পারবেন তো? কাউকে সঙ্গে দেব?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করল,

— কীভাবে তোমার বাবার—

— বাবা অফিসের কেরানী ছিলেন। দৌড়ে বাস ধরতে যাবার সময় পা পিছলে পড়ে যান। বাসের চাকাদুটো তার পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়।

— সেই থেকে এ সংসারের সব দায়-দায়িত্ব তুমি বহন করছ, তাই না?

রেশমী উত্তর দিল না। ম্লান আলোতে ওয়াহিদ দেখল ওর চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে চোখে ঘুম এল না ওয়াহিদের। বিছানায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগল। রেশমীর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। রেশমীর সংগ্রামী কঠিন জীবন, সংসারের জন্য ওর আত্মত্যাগ সবকিছু মিলিয়ে ওর জন্য কোমল এক অনুভূতি তার মধ্যে জেগে উঠল। ওকে যে নষ্ট মেয়ে ভেবেছিল, সেটা স্মরণ করে এখন সে নিজেকে ধিক্কার দিল। মনে হল ও মোটেই সস্তা মেয়ে নয়। নিজের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে এই বয়সে সংসারের জন্য রোজগারে নেমেছে। এরপর সেটে গেলে ওয়াহিদ ওর সঙ্গে গল্প করত। দু-একজন এ নিয়ে তার সঙ্গে রসিকতাও করত। একদিন দুপুরে ও খাচ্ছিল, ওয়াহিদ হুট করে সেখানে হাজির হল। ওর টিফিন বক্সের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দুটো পাউরুটির টুকরো আর আলুভাজি। বেচারি এত পরিশ্রম করে অথচ ভালমতো খেতেও পায় না। কেন জানি রেশমীর সংগ্রামময় জীবনের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল তার। এরপর থেকে সে ইচ্ছে করেই ওর বাবার নাম করে কখনও ছোট ভাইবোনদের জন্য মিষ্টির প্যাকেট কিংবা ফলমূল পাঠাত। প্রথম দু একদিন সঙ্কোচভরে রেশমী এসব গ্রহণ করলেও প্রতিবাদ করে একদিন বলল, কেন আপনি আমার পেছনে শুধু শুধু টাকা খরচ করছেন? বিনিময়ে আমি তো আপনাকে কিছু দিতে পারব না।

— রেশমী তুমি আমাকে যা দিয়েছ এর বেশি আর কিছু চাইবারও নেই।

রেশমী তার কথাটার অর্থ বুঝল না কিংবা বুঝেও বিশ্বাস করতে পারল না।

— কী দিয়েছি আমি আপনাকে?

— সে তোমার বুঝে নিতে হবে। সব কথাই কি মুখে বলতে হয়?

রেশমীর মুখে আবার সেই বেদনার ছায়াটা ফিরে এল। কি যেন সে ভাবছে। আঙুলের মধ্যে শাড়ির পাড়টা ক্রমাগত জড়াচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, জানেন, আজ রাতে আমাকে ফটোগ্রাফারটার সঙ্গে শুতে হবে নইলে ও ফিল্মে আমার চেহারাটা খারাপ করে দেবে। ওয়াহিদ ওর দিকে তাকাল? ও হাসছে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আক্রোশ। ও যেন তার মধ্যে ওর প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে চাইছে।

কিন্তু ওয়াহিদের মনের মধ্যে ঘৃণার বদলে সহানুভূতি জেগে উঠল। কোমলকণ্ঠে বলল, কেন তুমি নিজেকে এত ঘৃণা করো? শোনো, চুরি করলে, ঘুষ খেলে সমাজে আমরা তাদের অত খারাপ বলি না অথচ তোমাদের কাজটাকে সবচেয়ে জঘন্যভাবে চিহ্নিত করি। তোমরা তো কাউকে ধোঁকা দিচ্ছ না বা বঞ্চিত করছ না, স্রেফ পুরুষদের কিছু সার্ভিস দিয়ে টাকা কামাচ্ছ তাও তোমার নিজের জন্য নয়, কতগুলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে। এতে এত খারাপ বোধ করছ কেন?

রেশমী উত্তর না দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করল, একাজ করতে তোমার খারাপ লাগে তাই না?

রেশমী তিক্ত হেসে উত্তর দিল, এই জঘন্য কাজ করতে কি কারো ভাল লাগে?

— তাহলে কীভাবে—

— বাধ্য হলে অনেক কিছু করা যায়। প্রথম প্রথম মনটা বিদ্রোহ করে উঠত। এখন আর তা হয় না, অভ্যেস হয়ে গেছে।

সংসারের জন্য এতটা স্যাক্রিফাইস করলে তুমি?

রেশমী ওয়াহিদের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, কেউ সেটা বুঝবে না। কী হত আজ আমি এভাবে উপার্জন না করলে? ছোটবোনটা লেখাপড়া বন্ধ করে হয়তো এই একই পেশায় আসত, ছোটভাই দুটো গুন্ডা বদমাইশ হয়ে পাড়ায় পাড়ায় মস্তানি করে বেড়াত।

— ঠিক তাই। তুমি নিজের কষ্টের বিনিময়ে ওদেরকে ভাল পথে রেখেছ। ব্যাপারটাকে কেন এভাবে দেখতে পারছ না?

— আপনি সত্যি আমাকে ঘৃণা করেন না?

— আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো তো, কী মনে হয়?

রেশমী গভীর দৃষ্টিতে ওয়াহিদের চোখে চোখ রাখল। সে দৃষ্টিতে ওর প্রাত যে অনুভূতি লেখা ছিল সেটা দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই শুটিংটা এক্ষুনি শুরু হয়ে যাবে।

এরপর যখনই ওয়াহিদ রেশমীর সেটে যেত ওকে দেখে রেশমীর চোখদুটোতে খুশির দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ত। নিঃশব্দে দুজনের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে যেত। কিন্তু মুখে কথা হত না। ইতিমধ্যে ভার্সিটির গন্ডগোল মিটে গেল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে ঝগড়াটা ছিল নেতারা মধ্যস্থতা করে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। ওয়াহিদের ছাত্রাবাসে ফেরার সময় হয়ে গেল। এর আগের দিন রেশমীকে সন্ধ্যায় বাইরে খেতে নিয়ে গেল সে। রেশমী রেস্টুরেন্টে বসে সঙ্কোচভরে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ওয়াহিদ জিজ্ঞেস করল, কী দেখছ?

— যদি আপনার কোনো চেনা লোক এসে দেখে ফেলে!

— কী হবে তাহলে?

— আপনার দুর্নাম হবে না তো?

— ও নিয়ে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু আজ তোমাকে আমি একটা কথা বলব।

রেশমী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। ওয়াহিদ তাকে সব কথা খুলে বলল। সে যে সিনেমা জগতের কেউ নয়, বিশেষ কারণে তাকে এখানে এতদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল সব তাকে খুলে জানাল। সেই সঙ্গে এও জানাল যে তার ফেরার সময় হয়েছে।

রেশমী বিস্মিত দৃষ্টি মেলে সব শুনছিল। ওয়াহিদ থামতেই বলে উঠল, আপনার আচার আচরণ দেখে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল আপনি এ জগতের নন।

— আমি ফিরে যাচ্ছি তবে প্রায়ই তোমাকে দেখতে আসব।

রেশমী একমনে আইসক্রীম খাচ্ছিল, মাঝপথে ওয়াহিদের কথা শুনে খাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছিল। আইসক্রীমের বেশ খানিকটা অংশ গলে বাটিতে জমছিল। সেটা আবার সে খেতে শুরু করল।

— কী ভাবছ রেশমী?

— আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই না?

— কে বলেছে? আমরা সবসময় দেখা করব। আর একটা কথা মনে রেখো, যখনই তোমার কোনো সমস্যা হবে, তুমি আমাকে যোগাযোগ করবে। আমি তোমার পাশে দাঁড়াব।

— কী অধিকারে সে সাহায্য চাইব?

ওয়াহিদ গভীর দৃষ্টিতে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, আমার উপর তোমার সব অধিকার আছে।

রেশমীর দুচোখ জলে ভরে উঠল। এই প্রথম সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নায় ওর সমস্ত দেহটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওয়াহিদ বাধা দিল না। ও কেঁদে যদি খানিকটা হাল্কা হয়, হোক। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবার সময় রেশমী আবদার করে বলল, আমি একটা অনুরোধ করলে রাখবেন?

— বলো।

— এসব রাজনীতি ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দেনেন। রাজনীতি করে যতসব টাউট লোকজন। আপনি অনেক বড় দরের মানুষ, আপনাকে এদের সঙ্গে মানায় না।

— সত্যিই তুমি এটা চাও?

— হ্যাঁ।

— আমি রাজনীতি ছেড়ে দিলাম।

রেশমী যেন তার কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখদুটো।

— এত সম্মান কেউ আমাকে দেবে কখনও ভাবতে পারিনি।

— এ সম্মান তোমার প্রাপ্য, রেশমী। বাবা মা থেকে শুরু করে অনেকেই চেষ্টা করেছিল এ রাজনীতি ছেড়ে লেখাপড়ার জগতে আমাকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু পারেনি। অথচ জানো আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। ঠিকমতো লেখাপড়া করলে আজ আমি অনেক ভাল চাকরি করতাম। কিন্তু কী ভয়ানক নেশায় যে ডুবে গিয়েছিলাম।

— সে নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন তো?

— পারব শুধু তোমার জন্য।

সত্যিই ভার্সিটিতে ফিরে গিয়ে ওয়াহিদ রাজনীতি ছেড়ে দিল। দলের বন্ধু-বান্ধবরা বেশ অবাক হয়ে গেল। অনেকে ভাবল পুলিশের ভয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে তার মধ্যে পরিবর্তনটা এসেছে। দলের লোকজন জোরাজুরি করল। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকল। এর মাঝে কয়েকদিন রেশমীর সঙ্গে দেখাও করল, কিন্তু পরীক্ষা এগিয়ে আসাতে লেখাপড়ায় ভীষণভাবে মন দিল তাই রেশমীর সঙ্গে ততটা যোগাযোগ রইল না। একদিন হঠাৎ রেশমীকে দেখার তীব্র বাসনা জেগে উঠল। পড়াশোনার একফাঁকে সেটে গেল রেশমীর খোঁজে। রেশমী সেদিন সেটে আসেনি। স্পট বয়টা বলল, ওনার শরীর খুব খারাপ শুনেছিলাম, কদিন থেকেই তো আসছে না।

ঘড়ির দিকে তাকাল ওয়াহিদ। আজকে লাইব্রেরিতে না গেলেই নয়। আগামী পরশুর পরীক্ষার ব্যাপারে একটা বই সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু রেশমীকেও দেখার

ইচ্ছেটা ত্যাগ করতে পারল না। ভাবল লাইব্রেরির কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে রেশমীর বাড়িতে যাবে।

ওয়াহিদ বিকেলে হলে নিজের রুমে বসে গভীর মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছিল দরজায় টোকার শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। মাশরুর ভাই দরজার অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার চোখ মুখ থমথমে। অথচ উনি প্রাণোচ্ছল একজন মানুষ। দেখা হলেই পরিহাসছলে কিছু একটা রসিকতা করেন। আজ রসিকতার ধারে কাছে না গিয়ে সোজা বলে বসলেন, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। ওয়াহিদ রেশমীর বাড়িতে যাবে ঠিক করেছে, এই অসময়ে আবার এ কি প্রস্তাব! কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা সে তাকে জানাতে চাইল না। এমনিতেই রেশমীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নিয়ে তিনি রসিকতা করেন। মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে বলল,— আজ পড়াশুনার বড্ড চাপ, কোথাও বেরুতে চাইছি না।

— একজন মৃত্যুর আগে তোমাকে বার বার দেখতে চাইছিল, আমার মনে হয় তার মৃতদেহটার পাশে অন্তত তোমার দাঁড়ানো দরকার।

— মারা গেছে! কে?

অবাক হয়ে ওয়াহিদ মাশরুর ভাইয়ের দিকে তাকাল। মাশরুর ভাই তার চেহারার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে একটু দ্বিধা করলেন। ওয়াহিদের মনের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

— কথা বলছেন না কেন?

— রেশমী আজ দুপুরে মারা গেছে। খুব দ্রুত মারা গেল, তোমাকে খবর দেওয়ার সময়ও পাইনি। ওয়াহিদের কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল, কী বললেন?

তার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মাশরুর বললেন,— তুমি শক্ পাবে জানতাম। ওর প্রতি তোমার অনুভূতির কথা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মেয়েটি বড় অসহায় আর ভাল ছিল। ওয়াহিদ ততক্ষণে চেয়ারে বসে পড়েছে। মাশরুর ভাই তার খাটের পাশে বসলেন। অনেকক্ষণ দুজনের কেউ কথা বলতে পারল না। একরাশ নীরবতার পর ওয়াহিদ নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল? মাশরুর ভাই আবার ইতস্তত করছেন। সম্ভবত এমন কোনো কথা যা সঙ্কোচের কারণে বলতে পারছেন না। ওয়াহিদ আবার বলল,— প্লিজ আমাকে সব খুলে বলুন।

মাশরুর আস্তে করে বললেন, জানই তো কীভাবে ও অর্থ উপার্জন করত। কিন্তু মেয়েটা গর্ভনিরোধ ব্যবহারে সম্ভবত পটু হয়ে উঠতে পারেনি। কোনো এক হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে গর্ভপাত করিয়েছিল। অধিক রক্তপাতে শেষ পর্যন্ত—

মাশরুর কথাগুলো শেষ না করে থেমে গেলেন। ওয়াহিদ তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে এতই অবিশ্বাস্য ঠেকছিল যে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল

না। মাশরুর আপন মনে বলতে থাকলেন, ওদের সংসারের অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। ভাবছি ওর ছোট বোনটাকে রেশমীর জায়গায় কাজ দেব।

— চলুন যাই।

ওয়াহিদ যেন ঘোরের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। মাশরুর তাকে সঙ্গে করে রেশমীদের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেই দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমার পাশ কাটিয়ে রেশমীর বাড়ি পৌঁছলে। আজ রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়। ভিড় ঠেলে মৃতদেহের সামনে গিয়ে যখন ওরা দাঁড়াল তখন মুখের কাপড়টা উঠিয়ে রেশমীর মুখ দেখানো হচ্ছে।

ওর মুখটার দিকে ওয়াহিদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন ঘুমিয়ে রয়েছে রেশমী। ওর মুখে আজ নেই বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ। পরম প্রশান্তির ছাপ সে মুখে, ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি। চোখ দুটো বোজা। এত পবিত্র একটা মৃত মুখ সে আগে কখনও দেখেনি।

তসবির দানা

এমদাদুল হক নূর

সবে তখন সূর্য উঠছে। দরমার হাঁস মুরগিগুলো তখনও কলরবে মুখর। রোশনের মা নামাজ পড়ছিলেন আর মোনাজাতের সময় কাঁদছিলেন। হে খোদা তুমি সোভান সেখের মনটা ভাল করে দিও। আজ যেন অন্তত বিশটা টাকা দেয়। নইলে ইজ্জত বাঁচবেনা। তুমি মেহেরবান কর খোদা।

সারা রাত রোশনি বিবি ঘুমোতে পারেনি। রাতে তার জামাই বেটি এসে গেছে। ঘরে চালের একটি দানাও নেই। কি দিয়ে সে জামাইয়ের আদর যত্ন করবে? মা বাপ তার নাম রেখেছিল রওশন আরা খাতুন। অনেকে ডাকে রোশনি বলে। আর বেশির ভাগ লোক ডাকে রোশনের মা বলে। তার বড় ছেলের নাম রওশন!

কাজ করা বাড়িতে রাতে যা ভাত পায় তার কিছুটা রেখে দেয়। সকালে তাতে কুঁড়ো মাখিয়ে হাঁস-মুরগিগুলোকে দেয়। হাস-মুরগিগুলো তার অসময়ের সম্বল। ছোট ছেলের রাখালির মাইনে— আর গতরের খাটনি - এই নিয়েই তার বাঁচা। আজ আর ভাতে কুঁড়ো মাখাবার সময় হয় না। কারণ দেরি করলে চলবে না। যেমন করে হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সকালেই চা বিস্কুট কিনতে হবে। তারপরেই নাস্তা!

রোশনি বিবি ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে পড়ে। তখনও তার মেয়ে জামাই কপাটে খিল এঁটে বিছানায় পড়ে আছে।

চার পাঁচটি বাড়ির পরেই সোভান সেখের বাড়ি। তার বাড়িতেই তার ছোট ছেলে রহিম আছে। সোভান সেখের বাড়িতে বসে সোভান সেখকে পায় না। ফজরের নামাজ পড়ে গোয়াল বাড়িতে গেছে।

সোভান সেখ ঝুল পাঞ্জাবি গায়ে নাদুসনুদুস দুধ দেওয়া গাইটির দিকে দেখছিলেন। গাইটির শিরদাঁড়ায় থাপ্পড় মেরে ময়লা ঝেড়ে দিলেন। গাইটির রং লাল। এই গাইটির প্রতি সোভান সেখের আলাদা মায়া। কারণ তাদের বাড়িতেই এটি বিইয়েছে। বড় হয়েছে। তার মাও বড় শান্ত ছিল। অনেক দুধ দিত। দুধ দুয়াবার সময় কোন বিড়ম্বনা করত না। এ মেয়ে মায়ের মতই হয়েছে। মায়ের চেয়েও বেশি দুধ দেয়। এসব যখন সোভান সেখ ভাবছেন এমন সময় তার ধ্যান ভঙ্গ করে রোশনি বিবি। কোন ভূমিকা ছাড়াই বলে ওঠে—

সোভান ভাই বিশটা টাকা দিতে হবে?

কেন?

জামাই বেটি এসেছে!

মাসে দুবার করে তোমার জামাই বেটি আসবে আর আমাকে টাকা দিতে হবে? আশ্বিনের আজ দু তারিখ হলেও ভাদর মাসইতো চলছে। এখনও এক কাঠি ধান ওঠেনি। মাইনে তো রহিমের দুশ টাকা। নিয়ে ফেলেছ দুশ ষাট টাকা। আর একশ চল্লিশ টাকা দিলে তো দুবছরের টাকা দেওয়া হয়ে যায়। আগামী বছর কি খাবে?

দাও ভাই সামনের বছর শোধ করে দেব। এবছর খরা গেল। সাড়ে ছ'টাকা কেজি চাল কিভাবে আর সংসার চালাই। এবারে তো ধান ভাল হয়েছে। জিনিসপত্র সস্তা হবে। বেগ পেতে হবে না।

জামাই পুষতে পারবে না তো বেটির জন্ম দাও কেন? আমি পারব না। গরম গরম কথা চালায় সোভান সেখ।

রোশনি বিবি জানে সারা পাড়ায় কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। এবছরের খরার দরুণ সবার অবস্থা কাহিল। কে আর ধার দেবে। আর ক'টা দিন না গেলে কারোরই অবস্থা সচ্ছল হবে না। কাতর ভঙ্গিতে হেই সোভান ভাই বলে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে!

সকালবেলায় কি করে মাগীটা। আমি কি টাকার গাছ যে নাড়া দিলেই পড়বে?

হেই ভাই এবারটা-এবারটা তুমি দাও। রহিম আমার খেটে সব শোধ করে দেবে।

সোভান সেখ নির্দয় মানুষ হলেও এ যাত্রা রাজী হয়ে গেল বিশটা টাকা দিতে।

রোশনি বিবি দ্রুত পায়ে দোকান থেকে চা চিনি কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরল। পাশের বাড়ির আবিদের মায়ের কাছ থেকে খানিকটা দুধও চেয়ে আনল!

বর্ষার চাষ শেষ হলে গৃহস্থ পরিবারের জামাইরা শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসে। তখন চাষের কাজ থাকে না। থাকে সামান্য নিড়েনের কাজ। তার ফাঁকে হপ্তা দশ দিন শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে বেরোয়। সচ্ছল পরিবারের শ্বশুর শাশুড়ি খুশি হন। কিন্তু তাদের দেখাদেখি খানিকটা বিবেকহীন হতদরিদ্র পরিবারের জামাইরা অনেকেই শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসে। রোশনি বিবির জামাইও সেরকম। সেও বেড়াতে এসেছে - গ্রামের বাতাসে হাঁড়ি নড়া ভাদরে।

মা চা হল - বিটি মিহি সুরে জিজ্ঞাসা করল। তোমার জামায়ের বড় ভোক লেগেছে। এত বড় রাত।

তা তো লাগবেই মা। কাল কত কষ্ট করে ট্রেনে বাসে এসেছে। রাতে তো মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছুই ছিল না। অত রাতে ভাতও ব্যবস্থা করা যায় নি! চা খাইয়ে দিয়ে নাস্তা পানির ব্যবস্থা করে দিয়ে রোশনির মা কাজে বেরিয়ে পড়ল। সবুর সেখের বাড়িতে সে কাজ করে।

কিগো রোশনির মা এত দেরি? জিজ্ঞাসা করে সবুর সেখের স্ত্রী।

জামাই এসেছে মা! তাদের চা নাস্তা পানির ব্যবস্থা করে তবে তো বেরোতে পারলাম!

দু বছরের পুরনো জামাই বছরে কতবার আসেগো? বাঁকা সুরে কথা বলে সবুর সেখের স্ত্রী।

কি করব মা। বারণ তো করতে পারিনা। বেটি দিয়েছি!

দেওয়ালে গোবর দিতে বেরিয়ে যায়। রোশনি বিবি দুহাতে গোবরগুলো ভাল করে ছানে। থপাথপ থপাথপ দুহাতে দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়। কাজ করে আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। চারিদিকের অভাব দৈন্যে তার কলজে কানা হয়ে গেছে। শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। একটা শাড়ির অর্ধেকটা পরনে আছে বাকিটা বাহুতে বুকে জড়িয়ে আছে। বুক ঢাকার মত তেমন কিছু নেই। সারা শরীর শুকিয়ে কাঠ। বুকের উঁচু নীচু বোঝাই যায় ন। এখনও পঞ্চাশ পেরোয়নি। চল্লিশেই বিধবা হয়েছে। চারিদিকের দুঃখ কষ্টে সে শেষ হয়ে যেতে বসেছে। হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের যন্ত্রণা ঘুঁটে দেওয়ার তালে তালে আরও সশব্দ হয়ে ওঠে। মাথাটা ঘোরে। এখনও পেটে দানা পানি পড়েনি। এখনও এক পেজে গোবর আছে। সেটা দেওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দানা পানি মিলবে না। খানিকটা বসে। চিন্তা মগ্ন।

সবুর সেখের বিবি দেখতে এসেছে গোবর কতদূর দেওয়া হল। এসে দেখে রোশনি বিবি বসে আছে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওঠে— হারাম খাকি বসে আছিস তাড়াতাড়ি গোবর দিয়ে নে। বাসি হাঁড়ি থালা পড়ে আছে - আবার ভাত চাপাতে হবে। এইজন্যে তোর কপালে ভাত জোটে না। নিমক হারাম। কাজ করতে এসে বসে আছে। হারাম খাকি। মুখে যা আসে বলতে থাকে।

রোশনি বিবি আবার গোবর দিতে শুরু করে। বড় বেটার প্রতি তার খুব রাগ হয়। তার বাপ মরে যাওয়ার পর সে যেমনি কামাই করতে শিখল নিজেই পসন্দ করে বিয়ে করে ফেলল। তার একবছর পরেই পৃথক হল। মাকে আর কামাই দেয় না। বউ নিয়ে দিব্যি আছে। নাহ্, তার কোন দোষ নেই। তারও তো এবছর দিনের পর দিন ভাত হচ্ছে না। কাজ নেই, কে কাজ করবে। তার সামনেই তো দিনের পর দিন মাগ ভাতারে উপোস যাচ্ছে। বউ মানুষ কাজই বা কোথায় করতে যাবে। বাইরে বেরোলেই হারামজাদারা নজর দেবে। উহ! ছোঁড়াটারও বড় কষ্ট! মা হয়ে জন্মেছি কষ্ট লাগে। আহ্! খোদা আর পারছি না। উচ্চারিত হয় গভীর বেদনা আর্তি।

পানতা ভাত কাঁচা পিয়াজ দিয়ে উবু উবু গিলে নেয় রোশনি বিবি। তারপর বাঁ কাঁখে থালা বাসন ভর্তি করে নেয় আর ডান হাতে তিনটি মাটির হাঁড়ি নিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় ঘষা মাজা করে ধোয়ার জন্য।

রোশনি বিবি থালা বাসন মাজে। পানি নাড়িয়ে নাড়িয়ে ধোয়। পানিতে আঘাত লেগে ঢেউ ওঠে। সে ঢেউ কচুরি পানাতে গিয়ে লাগে। যেন রোশনি বিবির বেদনাতেই কচুরি পানারা বেদনার্ত হয়ে কেঁপে ওঠে। সে বেদনা আছাড় খায় পুকুরের চতুর্দিকে। থালা বাসন হাঁড়ি মেজে যেমনি ঘাট থেকে পাড়ে উঠতে যাবে অম্‌নি পা পিছ্‌লে আছড়ে পড়ে যায় রোশনি বিবি। তিনটি মাটির হাঁড়ি ভেঙে চুর! আর চিনা মাটির দুটি পেয়ালা। রোশনি বিবির কোমরে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। উহ্! আল্লাহ্! ভিতর থেকে শব্দগুলি কঁকিয়ে ওঠে। সবুর সেখের বিবির বাজখাঁই গলা এবার শুরু হল। হারামজাদা মাগীর কোনও কাজে হিজির নেই।

নষ্ট বই ভাল করতে দেখলাম না, যতদিন থেকে কাজে লেগেছে। সে দিন চায়ের পেয়ালার ডাণ্ডাটা ভেঙে ফেলল, আজ আবার অত গুলান হাঁড়ি। খান্‌কিকে কি আর বলব।'

কি কবর মা আমি কি আর ইচ্ছা করে করেছি। আমার পাছাটাও ভেঙে গ্যাছে। দাঁড়াতে পারছি না।

হারামজাদী, তোর পাছা ভাঙলো তো আমার কি। তোর ভাতার থাকলে কাঁদতো। তোর আর কি লুবো, ল্যাংটো করে কাপড়টা কেড়ে নিলে তবে তু জব্দ হোস! রোশনি বিবি চরম অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। নির্বাক। নিস্তব্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস খানকি! পালিন যা। কাল থেকে আর কাজে আসতে হবে না। জামাই-এর সাথে শুগা! গৃহস্থের গৃহিনী রেগে গিয়ে মুখে যা আসে বলতে শুরু করে। রোশনি বিবির গা টা ঘেন্নায় রিরি করে ওঠে। তবুও পালাতে পারে না। বাড়ির আঙিনাটা ঝাঁট দিতে শুরু করে।

কাজ কর্ম সেরে বাড়ি চলে যায়। কারণ, জামায়ের ভাত রান্না করতে হবে। দ্রুতপায়ে সে বাড়িতে প্রবেশ করে।

এই শোন না। কোথায় যাচ্ছ?

আসছি।

শোননা।

জামাই তার বিটিকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে, রোশনি বিবি জানলা দিয়ে লক্ষ্য করে নজর ফিরিয়ে নেয়।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে রোশনি বিবি রান্না চাপায়। একটু পরে বিটি নেমে আসে।

মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলে— মা, আঁচটা ধরিযে ভাতটাতো চাপাতে পারতিস। সবতো ব্যবস্থাই ছিল - বলে গেলাম।

ছোট্ট জবাব। দুদিন বেড়াতে এসেছি, আমি পারব না। স্বামীকে নিয়ে সুখে ব্যস্ত মেয়ে মায়ের কষ্টের কথা খেয়ালই করে না।

রোশনি বিবি আর কথা বাড়ায় না। আঁচের আগুনের মত তার হৃদয়েও এখন আগুন জ্বলছে। সে আগুনে ভিতর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিটি জামাইকে খাইয়ে নিজে অভুক্ত অবস্থায় থেকে আবার সবুর সেখের বাড়িতে বিকালে এল কাজ করতে। ভীরু পায়ে চরম অপরাধীর মত।

খট করে বার দরজা খোলার আওয়াজ হল। সবুর সেখের বিবি তখন খাওয়া সেরে মাটির দোতলার উপর ঘরে কাপড় চোপড় শিথিল করে শুয়ে আরাম করছিল। শুয়ে শুয়েই বলল— কে রোশনি, ভাত ঢাকা আছে উসারে (বারান্দায়)। খেয়ে নে। তারপর থালা বাটি গুলান ধুয়ে নিয়ে আয়। আবার ভাঙিস না যেন!

রোশনি বিবির খেতে কোন প্রবৃত্তিও জাগে না। কিন্তু না-খেয়েও কোন পথ নেই। খিদেয় আর দাঁড়াতে পারছে না। সেই কখন দুটো পানতা খেয়েছে।

ঢাকা ভাত খাওয়ার জন্য খোলে। দেখে পুই শাকে কচুতে আর খানিকটা আলু আছে অন্য বাটিতে। অথচ আজ দুরকম মাছ রান্না হয়েছে। টক মাছ। ঝাল মাছ। সে ঝি। ভাত দিয়েছে এটাই তার নসিবে আছে!

ভাই আবিদ, এবারের মত কিছু টাকা দিতেই হবে। আবিদ লক্ষ্য করে, ভীরু অপরাধীর মত রোশনি বিবি এসে তার সামনে দাঁড়ায়। বেদনায় ম্লান। লজ্জানত মুখ। কি চাচী, কি দরকার। তোমাকে যে বড় খারাপ দেখাচ্ছে গো?

জামাই এসেছে বাপ। পাঁচ দিন হয়ে গেছে। আর চালাতে পারছি না। শেষ সম্বল চারটে হাস মুরগি ছিল। সে গুলোও সস্তা দরে বিক্রি করে গত দুদিন চালালাম। আর যে কোথাও মিলছে না বাপ!

তা কত চাই চাচি?

বিশ টাকা দিলেই হবে। আজকালের মধ্যে চলে যাবে। আসা তো হয়ে গেল পাঁচ দিন। এই কমাসে সে আবিদের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছে। আবিদের ভাই বড় চাকরি কবে মাদ্রাজে। সে চিঠিতে জানিয়েছে, এবছর দেশে খরা। সাধ্যমত গ্রামের সবাইকে ঋণ ধার দিতে। আবিদ ঋণ ধার দিয়ে চলেছে হিসাব না-রেখেই। ধরে নিয়েছে এসব ঋণ সে পাবে না! রোশনি বিবি দোআ করে। আল্লাহ তোমাদের ধন দিক। তোমরা সুখী হও!

দুদিন পরেও রোশনি বিবির জামাই গেল না। রোশনি বিবি বড় মুস্কিলে পড়ে গেল। আর কোথায় যায়?

সকালে হাজার চেষ্টা করেও সে নাস্তার ব্যবস্থা করতে পারল না। প্রতিদিনই আলু ভাজা আব সরষে তেলের পরোটা করে দেয়। গরিবের ঘরে ঘি কোথায় পাবে। আজ আবিদের মায়ের কাছ থেকে খানিকটা মুড়ি আর চিনি চেয়ে এনে বাসনে করে দিল। আবিদের মায়ের কাছ থেকে খানিকটা চালও নিয়ে এল দুপুরের রান্নার জন্য।

দুপুরের রান্নার পর ভাত বেড়েছে রোশনি বিবি। মেয়ে রোখ দেখিয়ে বলতে শুরু করল— না, আমরা ভাত খাব না, আজ তু আমার স্বামীকে নাস্তা দিসনি।

রোশনি বিবি আর থাকতে পারে না। আমি কোথায় পাব? দেখছিস না— না-খেয়ে তোদের খাওয়াচ্ছি! আর তো সে বয়স নেই যে তোদের নাঙ করে খাওয়াব!

জামাই উপরে বসে সব শুনছিল। বৌকে ডাকল। বলল, চল, এখনি আমরা বেরিয়ে যাই। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। রোশনি বিবি জামাইকে বাধা দেবার চেষ্টা করল, হেইবাবা, থাক বাবা, জামাই কোনও কর্ণপাত করল না। হনহন করে চলে গেল। তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে টপটপ করে চোখের পানি সফেদ তসবি দানার মত দানা দানা হয়ে ঝরতে লাগল!

দুই বোন

আফসার আমেদ

আর্জিনা গ্রীষ্মের দুপুরে বিছানায় শুয়ে ছিল। ঘুমোতে চেয়েছিল। একটু ঘুমিয়েছেও। বোনাইয়ের বাড়ির বিছানায় সে শুয়ে আছে। ভরা যুবতী। ঘুম ভেঙে যাবার মুহূর্তে একটা সহজাত ভয় তার বুকের ভেতর ধাক্কা মারে। বোনাইকে ভয়। কেননা বোনাই, অর্থাৎ তার দুলাভাই তাকে নিকে করতে চেয়েছিল। কয়েক মাস আগের ঘটনা। দুলাভাই ইয়ারু হোসেনকে বিয়ে করা ছাড়া উপায়ও থাকত না আর্জিনার। বড়বোনের সতীন হয়ে এ ভিটেতে আসতেই হত আর্জিনাকে। কেননা তার দুলাভাইয়ের বিষয়সম্পত্তি অঢেল। চাষবাস বিস্তর। গ্রামের মাতব্বর গোছের। তাছাড়া মান্যতা পাবার মত ধর্মকর্ম করত। মুশুল্লি হয়ে উঠেছিল। কোরান কেতাব পড়তে পারত। আর্জিনার আব্বাজির কাছে তাঁর বড়জামাই গর্বের ছিল। ইয়ারুর শ্বশুর হবার সুবাদে আর্জিনার আব্বাজি আরও অনেক লোকজনের কাছে মান পেত। ইয়ারুর কথায় বশ ছিল শ্বশুরমশাই।

গতবছরই শীতের শেষের দিকে বোনাইবাড়ি এসেছিল আর্জিনা। তখনই মনে ধরেছিল তাকে ইয়ারুর। তখন বড় হয়ে উঠেছিল সে। বালিকা থাকতে থাকতে বড় হওয়া। গুলিসুতোর গেঞ্জি বুনতে বুনতে, মায়ের শাড়ি ফ্রকের ওপর পরতে পরতে বড় হওয়া। দাঁত ভাঙার স্মৃতি যখন বিস্মৃতি হয়নি। সেবারে নানা কথায় মন ভোলাত। নানা কিছু দিয়ে মন পেতে চাইত। কাছে কাছে থাকতে বলত। অমন রাশভারি মাতব্বর মুশুল্লি লোকটার সামনে আর্জিনা একেবারে কেঁচো। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনও পথ ছিল না। তার বড়বুবু অর্থাৎ ইয়ারুর বিবি তহমিনা ছিল দাসীর অধম। নিজের জন্য মুখ ফুটে কোনও কথা স্বামীকে বলতে পারত না। আর বলার যো-ও ছিল না। পঁচিশ বছর এ সংসারে পার করে দিয়েছে সে।

সেবারে, মাস পাঁচ আগে ইয়ারুর চার বিঘের আলুখেত সবুজে ভরে উঠেছিল। আর্জিনা বেড়াতে এসেছিল। ভাল খাবে, পরবে বলে। আর্জিনা এখানে থাকতে থাকতে নিকে করে ফেলবে এমন মতলব চলছিল। হাতচিঠি পাঠিয়ে শ্বশুরকে জানিয়ে দিয়েছিল ইয়ারু। গরিব শ্বশুরমশাই আর্জিনার বিয়ের খরচখরচা থেকে বাঁচবে। দুই বোন এক সংসারে সতীন হয়ে থাকলে পটবে ভাল। আর্জিনাও ইয়ারুর সম্মোহনে বন্দী হয়ে উঠেছিল। ভেবে নিয়েছিল লোকটার বিবি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আজ আর সে-ভয় নেই। ইয়ারুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। লোকটা জলজ্যান্ত বেঁচে আছে এ সংসারে। সেবারে আর্জিনা থাকতে থাকতেই বদলে যায় পরিস্থিতিটা। লোকটার হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে যায়। ল্যালাভোলা হয়ে যায়। সেবারে মুষল বৃষ্টিতে চার বিঘের আলুখেত মার খায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়ারু পাগল হয়ে যায়। একেবারে বদ্ধ উম্মাদ

নয়। হাঁটে অন্যরকভাবে। কথা বলে হাবাগোবার মত। আর সেই মুশুল্লির পোশাক পরে না। সেই পীরান গায়ে নেই। নেই মাথায় গোল টুপি। সেই রাশভারি ব্যক্তিত্বটাই হারিয়ে ফেলেছে। চাতুর্য নেই। বুদ্ধি নেই। কিছু খ্যাপামি করে মাত্র। একটু উদ্ভট রকমের। খেতে দিলে অনেক সময় খাবে না। কিন্তু সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করে খেয়ে আসবে। যে লোকটার ভয়ে সকলে থরথর কাঁপত, তারই এই অবস্থা।

বাড়ির পরিবেশটাই বদলে যায়। তহমিনা হয়ে ওঠে এ বাড়ির কর্ত্রী। তার হাতেই জমিজিরেত, আগান-বাগান, মুনিষ-মজুর, টাকা-পয়সা সব কিছুই। তহমিনার ব্যক্তিত্ব খুলে যায়। প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তহমিনা। খুব জোরে হেসে উঠতে পারে, মুশুল্লিকে ভয় নেই। ইচ্ছেমত আগানে-বাগানে যেতে পারে। পাড়াপড়শির বাড়ি যেতে পারে। নিজের ইচ্ছে মত কেনাকাটা করতে পারে। আহা, কত সাধ গোপান রাখত সে। প্রাণোচ্ছল জীবনের স্রোতে ভাসছে সে। মুশুল্লিকে আর ভয় করে না। বরং উদ্ভট দশা দেখে হিঃ হিঃ করে হাসে, মুশুল্লিকে বকাঝকা করে, দাবড়ানি দেয় বরং। ইচ্ছে মত চুল বাঁধে, শাড়ি পরে। নিজের বাসনাগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

তহমিনাই হাতচিঠি দিয়ে আর্জিনাকে ডেকে এনেছে। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে নেই। কিছুদিন থেকে যাবে। আর মুশুল্লিকে দেখে যাবে। আর্জিনা শুনেছিল। তার আব্বাজি দেখতে এসেছিল। আব্বাজিকে ভাঁড়নাচের গান শুনিয়েছিল মুশুল্লি। আব্বাজি 'তওবা' 'তওবা' 'নউজবিল্লাহ' বলতে বলতে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। জামাইটা নাকি শয়তান হয়ে গিয়েছে। এ সব কথা শুনে আর্জিনা খুব হেসেছিল। এখনও সেই হাসি তার ঠোঁটে। কিছুতেই সেই হাসি ঠোঁট থেকে যাচ্ছে না। বোনাইকে দেখে হতভম্ব। চেহারা একইরকম। কিন্তু লোকটা বদলে গেছে। তাকে নিয়ে মজা করতে ইচ্ছে হয়। যা বলবে, তাই শুনবে,— এমন সব ফরমাশ দিয়ে মজা করা। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় তো যাক!

ঘুম ভেঙে যাবার পর বুকটা একটু ধক করে উঠেছিল যা। তারপর সব মনে পড়ে যায় আর্জিনার। তখন সেই হাসিটা ঠোঁটে চলে এসেছিল। এরকম মজা আর কী হতে পারে! চমৎকার। আর্জিনা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। রান্না শিখেছে। নানা পিঠেপালা বানাতে পারে। নানা কিস্সা ছড়া জানে। শাড়ি পরা শিখেছে। ব্লাউজের ভেতর ছোটজামা পরতে শিখেছে। লোকের চোখে-পড়বার মত হয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ালে লোকজন তাকে দেখতে দেখতে যায়। দূরে চলে গেলেও চোখ ফিরিয়ে দেখে। তারও ভাল লাগা তৈরি হয়েছে। যেমন এই হাসি। এই হাসিতে থাকতে পারার অধিকার তৈরি করা সে বুঝেছে।

ঘুম ভেঙে যাবার পর এই প্রথম সে দরজার দিকে তাকাল। এবং দেখল দরজাগোড়ায় মুশুল্লি দাঁড়িয়ে আছে। আর আর্জিনাকে দেখছে। চোখে মুখে এক খুশির ভাব। কিন্তু বোকামিতে ভরা। সামান্য মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে আর্জিনা। তারপর কৌতুক পায়। কতক্ষণ এভাবে

দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। এই চোখ দিয়েই তো আগে দেখত। এই চোখ। এই শরীর। এই হাত পা।

ঘুমের ভেতর ঘেমে গিয়েছিল আর্জিনা। বালিশের পাশে রাখা হাত পাখাটা তুলে নিতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মুশুল্লি ভয় পেয়ে সরে যায়। হেসে আর পারে না আর্জিনা। শব্দ করে হেসে ওঠে। তক্তপোশ নড়ে যায়। দেওয়ালের টিকটিকি ভয় পেয়ে যায়।

'কী হল? পাশের ঘর থেকে তহমিনা ছুটে আসে।

আর্জিনা তখনও হাসতে থাকে।

'কী হল বল না লো।'

হেসে কুটিপাটি আর্জিনা। 'এখেনে দরজাগুড়ায় এসে দেখছিল। পাখা তুলতে ডর পেয়ে পাইলেছে।' বিছানায় উঠে বসে আর্জিনা।

আর্জিনাকে দু হাতে জড়িয়ে খিক খিক করে হেসে ওঠে তহমিনা। 'ও বুন, ভয়ে পালাল?'

দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়ে তহমিনা।

এখন এই লোকটার মধ্যে সেই লোকটা নেই। যে লোকটা আছে, সে লোকটাকে নিয়ে হাসা যায়। সে-হাসির কোনও দোষ নেই। সে লোকটারও এই হাসিতে কোনও যায় আসে না। সে যেমনভাবে থাকার, তেমনভাবে থেকেছিল। সে যদি এখন থাকত, তেমনিভাবেই থাকত। এই লোকটার মধ্যে সেই লোকটা নেই বলে লোকটা নেই হয়ে যায় না। লোকটার মত আর কেউ কি নেই? যদিও এ লোকটা এখন হাসির খোরাক। এখন হাসছে বলে যে আগে হাসি ছিল না, তা নয়। হাসতে পারত না।

এতকিছু সত্ত্বেও, লোকটাকে বাগে পেয়েছে, এক প্রতিশোধস্পৃহার মত লাগে তাদের। ভয় নেই, দুর্ভাবনা নেই। এই পেয়েছি। এবারে! কিছুটা দয়া ও করুণা করার মত তাকায়। যেহেতু মানুষ। সে করুণা ওরা বানায় না, এমনি এমনি এসে যায়।

ইয়ারু দালানের সিঁড়িতে একা একঘরে অথবা কুঁয়োর ধারে কিংবা বাগানে একা একা থাকে। নানা উদ্ভট কিছু বানাবার তোড়জোর করে। উদ্ভটত্বের নানা বোকামি নিয়ে থাকে।

গ্রীষ্মের বিকেলে একটা ধুলোর ঝড় ওঠে। আকাশে সাঁই সাঁই মেঘ উড়ে চলে যায়। বাগানে সজনে গাছের ডাল ভেঙে গেল। বাবলা ও শিরীষের শুঁটি ঝরঝরিয়ে ঝরে গেল। খুব সাদা ধুলোর ঝড়ের ভেতর দিয়ে কালো মেঘ উড়ে যায়। এতকিছু দেখার আনন্দের ভেতর ছিল দুই বোন। রোয়াকে পিঁড়িতে বসে ছোটবোনের চুল বাঁধছিল তহমিনা। সাজিয়ে গুজিয়ে পরিপাটি করে দিচ্ছিল। দুই বোন ধুলোর ঝড়ের ঝাপটা আঁচল মুখে চোখে সামাল দিয়ে নেয়। বাতাসের ঝাপটা চলে যায়।

দুজনে এভাবে থাকে। দুজনে দুজনের চুল নিয়ে। থাকতে তাদের ভাল লাগে। এ হেন

ভাললাগার মগ্নতার ভেতর ইয়ারুর অস্তিত্ব তারা হারিয়ে ফেলে। এমনকি ইয়ারুর প্রতি তাদের তামাশা ও তুচ্ছতার নগণ্য মজাও তারা হারিয়ে ফেলে। দুজনের এই থাকা যেন জীবনের অন্য মাধুর্য। বাঁচার এ এক গাম্ভীর্যও বটে। বাইরের ধুলোমাখা বাতাস ও মেঘমেদুরতা হয়ত থাকে।

বড়বোন বলে, 'ছোটবুন, আর্জিনা!'

'য়ু!'

'চালকড়াই ভাজা খাবি?'

'খেতে সাধ যায়।'

'বাক্সের তোলাকরা একটা ভাল শাড়ি পরবি?'

'হ্যাঁ।'

'চল, নদীর ধারে বেড়াতে যাই।'

আর্জিনা মুখের অভিব্যক্তিতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। তহমিনা তার চুলে আর্জিনার হাতের স্পর্শ দিয়ে সেটা আন্দাজ করে। কেননা তহমিনার চুল আঁচড়াচ্ছিল আর্জিনা। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। সূক্ষ্ম স্পর্শের ভেতর দিয়ে তারা ভাব বিনিময় করছিল। একাত্মবোধ করছিল। আকাশে কোনও পাখি উড়ে যায়, দুজনেই দেখেছে। এই দেখার বিনিময় তারা করছিল চুলে স্পর্শ ও স্পর্শিত হওয়ার ভেতর দিয়ে।

কথা বলতে চাইছিল। বলছিলও। এবং অনেক কথার ব্যঞ্জনা নিয়ে তারা খেলছিল। যেমন জাওলা মাছ পাত্রের জলের ভেতর এক একবার যেভাবে চলকে ওঠে, তেমনই তারা কথার কথান্তর তৈরি করছিল।

ছোটবোন বলে 'কত শখ, কত সাধ।'

'কীসের?'

'এই কত—'

'কী কত?'

'বলতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, বলতে পারা যায়নি।'

'সত্যি নয়?'

'সত্যিই তো।'

'মন কেমন করে।'

'মন!'

নিঝুম রাতের মত হয়ে ওঠে দুজনে। আত্মমগ্ন। যেন আচ্ছন্নতা। কুয়োর ভেতর জলের নিস্তরঙ্গতা। একটু টান দিলেই বালতিতে উঠে আসবে সেই জল। আলোড়ন দিয়ে।

ওরা তারপর উঠে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার আভা লাগে তাদের চিবুকে ও কানের লতিতে।

নাকের নাকমাচির পাথর ঝিকিয়ে ওঠে। তারপর তারা দালানে উঠে এলে দেখতে পায় দালান জলে ভর্তি। থইথই করছে। ওরা মুহূর্তের মধ্যে ধরতে পারে এটা মুশুল্লির কাণ্ড। তহমিনা চোখ ঘুরিয়ে দেখল, তার স্বামী এখানে ওখানে কাছাকাছি নেই। তারা যখন একে অপরের চুল বাঁধছিল, তখন ফন্দি এঁটেছিল। আর্জিনাকে পরিপাটি করে তুলেছিল। এবং আর্জিনাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। সবার অজান্তে চুপিচুপি এই অন্যায় করে থাকে ইয়ারু। এখানে সে তার অন্যায় প্রকাশ করে ফেলে।

দেখে দুজনে হেসে ফেলে। তহমিনা আর আর্জিনা। গায়ের কনুইয়ের ঠোনা মেরে দুজনে হাসে। আর উপচে পড়ে হাসির শব্দ। আর তামাশায় ভরে ওঠে তাদের চোখদুটি।

চারদিক সামলায় তহমিনা। তার পেছু পেছু যায় আর্জিনা। বড়বোনকে কাজে সাহায্য করে। কাজলের মত ভরা সন্ধ্যা এসে পড়ে। আকাশে অসংখ্য তারা জেগে ওঠে। গাছে পাতায় ঝোপে ঝাড়ে এক নিঃঝুমতা জড়ো হয়। পোকাদের নানা শব্দ। উদ্ভিজ গন্ধ নিয়ে ঝোপঝাড়, গাছপালা, চারপাশ। হ্যারিকেন ও কুপির আলোর মধ্যে ঘরবাড়িগুলি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঘর জুড়ে সাংসারিক নানা শব্দ। নানা কথার টুকরো। নানা আবেগ, নানা আহত আশার উষ্মা।

এ সবের অনুভূতি নিয়ে আর্জিনা থাকে। ইয়ারুকে দেখতে পায় না। দালানে জল ঢেলে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে। এখন সে হাস্যবিনোদনের মধ্যে নেই। যেন চকিত ভূত হওয়ার পূর্বাস্থায় আছে। সে ভাবে, তাকে কবজা করতে চেয়েছিল এই বোনাই। সেই ভয়, সেই অসহায়তার স্মৃতি, এখনও বুকের ভেতর চকিতে এসে পড়ে! সহসা সে আনমনা হয়ে পড়ে। কোনও অদৃশ্য অন্ধকারের দিকে তার মন চলে যায়। আগে ও এখনের ব্যবধানটা তার থাকে না। যেন তার খুব দুঃখবোধের ভেতর থাকা। তার কচি মনের ওপর প্রভুত্ব খাটানোর ভয়।

তারপরই মনে পড়ে যায় ইয়ারুর এখনকার দশার কথা। ধীরে ধীরে মনে কৌতুক জমে তার। খুব হাসির ব্যাপার। এতবড় হাস্যকরতার বুঝি জুড়ি কিছু নেই। মনের ভেতর বাধাহীন নিজস্বতার গান বেজে ওঠে। ভুলে যায় সেসব দিনের শ্বাসরুদ্ধ হওয়া অবস্থার কথা। দূরে চলে যায় সে-সব। জোরে ভেতর বহে চলা হাসিটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভাত বাড়তে বাড়তে তহমিনা পাশ ফিরে তাকায়। আর্জিনা আঁচলে মুখ চেপে খিকখিক করে হেসেই চলে। থামতেই চায় না।

তহমিনা হাস্যবদনে বলল, 'কী হল?'

আর্জিনা হাসতে হাসতে বলল, 'হাসছি।

'ও, ওই কথা?'

দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে। হাসতে থাকে।

কিছুক্ষণ হাসির ভেতর কাটে তাদের।

মুখে হাসি নিয়েই দালানের একধারে ইয়ারুর ভাতের থালা রেখে আসে তহমিনা। সেখানে একখানা ডাগর আলোর হ্যারিকেন রেখে আসে। ইয়ারু অন্ধকারে কোথাও ওত পেতে আছে, খাবারের অপেক্ষায়।

তহমিনা ফিরে আসে। দু'বোনে খেতে বসে। খেতে খেতে নানা গল্প করে। সামনে থাকে ডাগর আলোর হ্যারিকেন। খেতে খেতে নানা হাস্য করে তারা। তাদের হাস্যবিনোদন ফুরুচ্ছে না। হাস্যের জন্যই ইয়ারু। এমন স্বাধীনতার স্বাদ আর কোনওদিন পায়নি। যেন বিকশিত হয়ে ওঠে। দেওয়ালে পড়া তাদের হাত ও শরীরের ছায়ার নড়াচড়ার ভেতর জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছায়ার ভেতর প্রাণ এসে বসে। হীরামন পাখির গল্পের মত। সাধ ও স্বপ্নের ইচ্ছে নিয়ে থাকা। যেন কখনও তারা অন্যরকম ছিল না। ছিল না তাদের বিপরীত দশা।

ওরা ছাদে যায়। দুই বোন। রাতের আকাশ ওপরে উপুড় হয়ে আছে। আর আছে তারারা। আলোর বিন্দুর নানাভাবে নানারকম সন্নিবেশ। সেই পরিস্থিতিতে তারা বসে থাকে। খুব খোলামেলা ও বিশালত্বের সামনে। তারা খুশি হতে চাইছিল। এবং অনেকটাই তারা খুশি হয়ে উঠছিল। আবার সুখী হয়েও উঠছিল। নিজেদের ভেতর সুখী হবার প্রাণতা। সেখানে হারিয়ে যায় ইয়ারু। ইয়ারুকে নিয়ে এই হাস্যের তুচ্ছতা-নিরেপক্ষভাবেই তারা সুখী হতে চাইছিল।

তারার আলো ডানায় নিয়ে বাদুড় উড়ে যায়। পেয়ারা গাছের ডাকে পাকা পেয়ারার সন্ধান করে। আকাশে উলকাপাত হয়। তালগাছের পাতা হাওয়ার দোলা খায়। তার ভেতর তারা বসে ছিল। কথা বলছিল। যাপন করছিল জীবন। নরম আলোর চারপাশ মিহি বাতাস গায়ে মাখছিল। ইচ্ছে করে তারা নীরব হয়ে পড়ছিল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ছোটবোন ও বড়বোনের মধ্যে কত বয়সের ব্যবধান। অন্তত পঁচিশ বছরের। সমস্যা ও যাপনে তারা এক ও অভিন্ন। তারা নারী। তাদের বয়স যেন একটা জায়গায় থেমে আছে। তারা সেই উপলব্ধি নিয়েই সমবয়সী হয়ে পড়েছিল। বঞ্চনা ও অপমানের উপলব্ধির ভেতর। অসম্মান ও পরাধীনতার ভেতর।

ওরা ছাদ থেকে নিচে নেমে এল। ওরা দেখল দালানজোড়া অন্ধকার, ঘরজোড়া অন্ধকার।

তহমিনা বুঝল তার স্বামীর এ কাণ্ডকারখানা। ওরা যখন ছাদে ছিল তখন বাড়ির সমস্ত হ্যারিকেনগুলো কল ঘুরিয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। এবং কোথাও ওত পেতে বসে আছে। কিছু একটা মতলবে। এখন মতলবটা তার জানা যায়।

বড়বোনের আঁচল ধরে থাকে আর্জিনা। আর্জিনা ভীত হয়ে বলল 'বুবু।'

তহমিনা বলল 'বুঝেছি।'

আর্জিনা বলল, 'কী বুবু?'

'তোর বোনাইয়ের মতলব। তোর লোভেই হ্যারিকেন নিবিয়ে দিয়েছে।'

'কি হবে বুবু!' তহমিনাকে জড়িয়ে কাঁপতে থাকে আর্জিনা।

'ভয় পাসনে। ও কিছু করতে পারবেনি। দেখছিস না কেমন ল্যালাভোলা! সে রকম হলে তাহলে কি মতলবের কথা জানতে পারতিস!'

'তাই তো!'

'পাগল!'

'তহমিনার আঁচল ছেড়ে দেয় আর্জিনা।

'আয়, লোকটার সঙ্গে মজা করি আয়।' তহমিনা আর্জিনার হাত টানে।

আর্জিনার হাত নরম ও যুবতী লাবণ্যে ভরা। তাকে দেখতেও সুন্দর। সহজে ব্যথিত হয়। কোনও কিছুতে সে ভীত হয়ে পড়ে।

অন্ধকার দালানের ভেতর থেকে তহমিনা কোথা থেকে হাতড়ে এক বাক্স দেশলাই তুলে আনে। তারপর আর্জিনার হাতের মুঠোয় ভরে দিয়ে বলে, 'আমি তফাতে সরে থাকছি। তুই একটা করে দেশলাই কাঠি জ্বালা, দেখবি মজা। তোর ওপর লোভ দেখবি লোকটার। তোকে হাঁ করে দেখবে। তোর কিছু করতে পারবে না। কেননা লোকটা পাগল। — কেমন মজা হবে বল তো!'

মজাটা বুঝতে পারে আর্জিনা। সত্যিই তো বেশ মজা হবে। কাছাকাছি ওত পেতে আছে লোকটা। হ্যারিকেন নেভানোর ভেতর দিয়ে তার মতলব সে প্রকাশ করেছে। পাগলের হদ্দ। তাকে একটা জায়গায় রেখে তহমিনা দূরে সরে গেছে।

আর্জিনা ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বালে, তার মুখের সামনে, তার রূপের সামনে। আলোকিত হয়ে ওঠে আর্জিনা। দেখল, দালানের একপাশে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ইয়ারু। লোভের চোখে আর্জিনাকে দেখছে। হাত একটু কাঁপে আর্জিনার।

আর্জিনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইয়ারু।

কাঁপা হাতে কাঠিটা নিবিয়ে দেয় আর্জিনা।

অমনি হা হা হাসিতে ফেটে পড়ে তহমিনা। ছুটে এসে আর্জিনাকে একটু তফাতে টেনে নিয়ে যায়। আর্জিনাও হেসে কুটিপাটি।

দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বালে আর্জিনা। দেখল, ইয়ারু পৌঁছে গেছে, আর্জিনার আগের দাঁড়ানোর জায়গাটায়। আর এটা দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে আর্জিনা ও তহমিনা।

দ্বিতীয় কাঠিটা নিবে যায়। আলোকিত যুবতী আর্জিনা, পুরুষটির বিগত লোভের সামনে। এই লোকটাই তাকে নিকে করতে চেয়েছিল। তৃতীয় কাঠিটা জ্বালায়। আলোকিত হয়। সরে যায়। আগের জায়গায় পৌঁছে যায় ইয়ারু। তারপর দুই বোন হেসে লুটোপুটি খায়। মজা করে লোকটাকে নিয়ে। ইয়ারুরও উৎসাহ বেড়ে গেছে। ল্যালাভোলা, পাগল। একশ মজার খোরাক হয়েছে এখন। দুই বোন মজা না করতে ছাড়বে কেন? চতুর্থ কাঠি জ্বলে ওঠে

আর্জিনার দুই আঙুলের ফাঁকে। কাঠিটা যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আর্জিনা। তারপর অবস্থা বদল করে। ইয়ারুরও আর্জিনার আগের জায়গায় পৌঁছে যায়।

আর্জিনা পঞ্চম কাঠি জ্বালে তহমিনার ঘরের ভেতর। অন্ধকারে সেখানে পৌঁছে যায় ইয়ারু। আর সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আর্জিনা।

হাসিতে ফেটে পড়ছে দুজনে। কৌতুকে পেটে খিল ধরে যাবে যেন। এমন বেয়াদবি এই লোকটার সঙ্গে করা যেত নাকি? তার ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতা ছিল সাঙ্ঘাতিক। দাপট ছিল অসম্ভব। লুঙ্গির ওপর পীরান ও মাথায় গোল টুপি থাকত। এই পোশাকেই সে পরিচয় দিত। এখন সেই পোশাক নেই। এখন লোকটার হাড়মাস সম্বল শুধু। কোনও হাতিয়ার নেই।

ষষ্ঠ দেশলাই কাঠিটা জ্বালাতে ইয়ারুর ঘরে ঢুকে পড়ে আর্জিনা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছ নম্বর কাঠিটা জ্বালায়। কাঠিটা অনেকক্ষণ জ্বলে। তারপর ঘরের এক কোণায় পৌঁছে যায় আর্জিনা। ইয়ারু ঘরের ভেতব ঢুকে পড়েছে, বুঝতে পারে। হেসে ফেটে পড়ছে আর্জিনা। বাইরে হাসছে তহমিনা।

ছ নম্বর ও সাত নম্বর কাঠি জ্বালাবার মধ্যে একটা সময়ে ফাঁক থাকে। আর আর্জিনার হাসির অবস্থানের মধ্যে পৌঁছবার সুযোগ দেয় ইয়ারুকে। আর আর্জিনা নতুন অবস্থানে পৌঁছে যায় তার মধ্যে। ইয়াকুর ঘরের ভেতর। সাত নম্বর কাঠিটা জ্বেলে ফেলে আর্জিনা। আলোকিত যুবতী আর্জিনা তফাতে ইয়ারুর দেখার ভেতর। সাত নম্বর কাঠিটা জ্বালার পর আর্জিনার হাতের আলো কেঁপে উঠল। দেখল ইয়ারু সেই ফাঁকে তার পীরান ও টুপিখানা পরে ফেলেছে।

চারুবালা
নাসরীন জাহান

রংতুলিমেয়ে থেকেই যুবকটি তাকে প্রথমে ডাকে চারু .... ক্রমশ চারুবালা। প্রৌঢ়া যুবকটির মা, নিঃসঙ্গ বারান্দায় বসে দেখেন, নিকট অথবা দূরবর্তী পথ, যতটুকু দেখেন তার চাইতেও অনেকখানি আত্মবুঁদ .... অন্তত বাইরে থেকে তাকে যা দেখা যায়, ফিনফিনে প্রৌঢ়ার বহির-ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যের আড়ালে অহর্নিশি কী এক ভাবুক বেদনাতুর মুখ.....মাথার ওপর ঝুলন্ত কুয়াশারা, প্রৌঢ়া অনেক দূর উল বুনে ফের কী একটা পিনসম ভুল অনুভব করায় টেনে টেনে খুলে ফেলছেন সেই সোয়েটার অথবা মাফলার হয়ে উঠতে চাওয়া বিষয়টির শরীর। যখন বুনছেন, ভারি চশমা, শরীরটা কিছুটা পেছনে হেলানো টান টান— চোখ সামনের নির্জন পথে। দীর্ঘক্ষণ তিনি হাতের বস্তুটির দিকে তাকানোরই স্পৃহা বোধ করেন না, অথবা তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এই দুটি কাঁটা, খোঁচাখুচি করে এক অর্থহীন নির্মাণ নির্মাণ 'খেলা' হয়ে থাকে।

আর যুবকটি যখন মধ্যরাতে মাথায় নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, হাতের চাপে পিঁপড়ে মরে গেলেও যে দুঃখিত থাকে অনেকক্ষণ, এবং তার হাতের চাপে পড়ে মরে না গেলে পিঁপড়েটি তার মুখে খাদ্য নিয়ে চলা সারবাঁধা আত্মীয়দের সঙ্গে আরও কতদিন বাঁচতে পারত— এই নিয়ে বিমর্ষবোধ করে, সে ক্ষণকালেও বিচলিত নয়, তার জন্য একজন প্রৌঢ়ার ঘন্টা ঘন্টা অপেক্ষা কিংবা দুশ্চিন্তার যন্ত্রণার কথা ভেবে।

একটা বেহালা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন না মাঝরাত্তিরের পথে— চারুবালা বলে, প্রথমে টহল পুলিশ এরপর শহর পেরোনো আপনার বাজনা শুনবে অরণ্যের জোনাক পোকা!

মানুষের যখন সকাল শুরু হয়, যুবকটির শুরু হয় রাত্তিরের, যুবক তখন যেন একই সঙ্গে বাংলাদেশ আর আমেরিকায় থাকে, যখন এইখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, যুবক তার চেতন অবচেতনের কোষে কোষে অনুভব করে, ফালি ফালি কুয়াশাকে ভস্ম করে দিয়ে উদিত হচ্ছে সূর্যের রক্তাক্ত চাউনি.... প্রভাত হচ্ছে অনেক মাইক আজানের মধ্য দিয়ে, ঘাই দিয়ে উঠেছে ফেরিঅলা আর সুবজ বৃক্ষের নিচে প্রকাশ্য স্নান শেষে ক্রমশ ঘুমিয়ে পড়ছে পথ বারবনিতারা। যত রাত্রি বাড়ে, যুবকের অনুভূতিতে ততই দিনের টান— নিজেকে কক্ষবন্দি বোধ করে এক হাঁসফাঁস বোধ থেকে সে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে আলো-আঁধার রাত্রির পথে।

না ঠিক বেহালা নয়, শিল্প নয়— শিল্পের স্বপ্ন থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে কবে যখন ভার্সিটি জীবন, ভালো স্টুডেন্ট এবং উন্মাদ অনিয়ম সময়ের দ্বন্দ, যখন দ্বিধাগ্রস্ত, অভিনেতা না লেখক না কণ্ঠশিল্পী হবো....এইসব কিছু উপকরণের অনেকটা অনেকটাই নিজের মধ্যে ছিল— সবচাইতে জোরাল, অভিনেতা! রাজপুতসুলভ চেহারা লম্বা চুল নিয়ে দলও

গঠিত হয়েছিল একটা... সেটা কবে? কবে? রাত্রির গাড়ির সামনের গ্লাস ঢেকে যেতে থাকে ঘন কুয়াশায়। নিজের নিঃসঙ্গতার নখর থেকে পালাতে সে ব্যাক গিয়ারে গাড়ি খানিকটা নিয়ে এমন এক বন্ধুর বাসায় নামে, বস্তাপচা রাজনীতি, সস্তা প্রেম, ধর্ম আর সেক্স নিয়ে যে অনেক বেশি সময় পার করেও একটি ভালো লাইন তৈরি করে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে না।

চারুবালা ক্যানভাসে কী আঁকে? যুবক অবচেতনে ওর আঁকা মেঘপুঞ্জের মতো অবয়বগুলিতে কেবল নিজের ছায়াকেই মূর্ত দেখতে চায়। যদিও না মানুষ, না প্রকৃতি মূর্ত নয়, তারপরও কোনো একটা ব্রাশআঁচড় দেখিয়ে চারুবালা যখন নির্ঘুম স্বপ্ন বালিকার মতো ঘোরকণ্ঠে বলে ওঠে, এ আপনার কণ্ঠ, যার ওপর স্থির প্রতিনিয়ত আপনার ব্যক্তিত্ব.... যুবক যখন ভেতর বিলোড়িত অবাক, যে চারুবালা বিশ্বাস করে শিল্পীকে বলতে নেই, সে কী আঁকছে। আসলে শিল্পী নিজেও জানে না সে কখন কী আঁকে, দর্শককে কোনো একটা বিশেষ ভাবনায় স্থির করে দিতে নেই। তাতে ছবি দর্শকেরও আবিস্কারের স্বপ্ন মরে যায়, তার সৃষ্টিশীলতা নষ্ট হয়..... সে আজ বলে দিচ্ছে? তাও যুবকের কণ্ঠকে কেন্দ্র করে.....? যখন ভেতরে রোমাঞ্চ লোভ চিক চিক — তখন সে যুবকের মুহূর্তকে অকস্মাৎ শোকাতুর করে চুল ঝাঁকিয়ে একে একে বলে যায় অন্য বন্ধুদের বৃত্তান্ত। এই লাল রেখাটা আমার ওই বন্ধুর হৃৎপিণ্ডের ক্রন্দন, আর এই যে নিচটায় কালো ছোপ যার ওপর কুচিকুচি মার্বেল পাথর আর ডিমের ভাঙ্গা খোসা বসাচ্ছি, এ আরেক বন্ধুর...। যুবক ক্রমশ; নিভে আসতে থাকে যেমন, তেমন ঈর্ষাতুর যন্ত্রণার চিতার ঢেউ খেতে খেতে আবিষ্কার করে, যে কোনো একটা বিষয়ে চারুবালাকে শনাক্ত করা যায় না বলেই সে প্রতিনিয়ত নতুন। তার প্রতি চারুবালার যে গভীর মনোযোগ, তাকে চারুবালা প্রায়ই অগ্রাহ্য করে অন্যপুরুষদের প্রশংসায় যখন মাঝেমধ্যেই মুখর হয়ে ওঠে— তখন যুবকের মনে চারুবালার সামনে নিজের সম্পূর্ণ সুন্দর প্রকাশের দুর্দান্ত লোভ কাজ করে।

কিন্তু নিজ স্বভাবের অন্তর্মুখিতা ক্রমশ নিজেকে থামিয়ে দেয়। প্রতি ভোরেই তার মধ্যে এক অসহ্য নেশা কাজ করে, চারুবালার প্রভাতের গলা এত মাদকময়, সেই কণ্ঠ সবার আগে শুনতে চায় যুবক, মনে হয় সেই কণ্ঠনেশার আবেশ শরীরে ছড়িয়ে দিন শুরু হোক যুবকের, সেই কণ্ঠ শোনার লোভে আজকাল যুবকের মধ্যরাতে ঘুমিয়েও প্রায়ই ভোরে ঘুম ভাঙ্গে কিন্তু কী এক বোধে পড়ে প্রায়শ সেই ফোন রিসিভ করে না চারুবালা। আর নিজের যন্ত্রণা অসুখ চেপে যে চারু বালা স্বপ্নের কথার মধ্যে ঢেউ খেতে পছন্দ করে, তাকে নিজের অজান্তেই প্রায়ই যুবক নিজের, পরিবারের জাগতিক অসুখ দুঃখের কথা বলে বলে হঠাৎ আবিষ্কার করে, দুঃসহ গ্লানির পাকে পড়ে সে সাধারণ হয়ে পড়ছে, ফলে পরক্ষণেই সে নিজের সহজাত বৃত্ত ভেঙ্গে আবার নাম্বার ঘোরায়, যুবক জানে, নিজের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে মানবিক হতে চাওয়া চারুবালা এক্ষণি যুবকের মাথায় যন্ত্রণার খোঁজ নিতে চাইবে.....

যুবক সেই কণ্ঠকে থামিয়ে দিয়ে ডেকে ওঠে— হেই নাইটিঙ্গেল! কিন্তু কি এক অসহ্যবোধে চারুবালা তখন কেবল যুবকের আর তার পরিবারের অসুস্থতা নিয়েই নানারকম কথাবার্তা বলতে থাকে।

একাকী শয্যায় চারুবালা গোলাপি নাইটির ঘেরে কেবলই পেঁচাতে থাকে। প্রাণের মধ্যে সাঁওতালি নাচ ওঠে! নিদ্রাহীনতা কিংবা নিজেকে ক্রমাগত আবিষ্কার করতে না পারার বোধ তার ছকহীন মুহূর্তগুলো চেটে খেতে থাকে। ঘরের কোণেব গনগনে হিটারে চোখ রেখে সে কামবোধ করে, তার সমস্ত দেহের শিরা-উপশিরায় যখন বুভুক্ষু তৃষ্ণার তাণ্ডব— তখন পালায়, সে-ও!

তিন লাফ দিয়ে যখন ইজেলের সামনে—

ঝাঁক ঝাঁক কাশফুলের স্বপ্ন তার ভেতরটা শূন্য করে দেয়। এখন ক্যানভাসের একটাই আকুলতা— কাশফুল খাব। চারুবালা বগলে রংতুলি নিয়ে শহরের আশপাশে অনেক ঘুরেছে। কিছু দৃশ্য দেখে চমকিত হয়ে যে-ই চোখ ইজেলে— কাশফুলে ঢেকে যায় সব। শেষ রাতে সে ফোন করে যুবককে— শরৎকালটায় বলুন তো আমি কোথায় ছিলাম?

ঘুমজড়ানো যুবক বলে— ওই ছ'মাস আপনি অজানা বিছনায় পড়েছিলেন। অনেক চেক করেও ডাক্তার আপনার রোগ খুঁজে পায়নি। ফোন কেটে দেয় চারুবালা। তার শরীরের ওপর দু'বছর রাত রাত সাঁতার কাটা মানুষটির কথা মনে পড়ে। ওর সাথে সংসার কবাব সময়ই কী খেয়ালে জানি স্খলিত চারুবালা ওই রুদ্ধশ্বাস রুটিনে ক্লান্ত হয়ে তার প্রণয়প্রার্থী পাঁচজনের একজনকে এক স্যাঁতসেঁতে সন্ধ্যায় বলেছিল, আমাকে স্পর্শ কর তো? দেখি তো, এক রকম কি-না!

ও একটু হামলেই ছিল, পঞ্চমজন, টসটসে চোখগুলো যেন পিষে ফেলতে থাকত মিনিট মিনিট চারু দেহ....বেচারা, মায়াও হচ্ছিল খানিকটা চারুবালার। বুকের বোতাম খুলে দিতেই ও যখন হাউমাউ টাল খেয়ে, কাঁপতে কাঁপতে স্তনভাঁজে হাত রেখেছে— দু'বছব সংসার করা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ।

নাইটির ঘেরে ফের নিজেকে বাঁধতে বাঁধতে নাম্বাব ঘোরায়, যুবকটি ফোন তুলে মহাঘুমের অতলান্ত থেকে এবং চারুবালা তাকে বলে— আজকে থেকে আমার তুমি তুমি।

ওপাশ নিঃশব্দ....চারুবালাকে গ্রাস করে মফঃস্বলে বদলির চাকবি নিয়ে থাকা যুবকের স্ত্রী....হপ্তা, দুই হপ্তা পর সে এলে তার নগ্ন শরীরের ওপরে যুবকের নিজেকে উপুড় করে দেয়ার দৃশ্যাবলি— এবং তাদের দুই যমজ শিশু অমল, ধবল!

ছায়া স্পষ্ট হয়। প্রৌঢ়ার চোখে আজকাল এত ঘুম! কেবলই মনে হয়, বিছনায়, মেঝেতে, ঘাসে শরীরটা বিছিয়ে দেয়।

প্রৌঢ়ার স্মৃতির মধ্যে রিনরিন করে প্রাচীন আভিজাত্য! এই বিকটাকার রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ির মধ্যে, জন্মের পর থেকে তিল তিল বেড়ে ওঠা পিতা প্রপিতামহের খানদানি আবহের মধ্যে তিনি রপ্ত করেছেন,

সুশৃঙ্খল কৌশলে... জেদ আর অহঙ্কার প্রকাশ্যে নান্দনিক কায়দা।

ফলে, চিরকাল ভয় পেয়েছে সবাই, সম্ভ্রম, ভক্তি করেছে, ভালোবেসেছে, কিন্তু তার শাড়ির পাড় স্পর্শ করেছে একমাত্র চারুবালা।

তিনি চমকে উঠেছেন, গলে উঠেছেন, ভেঙে উঠছেন— কিন্তু জীবনে প্রথম তাকিয়েছেন নিজের অস্তিত্বের সব চাইতে দুর্বলতম দিকটির দিকে— তার পুত্র.. যুবক....যাকে ঘর, সংসার, প্রেম, যমজ শিশুর মায়া কিচ্ছু টানে না, তার দুঃখ কী, আদৌ কোনো দুঃখ আছে কি-না তিনি জানেন না এবং যার মাথায় সারাক্ষণ কী এক যন্ত্রণা যা-না ব্যথা, না আঘাত.... ভাষা দিয়ে যে তার মাথার মৃত্যুবোধকে ডাক্তারের কাছেও সনাক্ত করতে পাবে না। অপূর্ব এক রাজকন্যা এসেছিল তার ছেলের জীবনে একদা, তাকে হাসিয়ে খেলিয়ে তার স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি দিয়েছে দূর দেশে, যুবকের সাধারণ, প্র্যাকটিক্যাল স্ত্রীর সাধ্য কী সেই ঢেকে রাখা ক্ষতে হাত রাখে?

প্রৌঢ়া ভাবেন, হাত বেয়ে উল গড়িয়ে...চাকা...পড়াও...গড়াও. .যে স্ত্রী কি-না, এক নিঃশব্দ ভোর রাত্তিরে, প্রৌঢ়া নিজ কানে কানে সন্তর্পণে শুনেছেন....ছেলের ঘন নিঃশ্বাসের মুখে উচ্চারণ করে উঠেছে...আহ্ এইভাবে নড়ছ কেন, চাদর নষ্ট হয়ে যাবে, সে কী করে—।

চারুবালাব দিকেই একমাত্র সরাসরি তাকাতে পারে না যুবক. নিজেকে ঢাকতে হাবিজাবি নানা কথা বলে....প্রৌড়ার ভ্রমর প্রাণ ওই যুবকের দেহে, তাকে বড়দিন পর সে নাড়াল, সে-ই তো সটান সালাম শেষে নির্দ্বিধায় হাত দিয়ে প্রৌঢ়ার ক্ষতবুক চেপে ধরার ক্ষমতা রাখে এবং শাড়ির পাড়। ওই তো হেঁটে আসছে চারুবালা.....বোঁচা নাক....তীব্র চাউনি, গ্রীবা বাঁকিয়ে এত দ্রুত হাঁটা....প্রতিনিয়ত কেউ যেন ধাওয়া করছে পেছনে!

প্রাচীন বাড়ির খাঁজকাটা পথে হেঁটে হেঁটে প্রৌঢ়া চারুবালার হাত ধরেন....ভেতরে কৈশোরিক নাচ ওঠে....খিরো নদীর জলে উদ্দাম সাঁতারের স্মৃতি ওঠে... হায় খোলস— বলেন, বুঝতেই পারছ এখন আমাদের ভোর.....।

চারুবালা বলে, ওর গভীর রাত্রি, আমি জানি, ও ঘুমিয়ে আছে। অবশ্য প্রায়ই আমি ভোরে উঠি না। যাহোক আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আসলে কি আমার কাছে মেয়ে? মনে মন ভেবে প্রৌঢ়া ওকে নিয়ে মোগলী কায়দায় বানানো দোতলা বিছানার ওপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে বসেন, আমাকে দেখা মানে, আমাকে পাওয়া মানে অনেকটাই ওকে পাওয়া, ওকে জয় করা। তোমার চোখই বলছে মেয়ে, এখনো কব্জা করতে পার নি আমার ছেলেটাকে, তুমি যে সেই লড়াকু, যে তোমার পায়ের কাছে আসন গেড়ে বসে থাকে তাকে নিয়ে খেলো, নয় তাকে পাওয়ার নেশায় উন্মাদ হও, যে সরলভাবেই তোমাকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আকাঙ্খা না করে নিজ পথে হাঁটে....কিন্তু আমার ছেলে যে মেয়ে কোনো দলেই পড়ে না। ঘা খেয়েছে সে রাজকন্যার কাছ থেকে, এখন

সে তোমার ভয়ে পালাচ্ছে.... সে বুঝে গেছে তাকে ছাই দিয়ে ধরে তা আছড়ানো পর্যন্ত তোমার শান্তি হবে না!

ছিঃ! কী ভাবছি আমি চারু সম্পর্কে; ধিক দেন নিজেকে প্রৌঢ়া, আমার ছেলের যদি ওর সান্নিধ্যে প্রাণে আরাম হয়...?

চারু....মানে সাথে বালা... কার দেয়া নাম? প্রৌঢ়ার এই প্রশ্নে চুল ঝাঁকিয়ে হেসে ওঠে মেয়ে, আপনার ছেলের।

চন্দ্রের স্তন থেকে খসে পড়ে হলুদ পীড়ন। আসমানে চাঁদ, তার মধ্যে মুখ, কখনো স্ত্রীর, মা'র, যমজ শিশুর....সরে যায়, কোথাও গাঁথে না মন.... বরং ইচ্ছে হয় ওইখানে ক্রমশ স্থির হয়ে ওঠা চারুবালার মুখটাকে নামিয়ে দু'হাতের ভাঁজে রেখে কিছুক্ষণ নির্ভাঁজ চোখে দেখে.....চন্দ্র....চন্দ্র....বুকের মধ্যে গুমরানো বেদনা দাবায়, ভার্সিটির শ্রেষ্ঠ সুন্দরী রাজকন্যা— বলেছেন যুবক চারুকে এই গল্প...হোস্টেল থেকে এসে ওদের নিঃশব্দ বাড়িতে পালিয়েছিল তিন রাত। তখন তো যুবক স্থির পাগল, রাতভর আড্ডা, অভিনয়, মদ......কন্যার সাথে কথা বলতে ভয়, কন্যাকে ছুঁতে ভয়......অথচ একই ঘরে, কখনো এক বিছনায়, নারী বলেই হয়তো পুরুষের হাতটা আগে ধাবিত হোক— চাইছিল, যে-সে মেয়ে হলে কথা ছিল, কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে, অথবা অকপট সরল হতে, অথবা শরীর আর মনের তপ্ত আগুন যা চাইছে, তা করতে সুবিধে হতো। এ-যে অনেকের আকাঙ্খার চোখ ঝলসে দিয়ে আসা লীলাপটিয়সী, যুবক কী করে বোঝে ঠিক কোন ব্যবহারে নির্জন বাড়িতে আশ্রিতা কন্যার মস্তক থেকে আগুনের শিখা বেরোবে না?

চোখে কটাক্ষ হেনে, 'রূপসীদের যা রপ্ত থাকে' সেই নারী সিঁড়ি বাইতে থাকে। অদ্ভুত স্নানঘর, ওপরে ছাউনি নেই, কেবল চন্দ্র ঢলের উদ্দাম মাখামাখি.... মাথায় জল ঢেলে কন্যা একটানে উড়িয়ে দেয় শাড়ি, কুণ্ডুলি পাকায় ব্রা'র ঘ্রাণ— পেছনে আসা বিমোহিত যুবক স্নায়ু দিয়ে বুঝে যায়, এই ডাক উপেক্ষা মানে এইবার দুইজন এক সাথে ঠকা। চন্দ্রের আগুনে দুটি স্নানভেজা শরীর পুড়তে থাকে।

প্রৌঢ়া বলেন চারুবালাকে, ছেলেবেলা থেকেই ও যেন কেমন! গভীর দায়িত্ববোধ আর শৃঙ্খলহীন বাইরের পৃথিবী ওর বুকে পাশাপাশি থাকে... বলতে বলতে প্রৌঢ়া দূরতম অতীতে কী জানি হাতড়ান সেই চন্দ্রদৃশ্য স্মৃতি মনে করে চারুবালা অনুভব করে ঈর্ষায় ভেতরটা টনটন করছে, তাহলে কি প্রেমে পড়েছি? আশঙ্কায় যখন ছটফট চারুবালা, দেয়ালে কোন সম্রাটের গোঁফের তলা থেকে ক্ষীণ হাসি ফুটতে থাকে.....বাড়তে থাকে রোদ্দুর..... আর তারই এক ফালি টুকরো প্রৌঢ়ার চোখ গ্রাসে— বিছানা গড়িয়ে ফের উলের বল নাচতে নাচতে.... প্রৌঢ়া বলেন, যুদ্ধের সময়, কতইবা বয়স ওর? একটা ট্রাকে করে চলে গেল কোন অজানা ক্যাম্পে.... যেন সেই ছেলেটি ফিরে আসেনি— এতকাল পরে প্রৌঢ়ার গলায়

সেই হাহাকার.... সারাদিন খোঁজ নেই, সারারাত খোঁজ নেই, হায়রে আমার প্রাণের ধন, তোকে যদি তখন খুঁজে না পেতাম, এই জীবন কাটাতাম কী করে?

যুবকের অস্তিত্বের কোষে কোষে বেদনার প্রাচীন রশ্মি ক্রমশ পেঁচাতে থাকে। বিছনায় ঢেউ খেয়ে শচীন দেব বর্মণ শুনতে শুনতে সে ভয়ে চমকে ওঠে, টের পায়, চারুবালার ছবি আঁকা দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে অক্ষম জেদ উঠছে, পৃথিবীতে কাউকে শুনিয়ে যা নিয়ে আফসোস করেনি তা-ই করেছে চারুর কাছে— অভিনয়টা যদি করতাম....কেন করনি? অন্যমনস্ক চারুর তুলিতে অবারিত রঙের স্বাচ্ছন্দ্য..... ভার্সিটিতে আমাকে দেখে যখন সবাই হাততালি দিল, সেই রূপসী কন্যা গভীর বিস্ময়ে বলেছিল, এইসব ক্লাউনেরা করে, তারা নানা ভঙ্গি করে হাততালি পায়.... তুমি কি.....? প্রেম কী আজব অন্ধ চারু, আয়নায় নিজেকে সেইরাতে হাস্যকর মনে হয়েছিল।

চারুবালা তাক লাগিয়ে দিতে চায় যুবকটিকে। ক্যানভাসে ছবি এঁকে। চাঁদরাত্রি আর যুগল মনের মানবীকে নিয়ে কী দৃশ্য সে ভেতরে দেখতে পেয়েছে তার ভেতরচোখ কতটা গভীর— কাশফুলকে দাবিয়ে রেখে সে একের পর এক ক্যানভাসে তুলির ছোবল বসায়।

প্রৌঢ়ার চোখ রাত পথের দিকে, আচম্বিতে মাকড়সা দোল খেলেও চমকানো— এসেছিস? ঘর বর্হিমুখী যুবক এর সেবায় ওর সেবায় নানারকম ঘরে রাত্রি পার করে, সে সচেতন মানুষের শরীর এবং চিকিৎসা বিষয়ে। চারুবালা তুলিরঙের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যখন ফোনে— যুবক তাকে নিভিয়ে দিয়ে বলে, আমার পেসেন্টকে এই মুহূর্তে ওটিতে ঢুকিয়েছি....চারুবলার ভেতর ভয়, যে মানুষটাকে ঘর বাঁধতে পারে না, আমার স্বপ্ন তো তাকেই স্পর্শ করতে চায়, সেও যদি আকাশ আর নির্জন অরণ্যের গল্প না করে রাত রাত স্ত্রীর ঘেমো শরীরে এঁটে থাকা মানুষদের মতো সাধারণ গল্প করে—। চারুবালার ভেতরে চলে ক্ষয় আর নির্মাণের যুদ্ধ...... সে বলে, জান আজ চোখের সামনে একটা এক্সিডেন্ট দেখেছি, সেই থেকে—। যুবক তার সহজাত স্বভাবে, কোথায়? না মানে জানতে চাইছ পান্থপথের ঠিক কোন সাইডটায়, রক্তাক্ত দেহের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা চারু এরকম নানা লোকেশনজনিত, বা মূল বিষয়ের আশেপাশে ঘুরে তাকে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করা যুবকটির প্রতি ক্লান্তবোধ করে।

স্বপ্নাক্রান্ত চারুবালা নিজের চারপাশে ছড়াতে থাকে হাজার জোনাক। রুপসী সর্প পেঁচাতে থাকে কণ্ঠে, পেঙ্গুইনের মতো লাফাতে লাফাতে সে মেঘের মতো চুল উড়িয়ে দূরের ময়ূরাক্ষীর দিকে ছুটে যায়। ফের নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে সে যুবককে মহাকাশ থেকে ধপাস নিচে ফেলে, তখন এখানে সত্যি সত্যি দিন, মানে বিকেল, যুবক তিন ঘন্টার জন্য বাবার ব্যবসার কাজ দেখে যে সময়টায়— টেনে নিয়ে আসে সেখান থেকে তাকে....ইজেলটাকে ছাদে স্থাপন করে যুবককে চমকে দেয়ার নেশায় চারুবালার সারা অঙ্গে থর কাঁপুনি।

যুবক চেয়ে আছে, হঠাৎ প্রশ্ন করে, ক্যানভাসের নিচটায় হাত রেখে— এটা কী? চারুবালা বলে পিরিয়ড রং!

লাল বলছ না কেন? আসলে— ইতস্তত চারুবালা নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে নিজে বোঝাতে খুবই অসহিষ্ণু যেহেতু, বলে— আসলে এই লালটা, সম্পর্কের অবক্ষয় থেকে নেয়া, সম্পর্কটা থেকে শেষ অবধি বেদনার রং ঢেকে গেছে। যুবকটি যখন নিজেকে প্রতারিত বোধ করে এরপর তার জীবনে আসা যে-কোনো নারীকে বিশ্বাস করতে গিয়ে ভয় পেয়েছে।

এইবার চারুবালার কম্পিত অঙ্গ জল। ছবির বিষয় থেকে সরে গিয়ে যুবক রাজকন্যার প্রসঙ্গে যায়, বলে ওর একবার ডিপথেরিয়া হয়েছিল! আমার কী যে আতঙ্ক চারু! ডাক্তারের প্রশ্নে বলেছি, বিড়ালের ঠোঁঠ ও ছুঁতে যাবে কেন? ও কেবল আমার ঠোঁট কামড়েছে।

বছরটা হেলান দেয়।

মাঝে মাঝে যুবকের কণ্ঠের কোরাস....কানে শব্দময়, আমি ভয় পাই তোমাকে, তাই মূল স্থান ছেড়ে নানাপথে হাঁটি। কখনও নিজেই স্ববিরোধী, নিজেই সব বোঝো? আগুনে পুড়ে এই অবধি এসেছিস ভয়ের সাধ্য নেই আমাকে ভয় দেখায়। তাহলে আর ভয় কী? চারুবালার প্রশ্ন— এস, সামনে সামনে দাঁড়াও, আমি ক্লান্ত বোধ করে চলে গেলে নিছক কষ্টই তো পাবে!

রিং বাজতে থাকে।

প্রৌঢ়া পা ঘষটে রিসিভারে কান পাতেন। লাইন কেটে দেয় কেউ ওপাশে। গভীর রাতে চারুবালাকে চমকে দিয়ে যুবক বলল, তুমি ফোন করেছিলে? মা বলল, তোমাকে করতে!

আমি তো কথা বলিনি! চারুবালা রক্তাভ। যুবক বলে— এ রকম ফোন করার আমার আর কেউ নেই। মা জানে।

চারুবালার অ্যাডমায়াররা আসে। পত্রিকায় ছবি আঁকার কাজ ছেড়ে দিতে বলে, বলে এতে ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়।

তোমরা আমাকে খাওয়াবে?

ওরা, যারা যারা এই ভার নিতে চায় ঝলসে উঠতে থাকা চারুবালার চোখ এবং শরীরের দিকে তাকিয়ে অজানা বেদনায় চুপ হয়ে যায়।

ভোরে একজন ফোন করে, কণ্ঠ চেনে চারু, ফটোগ্রাফিতে ও সাংঘাতিক শাইন করেছে— তুমি কাল কেন বলেছিলে, আমার ভার যদি কেউ নিত?

নেতিয়ে পড়ে চারুলতা, তোমাদের আড্ডায়? না তো? বলেছিলাম বুঝি? জানি না তো।

যুবক মধ্যরাতে ফোন করে ; পাখি, তুমি সেদিন রাতে কাঁদছিলে কেন?

চারুবালা বলে, আমি? আমি কাঁদছি না তো?

আমি জানি, তুমি নিজেই জানো না কখন তুমি কেন কাঁদ, এই জন্যই তোমার স্বপ্ন থেকে বেরোতে পারি না।

হেই ঘুড্ডি....বিকেলে কাজে যাবে চারুবালা, ফোন, আরেক জনের, তুমি আমার সাথে পরশু হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলে নদীর একদম কিনার অবধি.....।

জলের মধ্যে হাঁটছি দেখেও ডাকলে না কেন? আহ্লাদি কণ্ঠ চারুর, আমার মাথায় কখন কী ভূত চাপে—

সেইজন বলে— আমার সঙ্গে যখন চলো, লাটাইটা আমার হাতে। তীরে দাঁড়িয়ে সেটা ধরে টানতে টানতে তো তোমাকে কাছে নিয়ে এসেছিলাম!

মোবাইলে ফোন করে আরও একজন— স্বপ্ন, জান শরৎ এসেছে! ব্রহ্মপুত্রে এখন অনেক কাশফুল!

রাত্রি রাত্রি চারুবালার সারা চোখে কাশফুলের শাদা ওড়াউড়ি। তমস তমসতর গভীরে শরীরে নাইটির ঘের...পাখি....পাখি....ঘুড্ডি. ..না কোনো ভাবনাই তপ্ত আগুনটাকে নেভাতে পারছে না, কারও চোখ .... বাহু.... আলিঙ্গনের স্বপ্ন না। কেবল দুর্মর এক যন্ত্রণা ওর, চাঁদরাত্রির নিচে চোখ যায়, জ্যোৎস্না চুইয়ে বৃষ্টিস্নাত দৃশ্যটার ওপর গনগনে শরীরটাকে পেতে যুবকের চোখে থেকে ওই স্মৃতিটাকে অন্ধকার করে দিতে হবে। কাঠশীতে মাথা কুটে মরে ভোর। সারাটা পথ আচ্ছন্নের মতো কাটে। ঘুড্ডি.... স্বপ্ন.... এইসব গল্প শুনে যুবক বলেছিল, আমি অপেক্ষা করে আজীবন জিতে এসেছি। ঘুরে আস দশপাক, তিন হাতের স্পর্শই না হয় নিলে শরীরে, শরীর কী সব! চারু, নষ্ট হয়ে যায় পাক খেলে? ক্লান্ত হয়ে ঠিক যাতে বসতে পার আমার দুই আঁজলার নিচে, ছটফট না করে তারই জন্য না হয় বছর বছর দাঁড়িয়ে থাকি!

চারুবালা বলে, কেউ বলে আমার চোখ সুন্দর, এইতো কাল একজন বলল, এত সুন্দরের ভার আমি কী করে বইছি? যুবক চেয়ে থাকে। চারুবালা প্রশ্ন করে কী দেখছ গো অমন করে? যুবকের চোখে ঘোর, দেখছি, সবাই যা বলে তা ঠিক কী-না!

ধেৎ! চারুবালা হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসে।

এ-ও কি তোমার অন্তরের তলা থেকে উৎসারিত? এই মহানতা প্রেম মোহের বড়ো শত্রু, যুবক তুমিও জান। কে কখন আমার রূপের প্রশংসা করলো, আমার ফোন কার সান্নিধ্যে তখন ব্যস্ত থাকে, এটা জানতে চাওয়ার মুহুর্মুহু চাপা ঈর্ষায় যখন তুমি এক বিন্দু ব্যক্তিত্ব না খুইয়ে ছটফট কর, তখন নিজেকে ঢাকতে কেন এই মহানুভবতার শব্দ খেলা? চারুবালা ভাবে, তুমি কি জান না তোমার উদারতা আমার রোমাঞ্চিত শরীরকে নিঃসাড় করে তোলে? তবে পরাজিতরাই কি নিজেকে জয়ের মুখোশ ঢেকে— ? চারুবালা যুবকের বাড়িতে নক করে।

দরজা খুলে প্রৌঢ়া চারুবালার চোখে কী যেন দেখে ঘুমন্ত যুবকটির ঘরের পর্দা সরিয়ে

ভেতর দিকে হাঁটতে থাকেন। কোট খুলে স্লিভলেস চারুবালা নিজেকে ঢুকিয়ে দেয় যুবকের কম্বলের ওমে।

চমকে যুবক দেখে, মুখের ওপর চারু নয় সাপের ফণা ঝুলছে। বিমূঢ় বিস্ময় ঢেকুর তুলে সে হতাশ কণ্ঠে বলে— চারুবালা, আমার শরীর মরে গেছে। দু'বাহু ওপরে তুলে আরও আরও নগ্ন চারু নান্দনিক কায়দায় ঢেউ খায়.... মোহগ্রস্ত যুবক ওর খোঁপা থেকে শঙ্খকাঁটা খুলে ফেলে।

চারুবালা চলে যায় নগরের বাইরে, ন্যূনতম এক মাসের জন্য, ইজেল আর শিট ভর্তি করে কাশফুল নিয়ে আসবে। প্রৌঢ়ার ভেতর চলছিল তখন, যখন চারুবালার ফেনিয়ে উঠতে থাকা বিচ্ছুরিত আলোকনার শব্দ এপাশেও আসছিল, পাপবোধের সঙ্গে সন্তানের প্রতি মমতার যুদ্ধ। হা পুত্র! শান্ত হ! কতকাল আনন্দ কী জিনিস ভুলে গেছিস....! কিছুই শুনছি না আমি, প্রৌঢ়া তখন ভাবছিলেন, চারুবালা আসেনি বাড়িতে, ছিটকিনি খোলা হয়নি....প্রৌঢ়া জবুথবু হেঁটে রান্না ঘরে গিয়ে কইয়ের ঝোলের লবণ জিহ্বায় চাখেন। এদিকে সারারাত নগর চষে বেড়ানো যুবক কী এক কঠিন ব্যথার অসাড় দেহে বিছানায় পড়ে থাকে চব্বিশ ঘন্টা.... চারুবালাকে সে ইস্টিশনে পৌঁছে দিয়েছে, বড় বেশি তরঙ্গের সঙ্গে মায়ার মিশ্রণ ওর মুঠোতে.... ট্রেন ছেড়ে দিলে চারুবালা হাত নেড়ে বলেছে, অপেক্ষা কর, আমি তোমার জন্যই আসব।

আঙুল এখন নাভিচাঁদে। সত্যিই সব স্মৃতি আড়াল করে দাঁড়িয়েছে সেই ভোর। উঠতি যৌবনের নেশা তো কুঁজো নারীর বিকট শরীরেও তরঙ্গিত হয় তার মধ্যে রাজকন্যা-- এখন যখন দিন গড়ান যুবক স্ত্রীর স্বাভাবিক শয্যায় প্রাকৃতিক জল ছেড়ে দিয়ে নিঃসাড় হওয়াটাকে সঙ্গমের রূপ নিয়েছে, সেই মিলনকে কী তুমুল ভুল ভুঝে ঈর্ষায় খাক হয়ে সেখানে তাকে ভেঙে চুরে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে তৈরি করার মতোই নিজ সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে চারুবালা আর ওর নেশা অথবা বিহ্বলতা কিংবা আচ্ছন্নতার মধ্যে পাক খেয়ে উঠতে থাকা দেহমনের অপ্রকাশ আকাঙ্খার মুখে সে-ও জীবনের প্রথম পরত কারও ভাঁজ খুলেছে, চোখের পাপড়ি থেকে নখের ডগা পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু মিহি চুমু খেয়ে সব শেষে দস্যু হয়েছে। চারু... চারু চলো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই.... একেবারে ট্রেসলেস...তুমি পৃথিবীর ক্যানভাসে ছবি আঁকবে আর আমি দেখতে থাকবো প্রতিদিন শিল্প হয়ে ওঠা শিল্পীর এক ফালি ওড়নায় ঢাকা নগ্ন শরীরের বহুমাত্রিক মোচড়। চারুবালার ট্রেন ছেড়ে দিলে আবার সেই অশরীরী ভয়, চারুর মুখে 'পুরুষের নারী শরীর জয়ের তৃপ্তি। যখন সে ঘন ঘন চারুবালাকে শয্যায় সান্নিধ্যে পাওয়ার তৃষ্ণার ছটফট...তখন চারুবালাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওই একটি বেলার উত্তাপই ওর কাম্য ছিল।

যুবকের অন্তরাত্মায় মিহিক্রন্দন— কি করিলে বলো পাইবো তোমারে, রাখিবো আঁখিতে আঁখিতে, এত প্রেম আমি কোথায় পাবো নাথ তোমারে হৃদয়ে রাখিতে। হায়! যে যায়,

সে সব ফেলেই যায়। তার সামনে নতুন বিষয়, নতুন কষ্ট, আনন্দের পৃথিবী। যাকে ফেলে যায়, রোম রোম স্মৃতির ভাঁজে পড়ে থাকা তার পৃথিবীটা কী ভয়াল এক চতুষ্কোণ কক্ষ! হুস্.... চারুবালা হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দেয় চড়ুই। ব্রহ্মপুত্রের কুয়াশা জলের ওপর বাতাসের ঝাপট ক্যানভ্যাস ভিজিয়ে দেয়। রংতুলি ফেলে কাশবনে শুয়ে থাকে চারু.... ফিনফিনে মেঘের সঙ্গে উড়ে যায় কাশের ডগা.... বাতাসের কুণ্ডুলিতে কাশডাঁটা উদোম শরীর দোলায়...কখনও যুবককে নিচে, কখনও নিচে চারুবালা ভস্ম হতে থাকা দুটি....পাখি, কাল সন্ধ্যায় তুমি কাঁদছিলে কেন? হেই হেই মেঘ....আমিও কাশকন্যা.....বুকের মধ্যে ধারাবাহিক ক্ষরণ....পরদিন খুব ভোরে আবার গিয়েছিল সে শুধুই প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা করতে। দরজা খুলেছে এক অচেনা নারী! কী শীতল তার চোখ! যুবক, কেন তোমাকে জাগাতে এতো সেদিন আমার লীলা? মহিলাকে দেখে চারুর নতুন অনুভব, কেন আমার খাঁজকাটা দেহের বিচ্ছুরিত আগুন দেখামাত্র কখনই তুমি জ্বলে ওঠো নি? তবে কি যুবক এই সত্য ছিলো, অন্ধকারে তুমি যে তুমুল মাংসস্তূপে ডুবে জেগে উঠতে, তোমার সেই অভ্যাস সত্তা আমার দেহটাকে দর্শনীয় স্থান হিসেবেই দেখতে চেয়েছিল কেবল?

হায়! ভারসাম্যহীন স্ফীত যৌবনের কাছে কী চরমভাবেই না পরাস্ত হচ্ছিলো আমার কামার্ত সুন্দর, যদি না আমি সে-ই ভোরে—। ভেতরে কুঁকড়ে ওঠা চারুবালা অঢেল অঢেল কাশফুলের একটা ডগায় চোখ রেখে বিমূঢ়— একটি ডগায় দুটি যমজ কাশফুল। সেই দিন প্রৌঢ়ের উচ্ছল কোলেও দোল খাচ্ছিল দুটি শিশু..... অমল, ধবল! চারুকে দেখাতেই কী-না, সেই নারী দুই পাহাড় স্তন খুলে দু'শিশুর মুখে তুলে দিয়েছিল!

মাথার ওপর দিয়ে কী উড়ে যায়? খঞ্জনপক্ষী? অসহ্য যন্ত্রণার ভারে চারু বালা অসাড় পড়ে থাকে কাশবনে। শেষ রাত্রির রক্তমাংস আহার করে দিন....পাশে জলের সঙ্গে শিশিরের লিরিক.....ক্যানভাসে শিশিরের ফলা ঘাই খেয়ে চলে যায় দূরবর্তী পথে।

যুবক এলোমেলো ঘুরে কেবল নিজের কাছ থেকে পালাতে চায়। সে টের পায়, জীবনের প্রথম তার একটি পা শক্ত লোহার বেড়ি দিয়ে এঁটে গেছে কেউ। একমাত্র সে এসে না খুলে দিলে এই মৃত্যু যন্ত্রণার নিষ্কৃতি নেই। প্রৌঢ়া বয়সের ভারে কাঁপতে কাঁপতে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে যুবককে বলেন, বেশি রাত হলে... টেবিলে খাবার দেয়াই থাকবে।

যুবকের স্ত্রীর শীতল চোখ দুটো খুলে নিয়ে যায় ব্রহ্মের জল। সময়ের সাথে সাথে চারুবালার চেতনায় ঝাপসা হতে থাকে নগরের ছায়া। না যুবক....না প্রৌঢ়া....কিচ্ছু তার মধ্যে তরঙ্গ তোলে না। কেবল যুবকের উচ্চারিত সেই প্রশ্ন পাখি সেদিন রাতে কাঁদছিলে কেন? এই প্রশ্নের বিষ তাকে কুণ্ডুলীর মধ্যে পেঁচাতে থাকে। এই প্রথম দু'বছর সংসার করা মানুষটির চলে যেতে থাকা অবয়ব মনে করে নিঃসাড়ে পড়ে থাকা চারুবালা কেঁদে কেঁদে কাশবন ভিজিয়ে ফেলে।

কৃষ্ণপুঞ্জ মেঘ আসমানে। চারপাশে কাশের সঙ্গে বাতাস-কাস্তের শ্বেতাভ সঙ্গম। কুয়াশা ভিজে কঠিন হয়ে ওঠা ডাঁটার মতো চারুর দুই পা। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ইজেল, সান্ধ্য আসমান রঙিন হচ্ছে ক্রমশ। যেন যুবক ছেনি হাতে খুঁড়তে থাকে চারুবালার আত্মা, ঝাঁক ঝাঁক কাশফুল সরিয়ে সে দেখতে চায় ভেতরে কী আছে। মাস যায়। মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে ক্রমশ চারুবালার দেহের আঁটি। বাতাসের ঝাঁকানিতে তার শাদা চুল ওড়ে, পাগলের মতো....তার বুকের ওপর পড়ে থাকে যমজ কাশফুল।

ঝাঁক বেঁধে আসে পাখিরা, যারা এতদিন একজন মানুষকে দেখে বহু দূর পালিয়েছিল।

দোজখের ফেরেশতা

সোহারাব হোসেন

এক.

মেটের হাটের বুক চিরে সোজা পুবমুখী চলে গেছে টাকিরোড, বারাসাত থেকে বসিরহাটের দিকে। লম্বালম্বি মেটের হাটটাকে দু'ভাগ করেই রাস্তাটা চলে গেছে। ফলে গঞ্জ মাটিয়ার দোকান-পসারগুলো এই টাকি রোডকে সামনে রেখে উত্তর ও দক্ষিণমুখী অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত থেকে গেছে অনন্তকাল।

বাজারে ঢোকার মুখেই রাস্তার দখিনদিকে মুরগিপটির গলি। রাস্তাটাকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে যেই আমার নিত্যকার সান্ধ্য আড্ডা মুরগিপটির গলির মোশারাফের দর্জি-দোকানের দিকে পা রেখেছি, অমনি একটি অমোঘ ও কাতর আহ্বান আমার পথ রোধ করে দেয় ঃ 'মাস্টার এট্টা কথা ছেলো।' আমি পিছন না ফিরেই বুঝতে পারি পাগলা-প্যাংলা সাহেবালি আমার পিছন নিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি গলির পথেই। গবহাটবার, তাই ভিড় নেই আজ। দাঁড়িয়ে পড়ি। অমোঘ নিয়তির মতো এক আকুল আর্তির জন্য অপেক্ষা করি। ভাবি। ভাবতে চেষ্টা করি রোগা রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখের সাহেবালিকে। ভাবি আর ঈশ্বরকে এক চোখো বলে গালাগালি দিই। ভাবতে চেষ্টা করি সহায়সম্বলহীন নিষ্পাপ মনের এই মানুষটির জন্মগত কোন্ পাপ একে নিদারুণ দুঃখু করে তিলে তিলে শেষ করে চলে যাচ্ছে। ভাবি। মেটের হাটের পরিত্যক্ত প্রয়োজনীয়তার প্রত্যন্ত নোংরাগুলো আমার মাথার ঘিলুতে এলাটিং বেলাটিং খেলা করে।

আমি মোহময় হয়ে পড়ি। সাহেবালির মুখের দিকে ফিরে নতুন করে কোন ভিন্ন অর্থ পড়ার চেষ্টা করি। তার চোখের স্বপ্নকে নিমন্ত্রণ করে আমার চোখ। সয় না— সয় না। অমনি আমাকে কিছুটা সময় চুপ করে থাকতে দেখে সে বলে ঃ

-- এট্টা কতা ছেলো মাস্টার!

— তা বলো ও সাহেবালি ভাই! শরীর-গতিক ভালো যাচ্ছে তো?—আমি উত্তর দিই।

— তা যাচ্ছে। কিন্তুক এট্টা কতা ছেলো বলবার।

— কিছু বলবে তুমি?

— দেড়ডা টাকা হয় মাস্টার?

— কেন কাজ-কাম বইছে না তোমার?

— তা বচ্ছে। কিন্তু আমার উপায় কী? রোগা শরীল। ফি-রোজ আর খাটতি পারিনেকো। লোকে জোন নেয় না।

— তা কত দিলে কাজ মিটবে তোমার?

— আটাডা কোনরকমে কিনিছি। এখন গুড়টুড় যা হোক তা কিনতি হয়।

— তা আমাকে কত দিতে হবে? কত দিলে কাজ মেটে তোমার?

— দেড়ডা টাকা দ্যাও তেবে!

কথা শেষ করেই হাত বাড়ায় সাহেবালি। নিষ্কম্প হাত। কোন দিকেই তার এখন ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্য হাতখানিতে ধরা আছে আটার প্যাকেট। চোখে তার প্রার্থনার প্রত্যাশারা আকুলি-বিকুলি করে। রাস্তা দিয়ে সাঁই-সাঁই শব্দ তুলে সরকারি বাস চলে যায় কলকাতার দিকে। পাশ দিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলে যায় কিছু মানুষ। যাবার সময় সাহেবালির দিকে চকিত তাকায়। একটু হাসির আঘাত ছুঁড়ে মারে। প্রতি-উত্তর দেয় সাহেবালি আমার দিকে হাতখানাকে আরও খানিকটা দৃঢ়বদ্ধ করে ঃ 'দেড়ডা টাকা তো দিতি হয় মাস্টার।'

'মোশারাফ দর্জির দোকানে এসো দিচ্ছি'— বলে আমি সাহেবালির পাশ কাটিয়ে মুরগিহাটার গলিতে ঢুকে পড়ি। পায়ের শব্দে বুঝতে পারি সাহেবালিও আসছে পিছুন পিছুন। তাকে উদ্দেশ্য করেই বলি ঃ 'কেমন চলছে তোমার সংসার? বাচ্চা-কাচ্চাগুলো ঠিক মতো খেতে পায়—ও সাহেবালি ভাই?' কথার পিঠে কথা কাটে সাহেবালি ঃ

— সোংসারডা মুক থুবড়ে পোড়তেছে। শালা সোংসারের শির দাঁড়াখানা ভেঙে গেছে মাস্টার।

— মাঠ ঘাটে তো এখন অনেক কাজ, তুমি লাগতে পার না?

— পারিনে মাস্টার। ফি-দিন পারিনে। আর শালার মানুষজোন-গেরস্তরাও হয়েছে য্যানো আজরাইল। রক্তখেগেরো সপ। মুখির গোড়ায় দাঁড়ালিই সটান জবাব দেবে— হবে না। তুই পারবিনে সায়বালি। আরে গায়-পায় রক্ত নায় আজ নিকো। কিন্তুক একদিন তো ছেলো। তুমিই বলো মাস্টার তখন কি দেড়-দু'জনের খাটনি একলা খাটিনি? সব শালা বেইমান বিশ্বঘাতক।

— তা খেটেছো সাহেবালি। গতরে তোমার শক্তি খানিকটা ছিল। তা সে সব গেল কোথায়?

প্রশ্ন ছুঁড়ে সচকিত হয়ে হাঁটতে থাকি। পিছুন পিছু সাহেবালি। কোন উত্তর দেয় না। নিজের মনে বোধ হয় সাত-পাঁচ খানিকটা ভেবে নেয়। কিম্বা হয়তো নিজের বিচিত্র খেয়ালে এই বিশ্বাসঘাতক দুনিয়াটাকে এখনো মনের সাধ পুরিয়ে গালাগালি দিয়ে নিচ্ছে।

মোশারাফের দর্জি ঘরে ওঠার আগে পিছুন-ঘুরে একবার সাহেবালিকে দেখে নিতে যাই। ঘরের উপরের সিড়িতে দাঁড়িয়ে সাহেবালিকে দেখি। আমার জন্য সাহেবালিকেও দাঁড়াতে হয়। সিঁড়ির নিচের ধাপে দাঁড়ানো সাহেবালির মুখ যেন অপরিচিত ঠেকে আমার কাছে। যেন ভিন্ গ্রহের কোন মানুষের রঙ ও রেখা সাহেবালির মুখে। মুখের চেহারা ও রঙ সেখানে পলকে পলকে পাল্টে যাচ্ছে। আমি খানিকটা চমকে উঠি। মানুষের মুখের রঙ

যে এত দ্রুত বদলে গিয়ে নতুন নতুন মাত্রা পেয়ে যেতে পারে তা আমার কাছে প্রবল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বুকের মধ্যে কীসের যেন শিরশির যাতায়াত প্রত্যক্ষ করি। এটা কি ভয়? হয়তো। এত দিনকার পরিচিত সাহেবালির মুখটাকে অপরিচিত হয়ে উঠতে দেখে সত্যিই খানিকটা ভীত হয়ে পড়ি আমি। একটি অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

পিছন দিকে ঘরঘর ঘরঘর করে সেলাই মেশিন চালায় মোশারাফ দর্জি। যেন আধিভৌতিক জগতের কোন আর্তনাদ। আমি কোনরকমে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করার বাসনায় সাহেবালিকেই প্রশ্ন ছুড়ি পূর্ব কথার জের টেনে ঃ

— তোমার গায়ের বল-শক্তিগুলো সব কোথায় গেল সাহেবালি?

সাহেবালি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন উত্তর দেয় না। পল-মুহূর্তেরা দুদ্দাড় বয়ে যায়। আমি আবার বলি ঃ

— কী হল কথা বলছো না কেন ও সাহেবালি ভাই?

— দেড়ডা টাকার দরকার ছেলো মাস্টার। দ্যাও দেড়ডা টাকা!

— তোমার শরীর এমন ভেঙে গেল কেন?

— দেড়ডা টাকা না হলি তো চলবে না মাস্টার! আটাডা কিনিছি কিলো দেড়েক। গুড়টুড় এট্টুস কিনতি হয়। এখোন কি অতো কতা বোলতি পারা যায় তুমিই বলো মাস্টার। আমি চমকে উঠি। সাহেবালি যেন প্রবল চপেটাঘাত বসিয়ে দেয় আমার গালে। সারাদিনের অভুক্ত হয়তো। টাকাটা এক্ষুনি তাকে দিয়ে দেওয়া দরকার। পকেটে হাত ঢোকাবার মুহূর্তে আবারো বিস্মিত হতে হল। সাহেবালি আমার পাশ কাটিয়ে দোকানঘরের ভিতর ঢুকল ত্বরিত। বেঞ্চে বসল জম্পেশ করে। আমার দিকে ফিরে হড়হড় করে কথা শুরু করল সাহেবালি ঃ 'বোসো মাস্টার ভাই। এট্টুস পরামর্শ লেই তোমার কাছতে। কপাল বোধায় আমার খুলে যাতি পারে।'

দরজা থেকে পা উঠতে চায় না আমার। বিস্মিত দৃষ্টিতে সাহেবালিকে নিরীক্ষণ করতে থাকি। মাথার মধ্যে আমাব ঘিলুরা হা-ডুডু খেলার গণ্ডি কাটে। সেখানে আধপাগলা প্যাংলা-হ্যাংলা সাহেবালিকে অদ্ভুত অচেনা লাগে। সাহেবালির পরিচিত মুখের আদলে যেন আজ অন্য পুরুষ এসে বাসা বাঁধছে। সে আবার বলে ঃ

— বোসো মাস্টার। তুমি তো এম. এ. বি. এ. পাশ দেছো— মানুষির হাল-হকিকত কিছু বুঝদি পারো?

সাহেবালির এমন প্রশ্নে আমি চমকে উঠি। কী বলতে চায় সে? এত দার্শনিক কথা সাহেবালির মুখে যোগান আসছে কোথা থেকে। আমি অবাক হতে হতে বলি ঃ 'না আমি মানুষের পরিণাম বুঝতে পারিনে সাহেবালি ভাই। তুমি পার?'

— খুউব পারি।

পারো?

পারি-পারি। তার জন্যি তো তোমার কাছে পরামর্শ-চাচ্ছি।

— তুমি কী বুঝতে পার?

— মরণের পর কেডা বেহেস্তো পাবে, কেডা দোজোক পাবে তা আমি শালা এখন বুঝদি পারি!

সাহেবালির এমন কথা শুনে ঘোরের রেশ ভাঙে আমার। মনে মনে একটু হাসি পায়। তার প্রকাশ ঘটে মুখের অস্তিত্বে। বুঝতে পারি আধপাগলা সাহেবালি নতুন এক খেয়ালে মেতে উঠেছে। আমার হাসি দেখে বোধ হয় বেশ বিরক্ত হয় সে। তা গোপনও রাখে না। ঘরঘর কলকল সেলাই কল ঘোরে। সাহেবালি প্রবল অভিঘাত হেনে বলে ঃ

— তুমি হেসতোছো? তোমার বিশ্বেস হচ্ছে না তো? তুমি মিলগে ন্যাও মাস্টার, আজগে ও পাড়ার হৈবুতুল্লোরে তো মাটিতি শুবগে দেইছি, ও বেহেস্তো পাবে।

— তুমি কী করে বুঝলে— আমি প্রশ্ন করি।

— ও আমি বুঝদি পারি। কবরে যখন লাশ শুবগে দেই তখোন এটটা সোন্দর বাস নাকে পাইগো মাস্টার। গোলাপ ফুলির ছেন্টের মতোন।

মোশারাফ দর্জি থামিয়ে দেয় তার সেলাইকল। আমার মাথার ভেতর দমবন্ধ ঘিলুদের অবশ অবস্থান। পাগলা সাহেবালির কথারা সেখানে যেন কারফিউ জারি করেছে। বলে কী পাগলা! কথা ঘোরানোর জন্য আমি বলি ঃ 'তালে কবর খোঁড়ার কাজ ধরলে তুমি পাকাপাকি?' সাহেবালি যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি। সে আপন খেয়ালেই বলে চলে ঃ 'আর শালা যে সব লাশ দোজাক পাবে কী দুর্গোন্ধোরে শালা সে লাশ। নাক-মুখ শালা ফেটে যাবার জোগাড়। শালা য্যানো হাজার বছুরে পচা ইঁদুরির দেহ।'

কথাগুলো যেন সাহেবালির অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত গতি নিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমার মস্তিষ্ক ও যুক্তি একথা মানতে চাইছে না। তবুও বলার স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসে আমি যেন বোবা, হয়ে গেছি। মুখ দিয়ে কোন রকমের অবিশ্বাস ঝরাতে পারছি না। সাহেবালি এখন আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন গ্রহের জীব। সর্বজ্ঞ দার্শনিক।

মোশারাফ দর্জি ঘরঘর ঘরঘর সেলাইকল ঘোরাতে শুরু করে পুনরায়। চোখে তার অবিশ্বাসের কৌতুক। বলে ঃ 'কবরখানায় তো হাজার মানুষের ভিড় থাকে, তা ঐ বেহেস্ত-দোজখের গন্ধ আর কেউ পায় না— শুধু তুমি পাও নাকি?'

ভেবেছিলাম মোশারাফ দর্জির কথায় রেগে উঠবে সাহেবালি। কিন্তু তা হল না। সে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিল ঃ 'একেনেই তো মজাগো দর্জি। আমি পাগলা-সাগলা মানুষ আমিই তো বুঝদি পরবো। তোমরা চালাকরা পারবা না।'

সাহেবালির কথায় এবার চমকে উঠি আমরা দু'জনেই। সাহেবালিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। দেখি বাতাসে শ্বাস টানছে সে। জোরে জোরে বাতাস টানতে টানতে বলে ঃ 'নিশেষ টানো মাস্টার, দ্যাখো এখোনো আমার গা দে বেহেস্তোর গোন্ধো এট্টুস এট্টুস বেরোচ্ছে।'

আমার মাথার ঘিলুতে লাট্টু-পাক। হাজার-হাজার মৃত মানুষের হল্লা—আর্তনাদ। মেটের হাটের পরিত্যক্ত সময়েরা হুড় হুড় করে নেমে আসে। রাত ভারি হতে থাকে। কালো রাত এখন রহস্যমাখা অস্তিত্ব নিয়ে আমাকে বেস্টন করে। সাহেবালির অপরিচিত মুখটাতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোন একটি জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটাতে চাই। বুকের গভীরে কাতলা মাছের হুপ-হুপ। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো এবার। ভাবনার এমন তালগোল পাকানো মুহূর্তে আবার কথা বলতে শুরু করে সাহেবালি ঃ

— আমারে কোনো শালা ফাঁকি দিতি পারবে না মাস্টার, দোজোখ বেহোস্তো কার নামে লেকা পড়তেছে সব আমি বুঝে লোবো শালা!

— চুপ করো সাহেবালি— আমি যেন কাকিয়ে উঠি। প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বলি ঃ তা'লে তো তোমার চলা-চলতির একটা হিল্লে হলো!

— কৈ আর হোলো?— সাহেব আলি উদাস হয়।

— কেন কবর খুঁড়ে তো কিছু মিলবে।

— সে তো প্যাটভাতা। কোলখানির দিন খাবা-দাবা শুধু। সোংসারডার কী হবে?

কথা বলা থামিয়ে দেয় সাহেবালি। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু আধিভৌতিক কথা শুনতে চাই পুনরায়। সাহেবালি হিসহিসানির মতোন বলে ঃ 'দেড়ডা টাকা দিতি হয় মাস্টার নালি পরিবারডা না খেয়ে মরে যে।' আমি পকেটে হাত ঢোকাই। দুটি চকচকে কয়েন দিই সাহেবালির হাতে। কোন সাড়াশব্দ না করে সে মুরগিপটির গলিতে মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

দুই.

মুরগি হাটের গলিতে পা দিয়েই বুঝতে পারি মোশারাফের সেলাই কলটা ঘরঘর ঘরঘর শব্দ তুলে জীবনের অর্থ-খুঁজে চলেছে। এ শব্দ যেমন গতিময়, যেমন নিজস্ব খেয়ালে উদাসীন তেমনি তা করুণ বেদনার রাগিনীও। দিন ও রাত্রির ক্রান্তি লগ্নে মেটের হাটটা আজ যেন ভরা সোমত্ত যুবতীর মতো ঐশ্বর্যময়ী। তার বুকের মধ্যে এখন নামগোত্রহীন হাজার হাজার মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি কান্নার সম্মিলিত কোরাস। তারই মধ্যে মোশারাফের সেলাই কলটা যেন রূপকথার দুয়োরানির মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে একঘেয়ে টানা কান্নার বিলাপ করে চলেছে।

আমি প্রাত্যহিক রীতির দাসত্ব করে দোকানঘরের দখিনকোণে রাখা তক্তপোষটায় বসি। হাত বাড়িয়ে ক্যাস বাক্সের উপর রাখা জলের জগটা নিই। ঢকঢক করে আলগোছে খানিকটা জল খাই। হাতের চেটোর উল্টোদিক দিয়ে মুখ মুছি। তারপর খানিকটা তৃপ্তির শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ঘরের অবস্থানটার দিকে নজর ফেলি। মোশারাফ দর্জি তার পায়ে ব্যস্ততা জাগিয়ে সেলাই কলটাকে কাঁদিয়ে চলেছে। আজ তার হাটবার। কোনদিকে তাকাবার ফুরসত নেই যেন। তার মাথার অনেক উপরে জ্বলছে ষাট ওয়াটের বাতি। ঘরঘর করে সেলাই কলটা

ঘুরেই চলেছে। আর সে দিকে অপলক চেয়ে ঘরের এককোণে বসে রয়েছে সাহেবালি। হ্যাংলা বোকা সাহেবালি। মস্তিষ্কের বোধ ও বুদ্ধিতে যেমন সাহেবালি হ্যাংলা, তেমনি মাস-আশহীন কঙ্কালসার চেহারাটা তার সেই বোধেরই সঙ্গে মানানসই। পরনের ছেঁড়া-খোড়া-লুঙ্গি-পাঞ্জাবি দেখে যে কেউই আন্দাজ করে নিতে পারবে— সাহেবালি মরা গরিব।

সেলাই কল চলছে কলকল বনবন করে। সেদিকেই তাকিয়ে আছে সাহেবালি। উদাসীনভাবে। উদাসীনভাবেই। যেন জগতের আর কোন কিছুর দিকে তার খেয়াল নেই। যেন নৈঃশব্দ্যে থেকে সেলাই কলটার সঙ্গে মনের হাজারো সুখ-দুঃখের কথা বলে নিচ্ছে। তবে আমি ঘরে ঢোকার পর অন্তত তিনবার সসংকোচ দৃষ্টিতে আমাকে সে দেখে নিয়েছে। কোন কথা বলেনি। মনে হয় সেলাই কলটার যান্ত্রিক কথোপকথন সবাইকে মগ্ন রেখেছে। সেই শব্দের আড়ালে, দিন-আনা-দিন-খাবা মুটে-মজুর-খাটা-সাহেবালি নিজেকে ধরে রেখেছে। ঘরের নীরবতা কেটে দিয়ে সাহেবালির উদ্দেশ্যে যেমনি আমি প্রশ্ন রাখতে যাবো, অমনি দর্জি থামিয়ে দেয় তার কল। মুহূর্তেই হাটুরে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আর্তি এসে দাগা মারে আমাদের সকলের মনে। আমরা একে অপরের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পড়ি। বিশেষত, সাহেবালি তার চল্লিশ বছুরে রোগা রক্তহীন চেহারাটা নিয়ে আমার চোখের পর্দায় খোঁচা দিতে থাকে। আমি বলি ঃ 'বলো সাহেবালি ভাই, কাজ কাম কিছু জুটেছিল আজ?' সাহেবালি নীরব থাকে। উদাসীন থাকে। আমি আবার বলি ঃ 'সাহেবালি ভাই শরীর গতিক ভালো তো?' এবার সাহেবালি তাকায় আমার দিকে। শূন্য দৃষ্টি। দুঃখের দোয়েল পাখিরা সে দৃষ্টির অভিসারী রশ্মিতে ছুটোছুটি করে।

কয়েকটি পল নীরবে কাটে। সামনের গলি দিয়ে লাখো মানুষ যায় আর আসে। ঘরঘর শব্দ তুলে চালু হয় সেলাই কল। সাহেবালি সেলাই কলের ঘূর্ণমান চাকাটার উপর নজর ফেলে যেন আরও গুটিয়ে যায়। জগৎ ও জীবনকে সে কি গ্রাহ্য করবে না আজ? অস্বস্তিতে পড়ি আমি। বেশ চেঁচিয়েই বলি ঃ 'কি কথাটতা বলবে না নাকি সাহেবালি ভাই?' কোন উত্তর আসে না ও প্রান্ত থেকে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি ঃ

— কী দেখছো চাকাটার দিকে?

— মানুষ দেখি— এতক্ষণে সাহেবালি জবান খোলে।

— চাকার মধ্যে কীসের মানুষ?

— সাহেবালি— পাগলা সাহেবালিকে দেখি।

— কেমন দ্যাখো?

— দেখি সে মনিষ্যি বনবন করে ঘুরতেছে। লাটা লাটা চোক বের করে ঘুরতেছে।

কলের ঘুরন্ত চাকাটার দিকে আমিও দৃষ্টি নামিয়ে দিই। কোন কিছুই আমার চোখে পড়ে না। সাহেবালির দিকে তাকাই। দেখি, স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎই ছন্দ কেটে যায় সেলাই কলটার। দেখি, চাকার থেকে দড়িটা ছিঁড়ে গিয়ে সেটা

বিকল হযে গেছে। সাহেবালির মুখে দেখি যন্ত্রণার ছাপ। দুঃখের বলিরেখারা সেখানে তজবিমালা গাঁথে। চোখ থেকে কপোল পর্যন্ত অত্যন্ত ঘনোট বুননে সে মালা সাহেবালিকে স্বতন্ত্র করে। সেই জগৎ থেকে সাহেবালি কথা বলে ঃ 'শালা সব দড়িগুনো বোধায় ঐরাম ছিঁড়ে যায়।' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। সাহেবালিকে নতুন করে চেনার জন্য তাকে নেড়ে নেড়ে প্রশ্ন করি ঃ

— কোন্ দড়ি ছিঁড়ে যায় ও সাহেবালি ভাই?

— কীসির আবার সোংসারের দড়ি। বোঝ কিনা, বে করে যে দড়ি বুকি জড়গে রেখিলুম সেই দড়ি।

— কেমন করে কেটে যাচ্ছে তা বলবে একটু?

প্রশ্ন করার পর উত্তরের জন্য আমি উৎসুক হয়ে থাকি। চোখ-মুখসহ সাহেবালির মাথাটাকে আমার চোখের মধ্যে পুরে নিতে চাই। কিন্তু সাহেবালি কোন কথা বলে না। চোখে তার রাগ ও ক্ষোভের দলা কেউটে সাপের গতি নিয়ে যেন শিকারে বের হয়। হ্যাংলা-প্যাংলা বুকের মধ্যে কামারের হাফর অনন্তকাল দম দিয়ে যায়।

আমি সাহেবালির থেকে মন তুলে নিই ক্ষণিক। মোশারাফের দিকে ফিরি। দেখি হেঁট হয়ে সেলাই কলটার নিচে মাথা ঢুকিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া সত্তাটিকে পরম মমতায় বাঁধতে শুরু করেছে। বেঁধেই ফেলেছে। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে ঘরঘর শব্দ তুলে সে সেলাই কলটাকে আবার টানতে শুরু করে।

দোকানের বাইরে গলিতে লাখো মানুষের কান্নাধবনি যেন। সেখানে হাটবারের ব্যস্ত হিসেবি জীবন তৈরির আটপৌরে রাজত্ব। আমার চোখে ঘোর ও বিস্ময়। সাহেবালির দিকে তাকাই। দেখি পুনরায় সে সেলাই কলটার ঘুরন্ত চাকাটার দিকে দৃষ্টি ফেলে সসংকোচে বসে আছে। স্থির দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত নীরবতা। আমি তা ভেঙে দিয়ে বলি ঃ

-- সেলাই কলের চাকাতে কী দ্যাখো সাহেবালি ভাই?

— দেড় কিলো আটা দেকি। দেড়ড় টাকা দেকি—চকিত জবাব আসে।

— আর কিছু দ্যাখো নাকি তুমি?

— দেখি দেখি। মাংসবুকির বউ দেকি। তার পাছার বাঁধন খুলে যাতি দেকি। মোল্লেগা লিচু বাগান দেকি। সেখানে বউ আর মরদে শঙ্খ-লাগা দেকি!

পরের জিজ্ঞাসা আমার গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে গোল হয়ে থাকে। আমি কিছুতেই তাকে উগরে দিতে পারিনে। ব্যথার যন্ত্রণারা আমাকে গ্রাস করে। সাহেবালির মুখের দিকে তাকাই। দেখি দুঃখেরা সেখানে পাথর হয়ে সাহেবালির মুখের আদলটাকে শক্তপোক্ত করে গড়ছে। ওদিকে থেমে গেছে সেলাই কলের ঘরঘর কান্না। মোশারফ দর্জি এত সময়ের নীরবতা ভেঙে বলে ঃ 'বউরে মোল্লেগা বাড়ির কাজতে ছাড়িয়ে নাও সাহেবালি।' সাহেবালির চোখে দোয়েল দুঃখের বাসা। সে তবুও বলতে পারে ঃ

— তালি সোংসারডা ছারেখারে যায়। প্যাটটা সবার খালি থাকে একবেলা।

— কিন্তু এটাই বা তুমি মেনে নেবে কেমন করে। দশজনেই বা মানবে কেনো?

— মানতে হয় দর্জি। বউডা মাংসবুকির। কতা শোনবে কেনো? খাতি দিতি পারিনে। আল্লাদ দোবো কন্‌তে?

পরিবেশটা ভারি হয়ে ওঠে। সাহেবালি আবার সেলাই কলটার চাকায় নজর বেঁধায়। অজান্‌তে দর্জি তাতে পায়ের চাপ দেয়। চাকা চলতে শুরু করে বনবন, ঘরঘর। আমি বলি ঃ

— কেন সাহেবালি, তোমার তো আয়পাতি এখন ভালো হবার কথা। কবর খুড়লে তো বেশ কিছু নগদ টাকা আসার কথা!

— তুমি দুনিয়ার কিছুই জানো না মাস্টার। শুধু খানিকটা লেখাপড়া শিখে মুখ্যুমানুষির মতোন থেকে গেলে!

— কেন?

— মুখ্যু না? কবরে মানুষ কি রোজ শোয়? তার ফেরে কবর খুড়লি তো ফুলপেটা খাবা জোটে। কলমাখানির দিন বরাতজোরে গোস্তোর খানা। টাকা তো দেয় না ওরা। টাকা কনে?

— তুমি চাইতে পারো না?

— না।

— কেন?

— চাবো কী করে? সব শালার লাশের গা দে পচা দোজোকের গোন্ধোই পাই। বোঝ কিনা মাস্টার বেহেস্তোর ফুলির বাগানের গোন্ধো আর কোনো লাশের দেহরতে পাইনে।

— বলো কী তুমি, সবাই কি দোজখবাসী হবে নাকি?

— তুমিই বলো মাস্টার যেদি কেউ পাপ করে দোজোকবাসী হয় তাতি আমার দোষ কী? শালা কবরতে উঠলি সায়বালির কাছে কতো খাতির। তকোন সবাই জানতি চায় লাশের গাদে বেহোস্তোর গোন্দো বেরেচ্ছে কিনা।

আমি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি। সাহেবালির দিকে অপলক চেয়ে থাকি। সেলাই কলটা বিরতি নেয় বোধহয় একটু। সাহেবালি আপন খেয়ালে বলেই চলে ঃ 'বোঝ কিনা মাস্টার, তারপর আর টাকা পয়সা চাবার কতা মুখি আনতি পারিনেকো আমি।'

আমি সাহেবালির কথার কোন উত্তর দিইনে। পাশ থেকে সেলাই কলটা চালু করতে করতে মোশারাফ দর্জি বলে ঃ 'তালে চলা চল্‌তির খুব কষ্ট যাচ্ছে তোমার?'

— দেড় কিলো আটাও যোগাড় করতি পারিনেকো ফি-দিন। বউডা দড়ি ছিঁড়ে লেচ্ছে শালা।—সাহেবালি উদাসীন উত্তর দেয়।

— বউরে শাসনে রাখো তবে!

— বউডা পরের হয়ে যাচ্ছে— বেইমান হয়ে যাচ্ছে দর্জি।

ঘরের মধ্যে সেলাই কলের একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ। মাথার ওপর ষাট ওয়াটের বাতির লো-ভোল্টেজের মরামরা আলো। মুরগিপটির গলিতে জীবনের বিকিকিনি। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি সাহেবালির দিকে তাকাই। দেখি, শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সেলাইকলের চাকাটার দিকে মনোনিবেশ করে বসে আছে। আমাদের দু'জনের দিক থেকে যেন মন তুলে নিয়েছে। তবু বলি ঃ

— চাকার মধ্যে কী দেখ সাহেবালি!

— দেড় কিলো আটা। দেড়ডা টাকা! দোবা মাস্টার? দ্যাও!

— আর কী দ্যাখো চাকাতে?

— বেহেস্তোর সুবাস। দেড়ডা টাকা। মাংসবুকির বউডা।

— সত্যি দেখতে পাও?

সাহেবালি কোন কথা বলে না। অতি সন্তর্পনে ওঠে দু'হাটুতে ভর দিয়ে। সেলাই কলের পাশ কাটিয়ে আমার সামনে দাঁড়ায়। প্রসারিত করে দেয় তার হৃদয় ও হাত। বলে— 'দ্যাও'।

তিন.

দীর্ঘকাল মাস্টারি করার অভিজ্ঞতার নিরিখে এতদিন দাবি করতুম যে, মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। এখন দেখছি আমার এই দাবি খুব একটা জমাটি ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই। অন্তত সাহেবালির ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই কথা অবনত মস্তকে মেনে নিতে মনে কোন দ্বিধা নেই। বস্তুত সাহেবালিকে এখন যত দেখছি ততই আমি বিস্মিত হচ্ছি। এমন কী মনের মধ্যে এই চিন্তা বিশ্বাসের মতো প্রবেশ করেছে যে, সাহেবালি এই মর-জগতের কেউ নয়। স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ও পরিবেশের কোন বিশেষ কাজে ঈশ্বর তাকে নবরূপে মর্তে পাঠিয়েছেন— এমন ভাবনায় এখন আমি সাহেবালির প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাশীলও। সাহেবালিকে ঈশ্বর প্রেরিত ফেরেশতা ভেবে নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি হাজারবার— কোথাও কোন কিছুই যেন বেমানান মনে হয়নি। প্রাত্যহিক সান্ধ্য আড্ডায় মোশারাফ দর্জির সঙ্গে আলোচনা করেছি অনেক। আমার এমন বিশ্বাস দেখে সে অবাক হয়েছে। এমনকী সাহেবালির উপর দেবদূতের মহিমা আরোপে সে মৃদু হলেও আপত্তি জানিয়েছে। বলেছে ঃ 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মাস্টার? সাহেবালির দেহে কখনো ফেরেশতা বাসা বাঁধতে পারে? ও হলো হাবা-হ্যাংলা মানুষ।' মোশারাফের কথার যুক্তি আমি বুঝি, কিন্তু মন যেন মানতে চায় না। বলি ঃ 'তা যদি না হবে, তবে ঐ যে বেহেস্তদোজখের গন্ধ পাওয়ার ব্যাপারটা কী করে ঘটে?'

মোশারাফ কোন কথা বলে না। এক মনে সেলাই কলটাকে ঘোরাতে থাকে। বোধ

হয় ওর মনেও এই নিয়ে একটা সুবিপুল দ্বান্দ্বিক অস্তিত্বের সংকট এখন তৈরি হয়েছে। আমি একমনে সেলাই কলটার ঘূর্ণমান চাকাটাকে দেখি। চাকায় জীবনের ওঠানামা। দাবা-ওলা। তার মধ্যে পাগলা সাহেবালির বিস্তীর্ণ প্রসারিত হাত। হাতে সুখ-দুঃখের পালতোলা নৌকা। সাতটা সমুদ্র। ভাবি, একা সাহেবালি অতটা পথ পাড়ি দেবে কেমন করে!

সাহেবালির কথা ভাবতে ভাবতে বোধ হয় বেশ খানিকক্ষণ আনমনা ছিলুম। সম্বিত পাই দর্জির কথায় ঃ 'বেশ কটা দিন কিন্তু সাহেবালিকে এদিকে দেখা যাচ্ছে না, এটা লক্ষ করেছো মাস্টার?'

— না!

— তার খোঁজ রাখো কোন?

— না! তুমি?

— রাখি কিছু কিছু। মনে হয় তার সুদিন ফিরেছে। আশ-পাশের গ্রাম থেকে এখন কবর খোঁড়ার ডাক পাচ্ছে সাহেবালি।

— তা ওর সংসারটা একটু সুসার যাচ্ছে কি বলো!

এ কথার কোন উত্তর দেয় না দর্জি। ঘরঘর ঘরঘর কল চলায়। যেন শুনতে পায়নি আমার কথা। আমি পুনরায় বলি ঃ 'সাহেবালির জীবনটা একটু তৃপ্তি পাচ্ছে তালে?' এ কথারও কোন উত্তর দেয় না মোশারাফ দর্জি। সেলাই কলটার দিকে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছে সে। আমি এর অর্থ বুঝি। বুঝি এই প্রশ্নের কোন উত্তর দর্জির জানা নেই। বুঝি হাজারো দোজখ বেহেস্তের খবরাখবর জানুক না কেন, সাহেবালি সুখে নেই।

একটি একটি করে দিন প্রবাহিত হয় দুঃখের কাঁধে হাত রেখে। দুঃখের দোয়েল পাখিরা সাহেবালির খবর এনে দেয় আমাকে। আভাসে আভাসে শুনতে পাই পৃথিবীর মানুষেরা এখন দলা পাকায় সাহেবালির কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায়। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে সদ্য মৃতজনের নিকট আত্মীয়েরা। আকুল জানার আগ্রহ নিয়ে সাহেবালির হাবলা-হ্যাংলা দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একসময় চোখে শ্রাবণের মেঘ নিয়ে ত্রস্ত পায়ে নেমে যায়। মিলিয়ে যায়।

সাহেবালি সংক্রান্ত এতসব কথা শুনি ও মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠি। মোশারাফ দর্জির সান্ধ্য-আড্ডায় আর আসে না সাহেবালি। দর্জিকে জিজ্ঞাসা করে ভাসাভাসা ও অসমর্থিত খবর শুনে অসহিষ্ণু হই। দিনের পর দিন যায়। আমি আশা করে থাকি সাহেবালি এবার নিশ্চয়ই কোন বেহেস্তবাসীর দেহের সুবাসের গন্ধ নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাকে চমকে দেবে। কিন্তু না, তেমনটি ঘটে না। আমার হৃদয়ে আশারা মোহভঙ্গে হতাশ হতে শুরু করে। হঠাৎ করেই একদিন দর্জি খবর দেয় ঃ 'শুনোছো মাস্টার! সাহেবালির বউটা মোল্লেদের ছোট ছেলের সাথে পালিয়েছে। শালার নারী জাতটারে বিশ্বাস করাও পাপ।'

খবরটা শুনে আমি চমকে উঠি। দর্জির দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি। একবার

অন্তত সামনাসামনি সাহেবালির সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করি। মুরগিপটির পথে দ্রুত হাঁটি। পিছনে পড়ে থাকে সেলাইকলের ঘরঘর কান্না। হিসহিসানি।

মেটের হাট থেকে সাহেবালিদের সাংবেড়ে গ্রাম মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ। আমি নিমেষেই তা অতিক্রম করে ফেলি। রাতের অন্ধকার একটু আগে পৃথিবীতে নেমে বেশ জমাটি করে জাবড়ে বসেছে। আমি সাহেবালির দু'চালা ঘরের কানাচে এসে দাঁড়াই। ঘরে মৃদু আলোর সূত্র। একপাশে গোটাচারেক ছেলেমেয়ে ঘুমের দেশে নেতিয়ে গেছে। অন্যপাশে জীর্ণ শীর্ণ সাহেবালি তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই তীক্ষ্ম প্রশ্ন রাখে ঃ 'কেডা, কেডা ওখানে?'

— আমি তোমাদের মাস্টারগো সাহেবালি ভাই। তোমার খোঁজ খবর নিতে এলাম একটু। কেটে গেল বেশ কটা মুহূর্ত। ভেবেছিলাম আমার উপস্থিতিতে সাহেবালি আতিথেওতায় মেতে উঠবে। কিন্তু তেমনটা হল না। বেশ নিশ্চিন্ত দৃঢ় গলায় সে বলে ঃ 'ও! তুমি মাস্টার! এসো'। সাহেবালি একটা ছেঁড়া মাদুরের অংশ ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। নিজেকে বেশ অপমানিত মনে করলেও কীসের যেন এক অমোঘ টানে গুটি মেরে বসে পড়ি দাওয়ায়। বলি ঃ

— শরীর-গতিক ভালো তো সাহেবালি ভাই?

— মাগিডা বাঁদন খুলে গেল।—নিরাসক্ত উত্তর সাহেবালির।

— সংসারটা তোমার ভেসে গেল এবার।

সাহেবালি কোন কথা বলে না। উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি ভেঙে যাওয়া সাহেবালির বুকের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে তন্ন তন্ন করে তার সুখী অস্তিত্বের উপস্থিতি খুঁজতে থাকি। পাইনা। জিজ্ঞাসা করি ঃ 'কবর খোঁড়ার কাজটা কি ছেড়ে দিলে?'

— হ্যাঁ দিলুম।

— কেন? কিছু না হোক জাহানে দুটো খেয়ে তো বাঁচতে।

— ডাকে না আর কেউ।

— কেন, ডাকে না কেন?

— ডাকবে কী! শালা সব লাশের গা দে তো দোজুখের পচা গোন্দো পাই। বোঝ কিনা মাস্টার, দুনিয়ার সবাই বোধায় পাপী-তাপী মানুষ। শালা বেহেস্তোর গোলাপফুলির সুবাস এতো খুঁজি তেবু তারে আর দেখতি পাইনে।

একটানা এতগুলো কথা বলে কিছু সময়ের জন্য থেমে যায় সাহেবালি। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি কেন আর সাহেবালি কবর খোঁড়ার ডাক পায় না। সেই আন্দাজে বলি ঃ 'তা তুমি তো দোজখের সংবাদ না দিলেই পার সবার কাছে!'

— 'তুমি বলো কী মাস্টার'— যেন চিৎকার করে ওঠে সাহেবালি। তার ভেঙে নুয়ে

পড়া দেহটা ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে ওঠে। বলে ঃ 'না গো মাস্টার তুমি আজো মানুষ হলে না। মুখ্যুই থেকে গেলে। আমারে তো মিথ্যে কতা বলতি নিকো।'

সাহেবালির কথাতে আমি চমকে উঠলাম। আমার নাগরিক অস্তিত্বের ভিত্তিমূল দোল খেয়ে উঠল। হ্যাংলা-হাবা সাহেবালির সামনে মাথাটা নত হয়ে এল। মুখে বেশ কিছু সময় কোন কথা জোগালো না। মাথার ভেতর সেলাইকলের ঘরঘর শব্দরা হি হি হাসতে শুরু করেছে। মৌন থেকে আমাকে সেই ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে জোরে জোরে শ্বাস টানার শব্দ পেলাম। একটু ভয়ও পেলাম। চারিদিকে নিঃস্তব্ধতা। তার মধ্যেই সাহেবালি বাঁচার জন্য বুক ভরে বাতাস নিচ্ছে। আমি তার দিকে তাকানো মাত্র সে বলে ঃ 'গোন্ধো পাচ্ছো মাস্টার? কোনো পচা গোন্ধোর ঈশারা?'

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম। তা দেখে সাহেবালি আবার বলে ঃ 'আমার মরার সোমায় ঘুনগে এয়েছে মাস্টার! বউডা হুড়কে গেলো। জোন মজুরি জোটে না।' আমি একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলাম এই কথায়। এত সময় যেন দমবন্ধ ছিলাম। দোজখ-বেহেস্তের সম্মিলিত আবহাওয়ায় বাতাস ভারি ছিল। এবার মর্ত্যের গন্ধমাখা কথায় বলতে পারলাম ঃ 'আজ কিছু খাওয়া হয়েছে সাহেবালি ভাই? কাছে টাকা পয়সা কিছু আছে? সাহেবালি মাথা নেড়ে 'না' বলে।

— খাবে কিছু— আমি উৎসুক হয়ে উঠি।

— আচ্ছা মাস্টার তুমি সত্যিই কোনো গোন্ধো পাচ্ছো না? পচা গোন্ধো?

— না, পাচ্ছি না সাহেবালি ভাই—আমি যেন প্রতিবাদ করে উঠলাম।

— জানো মাস্টার, শালা আমারো কপালে দোজোখ লেকা রয়েছ। দেখতি পাচ্ছো না সারাটা দেহ দুর্গোন্ধে ভরে উঠেছ!

আমি চমকে উঠি। ভীত হই। কথা ঘোরানোর জন্য বলি ঃ

— টাকা নেবে সাহেবালি ভাই? দেড় টাকা?

— না মাস্টার তুমি মানুষ হোলে না। টাকা দে কি বেহেস্তো কেনা যায়? বউ বেঁদে রাখা যায়? মুখ্যু। শালা লেকাপড়া শিকে তুমি মহামুখ্যু থেকে গেলে। সরো। পত দ্যাও! আমাকে অবাক করে দিয়ে সাহেবালি ঘর থেকে বাইরে নামে। নেমে দাঁড়ায় একটু। বলে ঃ 'বাড়ি যাও মাস্টার। এই দোজোকে তুমি থেকো না।' বলেই হন হন করে রাতের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে, আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে।

সাহেবালির পরিত্যক্ত বারান্দাতে আমি একা বসে থাকি। জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকি! না, কোনরকম গন্ধই আমার মাথায় প্রবেশ করে না একটুও।